স্বৈরাচারের দশ বছর

'ওজারতির দুই বছর' প্রণেতা

আতাউর রহমান খান

প্রাক্তন চীফ মিনিষ্টার

পরিচিতি :

অধ্যাপক আবুল ফজল

উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশক :

মোহাম্মদ নাসির আলী

৪৬, বাংলা বাজার, ঢাকা-এক

প্রথম সংস্করণ :

নভেম্বর : ১৯৭০

প্রচ্ছদ-শিল্পী :

প্রাণেশ মণ্ডল

মুদ্রাকর :

আবদুল কাদির খান

মুদ্রণী

৪৬, বাংলা বাজার, ঢাকা-এক

মূল্য : [illegible]

উৎসর্গ ঃ

ইতিহাসের প্রচণ্ডতম ঘূর্ণীঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে
আমার দেশের যে অগণিত ভাইবোন মর্মান্তিক
ভাবে প্রাণ হারাল, আমাদেরই অক্ষমতা
পারল না যাদের রক্ষা করতে,
তাদের স্মৃতির উদ্দেশে—

'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন'

পরিচিতি

এ বইর পরিচয় এ বইতেই নিহিত। এমন বইর আলাদা পরিচয় অনাবশ্যক। লেখক আতাউর রহমান খাঁ-ও সুপরিচিত পূর্ব-পাকিস্তানের প্রাক্তন চীফ মিনিষ্টার হিসেবেই শুধু নয়, একজন সৎ জন-নায়ক আর বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিসেবেও তিনি স্বনামখ্যাত। তাঁর মতো বিবেকী জন-নায়ক আমাদের দেশে খুব বেশী আছেন বলে আমার মনে হয় না। তাঁর 'ওজারতির দুই বছর' বইতে সে পরিচয় কিছুটা বিধৃত হয়ে আছে। গুণীজনেরা বলে গেছেন, 'ক্ষমতা মানুষের চারিত্রিক অবনতি ঘটায়, যে প্রয়োগ করে তার যেমন, তেমনি যার উপর প্রয়োগ করা হয় তারও।' আনন্দ আর গৌরবের কথা, ক্ষমতার এ বিষ-ক্রিয়া আর কলুষ থেকে ক্ষমতাসীন থাকা কালে যেমন আতাউর রহমান মুক্ত ছিলেন তেমনি ক্ষমতাহীন অবস্থায়ও আছেন। এ নজির এ দেশে, এ যুগে বিরল বলেই একে আমি আনন্দ আর গৌরবের কথা বলে বিশেষিত করেছি।

ক্ষমতা ব্যক্তি আর সমাজকে কি ভাবে আর কতখানি কলুষিত করে, কি রকম অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে নিয়ে যায় চারিত্রিক অধঃপতনের পাতালপুরীর পথে আতাউর রহমান খাঁর এ দ্বিতীয় বই 'স্বৈরাচারের দশ বছর' তারও এক ঐতিহাসিক দলিল। এ দশ বছর আমাদের ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায়—সে অধ্যায়েরই এক চলমান ইতিহাস এ বই। মোটামুটি লেখাপড়া জানা শিক্ষিত মানুষও ক্ষমতা হাতে পেলে কি রকম বর্বর হয়ে ওঠে, কি ভাবে জনতা আর জন-নায়কদের ইজ্জৎ সম্মান আর মনুষ্যত্বকে পদে পদে লাঞ্ছিত ক'রে আনন্দ পায় তার দেদার নজির এ বইতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। আতাউর রহমান কোথাও কল্পনার আশ্রয় নেননি, স্রেফ নিজের অভিজ্ঞতাই তিনি বর্ণনা করে গেছেন সহজ সরল স্বচ্ছ ও নিরলঙ্কার ভাষায়। এ বই

পড়তে শুরু করলে থামার উপায় নেই—আমি অন্তত পারিনি থেমে থেমে পড়তে। ছায়া-ছবির মতো ঘটনার পর ঘটনা লেখক তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে—যার অনেকখানি পাঠক নিজেও হয়তো দেখেছেন, নিজেও হয়তো শুনেছেন কিন্তু কাল-ধর্মে তার অধিকাংশই হয়তো মুছে গেছে স্মৃতি থেকে। একমাত্র ইতিহাসই সে সবকে ধরে রাখে, দেয় না মুছে যেতে, সতর্ক প্রহরীর হাতের আলোক-বর্তিকার মতো তা সমুজ্জ্বল করে রাখে মানুষের চোখের সামনে। ইতিহাসের প্রয়োজন আর মূল্য এ কারণেই। ইতিহাস কিছুই ভুলে না, দেয় না কোন কিছুকেই হারিয়ে যেতে। তাই ইতিহাসকে ধরে রাখতে হয়, করতে হয় অনুধাবন আর উপলব্ধি। নিতে হয় তার থেকে পাঠ। জাতির এক অন্ধকার যুগের ইতিহাস আতাউর রহমান খাঁ আমাদেব হাতে তুলে দিয়েছেন—তা অধ্যয়ন করে তার থেকে সবক্ গ্রহণের দায়িত্ব আমাদের, বিশেষ করে জাতির আশা ভরসা তরুণদের। কারণ, দেশের ভবিষ্যৎ তাঁদের হাতে, দেশ-শাসনের দায়িত্ব একদিন তাঁদেরই নিতে হবে কাঁধে তুলে। অতীতে আমাদের নেতা-উপনেতারা, এমনকি কর্মীরাও কি ভাবে ভুল-ভ্রান্তি করেছেন, দেশ আর মানুষের কথা না ভেবে কি ভাবে স্রেফ ক্ষমতার লোভে হয়েছেন দিশেহারা, প্রতিটি দেশ হিতৈষীর সে পরিচয় জানা অত্যাবশ্যক। তা হলেই ভবিষ্যতে তাঁদের পদক্ষেপ হবে অভ্রান্ত। এ বই পড়লে তাঁরা বুঝতে পারবেন এ 'অন্ধকার যুগের' অন্ধকারকে অধিকতর মসীময় করে তুলেছে দেশের মানুষ, দেশের শাসক-প্রশাসকরাই। এ অন্ধকার বাইর থেকে আরোপিত নয়, এ সম্পূর্ণরূপে আমাদের নিজের হাতে গড়া, নিজের হাতে টেনে আনা। আর কিছুমাত্র প্রাকৃতিকও নয়। এ পুরোপুরি man made বা মানুষেরই তৈয়ারি। আমরা হয়েছি আমাদের নিজেদের দুর্বলতার শিকার। এ চিত্র আতাউর রহমান খাঁ যথাযথভাবে এঁকেছেন 'স্বৈরাচারের দশ বছর'-এ।

বাঙালী চরিত্রের দুর্বলতা কোথায় তাও তিনি বর্ণনা করেছেন সুস্পষ্ট আর দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। এ দুর্বলতা তিনি দেখেছেন, দেখেছেন ভিতর থেকে। দেখে ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হয়েছেন। তাঁর মর্মবেদনার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর লেখায়। বাঙালী ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না, পারে না এক জোট মিলে কোন বড় কাজ করতে। এ সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বহুবার, বহুজায়গায় কঠোর মন্তব্য করেছেন। এবিষয়ে আতাউর রহমানের মন্তব্যও কম নির্মম নয়। কারণ তিনি নিজের দেশ আর দেশের মানুষকে ভালোবাসেন, তাদের মঙ্গলামঙ্গল সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা-ভাবনার অন্ত নেই। সে পরিচয় আমরা 'ওজারতির দুই বছর'-এ যেমন পেয়েছি তেমনি পাচ্ছি 'স্বৈরাচারের দশ বছর'-এও। সব চেয়ে বড় কথা, তিনি সর্বতোভাবে আন্তরিক আর নিরপেক্ষ। তাঁর বইতে দলীয় কিম্বা কোন রকম সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগির পরিচয় নেই। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার বর্ণনায় তাঁর ভাষা হয়েছে আরো নির্মম ও কঠোর। এসব ব্যাপারে তাঁর বিশ্বাস আর মনোভাব পুরোপুরি মানবিক।

আমাদের রাজনৈতিক সাহিত্য নেই বল্লেই চলে। যাঁরা সাক্ষাৎ রাজনীতি করেন বা করেছেন তাঁদের মধ্যে আবুল মনসুর আহমদ আর আতাউর রহমান খাঁ ছাড়া আর কেউ উল্লেখযোগ্য বই লিখেছেন বলে আমার জানা নেই। রাজনীতি এখন এক সার্বিক রূপ নিয়েছে, আজ জাতীয় জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত এমন কিছু নেই যা রাজনীতির প্রভাবমুক্ত। কাজেই কোন সচেতন নাগরিকের পক্ষেই এখন দেশের রাজনীতি সম্বন্ধে উদাসীন থাকা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক সাহিত্যই রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বাড়ায়, সাধারণ মানুষকে করে তোলে রাজনীতি সচেতন। 'রাজনীতি সচেতনতা' মানে দেশের আর দেশের মানুষের হিতাহিত সম্বন্ধে সজাগতা, নিজের নাগরিক দায়িত্ব উপলব্ধি করা। এ উদ্দেশ্য সাধনে 'স্বৈরাচারের দশ বছর' যথেষ্ট সহায়তা করবে।

আতাউর রহমান খাঁ সৎ আর নির্ভীক লেখক তাই কিছু-মাত্র রেখে ঢেকে, কারো মুখের দিকে চেয়ে কথা বলেননি তিনি। নির্ভয়ে নিজের মতামত করেছেন ব্যক্ত। কিছুকাল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন বলে উপরতলার সবাইর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল—পরিচয় ছিল 'স্বৈরাচারের দশ বছর' বিয়োগান্ত নাটকের সব কুশীলবের সঙ্গে—আয়ুব খাঁ থেকে মোমেন খাঁ। কেউ বাদ নয়। এঁদের সবাইর চেহারা এ বইতে দেখতে পাওয়া যাবে—ভিতরে বাইরে সে চেহারা যে কত কুৎসিৎ তাও যাবে জানা। আইন-কানুন, বিচার-আচার, সত্য-ন্যায় সব কিছুকে পদদলিত করে এরা কি ভাবে মানুষের উপর নির্যাতনের রোলার চালিয়ে সারা দেশকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল সেদিন সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার আলোয় তার যে ছবি আতাউর রহমান এঁকেছেন তা পড়ে অনেকে লজ্জায় অধোবদন হবেন। লজ্জা এ কারণে যে, এঁরা এদেশেরই মানুষ, এদেশেই এঁদের জন্ম! আতাউর রহমান অকুতোভয়ে এদের মোকাবিলা করেছেন দেশ আর দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে নিজের স্বাধীন মতামত জানাতে আর ঐ নিয়ে এঁদের সঙ্গে তর্ক করতে এতটুকু দ্বিধা করেননি তিনি, ভয়ে কি প্রলোভনে কখনো সায় দেননি এঁদের খেয়ালখুসীর সাথে। আতাউর রহমান খাঁ কখনো লেখকের নিজের আত্মমর্যাদাকে খাটো করে কথা বলেননি। সব সময় রয়েছেন সব রকম হীনমন্যতার উর্ধ্বে। যে অটল ব্যক্তিত্ব এ বইতে ফুটে উঠেছে তা যথাযথই শ্রদ্ধার্হ।

বলাবাহুল্য এ বই শুধু গত 'কালো দশকের' ঘটনাপঞ্জী নয়, এ যুগের এক বিশিষ্ট বাঙালীর অন্তরলোকের ছবিও, যে ছবি শোভন পরিমিতবোধ আর চারিত্রিক মহিমায় বেশ দীপ্তিমান।

আবুল ফজল

সাহিত্য নিকেতন, চট্টগ্রাম
২০শে নভেম্বর, ১৯৭৩

মরা দর্দিইস্ত অন্দর দিল অগর গোয়েম জর্বা সুজদ
গর দম দর'কশম, তরসম, কি মগজে উস্তোখাঁ সুজদ।

এক

ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠলাম।

প্রায় অন্ধকার ঘর। দারুণ পিপাসায় গলা কাঠ। পানি পানি বলে চীৎকার করে উঠলাম। পাশে ইজি-চেয়ারে শায়িতা নার্স ধড়মড় করে উঠে পড়ল। পানি না কি যেন হাতে দিল। এক ঢোক গিলে দম নিলাম। বুকটা তখনও ধড়পড় করছে।

উনিশ শ' আটান্ন সালের সাতই অক্টোবরের রাত। দশটা বাজে। জিন্নাহ্ হাসপাতাল, করাচী।

সহকারী সেক্রেটারী হামিদ আলি চৌধুরীও ঘরে এক পাশে শোয়া। উঠে কাছে এসে জিজ্ঞেস করল : ব্যাপার কি, স্যার?

বললাম স্বপ্নের কথা। ইসকান্দার মির্যা নিষ্কন্ধ—দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়ে আছে কবন্ধ। মুণ্ড গড়াগড়ি দিচ্ছে নীচে, পায়ের কাছে। আমাদের একজন খ্যাতনামা বন্ধুরও একই অবস্থা। উভয়েই পাশাপাশি দাঁড়ায়ে। কবন্ধ নিশ্চুপ—স্তব্ধ! হাত নেড়ে নেড়ে কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছে। এক একবার হঠাৎ দেওয়াল ছেড়ে উভয়েই সামনের দিকে ঝুকে পড়ছে।

দারুণ ভয় পেলাম। ঘুম ভেঙে গেল।

একটু শান্ত হয়ে শুতে যাব, হামিদ আলি সুসংবাদ জানুন

করল : মার্শাল ল' অর্থাৎ জঙ্গী আইন জারি হয়ে গেছে সারা পাকিস্তানে। মন্ত্রীমণ্ডলী পরিষদ সব বাতিল। যায় শাসনতন্ত্র! রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করা হয়েছে।

প্রধান সেনাপতি জেনারেল মুহম্মদ আয়ুব খাঁ হয়েছেন জঙ্গী আইনের সর্বাধিনায়ক। চীফ মার্শাল ল' অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর।

বিরাট বিপর্যয় ঘটে গেছে এরই মধ্যে। দুঃস্বপ্নের চেয়েও ভয়াবহ বিকট।

ব্যাপারটা ঠিকমত উপলব্ধি করার মত মনের বা দেহের অবস্থা তখন ছিল না। আবার শুয়ে পড়ি। মুহূর্তের মধ্যে ঘুমায়ে পড়ি।

ঘুম ভাঙ্গল অতি ভোরে। হামিদ আলি খবরের কাগজ নিয়ে এল। পড়েই বুঝতে পারলাম, আমি নাই। বিরাট বড় বড় হরফে সুসংবাদ ছাপা হয়েছে। দেখলাম, দেশও নাই।

পাকিস্তান তিনভাগে বিভক্ত। ক, খ ও গ জোনে। পূর্ব-পাকিস্তানের নাম উঠে গেছে। হয়েছে গ-জোন বা এলাকা। আদি সত্যিকালে নাম ছিল বঙ্গ, তারপর হল বাংলা—লোকে গর্বভরে বলত সোনার বাংলা। ছাপ্পান্ন সালে প্রথম শাসনতন্ত্রের বিধানে নাম হল পূর্ব-পাকিস্তান। আটান্ন সালে নামকরণ হল গ-জোন অর্থাৎ নামহীন। ছিল একটা অর্থপূর্ণ নাম—এখন একটা অক্ষর—'গ'।

কোথায় রইল দেশ? একটা অক্ষরে পরিণত হল এই ভূখণ্ড। পরিচয় জিজ্ঞাস করলে গাঁয়ের নাম বলি, দেশের নাম বলি বুক ফুলায়ে। এখন বাড়ীঘর দেশের ঠিকানা জিজ্ঞাস করলে বলতে হবে গ-জোনে। নাম গোত্রহীন।

শুনলাম, মানুষের নামও নাকি বাতিল করা হবে। অক্ষর বা অঙ্ক দিয়ে তার পরিচয় হবে। নামের বালাই থাকবে না। কোন একটা নাটকে—বোধ হয় রক্তকরবী—পড়েছিলাম,

পাতালপুরীর অধিবাসীদের নাম নাই। নম্বর দিয়ে তার পরিচয়। কিংবা অক্ষর। আটাশের 'ক' বা ছাব্বিশের 'গ' ইত্যাদি।

শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা হয় নাই। মেলা হিসাব-নিকাশের ঝামেলা—তাই। যাক বাঁচা গেল। পৈত্রিক নামটা অন্ততঃ রয়ে গেল।

হাসপাতালের কর্তা-কর্মীরাও টের পেয়ে গেল। পূর্ব-পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে যিনি ঢুকেছিলেন তিনি আর এখন নাই। এখন আছে নামগোত্রহীন 'গ'-জোনের অমুক। খাতির-যত্নের মাত্রা কমে গেল। এখানে বাস করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

সঙ্গীরাও সেই পরামর্শ দিলেন। উত্থানশক্তি রহিত—কাজেই ধরাধরি করে নিয়ে উঠাল এক হোটেলে। বিকালে সংবাদ-পত্রে দেখলাম, আবুল মনসুর আহমদ, শেখ মজিবর রহমান, হামিদুল হক চৌধুরী এবং দু'চারজন সরকারী কর্মচারী গ্রেফতার হয়েছেন।

ঢাকায় ফিরে আসার জন্য খুব অস্থির হয়ে উঠলাম। কিন্তু বিমানে আসনলাভ করা কঠিন। সরকারী পর্যায়ে লোকজনের যাতায়াত খুব বেশী শুরু হয়েছে। আমাদের স্থান কোথায়?

বিমান বিভাগের কর্তাকে টেলিফোনে অনুরোধ করায় তিনি বার তারিখ রাত্রে আমাদের ঢাকা আসার ব্যবস্থা করলেন।

ফিরে আসার আগে ইসকান্দার মির্যার সাথে দেখা করা অত্যন্ত জরুরী মনে করলাম। বিপর্যয়ের নায়ক—তার সাথে দেখা করে ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে শুনে যাওয়াই উচিত। কি হল, কেন হল, পরে কি হবে ইত্যাদি।

দেখা করাও কঠিন। জানা গেল তিনি কারও সাথে দেখা করেন না। অগত্যা একটা চিঠি লিখে পাঠায়ে দিলাম।

এক ঘণ্টার মধ্যেই খবর এল, তিনি এগার কি বার তারিখ

দেখা করতে পারেন। ঠিক হল বার তারিখে বেলা এগারটায় সাক্ষাৎ হবে।

গেলাম: গাড়ী বারান্দা পর্যন্ত এসে ধরে নিয়ে গেলেন। বললেন, এত কষ্ট করে না এলেই হত। ঢাকা ফিরে যাবার দরকারই কি? ওখানে কি ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। আমি ত ডাক্তারকে বলে দিয়েছি যেন ভাল ব্যবস্থা করে, ইত্যাদি।

বললাম, শোকরিয়া। কষ্ট হলেও জানা দরকার কি উদ্দেশ্যে এই সব করলেন।

এমন সময় মার্কিন রাষ্ট্রদূত ল্যাংলী ঘরে ঢুকলেন। মির্যা আমার সাথে তাঁর পরিচয় করাতে গেলে রাষ্ট্রদূত বলে উঠলেন, খুব ভাল চিনি। আরও দেখা হয়েছে।

মির্যা বললেন, সেটা কথা নয়। এই লোকটির উপর আমার ভরসা ছিল। আশা করেছিলাম ইনি গণতন্ত্র স্থাপনে সহায়তা করতে পারবেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকে নিরাশ করেছেন। নিজেও কম নিরাশ হন নাই। যার ফলে কয়েক বার পদত্যাগ করতে চেয়েছেন। প্রত্যেক বারই আমি তাঁকে নিষেধ করেছি।

তারপর রাজনীতি, নির্বাচন, দেশের দুরবস্থার কথার উল্লেখ করলেন। আমি বললাম, শাসনতন্ত্র বাতিল করা গর্হিত হয়েছে। অন্য কিছু করতে পারতেন। জনগণের দলিল কেমন করে নাকচ করলেন?

বললেন, নিরুপায় হয়েই করেছি। স্পীকারকে মেরে ফেললেন। গণতন্ত্র হত্যা করলেন। নির্বাচন হলে কি হত্যাকাণ্ড যে হত তা বলাই যায় না।

বললাম, শাহেদ আলির হত্যাকাণ্ড অতি জঘন্য সন্দেহ নাই কিন্তু এই কারণেই কি শাসনতন্ত্র বাতিল করলেন? নির্বাচন বন্ধ করার এটা ফন্দীমাত্র। নির্বাচন ত চুয়ান্ন সালেও হয়েছিল।

কৈ, একটি প্রাণীও ত মরে নাই। কোন গণ্ডগোলই ত হয় নাই।

বললেন, আমার ধারণা একটা কুরুক্ষেত্র হয়ে যেত।

বললাম, ভুল ধারণা।

আরও অনেক কথা বললাম, গণতন্ত্র স্থাপন করতে হলে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। অন্যান্য দেশেও তাই হয়েছে। ত্যাগের ভয়ে গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করে দিলেই দেশের কল্যাণ সাধিত হয় না। বরং ঘোর অমঙ্গল ডেকে আনা হয়।

বিদায়ের প্রাক্কালে বললেন, তাড়াতাড়ি সেরে উঠুন। আপনাকে আমার প্রয়োজন হতে পারে অল্পদিনের মধ্যে।

চলে এলাম। রাত্রে করাচী ত্যাগ করে হাওয়ায় ভর করে উড়লাম পূর্ব দিকে, গৃহ-কোণে। তেরই অক্টোবর ভোরে ঢাকা নামলাম। এয়ার-পোর্টে স্বাভাবিক ভিড়। কে কার খবর নেয়? পরিচিত দু' একজন লোক আড় চোখে চেয়ে কোন রকম হাতটা উপরে উঠায়ে কেউ দেখবার আগে নামায়ে ফেলে! সম্ভাষণের নমুনা।

গাড়ীতে উঠছি একজন করিৎ-কর্মা কর্মচারী কাছে এসে বলল: আপনাকে অ্যারেষ্ট করা হবে। সারারাত চেষ্টা করেছি—অনুনয় বিনয় করেছি—মানল না।

সটান বাসায় চলে এলাম। সব সুমসাম। এখানে ওখানে টেলিফোন করি। কেউ ধরে, কেউ ধরেনা। যে ধরে সেও কথা কয়না। হুঁ হাঁ করেই টেলিফোন ছেড়ে দেয়। জানতে চাই, এখানকার পরিস্থিতি। কিন্তু উপায় নাই

ওমরাও খাঁকে টেলিফোনে ধরলাম। জিজ্ঞেস করলাম, গ্রেফতার করবেন নাকি? করলে কবে?

উত্তর দিলেন, কিছুই বলা সম্ভব নয়। দেখা হলে বলবেন। রাত্রে টেলিফোন করে আমাকে জানাবেন কখন সাক্ষাৎ হবে।

প্রায় দশটার সময় খবর দিলেন যেতে। বল্‌লাম, মাণিক-মিঞাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। রাজী হলেন।

গেলাম ওমরাও খাঁর বাসভবনে। চেহারা বদলে গেছে। নানা কথা বললেন। এমন সব কথাও বললেন যা বলার সাহস এত দিন হয় নাই। আমাদের ভুল-ক্রুটি, অন্যায় অবিচার সব।

কথার জবাব দেওয়া সমীচিন মনে হল না। তবুও বললাম, এত ঘনিষ্ঠতা সত্বেও কোনদিন ত বলেন নাই। তা হলে বন্ধুর কাজ করতেন

বললেন, বলি নাই স্পষ্ট, তবে ইশারায় বুঝাবার চেষ্টা করেছি ত' একবার কিন্তু শোনার অবস্থা ত আপনাদের ছিল না।

অনেক কথার পর বললাম, অতি বিরাট দায়িত্ব আপনারা কাধে নিয়েছেন। দাবীও করেছেন চরম-মোক্ষম। দেশ থেকে দুর্নীতি অন্যায় অবিচার সব দূর করে দিয়ে পাকিস্তানকে কলঙ্কমুক্ত করবেন। রাজনীতিকরা এই সবের জন্য দায়ী ছিলেন বলে তাদের তাড়ায়ে দিয়েছেন। এখন এই দায়ীত্ব পুরাপুরি পালন করতে হবে আপনাদের। আপনারা ফেল করলে দেশ গেল। আমাদের বিকল্প ব্যবস্থা সব সময়েই পাওয়া যেত। একজন গেলে অন্যজন এসে পড়ে। কিন্তু আপনাদের বিকল্প কল্পনা করতে পারব না। আপনারাই শেষ।

তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, ফেল করব কেন? যে দায়িত্ব নিয়েছি, তা পালন করবই।

বললাম, মহাসুযোগ পেয়েছেন, একে উপেক্ষা করতে পারবেন না। আপনাদের হাতে ক্ষমতাও অসীম। যে কোন অবস্থার মোকাবেলা করার জন্য রাতারাতি আইন তৈরী করতে পারেন আপনারা। আমাদের যেমন সব বাধাবিপত্তির মোলাবিলা করতে হত আপনাদের তা করতে হবে না। কাউকে

সন্তুষ্ট করবার জন্য বা কারও ভয়ে কোন কাজ করার প্রয়োজন আপনাদের হবে না। আমাদের হাত পা বাঁধা ছিল নানাদিক দিয়ে। আপনারা হস্ত-পদ মুক্ত।

বললাম, আর একটা বিশেষ সুবিধাও আপনাদের আছে। সমস্যা সম্বন্ধে অজ্ঞতা।

অ্যাঁ, বলেন কি? চমকে উঠলেন। একটু বিরক্তির ভাব।

বললাম, ঠিকই বলেছি। দেশে অন্তহীন সমস্যা। দিন দিন বেড়েই চলেছে। কোনটা ছেড়ে কোনটা ধরবেন। একটার সমাধান হতে না হতে দশটা গজায়ে উঠবে। এর আশেপাশে আপনাদের যাবার দরকার হবে না।

বললেন, আমরা সব সমস্যার সমাধান করে ফেলব। দেখুন, আমি ভেবে দেখেছি, সমস্যা-সমাধান খুব কঠিন কাজ নয়। আন্তরিকতা ও সত্যের সাথে কাজ করলে খুবই সোজা।

বললাম, সেই জন্যই ত বলছিলাম। সমস্যার গুরুত্ব সম্বন্ধে আপনারা অজ্ঞ। এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটাই মঙ্গল। তবুও আমরা যেসব সমস্যাকে কঠিন ও দুঃসাধ্য মনে করেছি, আপনাদের কাছে তা সহজ হয়ে যেতে পারে। আপনাদের রেগুলেশনের প্রকোপ এখনও স্বচক্ষে দেখি নাই। কিন্তু শুনেছি দারুণ ক্ষমতা ওর—প্রায় অসীম। যা দুঃসাধ্য তা ওর শক্তিবলে সহজ সাধ্য হতে পারে—এটা ত মঙ্গলের কথা।

বললেন, আপনার সহযোগিতা বা সহায়তাও আমাদের প্রয়োজন হতে পারে। আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলাফল আমাদের উপকার করতে পারে।

বললাম, দেখুন, আপনাদের বিধিব্যবস্থায় আমাদের কিছু করার আছে কিনা জানিনা। না থাকারই কথা। কারণ আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী না হলেও বিলকুল আলাদা

ধরণের। আমাদেব কর্মপদ্ধতি ও অভিজ্ঞতা আপনাদের পদ্ধতি থেকে পৃথক। এখানে আমরা কি করতে পারি? তবে দেশের কল্যাণ হয়, এমন ব্যাপাবে যদি সহায়তা কবতে পারি, তা হলে অকাতরে তা আমবা করব।

উঠার আগে জিজ্ঞেস কবি .. ফ তাব করবেন নাকি?

বললেন, এখনও বলা কঠিন। সবুর করুন।

সবুব ত কববই।

দুই

আটান্ন সালের অক্টোবর মাসের তিন তারিখে করাচী যাই ইকনমিক কাউন্সিলের মিটিং-এ যোগদান করতে। তার আগের দিন আমাদের দল থেকে কয়েকজন ফিরোজ খাঁ-নুনের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন।

এ ব্যাপারে আমার জ্ঞান সীমাবদ্ধ। আমার মতামত বা পরামর্শ কেউ নেন নাই। ফিরোজ খাঁ-নুন আমাকে চিঠি দিয়েছিলেন কয়েকজনকে করাচী পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য। তাঁদের নামও লিখে দিয়েছিলেন। তাঁদের সাথে যোগাযোগ করার আগেই জানতে পারলাম শেখ মুজিবুর রহমান তাদেরে নিয়ে চলে গেছেন।

আমাদের দল থেকে কয়েকজনকে মন্ত্রিত্বে যোগদান করার জন্য ফিরোজ খাঁ-নুন গোড়া থেকেই পীড়াপীড়ি করেন। যেদিন প্রধানমন্ত্রী হন, সেদিনও বলেছিলেন যে আমাদের কয়েকজন তাঁর মন্ত্রিসভায় না গেলে তিনি ইস্তফা দেবেন।

তখন বলেছিলাম, মন্ত্রিত্বে যোগ দিয়ে দলভারী করাই আমাদের উদ্দেশ্য নয়। পূর্ব-পাকিস্তানী কেউ আজ পর্যন্ত কোন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে নাই—অর্থাৎ দেওয়া হয় নাই। অর্থ ও শিল্প-বাণিজ্য বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। আমাদের আমলে অর্থাৎ সোহরাওয়ারর্দীর মন্ত্রিত্ব কালে আবুল মনসুর আহমদ শিল্প বাণিজ্য দফতরের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন তের মাসের জন্য। অর্থ বিভাগের ভার আজ পর্যন্ত কেউ পায় নাই। এই দুই বিভাগের অন্ততঃ একটি আমাদের দিতে হবে। ফিরোজ খাঁ নিমরাজী হয়েছিলেন। তার পর অনেকদিন ব্যাপারটা চাপা থাকে।

আজ হঠাৎ এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নিয়েই মন্ত্রিত্বে যোগদান করার কি অর্থ হতে পারে? বিকাল বেলা নেতাকে টেলিফোন করে বললাম যে আমি পরদিন করাচী যাচ্ছি। ফিরোজ খাঁর সাথে আমার যে কথা হয়েছিল, তার একটা ফয়সালা করার পর শপথ নিলেই ভাল হয়।

নেতা বললেন, আহা, বড় দেরী হয়ে গেছে। ইট ইজ টু লেইট নাউ। এতক্ষণ বোধ হয় শপথ-পর্ব সাঙ্গ হয়েই গেছে।

তিন তারিখে বিকাল বেলা করাচী এয়ারপোর্টে পৌঁছেই দেখি মাণিকমিঞা উপস্থিত। বললেন, এখান থেকে সটান চলুন নেতার ওখানে। গিয়ে দেখি তিনি প্রেস কনফারেন্স করছেন। খুব ব্যস্ত। বাইরেও ভিড়। বললেন, এখন যাও, কাল ভোরে এস।

কাল ভোরে গেলাম। মাণিক মিঞা, শামসুল হক ও আমি।

মাণিক মিঞার কাছে জানতে পারলাম, পোর্টফোলিওর ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত এখনও হয় নাই। দর কষাকষি হচ্ছে। আমাদের দাবী অগ্রাহ্য হলে মন্ত্রীরা ইস্তফা দেবেন বলে হুমকি দিয়েছেন।

বললাম, তলে পড়ে গিয়ে চেঁচালে লাভ কি? ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়েছে। মিটমাট না করে ঢোকা উচিত হয় নাই। ঢোকার পর দাবী অগ্রাহ্য হওয়ার অজুহাতে ছেড়ে দেওয়াটাও অনুচিত হবে।

মাণিক মিঞারও তাই মত। তাড়া-হুড়া করে এটা না করাই উচিত ছিল।

নেতাও তাই বললেন। বললেন, এখন উপায় নাই। ফিরোজের হাতে ছেড়ে দাও। যা করার সে-ই করবে।

মাণিক মিঞা বললেন, শেখ মুজিব ও মন্ত্রীরা ত রাজী হচ্ছেন না। তাঁরা সাব্যস্ত করেছেন, ছেড়েই দিবেন।

নেতা বললেন, কাজটা ভাল হবে না কিন্তু। আমিও বললাম। ছেড়ে অবশ্য দিলেনই তারা।

অন্যান্য কথার পর মাণিক মিঞা আসন্ন নির্বাচনের কথা উত্থাপন করলেন। বললেন, নির্বাচনের ফলাফল আমাদের পক্ষে আশাপ্রদ হবে বলে মনে হয় না। আমাদের পার্টি শতকরা তিরিশটা আসন দখল করতে পারলে ভাগ্য বলে মেনে নেব।

নেতা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। পরে বললেন, বটে? এতই শোচনীয়!

হাঁ স্যার। অবস্থা সঙ্গীন। এবং তার জন্য আমরাই দায়ী। আওয়ামী লীগকে যে পর্যায়ে নামায়ে আনা হয়েছে তাতে এর চেয়ে বেশী আশা করা উচিত হবে না। অবস্থা সত্যিই নৈরাশ্যজনক।

নেতা বিছানায় বসেছিলেন—শুয়ে পড়লেন। মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

মাণিক মিঞা সান্ত্বনার সুরে বললেন, স্যার, এত ঘাবড়াবার কারণ নাই। বর্তমান অবস্থা যা, তাই বললাম। অবস্থার পরিবর্তন হওয়া যে সম্ভব নয় তা বলছি না। আপনি যদি একটু শক্ত হন তা হলে নিশ্চয়ই বর্তমান অবস্থার উন্নতি হতে পারে। আমরা ঠিক করেছি, এখান থেকে ফিরে যাবার পরই চীফ মিনিষ্টার সফরে বার হয়ে যাবেন। সব জেলা ও মহকুমায়, এমনকি সম্ভব হলে থানায় পর্যন্ত একটানা মিটিং করে যাবেন। প্রয়োজন হলে মফস্বলেই কেবিনেট মিটিং করবেন এবং দৈনন্দিন কাজকর্ম ফাইল দস্তখত ইত্যাদি মফস্বলে বসেই সম্পন্ন করার বিশেষ ব্যবস্থাও করবেন। আপনি সারা ডিসেম্বর মাসটা পূর্ব-পাকিস্তানে সফর করবেন। সব জায়গায় আপনার যেতে হবে না। গোটা কুড়ি সভায় আপনি বক্তৃতা করলেই চলবে। জানুয়ারী মাস আপনি কাটাবেন পশ্চিম-পাকিস্তান সফরে। ফেব্রুয়ারীর প্রথম বা মধ্যভাগে

পূর্ব-পাকিস্তানে ফিরে যাবেন এবং ইলেকশন পর্যন্ত ওখানেই থাকবেন। আমরা একটা প্রোগ্রাম তৈরী করে আপনাকে পাঠায়ে দিব। দয়া করে সেই অনুযায়ী কাজ করবেন। এই ভাবে আওয়ামী লীগের লুপ্ত গৌরব পুনরায় উদ্ধার করা সম্ভব হতে পারে। ইনশাল্লাহ বিপুল সংখ্যাধিক্যে ইলেকশনে জয়লাভ করতে পারব।

মাণিক মিঞা শেষ করার সাথে সাথে, নেতা একটা ঝাঁকানি দিয়ে উঠে পড়লেন। মাথা নেড়ে নেড়ে বললেন, ইয়েস, এগ্রিড। নোট বই খুলে লেখা আরম্ভ করলেন। চেহারার জ্যোতি আবার ফিরে এল। ধীরে ধীরে সারা মুখ রক্তিম হয়ে উঠল। চোখে আনন্দের আভাস। বললেন, ঠিক আছে। যা বলবে তোমরা, তাই করব।

ঐ দিন তাঁর সফরে বার হয়ে যাবার কথা বেলা দেড়টায়। জ্যাকোকাবাদ যাবেন, তার পর অন্যান্য জায়গায়।

তিনি চাঙ্গা হয়ে উঠলেন যাবার জন্য। সব গোছাতে লাগলেন। পরের দিন যে ন্যাশনাল ইকনমিক কাউন্সিলের 'মিটিং' হবে, সে সম্বন্ধেও আলাপ আলোচনা করলেন।

বেলা দশটায় উঠে পড়লাম। নেতা বার বার বলতে লাগলেন, গড ব্লেস ইউ, গড ব্লেস ইউ।

তারপর, সাধারণত যা করেন না—উঠে বার হয়ে এলেন কাঁধে হাত রেখে। জিজ্ঞাসা করলেন, বাহন আছে ?

হেসে বল্লাম, স্যার এখনও চীফ মিনিষ্টার আছি, একটা গাড়ী থাকবে না আমার জন্য ?

খুব জোরে হাসলেন, বললেন, অফ্ কোর্স।

ঐ দিনই রাতে অসুখ করল আমার—ভাইরাস নিউমোনিয়া। পরদিন ভোরবেলা সবাই ধরে হাসপাতালে নিয়ে এল—জিন্নাহ হাসপাতালে।

দুই দিন পরই বিপর্যয়—মার্শাল ল'—জঙ্গী আইন।

তিন

দেশে জঙ্গী আইন ঘোষণা করেছে—মার্শাল ল' রেগুলেশন। রেগুলেশনের নির্দেশে সব কিছু উলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। হুকুম অমান্য করলে মার্শাল ল' রেগুলেশনের অপরাধ ও বিচার। রোজই দু'চার পাঁচটা রেগুলেশন জারী হচ্ছে। এটা করলে তিন সাল ওটা না করলে পাঁচ সাল, দশ সাল। শুধু সালই নয়, বেত্রাঘাতও সাথে সাথে। চরম দণ্ডও দেওয়ার অধিকার আছে রেগুলেশনের—মৃত্যুদণ্ড।

হুকুম জারী হল, দ্রব্যমূল্য কমাও। হু হু করে কমতে লাগল। না কমায়ে উপায় নাই। তিরিশ টাকা গজের কাপড় পনর টাকা। এমনি হিসাব। একজন ব্যাপারী টেলিফোন করে দুরবস্থার বর্ণনা দিল। দুই দিনে আশি হাজার নেমে গেছে। কাল নাগাদ মাল খালাস। লাখের উপর লোকসান দিয়ে দোকানে তালা লাগাব।

চিনামাটির দোকানে মানুষের মাথা—লাইন লেগে গেছে। তিনশ টাকার ডিনার সেট দেড়শ টাকায়—পঞ্চাশ টাকার টি-সেট কুড়ি টাকায়। অন্যান্য জিনিষও ঐ দরে।

কেনা দামের চেয়ে অনেক কম দামে বিক্রি করতে হল। এর আগে অবশ্য অনেক বেশী মুনাফা লুটেছে। কিন্তু তার প্রতিশোধ ত এই ভাবে হয় না। দোকানদার তার মাল খরিদের রশিদ পত্র দেখায়ে অন্ততঃ কেনা দামে বিক্রি করার অনুমতি দেবার জন্য মিনতি করেছে। কোন ফল হয় নাই।

কিন্তু যাদের সুবিধার জন্য সস্তাদরে বিক্রি করার হুকুম জারী হল—গরীব জনগণ, তারা এর আশে পাশেও নাই:

অর্থাৎ তারা বাইরে থেকে দেখেই খুশী। এসব কেনার ক্ষমতা তাদের নাই। যারা আগেও বেশী দামে কিনতে পারত, তারাই কিনল কম দামে। সুযোগ পেল তারাই। ছোট ছোট দোকানদারেরা কিছু কিনে পরে লাভ করার সুযোগ নিল। বড় বড় দোকানপাট খালি হয়ে গেল।

এই হিড়িক চলল সামান্য কয়েক দিন। তার পর যে কে সেই।

জঙ্গী আইনের কর্তারা বুঝলেন, অবশ্য বিলম্বে, যে হুকুম দিয়ে জিনিষের দাম কমান যায়, কিন্তু সেটা স্থায়ী হতে পারে না। আর সমস্যার সমাধানও তাতে হয় না।

অফিস আদালতেও দারুণ তাড়াহুড়া। কাজ হোক না হোক হাত পা নাড়াচাড়া খুব চলছে। সবাই শশব্যস্ত।

কাছারীতে হাকিমের ক্ষিপ্রগতি। কচু-কাটার মত মোকদ্দমা ধরছেন আর শেষ করছেন। মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এরই মধ্যে সব মোকদ্দমা শেষ করতে হবে। গুদাম খালাস করার মত।

এক রসিক হাকিমের সাথে দেখা। বললাম, খুব চালাচ্ছেন বুঝি!

হেসে বললেন, খুব চালাচ্ছি। ইনসাফ হোক না হোক সাফ করে ফেলছি সব। মামলা মোকদ্দমার আবর্জনা আর রাখব না।

তাই হল। কিন্তু কিছুদিন পর সেই সব আবর্জনা উর্দ্ধতন আদালতে গিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াল। নতুন রূপ পেল। কোন ক্ষেত্রে একটার জায়গায় তিনটা হল। একদিকে কমে আরেক দিকে বাড়ল। তা হোক, প্রথম চোটে কমল ত। জঙ্গী আইনের বিধানই তাই।

সেক্রেটারীয়েট বড় বড় আমলাদের ঘাঁটি। হঠাৎ একদিন সব দরজা বন্ধ। বাইরে সিপাই সান্ত্রী পাহাড়া। ব্যাপার কি?

বড় বড় কর্মচারী বিলম্বে অফিসে আসেন। তাদের ধরার জন্য এই ব্যবস্থা। অনেকেই বাইরে পড়ে গেল। ভেতরে ঢোকার পথ বন্ধ। বেকায়দায় পড়ে গেল বেচারারা। ও দিনের মত কামাই লেখা গেল।

ঐ একদিনই। কয়দিন পর আবার আগের মত চলল। হুকুম দিয়ে অভ্যাস পরিবর্তন বা চরিত্র গঠন করা সম্ভব নয়। মার্শাল ল' র কর্তারা এটাও বুঝলেন।

বাড়ীঘর পরিষ্কার করার নির্দেশ হল। সবাই লেগে গেল ঘষামাজার কাজে। চারদিকের গাছপালা কেটে পয়মাল। ফলবান বৃক্ষ। সবই আবর্জনা। অনেক পুরাতন বাড়ী নতুন পোষাক পরল। মেরামত চুণকাম হল বহুকাল পরে। টাকা ধার করে বৌ-এর গয়না বিক্রি করে বা বাঁধা দিয়ে এ সব করল।

মার্শাল ল' এসে গেছে। যুগের পরিবর্তন হচ্ছে। পুরাতন জরাজীর্ণ কোন কিছুই টিকে থাকতে পারবে না। সব নতুন করতে হবে—অন্ততঃ নতুনের চেহারা দেখাতে হবে।

মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স কয়েক বছর অনাদায়। লাখ দশেক কি তারও বেশী। হুকুম হল পনর দিনের ভেতর সব আদায় করতে হবে। হয়ে গেল আদায়। হাঁড়ি পাতিল, ঘটি বাটি, তামা কাঁসা বেচে ট্যাক্স আদায় করল।

ওমরাও খাঁ একদিন বললেন, দেখলেন কেমন করে টাকা আদায় হয়? আপনারা ফেলে রেখেছিলেন দশ বছর। আমাদের লাগল পনর দিন। কৃষককে ঋণ দিয়েছেন, ফেরৎ দেবার নামও করে নাই। হুকুম দিয়েছি, সুদসহ শোধ করেছে।

বললাম, আগেই একদিন বলেছি, আপনাদের শক্তি অসীম। অসাধ্য সাধন করতে পারেন। হুকুম দিলেন সঙ্গে সঙ্গে কাজ হয়ে গেল। স্বীকার করি, আমরা এ রকম পারি নাই। এই

যে দিল বা দিচ্ছে. এতে লোকের ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে। না খেয়ে অনেকেই ধার শোধ করেছে এদের প্রতি একটু দয়া না করলে চলবে কেমন করে ?

বললেন, দয়া করলে রাষ্ট্র চলবে কেমন করে ?

বললাম, আমাদের দেশের জমিদাররাও তাই বলত। দয়া করলে জমিদারী চলবে কেমন করে ? শেষ পর্যন্ত দয়া না করেও কিন্তু জমিদারী টিকে নাই। মানুষের জন্যই দেশ রাষ্ট্র ও জমিদারী। মানুষ না বাঁচলে দেশ বাঁচার কোন অর্থই হয় না।

বললেন, আপনি খুব সত্যি বলেছেন। দিল ত সবাই। টাকা আছে, দিবে না সব কাজেই দেদার টাকা খরচ করে, অথচ ট্যাক্স খাজনা ও ঋণ পরিশোধের বেলায় টাকা নাই। আপনি এ সব বাহানা বিশ্বাস করেন ?

বললাম, সত্যি, বাহানা নয়।

পূর্ব-পাকিস্তানে প্রতিটি মানুষের ঘরে টাকা আছে অথচ বার করে না, এ কথাটা ওদিককার প্রায় সকলেই বিশ্বাস করে। ওমরাও খাঁ একা নয়।

চৌধুরী মোহাম্মদ আলি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে পূর্ব-পাকিস্তানের শিল্প-বাণিজ্যের অনগ্রসরতার কথা উল্লেখ করলে তিনিও ঐ কথা বলতেন। পুঁজি গঠন হয় না। টাকা ব্যাঙ্কে রাখবে না। মাটির নীচে টাকা পুঁতে রাখবে অথচ ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োগ করবে না। ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রগতি হবে কেমন করে ? শুধু কেন্দ্র থেকে টাকা চাই। টাকা আদায়ের এটা একটা ফন্দি।

ফিরোজ খাঁ-নুনও তাই মনে করতেন। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে একদিন আমাকে বললেন, এদিকে জমিনের খাজনা বিঘাপ্রতি এক টাকা দু'টাকা। আশ্চর্য। দশ টাকা ধার্য করে দিন। না হলে কেমন করে চালাবেন ?

বলেছিলাম, দেবে কোথেকে? ধার্য করলেই ত আর হয় না? কৃষক মরে যাবে। অনাবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি এ সব কৃষকের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে।

বললেন, তা ত সব দেশেই হচ্ছে। এখানে এদের হাতে টাকা আছে অথচ দেবে না। চাপ দিন। আইন পাশ করুন। দেখুন কেমন দেয়। তা না করে শুধু চাইবেন কেন্দ্রের কাছে। কেন্দ্রের ভাণ্ডার কি অফুরন্ত?

বললাম, আমাদেরই দেওয়া টাকার সামান্য অংশ ফেরৎ দিয়ে দানের মহিমা অর্জন করবেন না?

মার্শাল ল'র কর্তাদেরও ধারণা ছিল, টাকা আছে অথচ দেবেনা।

ভীতত্রস্ত মনে চারিদিকে তাকালে মনে হয় যুদ্ধ জয় করে বিরাট সেনাবাহিনী দখল করেছে এই দুর্ভাগ্য দেশ। উদ্ধত বিজয়ীর উৎকট আস্ফালনে পরাভূত দেশবাসী সন্ত্রস্ত। মানুষের অন্তরাত্মা পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। সহজ সরল জীবনধারা নিস্তব্ধ হয়ে উঠেছে। বিপর্যয়ের ঢেউ ছড়ায়ে পড়েছে সর্বত্র—দেশের আনাচে কানাচে—জীবনের সর্ব পর্যায়ে মার্শাল ল'র প্রকোপ।

নিত্যনতুন আইন জারী করে নতুন ধরণের অপরাধ সৃষ্টি করে তার অভিনব বিচারপদ্ধতি প্রবর্তন করেছে নতুন রাজা। বিজয়ী বীর তার বিশাল স্কন্ধে গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেছে নব-পর্যায়ে দেশ শাসন করার।

আগের ইতিহাস ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন ইতিহাস রচনা করতে হবে—সেটাই নাকি হবে জাতির সত্যিকার ইতিহাস।

চারদিকে সিপাই সান্ত্রী। তারাই রাজা, তারাই মালিক, তারাই দেশ। এই দেশরক্ষার দায়িত্ব ত ছিলই গোড়া থেকে, এখন সামান্য ব্যক্তিমাত্র হয়েছে। কামানের লক্ষ্য ঘুরে গেছে। ছিল বাইরের দিকে, ঘুরে এখন [illegible] হয়েছে উল্টো দিকে—দেশের দিকে।

[illegible]—

মহামতি কায়ানী বলেছেন, আমাদের সেনাবাহিনী দারুণ চমৎকার কাজ করেছে। তারা নিজের দেশটাই জয় করে ফেলেছে।

অন্য দেশ জয় করার চেয়ে নিজের দেশ জয় করা অনেক সহজ। নিরাপদও। কোন হাঙ্গামা নাই। গুলি খরচ নাই। অথচ একটা জয় করার গৌরব আছে। শুধু জয়ই নয়—বিপ্লব। বিরাট বিপ্লব!

সত্যিকার বিপ্লব বলে কেউ কেউ মনেও করে। অনেকে আনন্দ ও তৃপ্তিও লাভ করে। জরাগ্রস্ত মনে পরিবর্ত্তনই আনন্দ —ক্লীবের আনন্দ।

দেশের সনাতন আইন পঙ্গু হয়ে গেছে। রেগুলেশনের প্রতাপে আইন কানুন কোনঠাসা হয়ে গেছে। কোর্ট কাছারীও পরাধীন। নতুন আইনের বলে স্থাপিত হয়েছে সামারী মিলিটারী কোর্ট। স্পেশাল মিলিটারী কোর্ট।

সিপাইরাই বিচারপতি। বিচারের পদ্ধতি সরল ও সংক্ষিপ্ত, প্রমাণ আরও সংক্ষিপ্ত। না হলেও ক্ষতি নাই। অনুমানই যথেষ্ট। সামারি কোর্ট প্রমাণ লিপিবদ্ধ করতে বাধ্য নয়। করেও না। স্পেশাল কোর্টে দুইজন সিপাই একজন ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি সাক্ষী-গোপাল।

মোকাদ্দমায় পুরাতন দলিল পত্রও বেকার। দুই পক্ষে দলিল পেশ করা হয়েছে। হাকিম হুকুম দিলেন, পুরাতন বাতিল, নয়া দলিল লাও—একদম নয়া। অর্থাৎ পুরাতন কোন কিছুই চলবে না। দলিল-দস্তাবেজও না।

এই সব বিচারালয়ে শাস্তি অমোঘ ও নির্মম। অভিযুক্ত হলেই অর্দ্ধেক সাজা হয়ে যায়। বাকীটা হুকুম সাপেক্ষ।

অপরাধ নানা ধরণের। পান-বিড়ির দোকানদার ক্যাশ-মেমো দেয় নাই। পথের ধারে বসে আণ্ডা বেচে, সে ক্যাশ-মেমো দেয় নাই। অমুক রেগুলেশন ভঙ্গ করেছে। সুতরাং চল সামারী কোর্টে।

সত্যিকার সনাতন অপরাধীরা ত আছেই—যথা, চোরাচালানী,

কালবাজারী। বহু কাল থেকেই তারা সমাজ বিরোধী দুষ্কর্মে লিপ্ত। পুরাতন পাপী। তাদের শাস্তিও গুরুতর।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব-পাকিস্তানে সোনা চালান নিষিদ্ধ। অদ্ভুৎ ব্যাপার। দুনিয়ার কোন দেশে এমন আইন নাই। একই দেশের এক অংশ থেকে অন্য অংশে মাল আমদানী রফতানি নিষিদ্ধ—অপরাধজনক। দণ্ডও প্রায় চরম।

জঙ্গী আইনের সময় কড়াকড়ি বেড়ে গেল। সিপাই সান্ত্রীর নজর ও দিকেই বেশী।

এই নিষেধাজ্ঞার কারণ কি? বলা হয়, পশ্চিম থেকে সোনা এনে তার মারফত হিন্দুরা পূব-পাকিস্তান থেকে তাদের সম্পত্তি বিক্রয়-লব্ধ অর্থ চালান দেয় ভারতে। সেই চালান বন্ধ করার জন্যই এই ব্যবস্থা, যাতে পূব পাকিস্তানে সোনা ঢুকতেই না পারে।

দেশ বিভাগের পর হিন্দুরা এদেশ থেকে প্রচুর অর্থ নিয়ে গেছে ভারতে—যেমন ভারত থেকেও মুসলমানরা বহু অর্থ নিয়ে এসেছে সোনার মারফতে নয়, সরাসরি। অনেক বড় বড় কর্তাব্যক্তি এ ব্যাপারে সাহায্যও করেছে—কেউ কেউ বিমান ঘাঁটিতে উপস্থিত থেকে পার্টির সহায়তাও করেছে। এখন সম্পত্তির পরিমাণ কমে গেছে। কেনা-বেচা আইনত বন্ধ। সুতরাং সোনার সাথে কোন সম্পর্ক এখন নাই।

কিন্তু, পশ্চিম পাকিস্তানে এত সোনাই বা এল কোথা থেকে? ওখানে সোনার খনি আছে বলে ত জানতাম না। তবে জানি আরব ও পারস্য উপকূল থেকে এই মহামূল্য ধাতু সংগ্রহ করে পাকিস্তানে আমদানী করে এক জাতীয় ব্যবসায়ীর দল। তারা হিন্দুস্থানী মুদ্রা দিয়ে এ সব ক্রয় করে। সরকারের একদম অগোচরে হয় কিনা বলা কঠিন।

মার্শাল ল' পাতালপুরীতে স্বর্ণদ্বীপ আবিষ্কার করেছে। করাচীর কাছেই সাগরের তলায়। ডুবুরিরা ডুব মেরে তাল তাল

সোনা উঠায়ে এনেছে। জেলেরা যেমন ডুব দিয়ে মাছ ধরে আনে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যেমন ডুব মেরে শালুক তুলে আনে বিল-হাওরের তলা থেকে। ডুব দিলেই সোনা।

বেশুমার সোনা তোলা হয়েছে। সোনা দিয়ে পাকিস্তান ভরে দেবে। কয় মণ বা টন উঠল তার হিসাব লেখা আছে কিনা তাই বা কে জানে। খবরের কাগজে বড় বড় হরফে সংবাদ প্রকাশিত হল। পাকিস্তান সোনালী হয়ে যাচ্ছে।

এতদিন সোনা ডুব মেরে ছিল। মার্শাল ল' এসে তুলে আনল। আকারে ইঙ্গিতে বলা হল এটা মস্ত বড় দুষ্কৃতি। দুষ্কৃতিটা কোথায়? ছিল ডুব মেরে পাকিস্তানের এলাকার মধ্যেই। এখন উপরে উঠে এল। ভালই ত হল!

এই সোনা সাগরের তলায় ডুব মেরে থাকতে পারে কিন্তু উড়ে আসতে পারে না পূর্ব দিকে, পূর্ব-পাকিস্তানে। উড়াটা অপরাধ।

এই নিষেধাজ্ঞা দুই অংশে বিরাট অর্থনীতিক বৈষম্য ও দুই ধরণের অর্থনীতি সৃষ্টি করার সহায়ক। দ্রব্যমূল্যের বিরাট তারতম্য, মুদ্রার ক্রয় শক্তির তারতম্য দুই অংশে দুই ধরণের অর্থনীতি সৃষ্টি করে বসে আছে।

যারা গোড়া থেকেই অর্থনীতিক বৈষম্য সৃষ্টি করার নীতি অবলম্বন করেছে, তারা মনে বিশ্বাস করে, দুটি অংশ আসলে দুটি আলাদা দেশ। বড় জোর এক অংশ অন্য অংশের লেজুড় বা কলোনি। অর্থাৎ কাঁচামাল ও বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহ করার উৎস। আর পশ্চিম পাকিস্তানের তৈরী মাল বিক্রি করার বাজারও বটে। কাজেই দ্রব্যমূল্যের পার্থক্য ও তারতম্য বজায় রাখতেই হবে।

চার

ঢাকা ফিরে আসার দিন দুই পর এক সরকারী কর্মচারীর মারফতে খবর পেলাম, গবর্ণর আমাকে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে বলেছেন।

ব্যাপার কি? হঠাৎ আমাকে কেন? কিঞ্চিৎ ভয় হল, কৌতূহলও। কাজেই গেলাম।

গভর্ণর জাকির হোসেন। ছিলেন পুলিশ অফিসার। ধাপে ধাপে উপরে উঠেছেন। ছয়চল্লিশ সালে ঢাকা এস, পি, হয়ে এলেন। সোহরাওয়ার্দী বাংলার প্রধান মন্ত্রী। তাঁকে ধরে আমরা এটা করেছিলাম। কিছু দিন যাবার পর উন্নতি কামনা করলেন। কিন্তু মেলা বাধা ছিল। উপরের সাহেবগুলি সরে না গেলে তাঁর স্থান হয় না। আমাদের অনুরোধে কিছুদিন পর সোহরাওয়ার্দী সেটা করলেন। চলে গেলেন কলকাতা, ডি, আই, জি, হয়ে।

ঢাকা থাকাকালীন আমাদের খুব তোয়াজ করতেন। পাকিস্তানে বিশ্বাসী না হলেও বলতেন, যদি পাকিস্তান হয়েই যায়, তা হলে আপনার স্থান হবে অনেক উর্ধ্বে। এই রকম নেতারই আমাদের প্রয়োজন হবে।

লর্ড ওয়েভেলের সাথে এক সাক্ষাৎকারে তিনি উপস্থিত ছিলেন—অবশ্য বারান্দায়। কথাবার্তা শোনার পর জড়ায়ে ধরলেন, বললেন— যা বললেন, এমন আর কোনদিন শুনি নাই। আপনার জন্যে আমরা গৌরব বোধ করি ইত্যাদি।

সাতচল্লিশ সালে হয়ে এলেন আই-জি-পি। তারপর খাজা নাজিমুদ্দিনের বদৌলতে হলেন পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান। এক টার্ম শেষ হওয়ার পর আর এক টার্ম থাকার আশা পোষণ করছিলেন। কিন্তু তা ত হয় না।

একবার পূর্ব-পাকিস্তান থেকে হয়েছে—এর পর পশ্চিম পাকিস্তানের পালা। এই ছিল বিধান।

আবুল মনসুর আহমদ তখন অ্যাকটিং প্রাইম মিনিষ্টার। তাঁর কাছে গিয়ে নিবেদন করলেন, আর এক টার্ম তাঁকে নিয়োগ করাব জন্য। আবুল মনসুব বললেন, অসম্ভব। এটা হতে পারে না। এবার পশ্চিম পাকিস্তান হতে নিতে হবে।

জাকিব হোসেন নাছোড়বান্দা! বললেন, যদি চেয়ারম্যান না করা যায় তা হলে অগত্যা মেম্বরই বাখা হোক। আবুল মনসুর তাতেও রাজী হন নাই। বলেছেন, এটা বড় দৃষ্টিকটু হবে।

জাকির হোসেন চটে গেলেন। বন্ধু মহলে প্রকাশ কবলেন তার দুঃখ ও ক্ষোভ। অভিযোগ কবলেন, এবা খামাখা বাঙালী দরদের ভাণ করে। আসলে পশ্চিমা ভক্ত। কোন সাহস নাই ইত্যাদি। তারপর দেশে ফিরে এসে চাটগাঁয বসবাস করতে লাগলেন।

হঠাৎ গবর্ণর। গদিতে বসেই বন্দী করলেন আবুল মনসুরকে। সাথে সাথে শেখ মুজিবর রহমান, হামিদুল হক চৌধুরী, আরও অনেককে।

আমার সাথে দেখা হতেই মুখখানা বিকৃত কবে, কালমুখ আরও কাল করে সোহরাওয়ার্দীকে একটা শক্ত গাল দিয়ে বললেন, কোথায় সে? একবার ঢাকা আসুক—ভরে দেব জেলে। কলকাতার গুণ্ডামি এখানে চলবে না।

হতবাক হয়ে গেলাম। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা লাগল। কী উত্তর দিব? রক্তে আগুন ধরে গেল। কানে ভোঁ ভোঁ শব্দ ছুটল। চোখের পর্দা মানুষের এমনি মোটা হয়ে যায়? লোকটার ধৃষ্টতা দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম।

বললাম, কি সব বলছেন? কাকে বলছেন এই সব? কেমন করে বলছেন? মুখ দিয়ে আমারও শক্ত গালি এসে পড়ছিল।

চেপে গেলাম। কি কাণ্ড করে বসে বলা ত যায় না। ক্ষমতায় উন্মত্ত। হুঁস-তোবা নাই। অপমান করতে একটুও দ্বিধা করবেনা।

শেষে বললাম, এই সব শোনাতে আমাকে ডেকেছেন নাকি? সোহরাওয়ার্দীই আপনাকে উপরে তুলেছিলেন,আমাদেরই অনুরোধে। তাই ত আই, জি, হতে পেরেছিলেন এবং পরে আরও কিছু হতে পেরেছিলেন। তাঁকে গাল দিতে আপনার জিভে আটকাল না।

রাগে গোংরাতে লাগলেন। প্রায় ধমক দিয়েই বললেন, ওসব ভুলে যান!

বললাম, আপনি ভুলতে পারেন, কিন্তু আমরা কেমন করে ভুলি?

চট্ করে অন্য কথা তুললেন। দেখুন ক্ষমতা পেয়ে কি রকম দুর্নীতি করেছেন আপনারা। আওয়ামী লীগের সবাই টাকা লুটেছে।

বললাম, কোথায় পেলেন এ সব তথ্য? সব মিথ্যা খবর শুনেছেন।

বললেন, মিথ্যা? আপনাদের লোকেরা পারমিট লাইসেন্সের কারবার করে নাই?

বললাম, একদম অস্বীকার করতে পারব না। কিছু কিছু লোক দু' একটি ছোট খাট পারমিট যোগাড় করে যৎকিঞ্চিৎ পয়সা উপার্জন করেছে। তা অতি নগণ্য। আপনাদের মুসলিম লীগের আমলের তুলনায় বিন্দুবৎ। দু চার' পাঁচ শ'র বেশী পায় নাই। তারা পেয়েছে লাখ লাখ।

বললেন, শেখ মুজিবর রহমান কত মেরেছে?

বললাম, এক পয়সাও না। সে দুর্নীতিপরায়ণ এটা বিশ্বাস করি না।

বললেন, বড় যে তার পক্ষে কথা বলছেন এখন। আপনার সাথে তার ঝগড়া ছিল কিসের?

বললাম, ঝগড়া হত অন্য কারণে—রাজনৈতিক কারণে। তার উগ্র স্বভাবের জন্য এবং ভুল নীতির জন্য আমার সাথে তার বিরোধিতা হত। কিন্তু তাই বলে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করলে তার বিরোধিতা করব না, এত ছোট আমি নই।

মুচকি হেসে বললেন, বটে। আচ্ছা, বেবী কোন কোন ফার্মের ডিরেকটর ?

বললাম, অবাক করলেন আপনি। কে কোথায় কোন কোম্পানীর ডিরেকটর সে খবরও আমার রাখতে হবে নাকি ?

বললেন, তা হলে চোখ বন্ধ করে চীফ মিনিস্টারী করেছেন নাকি ?

বললাম, তা কেন করব ? কিন্তু এসব ব্যাপার অবাস্তব। এদিকে দৃষ্টি দিয়ে সময়ের অপচয় করার প্রবৃত্তি আমার ছিল না।

চুপ করে রইলেন কতক্ষণ। বললেন, বেশ, এখন যান। বোঝা গেল, আপনি কোন কথা বলতে চান না।

উঠে পড়লাম। বললাম, সবই বলতে চাই। আপনি শুনবেনও না, বিশ্বাসও করবেন না। কালো চশমা চোখে দিয়েছেন। অন্য বং চোখে পড়বে না।

মনে পড়ে গেল, কয়েকমাস আগেব কথা—মাত্র কয়েক মাস। ইনি ঢাকা এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলেন। খুব ব্যস্ত ছিলাম বলে সময় নির্দিষ্ট করতে পারি নাই। তারপর ঘনঘন তাগাদায় অতিষ্ঠ হয়ে একদিন ঠিক করে দিলাম।

এসে কুশলবার্তার পরই বললেন, রাজনীতি করব। আওয়ামী লীগে যোগদান করব। কি করতে হবে বলুন। উপদেশ চাই।

বললাম, তাজ্জবের কথা। ছিলেন সরকারী কর্মচারী, এলেন রাজনীতি করতে। ক্ষমতায় আছি বলে কিছু প্রাপ্তির আশায় নাকি ?

ঝটপট বললেন, মোটেই না। কোন কিছুর আকাঙ্খা আমার নাই। আর সরকারী কর্মচারীদের কি রিটায়ার করার পরও রাজনীতি করার অধিকার নাই?

বললাম, অধিকার সবারই আছে। কথা হচ্ছে আপনারা এই জীবনে অভ্যস্ত নন। আপনাদের চিন্তাধারা ভিন্ন ধরণের। সরকারী চাকুরেদের মাথা মগজ সবই সরকারের কাছে বাঁধা থাকে। সেখান থেকে মুক্ত করা খুব শক্ত—চাকুরী ছাড়ার পরও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয় না।

বললেন, আমার কিন্তু হয়েছে। দেশের খেদমত করতে চাই। চাকুরী করে ওটা এতকাল সম্ভব হয় নাই। আমি কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে ভিড়ে যেতে চাই। সোহরওয়ার্দীর মত নেতা আছেন সেখানে। অনেক কিছু শেখা যাবে তাঁর কাছে।

বললাম, বেশ ত, আসুন। কিন্তু গাঁয়ে চলে যেতে হবে। সম্পর্ক ত প্রায়ই ছিন্ন হয়ে গেছে। আবার স্থাপন করার চেষ্টা করুন। কোট প্যাণ্ট টাই বাদ দিয়ে, ওদেরই একজন হবার চেষ্টা করুন। আপনার উপর আস্থা এসে গেলেই আপনার পথ উন্মুক্ত। বাধা বিপত্তিও আছে। অনেকেই বলবে, ইনি এতদিন গাছের খেয়েছেন, এখন এসেছেন তলার কুড়াতে। এতদিন যারা ত্যাগতিতিক্ষা করে আশায় দিনক্ষণ গুণছে তাদের কি হবে? এই সব অভিযোগের জবাব দিতে হবে আপনাকে।

বললেন, আমার এলাকায় এসব বাধা হবে না। লোকের অভাব। কারও প্রাপ্য আমি কেড়ে নেব না। কোন অসুবিধা হবে না।

বললাম, বেশ ত অসুবিধা না থাকলেই ত আপনার সুবিধা। নেমে পড়ুন।

তা ত পড়বো। কিন্তু আপনার কাছে আশ্বাস চাই।

কি আশ্বাস? আগামী ইলেকশনে নমিনেশন? সেটা ত ঠিক করবেন নেতৃবৃন্দ, পার্লামেণ্টারী বোর্ড ইত্যাদি।

সেও ত সোহরাওয়ার্দ্দী, শেখ মুজিবুর রহমান ও আপনি।

বললাম, ও রকম করে হয়না। গণতান্ত্রিক প্রথামতে ওটা হয়। নীচের তলা থেকে মতামত সংগ্রহ করে উপরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

চলে গেলেন। অসন্তুষ্ট হলেন কিনা বলা যায় না। তবে কাজ শুরু করে দিলেন। আমাদের মন্ত্রিরা সফরে গেলে তাঁদের সাথে ঘুরাফেরা করেন। একজনকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেন। কোন কোন জনসভায় বক্তৃতা দেবার ইচ্ছাও প্রকাশ করলেন। কর্মীরা বাধা দিয়ে বসায়ে দিয়েছে।

এমনই চলল বেশ কিছুদিন। তার পর হঠাৎ—

মার্শাল ল' এল—তিনিও এলেন। রাজবাড়ীর হাতী ছেড়ে দেওয়া হয়েছে রাস্তায় শূণ্য তখ্‌তে কাকে বসাবে খুঁজে আনতে। সামনে একে পেয়ে শুঁড় দিয়ে তুলে এনে বসায়ে দিল লাট গদীতে।

হাতী দেখে নাকি ঘাবড়ায়ে গিয়েছিলেন। পিছন দুয়ার দিয়ে পালায়ে যাবার উপক্রমও করেছিলেন। কেউ কেউ সাহস ও ভরসা দেওয়ায় সামনে এসে দাঁড়ান।

গভর্ণর হয়ে ঢাকা বিমানবন্দরে এলে খাজা নাজিমুদ্দিন তাকে সম্বর্দ্ধনা জানান বিমানঘাঁটিতে। এতে আরও জোরদার হলেন।

সিংহাসনে বসেই হুঙ্কার ছাড়লেন। শুরু হল দাপট। ওমরাও খাঁকে সাথে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন সর্বত্র। হাতে সিপাইদের মত ডাণ্ডা। সব জায়গায়ই আয়ুব খাঁকে উল্লেখ করেন, আমার প্রেসিডেন্ট, আমার আয়ুব বলে।

একদিন গেলেন জেলখানায়। যাদের বন্দী করেছেন তাদের সামনেও প্রতাপ দেখাতে হয়। জিজ্ঞাস করলেন, কেমন আছেন জনাবরা?

জনাবরা ফিরেও তাকালেন না। তখন কৃত্রিম সৌজন্যের ভাণ

করে বললেন, এই সব গ্রেফতারের জন্য আমি দায়ী নই।

কে দায়ী, জানবার তাদের কোন ঔৎসুক্যও ছিল না।

এটাও আশ্চর্য ব্যাপার। কেউ জানেনা এ বিষয়। মির্যা বলেন, আমি জানিনা। আয়ুব খাঁ, ওমরাও খাঁও তাই বলেন। চীফ সেক্রেটারী কোন খবরই রাখেন না। তবে এরা গ্রেফতার হলেন কেমন করে? কার আদেশে?

শেষ পর্যন্ত জাকির হোসেনও বললেন, আমি দায়ী নই! কে দায়ী? কেউ নয়?

তাঁর ঘরে বসেই আইন পরিবর্তন করা হয়েছে। অবশ্য গ্রেফতারের পরে। গ্রেফতার শুদ্ধ ও আইনানুগ করার জন্যই আইনের সংশোধন করা হয়।

এই ব্যক্তি আমাকেও দেখালেন তাঁর বিক্রম। হঠাৎ-পাওয়া ক্ষমতার প্রকোপ।

বড় ক্ষোভ বড় দুঃখ হয়েছিল সেদিন। আল্লাহ্ এই সব লোকের কাছে আমাদের এমন অসহায় করে ফেললে? কার অপরাধে? কোন পাপে? এই সব ধৃষ্টতার সমুচিত জবাব কি কোনদিন আমরা দিতে পারব না?

পাঁচ

আকস্মিক বিপত্তির প্রচণ্ড ধাক্কা মানুষকে অভিভূত করে ফেলে। দুর্দৈব অতি বড় শত্রুদের মধ্যেও সাম্য ও শান্তি স্থাপন করে। জঙ্গী আইনের প্রকোপ ও কার্যক্রম দেখে না থাকলেও যখন নাজিল হল দেশের উপর, তখন রাজনীতিকরা তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন। এটা স্পষ্ট বুঝা গেল যে রাজনীতিকদের কাছ থেকে বলপূর্বক ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে সুতরাং নির্যাতন ও লাঞ্ছনার প্রধান ও প্রথম লক্ষ্য হবেন তাঁরাই। পাইকারী ভাবে তাঁদের উপর নির্যাতন চলবে বিভিন্ন ধরণের। কোন বাছ-বিচার হবে না। কেউ অব্যাহতি পাবেন না।

রাজনীতিকরা এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে, যে উদ্দেশ্যেই বিপর্যয় সৃষ্টি করা হোক না কেন, তাঁদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কোন্দলই ষড়যন্ত্রের ইন্ধন যোগায়েছে। অন্ততঃ তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার একটা সুযোগ ত তারা পেয়ে গেছে।

সুতরাং অতি সাবধানে চলতে হবে। নতুন রাজা আমাদের দলাদলির সুযোগ নেবার চেষ্টা করবে। ভেদাভেদ বাড়ায়ে তোলার চেষ্টা করবে। অতঃপর চেষ্টা করতে হবে যেন আমাদের কেউ কোন ফাঁদে আটকা না পড়ি। স্থির করা হল যে, কয়দিন আগে একে অন্যের বিরুদ্ধে যে কয়েকটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়েছে সে সব উঠায়ে নিতে হবে। নিজেদের শত্রুতা জিয়ায়ে রাখা চলবে না। সব এক। একসাথে আসন্ন আঘাতের মোকাবিলা করতে হবে।

মোকদ্দমা দায়ের হয়েছিল আইন পরিষদে হট্টগোল উপলক্ষে। যার চূড়ান্ত ঘটেছিল শাহেদ আলীর মৃত্যুতে।

ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলীর মৃত্যু আমাদের রাজনৈতিক

জীবনের একটা কলঙ্কময় অধ্যায়। বিভিন্ন দেশে এর চেয়েও বীভৎস কাণ্ড ঘটেছে তার নজির টেনে নিজেদের দোষ স্খালনের চেষ্টা করব না।

ঘটনা অত্যন্ত আকস্মিক। ইচ্ছা করে তাঁর মৃত্যু কেউ ঘটায় নাই। এর জন্য 'কেউ কোন প্রত্যক্ষ ষড়যন্ত্র, করেছিল বলেও জানা যায় নাই। রাজনৈতিক দলের রেষারেষি চরম পর্যায়ে উঠেছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু শাহেদ আলী উপলক্ষ্য হলেও তার লক্ষ্য ছিল না। তার প্রতি কারও হিংসা বা বিদ্বেষ ছিল না। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি ছিলেন নিরীহ প্রকৃতির। অবশ্য দু' একবার দল পরিবর্তন করেছিলেন, কিন্তু তার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে কেউ বিশেষ কোন অভিযোগও করে নাই। স্পীকার আবদুল হাকিমের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত করার ফলেই পরিষদে সরকার ও বিরোধীদলের মধ্যে উত্তেজনা প্রবল আকার ধারণ করে। এক পর্যায়ে একদিন সে প্রস্তাব পাশ হয়ে গেছে বলেও সবকার পক্ষ ঘোষণা করে। অবশ্য, অস্থায়ী স্পীকারের নির্দেশ বলে। বিরোধী দল এটা গ্রহণ করে নাই এবং সেজন্য তারা চেষ্টা করেছিল যেন অন্য কোন ব্যক্তি স্পীকারের আসন গ্রহণ করতে না পারে। তারা স্পীকারকেই বলপূর্বক তাঁর আসনে অধিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। সেই জন্য ভয় দেখায়ে শাহেদ আলিকে গদীত্যাগ করাবার চেষ্টা করে। খুবই চেঁচামেচি শুরু হয়। উভয় পক্ষই পরিষদ গৃহে আসন ত্যাগ করে দাঁড়ায়ে পড়ে। বিরোধীদল কাগজ পত্র নিক্ষেপ করতে শুরু করে। তারপরই বিভিন্ন ধরণের কঠিন বস্তু। তারই একটা লেগে যায় শাহেদ আলির মুখে ও নাকে। রক্তাক্ত জখমের সৃষ্টি হয়। ব্লাড প্রেসার ও বহুমূত্রের সংযোগে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জখম গুরুতর আকার ধারণ করে। পরদিন তাঁর মৃত্যু ঘটে।

সংক্ষেপে এই হল ঘটনা। রাজনীতিকরা গুরুতর অপরাধ

করেছিলেন সন্দেহ নাই। তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা কর্তব্য বোধ শালীনতা সবই যেন লোপ পেয়েছিল ক্ষণিকের উত্তেজনায়। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার। সরকার পক্ষ শত চেষ্টা করেও এই পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে পারে নাই। ডেপুটি স্পীকারকে নিরাপদ রাখার জন্য সরকার অতিরিক্ত সান্ত্রীও নিযুক্ত করেছিল। হট্টগোলের সময় সরকার পক্ষের সদস্যরা প্রায়ই নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। অনেকেই হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন।

জঙ্গী আইন প্রবর্তন করার এটাও একটা কারণ। একটা ওজুহাত পেশ করার পক্ষে এটা একটা ঘটনা বটে। কিন্তু মার্শাল ল' প্রবর্তন করার একটা কারণ হিসাবে এই ঘটনার উল্লেখ অবান্তর। যদি তাই হয়ে থাকে, তা হলে পূর্ব-পাকিস্তানের দুর্ঘটনার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানকেও কেন শাস্তি দেওয়া হল। পূর্ব-পাকিস্তানী রাজনীতিকদের শায়েস্তা করার কি আর কোন ব্যবস্থা ছিল না? আর রাজনীতিকরা অপরাধ করে থাকলে তাঁদের ও তাঁদের সাঙ্গ-পাঙ্গদের বেছে বেছে সাজা দিলেই ত সুবিচার হয়ে যেত। জনগণ কি করেছিল? তাদের উপর এই চরম দণ্ডদানের ব্যবস্থা কেন করা হল?

পাকিস্তানে এর আগেও কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটেছে, তখন ত মার্শাল ল' জারী করার প্রয়োজন মনে করা হয় নাই। রাওলপিণ্ডি ষড়যন্ত্র মামলায় সামরিক উর্দ্ধতন কর্মচারীরা লিপ্ত ছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল। তারা শক্তি প্রয়োগ করে এবং প্রয়োজন হলে রক্তপাতের মাধ্যমে সরকার উৎখাত করার ষড়যন্ত্র করেছিল। তখন ত জঙ্গী আইন প্রবর্তন করা হয় নাই। শিশু রাষ্ট্রের উপর অতবড় হামলার ষড়যন্ত্রের চেয়ে বড় দুর্ঘটনা আর কি হতে পারে?

একান্ন সালে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খাঁকে হত্যা করা হয় সামরিক বাহিনীর প্রধান ঘাঁটি রাওলপিণ্ডির বুকের উপর।

এর পিছনেও মস্ত বড় ষড়যন্ত্র ছিল। সে হত্যা-রহস্য আজও উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। ঐ সময়ে মার্শাল ল' জারী করা হয় নাই।

সীমান্তের নেতা ডকটর খান সাহেবও আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন। সে সময় সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নীরব ছিলেন।

বড়লাট গোলাম আহমদ নিজ স্বার্থে গণপরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে দেশ শাসন করতে শুরু করেছিলেন। নির্বাচিত প্রধান-মন্ত্রীকে অকস্মাৎ তাড়ায়ে দিয়ে অন্য একজনকে গদিতে বসায়ে ছিলেন। সামরিক প্রধানকে নাকি ক্ষমতা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু তখন ক্ষমতাগ্রহণে অস্বীকার করেছেন বলে ঘোষণা করে থাকেন।

দেশ ও জাতির পক্ষে এ সব কি ভয়ানক দুর্দৈব ছিল না?

প্রাদেশিক পরিষদের ডেপুটি স্পীকারের আকস্মিক মৃত্যুই কি সারা দেশে মার্শাল ল' জারী করার কারণ হয়ে দাঁড়াল?

না, শক্তি প্রয়োগ করে ক্ষমতা দখলের এটা একটা ওজুহাত? সে ষড়যন্ত্রের ইতিহাস পরে বলছি।

যা হোক শাহেদ আলির এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ঘটনার দিনের ব্যাপারে কয়েকটি মামলা দায়ের হয়। নেতৃবৃন্দ এই সব মামলা তুলে নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

মোকাদ্দমা চলতে থাকলে তিক্ততা আরও বেড়ে উঠবে। ফলাফল কি হবে তাও বলা শক্ত। সাক্ষী প্রমাণ পাওয়া কঠিন। অবশ্য বর্তমান সরকার ইচ্ছা করলে সাক্ষী সৃষ্টি করা কঠিন হত না। কিন্তু আমরা এটা চাই না।

আমাদের এই সিদ্ধান্ত সরকারী মহলে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। বিবদমান দলগুলি এক হয়ে গেল? এতদিনের কোন্দল বিবাদ বিসংবাদ সব ভুলে গেল? তা হলে ত মার্শাল ল জারী করার যৌক্তিকতা অনেক খানি খর্ব্ব হয়ে যায়। মামলা থাকলে উভয়

পক্ষই কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করবে। আমরা হাতে নাতে প্রমাণ করে দেব যে মার্শাল ল' জারী করার কি প্রয়োজনীয়তা ছিল।

অতএব এই দলাদলি জিয়ায়ে রাখতে হবে।

গভর্ণর জাকির হোসেন কোন কোন দলের নেতাদের ডেকে মোকদ্দমা তুলে নিতে বারণ করলেন। বিচার-হতে হবে। একটা মানুষ মরে গেল, তার বিচার হবে না? ভয়ও দেখালেন, সরকার যদি মোকাদ্দমা তুলে নেবার অনুমতি না দেয়?

নেতারা বলেছিলেন, বেশ ত না দেন অন্যভাবে মোকদ্দমা নষ্ট করে দেব। অগত্যা কর্তৃপক্ষ রাজী হয়েছিল।

মোকাদ্দমা গুলি তুলে নেওয়া হল। বিভিন্ন দলের কর্মীরাও সন্তোষ প্রকাশ করল। সঙ্গে সঙ্গে তারা নেতাদের উপরও চাপ দিল যে এই ঐক্য যেন অটুট থাকে। প্রয়োজন হলে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চালাতে হবে। বিচ্ছিন্ন থাকলে একে একে সবই শিকারে পরিণত হবে।

গণ ঐক্যের এই ছিল প্রথম সূচনা। বাঙালী এক হতে পারে না। অতীতে কোন কালে হয় নাই। দেশ জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। নানা ধরণের বিদেশী ভাগ্যঅন্বেষণ কারীরা কর্তৃত্ব করেছে সবার উপর। তাতেও বাঙালীর দুঃখ হয় নাই। জ্ঞানের উদয় হয় নাই। একলাই সংগ্রাম করে দেশ স্বাধীন করব এই আত্মাভিমান অন্যদিকে তার অস্তিত্বকে বিনাশ করে দিয়েছে, তখনও তার চৈতন্য হয় নাই। এই দুরপনেয় কলঙ্ক বাঙালী চরিত্রের বৈশিষ্ট বলেই অপবাদ বা প্রবাদে পরিণত হয়েছে।

আমরা এই অপবাদ মিথ্যা প্রমাণিত করার প্রাথমিক ভিত্তি রচনা করলাম। খুব কঠিন কাজ কিন্তু আমরাও কঠিন সংকল্প নিলাম। ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ছবি ভেসে উঠল আমাদের চোখের সামনে। অসম্ভবকে সম্ভব করার দুঃসাহস আমাদের চাঙ্গা করে তুলল।

এতদিন স্বাধীনতা ছিল, রাজনীতি ছিল, গণতন্ত্রও ছিল। পদ বা পদের লোভে তখন সবাইকে উন্মত্ত করে রেখেছিল। ভাগ-বন্টনের অংশ নিয়ে বিবাদ করেছি। এখন পদ কোথায়! সবাই ত নগ্নপদ, এমন কি পদহীন। কি আছে এখন? কি নিয়ে কোন্দল করব? লভ্যবস্তুটা কি? যদি কিছু নাই থাকে তা হলে মারামারি কাটাকাটি করব কি নিয়ে?

আছে এখন শুধু ভবিষ্যতের সংগ্রাম—আঘাতে, প্রতিঘাতে। দুঃখ নির্যাতন ও লাঞ্ছনা গঞ্জনায় অংশগ্রহণ। তাই দলাদলি ভুলে গেল সবাই। গতজীবনের তিক্ত বিবাদময় দিনগুলির প্রতি ধিক্কার দিয়ে ভবিষ্যতের মোকাবিলা করার পন্থা আবিষ্কারে চিন্তিত হয়ে পড়ল।

ছয়

একদিকে আমরা যেমন পূর্ব-ইতিহাস ও কীর্তিকলাপের স্মৃতি সমাধিস্থ করার চেষ্টা করছিলাম অন্য দিকে আর একদল লোক নাজাত দিবস পালন করার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল। তারা পল্টন ময়দানে জনসভা ডাকল। দেশ মুক্তি-লাভ করেছে। রাজনীতিক-দের হাত থেকে সবাই রক্ষা পেয়েছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। অপরিসীম আনন্দে তারা মার্শাল ল' জিন্দাবাদ করে উঠল।

আমাদের দেশে এক শ্রেণীর লোক আছে, কোন কিছুই যাদের পছন্দসই নয়। কারুর প্রশংসা শুনলে তারা কষ্ট অনুভব করে। তারা এক অবস্থায় টিকতে পারে না। পরিবর্তনের জন্য ছটফট করে। পরিবর্তন হলেই তারা নাজাত মনে করে। আজব দেশের মানুষ! নিত্যনতুনের প্রতি আকর্ষণ দুর্বার। বর্তমানকে

দেখা হয়ে গেছে, ভবিষ্যৎ দেখতে হয়। অতীতকে ত কবর দেওয়াই হয়েছে।

কোন কারণ বা অভিযোগ না থাকলেও স্রেফ মুখ বদলাবার জন্যই নতুনের রূপরস আস্বাদন করতে চাই। এই চাওয়াই তৃপ্তি। এরই কাল্পনিক আনন্দে বিভোর হয়ে বর্তমানকে অবহেলা অপমান করি। নতুন যা এল তা হয়ত পুরাতনের চাইতেও বিস্বাদ ও ক্ষতিকর। তাতে কিছু আসে যায় না। দু'চারদিন দেখে না হয় বদলাব। আবার হবে নাজাত।

নতুন সরকার এদের হাতে পেয়ে একটা মহা অস্ত্র লাভ করল।

শেখ মুজিবর রহমান, আবুল মনসুর আহ্‌মদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যে দিন গ্রেফতার হয়ে কোর্টে উপস্থিত হলেন, সেদিন হাজার হাজার নাজাত-প্রাপ্ত মানুষ কোর্টের প্রাঙ্গণে জমা হল তামাশা দেখ্‌তে। কি উল্লাস তাদের! এঁদের দেখ্‌তে পেয়েই হাততালি দিয়ে উঠল। বেশ হয়েছে। উচিত কাজ হয়েছে! মার্শাল ল' আবার জিন্দাবাদ!

দেশের ভালমন্দ বোঝবার এদের ক্ষমতা নাই। সমাজের প্রায় নিম্নস্তরের মানুষ এরা। বিচার বুদ্ধিও নিম্ন স্তরের। এরাই জয়ধ্বনি করে উঠল।

এটা আমাদের রক্তের প্রভাব। চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। বড়র অপমানে বড় আনন্দ পাই। নিজে অপমান করার সুযোগ পেলে ত কথাই নাই। অন্য কেউ তাকে অপমান করলেও কম আনন্দ পাই না। পরের দুঃখ বিপদ দেখলে যে আনন্দ পাই, সেটাই নাকি বিমল আনন্দ। কোন এক বিখ্যাত কবিও নাকি তাই বলেছেন।

যে ব্যক্তি আমার চেয়ে বড় তাকে লাঞ্ছিত হতে দেখলে আনন্দ উথলে ওঠে। সে ত কিছুটা ছোট হয়ে গেল—হয়ত বা আমারই স্তরে নেমে এল। উপরে থাকার বাহাদুরী অন্ততঃ এখন আর করতে পারবে না। এটাই আত্ম তুষ্টির প্রধান কারণ।

যুগে যুগে আমরা এই কাজটি করে এসেছি।

বড়র মর্যাদা যে জাতি করে না, সে জাতি কখনও বড় হতে পারে না। কোনদিন হয় নাই। ইতিহাস এর সাক্ষ্য বহন করে। আমরা বড় হতে পারি নাই।

বড়কে সামালোচনা করা চলে কিন্তু হেয় করা গুরুতর অন্যায়। কোন দেশেই বড় মানুষ ঘরে ঘরে হররোজ জন্মে না। তাঁকে সৃষ্টি করে নিতে হয়। তাঁকে তুলে ধরতে হয় দুনিয়ার সামনে। তাঁকে দিয়েই দেশ পরিচয় লাভ করে।

অসাধারণ প্রতিভাধর মনীষী বা যুগমানবের কথা আলাদা। তিনি নিজস্ব প্রতিভা ও আলোকেই জ্যোতিষ্মান হন—অন্য সবাইকে উদ্ভাসিত করে তোলেন। দেশ জাতি রাষ্ট্র তাঁর মহিমায় বিরাটত্ব লাভ করে।

তাঁদের কথা বলছি না। বলছি, আমাদের মধ্যেই যাঁরা আমাদের চেয়ে বড় তাঁদের কথা। সাধারণ মানুষের সাথে থেকেও যাঁরা পৃথক, যাঁরা স্বতন্ত্র।

প্রধান মন্ত্রী থাকাকালে বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্খীদের এই কথা বুঝাবার চেষ্টা করেছি। অনেকেই কুৎসা রটনায় অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিল। নিরর্থক ও বিনা কারণে। বলেছি, তোমরাই না আমাকে নেতা করেছ। যোগ্যতা বা গুণ না থাকা সত্বেও। এখন কেন এমন আচরণ। তোমাদের সমবেত শক্তিই আমার শক্তির উৎস। যতদিন আমাকে এই অবস্থায় রাখবে, ততদিন আমাকে হেয় করার চেষ্টা করা অন্যায়। অযোগ্য মনে করলে এখনি সরায়ে আমার কাজের ভার ও দায়িত্ব যোগ্যের হাতে দিয়ে দাও। আমাকে এখানে রেখে ছোট করার চেষ্টা করলে তোমরাও সেই পরিমাণে ছোট হতে বাধ্য। আর আমাকে উপরে তুলে ধরে রাখলে তোমরাও সেই অনুপাতে উর্ধে উঠে যাবে। আমাকে তোমাদের মান মর্যাদার মাপকাঠি ধরে নিতে হবে।

এ সব কথা কানে তুলেছে কিনা ঠিক বুঝতে পারি নাই।

সরকারী সি-প্লেনে বিভিন্ন স্থানে সফরে গিয়েছি। বহু লোক জমা হয়েছে সম্বর্দ্ধনা জানাতে।

মৌলানা ভাসানী মজলিস জমায়ে গল্প করতেন আর মন্তব্য করতেন: আরে চীফ মিনিষ্টারকে দেখতে বা তাঁর কথা শুনতে কি এত লোক যায় নাকি? তারা যায় সি-প্লেন দেখতে।

হতেও পারে! কিন্তু তাই বলে তিনি বলবেন এই কথা! তিনি তখন আমাদের দলপতি। তিনি মানুষকে উৎসাহিত করবেন, না এই সব কথা বলে আমার ভুল প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন? তার সাথে আমার প্রতিযোগিতার প্রশ্নই উঠেনা। আমার জনপ্রিয়তা তার জনপ্রিয়তাকে আদৌ খব করতে পারবে না। তিনি উৎসাহ দিয়ে আমার শক্তি সামর্থ বাড়াবেন, না এই মন্তব্য করে আমাকে দুর্বল করবেন?

মাঝে মাঝে এই রকম করতেন। অন্য কেউ বড় হয়ে উঠে এটা তিনি চান নাই। সভা-সমিতি করতে গিয়ে দেখেছি, জনগন উল্লাস ভরে জিন্দাবাদ দিয়েছে তার নামে। সে পালা শেষ হবার পর যেই অন্য কারুর নামে ধ্বনি উঠল, আর অমনি তিনি ধমক দিয়ে উঠতেন, খামোশ! খালি জিন্দাবাদ! কি হবে জিন্দাবাদ করে? আল্লার নাম নাই—খালি জিন্দাবাদ! ধমক খেয়ে জনতা নারায়ে তকবীর শুরু করে দেয়।

নেতৃত্বের অন্যতম প্রধান সর্ত—পরবর্তী নেতৃত্ব সৃষ্টি করা কিংবা তার জন্য পথ সুগম করে দেওয়া। তার তিরোধানের পর তাঁরই আরদ্ধ অসমাপ্ত কার্য সম্পন্ন করতে পারে, কিংবা তাঁর জীবদ্দশায়ও তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে এমন নেতৃত্ব সৃষ্টি করার দায়িত্ব সত্যিকার নেতার। বশংবদ, প্রশংসমান অন্ধভক্তের উপর নির্ভর করে যে নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়, তার আয়ুষ্কালও সীমিত হয়। মৃত্যুর সাথে সাথে তাঁর পরিপূর্ণ সমাপ্তি ঘটে।

বাংলাদেশে নেতৃত্বের এই সঙ্কট, এই দুর্দ্দশা আমরা দেখতে

পেয়েছি। যার ফলে নেতৃত্বের অভাব-মোচন আজও হয় নাই। এই কলঙ্কের বোঝা আমাদের মাথা থেকে কবে নামবে তা বলা যায় না।

আর একটা দোষ আমাদের। দেশের অর্থাৎ পূর্ব-বাংলার লোক আমরা চাইনা। তাদের কর্তৃত্ব আমাদের সহ্য হয় না। বাইরের যে কেউ হোক, তার হাতে যত অপমানই আমাদের হোক না কেন, তার জন্য আমরা বেদনা বোধ করি না।

এটা মধ্যবিত্তসুলভ মনোভাব। মধ্যবিত্তদের মধ্যেই বিদ্বেষের পরিমাণ বেশী। আমরা সবাই মধ্যবিত্ত—একই পর্যায়ের। কেউ কারও প্রাধান্য মানতে রাজী নই।

নিজেদের মানুষকে ছোট করে বাইরের মানুষকে বড় করার অপরাধ আর কোন দেশ করে না। আমরা করি, তাই জাতটাকে পঙ্গু করে রেখেছি। এর জন্য কাকে দায়ী করব ?

সাত

মার্শাল ল' জারী করার পর আয়ুব খাঁ ঢাকা তশরীফ আনলেন। নাজাত-প্রাপ্ত শহরবাসী তার সম্মানার্থে এক নাগরিক সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করল, শাহবাগ হোটেলে। আমিও নিমন্ত্রণ পেলাম।

যেতেই হয়। কি অবস্থা, কি বিষয় জানতে হয়। ভেতরে দরজার পাশে দাঁড়ায়ে আছি। মহাসমারোহে এলেন চীফ মার্শাল ল' এ্যডমিনিষ্ট্রেটর। দরজার পাশে আমাকে পেয়ে ধরে ফেললেন। কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করলেন। আমার অসুখ সেরেছে কিনা তাও জিজ্ঞাস করলেন। সহানুভূতির সুরে বললেন, বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন খেটে খেটে। খুব জুলুম করেছে সবাই আপনাকে। বিশ্রাম করুন, সুস্থ হয়ে উঠুন।

বললাম, না, এমন আর কি! খাটতেই হয়—বেশী আর কম। আপনারা এসেছেন, আমরা চিরশান্তি লাভ করব। অনন্ত বিশ্রামের সুযোগ এসেছে।

বললেন, না, না, আমরা আর কতদিন। এ সব আপনাদের প্রত্যাবর্ত্তনের প্রস্তুতি। রাস্তা পরিষ্কার করছি। কিছুদিন ধৈর্য ধরে থাকুন।

বললাম, অসীম ধৈর্য ধরে বসে আছি। কিন্তু এ পথে আর না গচ্ছামি। খুব শিক্ষা হয়েছে। মান সম্মানটা বজায় রাখতে পারলেই আল্লার শোকর। আমরা ধিক্‌কৃত দেশকে ধ্বংস করে দিয়েছি। আবার কেন?

বললেন, এটা ক্ষোভের কথা। ইচ্ছা করে কি আর ধ্বংস করেছেন? ভুলভ্রান্তি সবারই হয়। আপনাদেরও যে হয় নাই এ কথা বলতে পারেন না। তা ছাড়া সবাইত আর মন্দ নয়।

বলেন কি? সবাইকে এজমালী গালাগাল দিচ্ছেন না?

তা হয়েই থাকে। একটা ব্যবস্থাকে দোষী করলে সংশ্লিষ্ট সবাই তার মধ্যে এসে পড়ে। কিছু অতিরঞ্জন হয়। আমার উদ্দেশ্য, সবার শুভবুদ্ধি ফিরে আসুক। এটা হলেই আমরা সরে পড়ব।

বললাম, তা আসুক বা যাক, কিন্তু আমাদের শুভবুদ্ধির উদয় হবার আর দরকার নাই। আপনাদের মধ্যে শুভবুদ্ধি দেখতে পেলেই আমরা খুশী হব। দেশ ধন্য হবে।

ইনি যখন এখানে সম্বর্দ্ধিত হচ্ছিলেন, প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্যা ওদিকে করাচী সহরে মিছিল বার করে জয়ধ্বনি শুনছিলেন, ইস্কান্দার মির্যা জিন্দাবাদ।

আয়ুব খাঁ ভাবলেন, ব্যাপার গুরুতর। কাজ করে কে, আর জিন্দাবাদ পায় কে! ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে অনেক আগেই। মির্যা টেরই পায় নাই।

করাচী ফিরে গিয়ে আয়ুব খাঁ তাঁর নিজস্ব মন্ত্রণাসভা ডাকলেন—

মুসা, আজম খাঁ, শেখ ও বার্কী। তাঁরা বশংবদ ও বিশ্বস্ত অনুচর। সিদ্ধান্ত হল, মির্যাকে আর সুযোগ ও সময় দেওয়া হবেনা। হটাতে হবে। এই দায়িত্ব নিলেন বংশবদ সামরিক নেতৃবৃন্দ।

জঙ্গী আইন প্রবর্তনের কুড়ি দিন পর সাতাশে আটাশে অক্টোবর সংবাদপত্রে এক কোণে ছোট্ট একটু খানি খবর প্রকাশিত হল: নানা অসুবিধার দরুণ ইস্কান্দার মির্যা আসন থেকে নেমে পড়ছেন এবং মোহাম্মদ আয়ুব খাঁ চড়ে বসেছেন। এক জঙ্গলে দুই বাঘ থাকতে পাবে না। উভয়েই জাঁদিরেল অর্থাৎ জেনাবেল।

ইস্কান্দাব মির্যাকে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাওয়া হল প্রায় বন্দী হিসাবে। তাবপব রফতানী করা হল বিদেশে—লণ্ডনে।

একেই বলা হয় বিপ্লব। এরই নাম অক্টোবর বিপ্লব। আগের বিপর্যয় অর্থাৎ সাত তারিখে যা ঘটেছিল সেটা বিপ্লব নয়।

হালজমানায় দেশে বিদেশে নানাধরণের দুর্ঘটনা ঘটছে বা ঘটান হচ্ছে।

সব দুর্ঘটনা বিপ্লব নামে খ্যাতি লাভ করছে। কোন রকমের অভ্যুত্থান, ষড়যন্ত্র কিংবা বিপর্যয়ের মাধ্যমে প্রচলিত বিধি ব্যবস্থা উলট পালট করার নামই বিপ্লব। ছলে বলে কিংবা কৌশলে রাজ্য বা রাজকীয় ক্ষমতা দখল করতে পারলেই তার নাম হয় বিপ্লব। এ সব হচ্ছে বর্তমান যুগের বিপ্লবের সংজ্ঞা। নামের একটা মহিমা আছে। ঐ নামে ডাকলে সবাই মুগ্ধ হয়। গৌরব ও গর্ব্ব বোধ করে।

এই ভাবে বিপ্লব করার সাথে সাথেই প্রচলিত প্রথা পদ্ধতি রীতিনীতির পরিবর্তন শুরু হয়। নাম ধাম পরিচয় সব বদলাতে হয়। পুরাতন সব বাতিল করা হয়, নতুন আমদানী করা হয়। এ সব না করলে বিপ্লব কিসের। এ সব করেই ত বিপ্লবকে ফরাসী বা রুশ বিপ্লবের পর্যায়ে তোলা হয়।

সাতাশে অক্টোবরের ঘটনাও বিপ্লব নামকরণ করা হয়েছে।

অক্টোবর বিপ্লব। এক জেনারেল আর এক জেনারেলকে হটায়ে দিয়েছেন—যুদ্ধে নয়, কৌশলে ও বল প্রয়োগের ভয় দেখায়ে। সুতরাং বিপ্লব। প্রতি বছর ধূমধাম করে উৎসব করা হয় ঐ দিনে।

বিপ্লব মানে দ্রুত আমূল পরিবর্তন। আদর্শ ও দর্শনের, মতের ও চিন্তাধারার।

সাতচল্লিশ সালে পাকিস্তান কায়েম হয়েছিল। গোলামীর বন্ধন ছিন্ন করে মানুষ মুক্ত জীবনের ভিত্তি স্থাপন করার প্রতিশ্রুতি পেয়েছিল। দশ কোটি মানুষ সত্যিকার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবার স্বপ্ন দেখেছিল।

সাতাশে অক্টোবর সে প্রতিশ্রুতি ও স্বপ্ন ভেঙ্গে দিল ফৌজী আইন। এটা হল প্রতি-বিপ্লব। আগের আদর্শ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল।

সাধের পাকিস্তান! কোটি কোটি আদম-সন্তানের ত্যাগ-সাধনার আশা আকাঙ্খার প্রতীক পাকিস্তান! বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের মুক্তির সহায় সম্ভাবনা! সবই বিলীন হয়ে গেল?

কি ভেবেছিল মানুষ, আর কি হল; এখন ভাবছে, কি হবে; ভবিষ্যতের কোনরূপ আছে! কোন ছবি! না সবই মরীচিকা—ধোঁকাবাজি!

মানুষ ভেবেছিল য়ুটোপিয়া—মর্তে বেহেশত। ভেবেছিল, পাকিস্তান—পাকজমিন, পূত-পবিত্র নিষ্কলষ! স্বর্গ রাজ্যের এক-খণ্ড নেমে এসেছে মর্তে—এই ধরণীর ধূলায়!

পল্লীর এক বৃদ্ধ জিজ্ঞাস করেছিলেন—পাকিস্তান হল, এখন পুলিশ, কোর্ট-কাছারী, সিপাই-সান্ত্রী, জেল-ফাটক—এ সব থাকবে না উঠে যাবে?

বলেছিলাম, কেন উঠে যাবে! এ সব না থাকলে রাষ্ট্র রক্ষা করা দায় হবে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন, তালে আর কিসের পাকিস্তান!

নামটাও বদলায়ে ফেলেন। কইবেন পাকিস্তান, আর পাপ দুর্নীতি, বেইমানী সবই রাখবেন, তা কেমন করে হয়।

হতে পারে অদ্ভুত খেয়াল। কিন্তু এই ছিল তার স্বপ্ন—অনেকেরই। অন্ততঃ তার স্বাধীনতা, তার অধিকার কেউ হরণ করে নেবে এটা কোনদিন কল্পনা করে নাই কেউ। সে স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। সে কল্পনা ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

কালের ঘড়ির কাঁটা ঘুরে গেল পিছন দিকে—কয়েক শ' বছর।

কার পাপে, কোন অন্যায়ের প্রতিহিংসা সমস্ত ন্যায়বিচারের মস্তকে পদাঘাত করল এমন অকস্মাৎ! মানুষের দেশ, তার অধিকার মর্যাদা, তার আদর্শ-দর্শন বিলুপ্ত হয়ে গেল! তার জ্ঞানবুদ্ধি বিচার ক্ষমতা নাই বলে দুনিয়ার কাছে তাকে হেয় করা হয়েছে। তার নীতিজ্ঞান অতি নিম্ন মাণের এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করে তাকে মানবেতর শ্রেণীতে পরিণত করা হয়েছে! এক কথায় পাকিস্তানের মুলনীতি ও আদর্শের মূলোচ্ছেদ করা হয়েছে। তাই এটা বিপ্লব নয়—প্রতি বিপ্লব। বিপ্লব-বিরোধী আন্দোলন।

এরই গৌরবে তিনি ফিল্ড মার্শালের উচ্চশৃঙ্গে উঠে বসেছেন। যুদ্ধ জয় করলে নাকি ফিল্ড মার্শাল হয়। যুদ্ধ জয় না করে জেনারেল জয় করলেও ফিল্ড মার্শাল হওয়া যায়।

মূর্খজনেরা বলে, মার্শাল ল' জারী করলেও ফিল্ড মার্শাল হয়। একই উচ্চারণ—বানান ভিন্ন।

বিপ্লব সংঘটন করার পর পরই বিপ্লবী আয়ুব খাঁ তখ্‌তে বসে ডাকলেন বড় বড় আমির ওমরাহ মন্‌সবদারদের।

মোগলাই কায়দায় হাঁক ছাড়লেন: নতুন জীবন শুরু করতে হবে। আগের সব ভুল। সব ভুলে গিয়ে গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। ফিন্ পহলে সে।

সবাই বলল, ইয়েস স্যার, কোরাসের সুরে।

এখন থেকে যা করা হবে সবই হবে উত্তম—দোষত্রুটি-মুক্ত, নিখুঁত।

আবারও ইয়েস স্যার।

সেনাপতি বললেন, এখন বল তোমরা, আমরা কি করব আর কেমন করে করব?

সবাই একে অন্যের মুখের দিকে চেয়ে রইল। কি বলবে?

তখন বাধ্য হয়ে নতুন রাজা, আল্লাহ্‌র কালামের অনুকরণে বললেন, আমি যা জানি তা তোমরা জাননা। তোমাদের পরীক্ষা করছিলাম। সব এই মাথায় জমা আছে। ধীরে ধীরে বার করব, বহু কালের সঞ্চিত জ্ঞানবুদ্ধি। তোমরা জান না।

জানেই না। তাই বলল।

দু' একজন অতি চালাক। কায়দা করে বলল, অল রাইট স্যার। ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে। ভেবে চিন্তে সবই করা যাবে।

নো-নো, গর্জে উঠলেন বাদশাহ সালামত। তা হবেনা। ধীরে ধীরে চলবেনা। ওটা ছিল রাজনীতিকদের পথ।

আই অ্যাম ইন এ হ্যারী। খুব তাড়াতাড়ি সংস্কারের কাজ শেষ করতে হবে।

ওমরাহর দল মাথা নেড়ে নেড়ে সায় দিল। না দিয়ে উপায় নাই।

এই ঘটনার সূত্র ধরে মার্কিন কূটনীতিবিদ সেসিল বার্টন মার্শাল লিখেছিলেন: বলা হয়: আসুব নিখুঁত প্রস্তর ফলক নিয়ে কাজ শুরু করেছেন। কিন্তু তাতে কি মন্ত্র লিখতে হবে তা তিনি জানেন না।

বার্টন মার্শালও জানতেন না, আমাদের ভবিষ্যৎ মার্শাল অনেক মন্ত্রই জানেন। মন্ত্র ও যন্ত্র সবই তাঁর আয়ত্তে। সাদা ফলকে তিনি অনেক মন্ত্রই লিখে ফেলবেন।

আট

মার্শাল ল'র সঙ্গীতের মূল সুর দুইটি : এক নম্বর রাজনীতিকরা দেশ ধ্বংস করে দিয়েছে। তারা দুর্নীতিপরায়ণ। তাদের নির্মূল করতে হবে। দুই নম্বর, অবাধ গণতন্ত্র—বিশেষ করে পশ্চিমা গণতন্ত্র এদেশে অচল। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে—বিফল হয়েছে। সাধারণ মানুষ ভোট দিতে জানে না। তাদের ভোটে গণতন্ত্র স্থাপন করা অসম্ভব।

মার্শাল ল' এই দুই অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। এরই উপর নির্ভর করে জঙ্গী আইন প্রবর্তন করার যৌক্তিকতা। বলপ্রয়োগে রাজনীতিকের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া সহজ, জনগণের মৌলিক অধিকার রাষ্ট্রচালনাব অধিকার ছিনায়ে নেওয়াও সহজ, কিন্তু এর সমর্থনে যুক্তি চাই—প্রমাণ করতে হবে অভিযোগ সত্য—তা' না হলে দস্যুতা ও লুণ্ঠনের অভি-যোগ হতে বাধ্য।

তাই অভিযান শুরু হয়ে গেল রাজনীতিকের বিরুদ্ধে, প্রবল মারাত্মক ও ব্যাপক আকারে। অপপ্রচারের অভিযান চলল দিকে দিকে। বিষাক্ত বাষ্পের মত তার ঢেউ সাবা দেশ বিক্ষুব্ধ করে তুলল। অফিস আদালত, দোকান বাজার, হোটেল চা-খানা সর্বত্রই এই অপপ্রচারের প্রকোপ। দালালের সংখ্যা বেড়ে গেল অসম্ভব রূপে। অনেকেই বেতনভুক্ত—আবার কেউ কেউ সখ করে ভর্তি হল এই দলে। দলের কাজ, কাজেই শরীক হতে হয়। বাজী রেখে প্রতিযোগিতা হয়েছে, কে কোন্ রাজনীতিকের বিরুদ্ধে কতটা বলতে পারে। জজ হাকিমরাও সম্পূর্ণ উদাসীন নিরাসক্ত থাকতে পারেন নাই। সুযোগ পেলেই হয় রসিকতা, না হয় বিদ্রূপ—কটাক্ষ, না হয় সরাসরি অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছেন।

হাইকোর্টের এক জজ। আমার প্রাক্তণ পলিটিকাল সেক্রেটারীর সাথে দেখা হতেই, হা হা করে উঠলেন। কেমন ধোলাই হচ্ছে আপনাদের? দুষ্কর্মের খতিয়ান কেরমে কেরমে বেড়েই যাচ্ছে! ব্যাপার কি? কি সব করছেন আপনারা?

সেক্রেটারী বলল, ভুলত্রুটি সবাই করছে, ঘাড়ে চাপছে আমাদের।

জজ বাহাদুর বললেন, কই, মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ত কেউ কিছু বলতে পারছে না?

সেক্রেটারী বলল, অর্থাৎ মার্শাল ল'র কর্তাবা যা' বলছেন, তাই বেদবাক্য। সত্য মিথ্যা যাচাই করার প্রয়োজনও মনে করেন নাই! আপনাদের মুসলিম লীগের ধোলাইও হত, থাকত যদি আপনাদের চরিত্রের কোন ব্যক্তি তখন ক্ষমতায় আসীন। আমাদের নেতৃবৃন্দ ধোলাইর ব্যবসাকে ঘৃণা করতেন। না হলে দেখতে পেতেন ধোলাই কাকে বলে!

জজ মানুষ! তিনিও আমাদের ধোলাই দেখে আনন্দ পাচ্ছেন। এই আনন্দের টানেই তিনি কিছুকাল পরে হলেন প্রাদেশিক কন্‌ভেনশন লীগের কর্তা। আরও কিছুদিন পর ঐ টানে চলে গেলেন আয়ুব খাঁর জাতীয় পরিষদের স্পীকার হয়ে। এখন নিজেই ধোলাই শুরু করে দিয়েছেন বেধড়ক। যত্র তত্র বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন, কর্তার গুণগান আর রাজনীতিকদের নিন্দাগান। মাঝে মাঝে অস্থায়ী প্রেসিডেণ্টের আসনে বসেন। ঠিক বসেন না। কারণ, বসার ব্যবস্থা হওয়ার সাথে সাথেই চলে যান বরিশাল, নিজের জেলায়—প্রত্যেক বার। আগের নজীরের অনুকরণ করেন। ফজলুল কাদের চৌধুরীও অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট হওয়ার সাথে সাথে চলে যেতেন চাটগাঁ—নিজের বাড়ী! দেশের লোকদের দেখাতে হবে, তিনি হয়েছেন একটা মস্ত বড় বস্তু। কি তাজ্জব ব্যাপার!

রাজনীতিকদের অপপ্রচারের ব্যাপারে নেতৃত্ব নিয়েছিলেন

জাকির হোসেন। তাঁরই প্ররোচণায় সরকারী কর্মচারীরা অভি-যানের পুরোভোগে। অতি ক্ষুদ্র অংশ এর বাইরে—তাদের সংখ্যা হাতে গোণা যায়। বাকী সব কীর্তনে মগ্ন। কর্তার সুরে সুর মিলায়ে গাইতে হয়। বিশ্বাস না করলেও। সুর না মিললেও মুখ নাড়তে হয়! রাজনীতিকদের আমলে দেশের দুরবস্থা, কাল্পনিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও আসন্ন বিপদের আশঙ্কার নিখুঁত ছবিও নক্শা রচনা করার দায়িত্ব তাদেরই উপর। তার উপর করাচী পিণ্ডি, ইসলামাবাদের কারখানায় তৈরী মুখরোচক তথ্য প্রচার করার ভারও তাদের উপর।

সরকারী কর্মচারীদের তবু গল্প তৈরী করার মত যৎকিঞ্চিৎ মালমসলা হাতে থাকে, কিন্তু বেসরকারী লোকদের হাতে ত কিছুই থাকেনা। তারা হাওয়ার উপর গল্প সৃষ্টি করে। কোন ঘটনার পূর্বকালের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। শুধু গুজবের উপর নির্ভর করে একটা বিরাট কাহিনী সৃষ্টি করে। কেন, কি অবস্থায় একটা ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটেছে, তার কারণ অনুসন্ধান করার প্রবৃত্তিও এদের নাই। তা হলে ত অপবাদ মাঠে মারা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রখ্যাত অধ্যাপক—প্রবীণ সাহিত্যিকও। হঠাৎ নেহাত অপ্রাসঙ্গিক ভাবে রাজনীতি ও রাজনীতিকদের নিন্দা করলেন। এক প্রবন্ধে লিখলেন, এরা শুধু ক্ষমতার জন্য কোন্দল করে। দেশপ্রেম, জনকল্যাণ, এ সব ফাঁকাবুলি।

বেচারা নেহাত গোবেচারী। কারও সাতেপাঁচে নাই। রাজনীতিরও ধারে কাছে নাই। তিনি এ সব লিখবেন, এটা কল্পনা করতে পারি নাই। তবে কি মার্শাল ল'র মাহাত্ম্য ও প্রকোপ এত শক্তিশালী! মানুষের স্বভাব-সংস্কার হঠাৎ এমন পরিবর্তন করে দেয় যে আসল মানুষটিকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

এই সব হচ্ছে শাসক-গোষ্ঠির প্রচারের প্রতিষ্ঠান।

রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে কুৎসা অপরাধ সৃষ্টি করে দুনিয়ার

সামনে তাদের অপদার্থ প্রমাণ করতে না পারলে বলপ্রয়োগে ক্ষমতাদখলের যুক্তি সবল হয়ে যায়। এই রকমে দুষ্কৃতির নজির ইতিহাসে অনেক পাওয়া যায়। পলাশীর যুদ্ধে বাঙালী তথা ভারতের স্বাধীনতা হরণ করার পর ইংরেজ বণিক বা সৈনিক এমনি যুক্তি খাঁড়া করার চেষ্টা করেছিল দেশবাসীর দুষ্কর্মের। এর ফলে, গোটা মুসলমান জাতিটাই তাদের কুৎসা, নির্যাতন ও বঞ্চনার লক্ষ্য হয়ে রইল বহুদিন ধরে। জ্ঞান গরিমা সম্পদ সম্মানে এককালে যাঁরা উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, হঠাৎ তাঁরা স্থানচ্যুত হয়ে গেলেন এবং ধীরে ধীরে সমাজের নিম্নস্তরে নেমে আসতে বাধ্য হলেন। বৃটিশ প্রভুরা বিনা উদ্দেশ্যে এটা করে নাই! মার্শাল ল'র কর্তাদের শিক্ষাদীক্ষাও তাদেরই পাঠশালায়!

দেশ বিদেশের দালালরা কতই না গল্প রচনা করেছে রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে।

উকিল বারে এক নতুন আমদানী! কোনদিন তার চেহারাও দেখি নাই। একদিন বন্ধুবান্ধব নিয়ে গল্প জুড়ে দিল; চীফ মিনিষ্টারকে একটা ব্যাপারে কুড়ি হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়েছিল। অথচ কাজটা হলনা।

শ্রোতারা সবই ত আর তার মত নয়। দু'একজন বলল, বল কি, উনি ঘুষ খান, এটা ত শুনি নাই। কেমন করে দিলে, কখন দিলে, একটু বিস্তারিত বল শুনি।

দু'একজন চেঁচায়ে উঠল, আহা! না দিয়ে থাকলে কি এমনি বলবে নাকি?

দোটানায় পড়ে গেল। ঢোক গিয়ে বলল, টাকাটা ঠিক ওর হাতে দেই নাই—দিয়েছি ওর স্ত্রীর হাতে।

ঠিক এই মুহূর্তে আমার পলিটিকাল সেক্রেটারী বেচারা দুর্ভাগ্য-ক্রমে ওখানে গিয়ে উপস্থিত। গল্পসৃষ্টিকারী তাকে চেনে না।

গল্পের সূত্র অনুধাবন করে সেক্রেটারীর খুব রাগ হল কিন্তু

লোকটা কতদূর যায়, দেখার জন্য তার কৌতুহল হল। বলল, তাঁর স্ত্রী ত বহুকাল কঠিন রোগে শয্যাশায়ী, উত্থানশক্তি রহিত। তাঁকে কেমন করে দিলে? কোথায়?

বেচারা বলছিল গল্প। জেরার জন্য প্রস্তুত ছিল না। ভেবেছিল, সবার হজমশক্তি তারই মত। ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। কিন্তু মান বাঁচাতে হবে ত। বলল, না, তার হাতে দেই নাই। দিয়েছি ঐ বাড়ীরই একটি মেয়েলোকের হাতে।

আরও ফেসাদে পড়ল। এক মিথ্যা ঢাকতে আর এক মিথ্যার আবিষ্কার করতে হয়, কিন্তু তাতে দায় আরও বাড়ল।

কে মেয়েলোকটি? প্রশ্ন হল।

তা বলতে পারব না। ওনাদেরই লোক হবে।

তা হোঁক, কোথায় দিলে, কোন্ কামরায়, না দোতলায়, কোন্ দিকে দরজা, এই সব জেরা শুরু হয়ে গেল।

ধরা পড়ে গেল। কোনদিন যায় নাই চীফ মিনিষ্টারের সরকারী বাসভবনে। অন্দরের খবর জানতেই পারে না।

সবাই তখন মাথায় চাটি মারতে লাগল। কেউ কেউ বলে উঠল, ব্যাটা তোর নামে মানহানির মোকদ্দমা হবে, জানিস? হাতে পায়ে ধরে মাফ চাইতে লাগল: এ কথা যেন আর কেউ জানতে না পারে।

কিন্তু আমার কানে গেল খোঁজাখুঁজি করলাম। কারণ এটা নিয়েও ত একটা কেস. দায়ের হতে পারে। গুজবের যুগ। জানা গেল, তার দেশের এক নিরাহ ভদ্রলোকের কাছ থেকে কিছু টাকা এনেছিল তদবীর করার নামে। মাত্র কয়েক শ টাকা। টাকাটা হয়ত মেরে দিয়েছে। যার টাকা তাকে গিয়ে বলেছে কাজ হল না। এখন মর্শাল ল'র অপপ্রচারের ঢেউ-এ চীফ মিনিষ্টারের ঘাড়ে দোষ চাপাবার চেষ্টা করছিল। একটা গল্প রচনা করা হল।

কয়েক বছর পর এই ছোকরা কনভেনশন লীগের টিকেটে

জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হল। এরি জন্য হয়ত শুরু থেকেই রাস্তা পরিষ্কার করছিল।

মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত বাঙালী চরিত্রের এটাও একটা বৈশিষ্ট্য। উদ্দেশ্য বা স্বার্থ থাকুক বা নাই থাকুক অন্যের কুৎসা রটনা করে কুৎসিত আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ ছাড়তে চায় না।

বাঙালীর সাথে মিশে বাইরে থেকে যারা এসেছে তারাও এ সব করে আনন্দ পায়। এমনি বাঙালীকে তারা সুনজরে দেখেনা। তারপর যদি উপলক্ষ পাওয়া যায় তাহলে কথাই নাই।

উনষাট সালের সাতাশে অক্টোবর বিপ্লব-দিবস। প্রথম বার্ষিকী। শহরময় দিবসের প্রস্তুতি। বড় বড় ব্যবসায়ীরা তোরণ নির্মাণ করে রাজভক্তির প্রমাণ দিচ্ছে।

আগের দিন রাত্রে এক ব্যক্তি—নিশ্চয়ই মহাজন ব্যবসায়ী হবে, আমাকে টেলিফোন করল; ক্যা সাব কাল্‌কা দিন নাহি মানা রহে?

কিসের দিন—আপনিই বা কে, জিজ্ঞাসা করলাম।

বলল, নেহী জানতে? আপলোগোঁকা মৌত কা দিন।

জবাবে বললাম, আমাদের মউত আর শয়তানের পয়দায়েশ নাকি? খুব মানান আপনারা—আপনাদের জন্মদিন।

টেলিফোন ছেড়ে দিল।

ষাট সালে চাটগাঁ ও উপকুল অঞ্চলে ভয়াবহ ঘূর্ণিবাত্যা বয়ে গিয়েছিল। সমস্ত এলাকা বিপর্য্যস্ত। আমরা একটা বেসরকারী রিলিফ কমিটি গঠন করে চাঁদা আদায় করা শুরু করেছিলাম। কিন্তু সরকার নির্দেশ দিল, বেসরকারী কমিটি চাঁদা আদায় করতে পারবে না। ফলে আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে গেল।

এক মহাজন টেলিফোন করলেন: ক্যা সাব, চাঁদা উঠাকে ক্যা ফায়দা হোগা! কুছ পয়সা আভি নিকালিয়ে। লাখ লাখ মারকে চুপসে বয়ঠে হ্যায়, চাটগাঁও কে লিয়ে দু' এক লাখ দিজিয়ে।

কি জবাব দেব এই ধৃষ্টতার? কোন ভদ্রোচিত জবাব দেওয়া কি সম্ভব?

সবই অপপ্রচারের মহিমা।

মার্শাল ল' জারী হবার মাস দুয়েক পর আমার এলাকার দুই তিনজন মাতাব্বর এলেন দেখা করতে। আমার প্রশংসা করিলেন। মার্শাল ল' হোক আর যা-ই হোক আপনি চির দিন আমাদের নেতা থাক্‌বেন। আপনি বটগাছ—এর ছায়াতলে আমরা শান্তি লাভ করব, ইত্যাদি।

তারপর বললেন, গ্রামে একটা পাকা মসজিদ করছি, চাঁদা দিতে হবে।

বল্‌লাম, এখন ত অবস্থা সঙ্গীন। উকালতি ব্যবসা আবার শুরু করলে তখন যদি পারি কিছু নিশ্চয়ই দিব।

বল্‌লেন, হাজার খানেক টাকা আপনার কাছ থেকে আশা করি। কমপক্ষে।

বল্‌লাম, আশ্চর্য! এত টাকা কোত্থেকে দিব?

মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল; তারপর বলল, স্যার এত টাকা করলেন, কি হল সব? শুনি ত লাখ লাখ।

রাগও হল, দুঃখও হল। বল্‌লাম, মায়না যা পেয়েছি, তাতে ত লাখ লাখ হতেই পারে না। তা হলে, আপনাদের ধারণা দুর্নীতি করে টাকা করেছি, নইলে এত টাকা কোথায় পাব?

চুপ করে রইল।

বললাম, এতক্ষণ যে বড় তারিফ করছিলেন, আমি মস্ত বড় নেতা ইত্যাদি, কেমন করে বিশ্বাস করেন আমি অন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জন করব? যদি তাই বিশ্বাস করেন তা হলে কেমন করে আমার প্রতি আপনাদের সম্মান দেখাতে পারেন? এই দুই অবস্থার সামঞ্জস্য কেমন করে করবেন! যদি বিশ্বাস করেন আমি দুর্নীতিপরায়ণ তা হলে তৎক্ষণাৎ আমার প্রতি আপনাদের

ঘৃণার উদ্রেক হওয়া উচিত। শুধু তাই নয়, দেশময় আপনাদের প্রচার করা উচিত যে যাকে আমরা নেতা বলে মানতাম সে দুর্নীতিপরায়ণ-দুষ্কৃতী। নেতা হবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। তা না করে, তার কাছে মসজিদের জন্য চাঁদা চাইতে এসেছেন! অদ্ভুত আপনাদের মনোবৃত্তি।

চঞ্চল হয়ে উঠল। বলল, মাফ করবেন, আমরা মূর্খ মানুষ, এ সব বুঝি না। দু'এক জন লোকের কাছে গিয়েছিলাম তারাই বলল, এবং তারাই পাঠায়ে দিল আপনার কাছে। বলল, অন্ততঃ হাজার পাঁচেক ত দেবেই। তাই বলছিলাম।

হেসে বললাম, ও টাকা দিয়ে যে মসজিদ হতে পারে না, সে কথাটা ভাবেন নাই ?

বলল, আর লজ্জা দিবেন না, লোকের মুখে শুনেই বলেছিলাম।

বললাম, শুধু শোনা নয়, বিশ্বাসও করেছিলে, নইলে আমার কাছে এত টাকা আশা করেন কেমন করে ?

মার্শাল ল হবার পর বহিরাগত বন্ধুদের উৎপাত ও দৌরাত্ম বেশ বেড়ে গিয়েছিল। না জানি কেমন করে তাদের ধারণা হয়েছিল যে রাজত্বটা তাদেরই। অন্ততঃ নিজেদের রাজার জাত মনে করত। যেমন ভাবত, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি বন্দরের পাটের অফিসের ইংরাজ কর্মচারীরা। দাবীও একেবারে মিথ্যা নয়। জাত ত রাজারই বটে।

আগেই বলেছি, রাজনীতিকদের আপমান করার সরাসরি দায়িত্ব নিয়েছিলেন গভর্ণর জাকির হোসেন।

একদিন হুঙ্কার দিলেন : রাজনীতিকদের ক্রিয়াকলাপের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত একটা হোয়াইট পেপার তিনি বার করবেন ছাপার অক্ষরে।

তাঁর নিকটস্থ একজন কর্মচারীকে বললাম, কি সব বলছেন উনি ? আমরা যে তাঁর কীর্তিকলাপ ও গুণাবলীর বিস্তারিত

বিবরণ দিয়ে একটা ব্ল্যাক পেপার বার করছি, তার খবর রাখেন তিনি ?

কথাটা বোধ হয় তাঁর কানে গেছে। হোয়াইট পেপার আর বার হয় নাই। আমরাও ব্ল্যাক পেপার চেপে রেখেছি।

কি তিনি বার করতে পারতেন ? রাজনীতিকরা এই দেশেরই মানুষ ! জনগণের মাঝেই তাঁদের জন্ম, শিক্ষা-দীক্ষা, জীবন গঠন। ভালমন্দ যা আছে তা সবার জানা আছে। সরকারী কর্মচারীদের মত আলাদা জীবন ও সমাজ তাঁদের নয়। সরকারী কর্মচারীদের মত চাকুরী জীবনের ইতিহাস ও গোপন-তথ্যও তাঁদের নাই। মানুষ জানে রাজনীতিকরাই তাদের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাদের অসীম দুঃখ দৈন্য, অগণিত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা রাজনীতিকরাই করে। এ সব করতে গিয়ে ভুলভ্রান্তি, এমন কি অন্যায়ও তাঁরা করবেন না, রাজনীতিকদের এমন অতি-নৈতিক আদর্শবাদী ফেরেশতা বলে জনগণ ভুল করেনা। রাজনীতিকদের কর্মজীবনের উপর জনগণের তীক্ষ্ণদৃষ্টি সর্বদা নিবদ্ধ থাকে, তারা ভুল করলে জনগণ তাদের শোধরায়।

জনগণ এটাও জানে, সত্যিকার রাজনীতিক দালালী করতে জানে না। ত্যাগ সাধনা সততা ও ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমেই তাঁরা গণমনে আসন লাভ করেন। উড়ে এসে জুড়ে বসে উগ্র বাক্যবাণে তাঁরা মানুষকে জর্জরিত করেন না। তাদের মর্যাদার হানিও করেন না। এটা পারে শুধু সরকারী দালালরা, যাদের নিজস্ব ক্ষমতা বা শক্তি বলতে কিছুই নাই। পরের কাছ থেকে ধার করা ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে তারা নিজেদের শক্তিশালী মনে করে।

আমার আমলের কয়েক হাজার টাকার বিল পেশ করা হয়েছিল জাকির হোসেনের কাছে। শাহবাগ হোটেলের বিল। বিদেশী পর্যটক আমন্ত্রিত মেহমানদের সম্মানার্থে চা, খানার ব্যবস্থা করতে হয়েছে, বড় ছোট হরেক রকমের প্রেসিডেন্ট প্রধান মন্ত্রীকেও

খানা দিতে হয়েছে। এ সবের বিল অনাদায়ী ছিল। গভর্ণর নির্দেশ দিলেন, যাঁর বিল তাঁর কাছে অর্থাৎ চীফ মিনিষ্টারের কাছে পাঠায়ে দাও।

বিল এল আমার কাছে। লিখে দিলাম, আমার নিজস্ব ব্যাপার ছিল না। সরকারী ব্যবস্থার টাকা সরকারই দিবে। বিল যথাস্থানে ফেরৎ গেল।

গভর্ণরের এটা একটা হাতিয়ার। বিভিন্ন স্থানে সভাসমিতিতে এর উল্লেখ করেছেন। ময়মনসিং শহরে এক সভায় এই বিলের উল্লেখ করলেন। বড় বড় সবাই সভায় উপস্থিত। কর্মচারী রাজনীতিক প্রাক্তন এম-পি-এরাও মৌলিক গণতন্ত্রী।

বললেন, এই দেখুন এরা—অর্থাৎ প্রাক্তন রাজনীতিকরা দেশকে ধ্বংসের মুখে টেনে এনেছিল। সেদিন আওয়ামী লীগের প্রধান মন্ত্রী হোটেলের বিল অনাদায় রেখে সরে পড়েছে দেখলাম। বড় বড় পার্টি দিয়েছে—খানা পিনা। রাজকীয় কাণ্ড কারখানা করেছে শাহবাগ হোটেলে আর দলীয় সদস্যদের দাওয়াত করেছে এই সব রাজভোগে। আমরা তার বিল কেন শোধ করব? দিক নিজে টাকা।

বিল যে আমি ফেরৎ দিয়েছি, সে খবর তাঁর জানা ছিল না।

মনোরঞ্জন ধরও উপস্থিত ছিলেন। উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আপনার এই উক্তির প্রতিবাদ আমি না করে পারছি না। আপনি কাগজ-পত্র না দেখে অযথা মন্তব্য করেছেন। আপনার মন্তব্য অসত্য।

চারদিক থেকে হৈ হৈ করে উঠল বশংবদ কর্মচারীর দল। আরে করেন কি? গভর্ণরের মুখের উপর জবাব? বেটার সাহস ত কম নয়, কেঁউ কেউ মন্তব্য করল।

মনোরঞ্জন ধর বললেন, কেন, কি হয়েছে? আমি আতাউর রহমান সরকারের একজন সদস্য ছিলাম। এতে গর্ব অনুভব করি। আমার হাতে ছিল অর্থ দফতর। যা' ব্যয় করা হয়েছে, সবই সরকারের ব্যয়—ব্যক্তিগত নয়। দলীয় সদস্যদের খাওয়ানোর

কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কার কাছে শুনেছেন আপনি? বড় বড় পার্টিতে নিমন্ত্রণ করা হতনা বলে সদস্যরা চীফ মিনিষ্টারকে দোষারূপ করেছে। কিন্তু তিনি দাবী প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর আপনি কিনা বলছেন দলীয় লোকদের শাহবাগ হোটেলে দাওয়াত করেছে? আশ্চর্য!

অনেকেই পাঞ্জাবী ধরে টানাটানি শুরু করল। থামুন, যথেষ্ট হয়েছে। সভার কাজ হতে দিন। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করুন।

মনোরঞ্জন ধর চটে উঠলেন, কেন থামব? ভয়ে? কারও পাকা ধানে মই দিয়েছি? না আমি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক বলে আমার দেশপ্রেমের প্রতি কটাক্ষ করে আমাকে দমায়ে দিতে চান? তা হবে না। দেশ আমারও। আপনাদের কারও চাইতে এই দেশকে আমি এক বিন্দুও কম ভালবাসি না।

গভর্ণর থ' হয়ে গেলেন। ভাবতেই পারেন নাই এমন প্রতিবাদ উঠবে। এ অবস্থায় মুখ ফুটে কথা বলাই ত দুঃসাহসের কাজ। প্রতিবাদ করার প্রশ্নই উঠেনা। মিলিটারী গভর্ণর। কেউ কেটা নয়।

এ অবস্থার যা হয় তাই হল। যারা বেশী ডাণ্ডা ঘুরায়, তারা আসলে ভীরু। হেসে বললেন, আপনি উত্তেজিত হয়েছেন বলে মনে হয়। এখন বসুন।

কিছুক্ষণ পর সভা ভঙ্গ হয়ে গেল।

কয়েকদিন পর মনোরঞ্জন ধর এক মামলার আসামী উল্লেখ গ্রেফতার হলেন। এস-ডি-ও যথারীতি জামিন না মঞ্জুর করলেন। কিন্তু জজ সাহেব জামিন দিলেন।

মনোরঞ্জন ধর, খয়রাত হোসেন; মনসুর আলী প্রমুখের বিরুদ্ধে একটা মোকদ্দমা দায়ের হয়েছিল। সেও এক তাজ্জব ব্যাপার। আমাদের আমলে নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মীদের সাহায্য করার জন্য সরকার থেকে আড়াই লাখ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল। বাজেটে ঐ টাকা বরাদ্দ করে পাশ করা হয়েছিল।

সাহায্যের জন্য বহু দরখাস্ত পড়ল। সে সব বাছাই করার জন্য কয়েকজন মন্ত্রী নিয়ে একটি কেবিনেট সাব-কমিটি গঠন করা হয়। আমিও তার সভ্য ছিলাম কিন্তু সময় অভাবে সভায় উপস্থিত থাকতে পারি নাই বলে আমার পলিটিক্যাল সেক্রেটারী আমার বদলী হাজিরা দিত—তাও মাঝে মাঝে।

যারা বিনা বিচারে জেল খেটেছে কিংবা বিভিন্ন রকমের নির্যাতন ভোগ করেছে তারাই এই টাকা পাওয়ার অধিকারী। টাকাও দেওয়া হল জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের মারফত। মন্ত্রীদের কারও কিছু করার ছিলনা—টাকা বিতরণের ব্যাপারে।

তবুও এদের নামে মোকদ্দমা দায়ের হল। সরকারী আইনজ্ঞরা নাকি রায় দিয়েছেন, মোকদ্দমা সঙ্গীন—জেল অনিবার্য।

একদিন দুইজন পুলিশ কর্মচারী এল আমার জবানবন্দী নিতে। একজন ইনস্পেকটর আর একজন সাব-ইনস্পেকটর। কয়েকটি কাগজে আমার দস্তখত দেখায়ে জিজ্ঞাসা করে নিল এগুলি আমার দস্তখত কি না।

বললাম, কি নিয়ে এত ধ্বস্তাধ্বস্তি করছ, মন্ত্রীদের গ্রেফতার করে এনেছ ?

স্যার, তাত জানি না। উপর আলার হুকুম।

বললাম, এ সব গৎ এখনও ছাড় নাই ? উপর আলার হুকুম ! সব সময়েই তাদের ঘাড়ে দোষ চাপায়ে কাজ সেরে নাও। তাদের বলতে পার না যে এ মোকদ্দমা অচল ? অন্ধের মত হুকুম পালন করাই কর্তব্য পরায়ণতার লক্ষণ নয়।

বাজেট বই নিয়ে এসেছিল সাথে। বললাম, ও বই এর মার-প্যাঁচ বোঝা তোমাদের সাধ্য নয়—তোমাদের মনিবদেরও নয়। তাই, একটা তফসীরও সাথে সাথে ছাপা হয়। সে বই খানা মন দিয়ে পড়তে বলো তাদের। হয়ত মাথায় কিছু ঢুকতে পারে।

আচ্ছা স্যার, তাই করব। প্রয়োজন হলে আবার এসে আপনাকে বিরক্ত করব।

বললাম, যতবার খুশী এস। যতক্ষণ মগজে প্রবেশ না করে।

আর আসে নাই। মোকদ্দমাও কোর্টে ওঠে নাই। ওঠার কথাও নয়। তবুও মন্ত্রীদের গ্রেফতার করে অনর্থক হেনস্তা করা হল। খয়রাত হোসেনকে বন্দী অবস্থায় টেনে আনা হয়েছিল রংপুর থেকে ঢাকা। এখানে জামিন হল।

সরকারের উর্ধ্বতন আইন উপদেষ্টা একদিন আমাকে বললেন, খুব শক্ত মোকদ্দমা। কাষ্ট আয়রণ কেস—ঢালাই লোহার মত শক্ত।

হেসে ফেললাম, বললাম, এটা একেবারে তরল ও অচল।

একদিন তিনি জজ কোর্টের দিকে গেলেন। কোন্ ঘরে মামলা করা হবে, তার খোঁজ করলেন। তিনি নিজেই সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করবেন। তাও প্রকাশ করলেন।

শেষ পর্যন্ত বললেন, প্রত্যেকটি মন্ত্রীকে কাটগড়ায় দাঁড় করায়ে ছাড়ব। সবাইর সব গোমর ফাঁক করে দেব।

এই দম্ভ ও আস্ফালন প্রায় সার্বজনীন ছিল।

তারপর একদিন জাকির হোসেনকে সিংহাসন ছাড়তে হল। সব বাহাদুরী, মুখের তুবড়ি, আমার আয়ুব খাঁ—সব বুলিই বন্ধ হয়ে গেছে।

কেন্দ্রের এক মন্ত্রীকে বলেছিলাম, মার্শাল ল' জারী করাতে যত ক্ষুব্ধ না হয়েছি আমরা তার চেয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছি এই সব জাতীয় লোককে গভর্ণর নিযুক্ত করাতে। এরা মানুষকে মানুষ মনে করেনা। শক্তির গর্বে সবাইকে অপমান করে।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনারা এ বিষয়ে কিছু করতে পারেন না?

বললেন, আমাদের বলার বা করার দরকার করেনা। এর বিরুদ্ধে আবেদন, নিবেদন, অভিযোগ শত শত পড়ে আছে বড় কর্তার সামনে—টেবিলের উপর।

তবুও রাখছেন কেন একে? আমাদের অপমান করার জন্য?

এটা বুঝতে পার না? যে কাজ তাকে দিয়ে করান সম্ভব,

অন্য কাউকে দিয়ে তা হতে পারে না। তাই একে রাখতেই হবে। প্রয়োজন শেষ হলে এরও শেষ। আবার ঐ জাতীয় আর একটাকে ধরে এনে বসাবে, যে কোন কাজ করতে দ্বিধা বা কুণ্ঠা বোধ করবে না। একনায়কত্বের ধারাই তাই।

ঠিকই বলেছেন—এরা ঠিকাদার। বিশেষ কাজের জন্য নিযুক্ত করা হয়। মেয়াদও নির্দিষ্ট থাকে। কাজ হয়ে গেলে মেয়াদও শেষ। এরা একজনেরই সেবাদাস। তারই খেদমতে সর্বদা হাজির। তার হুকুমই সব অপকর্মের যুক্তি। দেশপ্রেম, মানবপ্রেম, দেশের উন্নয়ন অগ্রগতি—এ সব কথা বলতে হয় দুষ্কর্ম চাপা দেওয়ার জন্য। জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক সব গুরুর চরণে উৎসর্গীকৃত।

মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে—এ সব বড় বড় দর্শন ও আদর্শ দেশ-প্রেম ধর্মের বোলচাল স্তব্ধ হয়ে গেছে। ঠিকাদারীর রীতিই তাই। ব্যতিক্রম হতে পারে না।

নয়

সামরিক শাসন জারী হবার কিছুদিন পর রাণী এলিজাবেথের স্বামী ডিউক অব এডিনবরা ঢাকা এলেন পাকিস্তান বিজ্ঞান অ্যাসো-সিয়েশনের নিমন্ত্রণে। বক্তৃতার আসর কার্জন হল। ডিউকের সাথে বিভিন্ন দেশের অনেক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকও এসেছেন।
নিমন্ত্রণ পেয়ে কার্জন হলে গেলাম। গিয়ে দেখি, প্রথম তিন চার সারি চেয়ার উল্টা করে রেখে দিয়েছে। তার পিছনে আমাদের আসন। মৌলানা আকরম খাঁ, তমিজুদ্দিন খাঁ আবু হুসেন সরকার ও আমি। মৌলানা ও তমিজুদ্দিন খাঁ যান নাই।

ভাবলাম, অনেক অভ্যাগত অতিথিবৃন্দ এসেছেন, তাঁদের জন্য চেয়ারগুলি সংরক্ষিত।

কিছুক্ষণ পর দেখি, মাত্র প্রথম কাতার বাদ দিয়ে আর সব সারিতে বসে গেল আমাদের সেক্রেটারী জয়েন্ট ও ডেপুটি সেক্রেটারীরা সস্ত্রীক। কেউ কেউ পিছন দিকে চেয়ে কিছুটা বিব্রত বোধ করল। অল্প সময়ের জন্য। অত শীগ্‌গীর চোখের পর্দা মোটা হয় কেমন করে। তার পর ঠিক হয়ে বসে পড়ল।

আবু হুসেন সরকারকে বললাম, চলুন, আর কেন? খুব হয়েছে! এরপর যদি কেউ এসে এখান থেকে উঠায়ে আরও পিছনে নিয়ে যায়?

প্রধান অতিথি ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ এখনও এসে পৌঁছান নাই। সরকারকে বললাম, চলুন, এই ফাঁকে।

বললেন, না সেটা বড় খারাব দেখাবে।

বললাম, এই অবস্থাটা কি খুব ভাল দেখাচ্ছে নাকি?

সরকার বললেন, মনে করুন, সিনেমা দেখতে এসেছি। দামী ও মানী আসনগুলি ত পিছনের দিকেই থাকে। চক্ষু বন্ধ করে থাকুন না হয় কতক্ষণ।

তাই রইলাম। ডিউক এলেন দলবলসহ। জাকির হুসেনও সাথে।

চোখ মেলে দেখলাম, বিভিন্ন জায়গায় উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আমাদের দিকে আড় চোখে চাইছে আর কি যেন বলাবলি করছে। মনে হয় কৌতুক বোধ করছে। আমাদের অবস্থা দেখে কিংবা সহানুভূতিতে।

বিকালে ডক্টর ওসমান গণিকে টেলিফোনে বকাবকি করলাম একচোট। তাঁর নিমন্ত্রণেই ডিউক এসেছিলেন। তিনি যজ্ঞের হোতা। বললাম, নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এমন অপমান কেন করলেন?

অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে বললেন, আমি যারপর নাই লজ্জিত।

আপনারা রাগ করবেন, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু এতে আমার কোন হাত ছিলনা। সরকারী নির্দ্দেশেই সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমার পরামর্শ উপেক্ষা করেছে।

বললাম, এতে কি সরকারের গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছে? আগের কাতারে বসায়ে দিলেই কি কর্মচারীদের মর্যাদা বেড়ে যায় নাকি? আমাদের যারা চেনে তারা সরকারকে ধিক্কার দিয়েছে। বিদেশী মিশনের কেউ কেউ দুঃখ প্রকাশ করেছে।

বললেন, তা ত করবেই। আমি নিজেও উপলব্ধি করেছি। আমার দুঃখের কথা শুনবেন? আমি প্রেসিডেণ্ট অথচ আমাকে পাশ কাটায়ে সব প্রোগ্রাম ঠিক করা হয়েছে। আমি ডিউককে নিমন্ত্রণ করেছিলাম তার জন্য গবর্ণর আমাকে যা-ইচ্ছা-তাই বলে গাল দিয়েছেন। তুমি কে? তুমি কেন নিমন্ত্রণ করে? ইত্যাদি।

অতীতের ইতিহাসের কথাও উল্লেখ করেছেন। বললেন, তোমাকে কি আমি চিনিনা? রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় ছেলেদের উস্কানি দিয়েছ। এ সব রেকর্ড করা আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর ফিবে আসতে না পার তারও ব্যবস্থা আমি করব।

করেও ছিলেন।

অনেক তেল খরচ করে সে ব্যবস্থা বাতিল করতে হয়েছিল ডক্টর ওসমান গণিকে।

তার দুঃখের কাহিনী শুনে আমার দুঃখ দূরে চলে গেল।

রাজনীতি ও রাজনীকদের বিরুদ্ধে যে অভিযান শুরু হয়েছিল তা' শুধু অপপ্রচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না। ধর পাকড়, মামলা মোকদ্দমাও দায়ের হল। প্রমাণ ছাড়া মুখের কথার মূল্য কি? তাই প্রমাণ করতে হবে রাজনীতিকরা দূর্নীতিপরায়ণ।

সরকারী কর্মচারীরা করিৎকর্মা। গ্রেফতার করার জন্ম বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত হল। মাল-মস্‌লা সংগ্রহ করতে হবে।

বাছা বাছা কয়েকজন পুলিশ কর্মচারী—ছোটবড় মাঝারি সব পর্যায়ের লোক পূর্ণোদ্যমে কাজে লেগে গেল।

অবসর প্রাপ্ত কর্মচারীরাও আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। একজন আমাদের আমলে পূর্ণবহাল করার জন্য আবেদন তদবীর করেছিল—ফল হয় নাই। মার্শাল ল' জারী হবার সাথে সাথেই গভর্ণমেণ্ট হাউসে ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করল। পুলিশের মানুষ, পুলিশ গভর্ণরের কাছ থেকে কাজ বাগায়ে নিল। দূর্নীতি বিভাগের একজন কর্তা হয়ে বসল।

অবসর-প্রাপ্ত আই-জি দোহাও হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। সব অফিসে আনাগোনা শুরু করে দিলেন। অযাচিত উপদেশ নির্দেশ দিতে লাগলেন। গভর্ণরের বাড়ীতে দহরম মহরম। চলাফেরা ভাবভঙ্গী দেখে অনেকেই মনে করত বড় একটি চাকুরী পেয়ে গেছে। তারও ধারণা ছিল, এই হট্টগোলের মধ্যে যদি কপাল আবার খুলে যায়!

খুলেছিল অনেকদিন পর।

দূর্নীতির অভিযোগে মোকদ্দমা দায়ের করার পূর্বে সরকার নির্দেশ দিল, রাজনীতিকরা তাদের আয়ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ দাখিল করবে। অর্থাৎ তাদের আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী হয়ে থাকলে কিংবা জ্ঞাত ও প্রকাশ্য উপায়ে অর্জিত ধনসম্পদের চেয়ে তাদের অধিক সম্পদ জমা হয়ে থাকলে এটা প্রমাণিত হবে যে দূর্নীতির মারফত তারা এই ধনসম্পদ অর্জন করেছে।

দু'টি মোকদ্দমা দায়ের হয়েছিল—মনসুর আলি ও কোরবান আলির নামে। একটি হাইকোর্টে বাতিল হয়েছিল আর একজনের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা প্রমাণ অভাবে ডিস্‌মিস হয়েছিল আট বছরপর।

এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল।

তারপর সরাসরি দূর্নীতির দায়ে মামলা দায়ের করা হল। ঘটা করে প্রচার করা হল সংবাদপত্র, এমনকি রেডিও মারফত।

অমুকের নামে অত নম্বর মোকদ্দমা। মোকদ্দমার ফলাফল যাই হোক, দেশবাসীকে জানাতে হবে যে এরা দুর্নীতি করেছে। দেশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। সামরিক আইন দেশকে রক্ষা করেছে এদের হাত থেকে।

শেখ মুজিবর রহমান ও আবুল মনসুরের নামে একাধিক মামলা দায়ের হল। গ্রেফতার ত আগেই করা হয়েছিল—অনুমান ও অপপ্রচারের ভিত্তিতে। পরে আইন সংশোধন করে গ্রেফতার শুদ্ধ করা হয়েছিল।

গ্রেফতারের সাথে সাথে জামিনের দরখাস্ত করা হয়। নিম্ন আদালতে অগ্রাহ্য হওয়ার পর জজকোর্টে দরখাস্ত করা হয়। সরকারী উকিল কোমর বেঁধে দাঁড়াল বিরোধিতা করার জন্য। শুরু করল, স্যার, এরা যা করেছে তার তুলনা হয় না। টাকা যা মেরেছে তার হিসাব-নিকাশ নাই। লাখে লাখ—বেশুমার।

স্রেফ গাঁজা। ডাহা মিথ্যা। কোন প্রমাণও নাই। ছিল শুধু অনুমান, তাই যথেষ্ট। সরকারী নির্দেশও তাই ছিল।

জামিন হয় নাই।

আয়ুব খাঁ অবশ্য বড় গলায় শুরুতেই বলেছিলেন, নো উইচ হান্টিং। অর্থাৎ ডাইনী খোঁজার মত বন-বাদাড়ে ঘরের আনাচে কানাচে তল্লাসী দেওয়া হবে না। খাঁটি মাল-মস্‌লার ভিত্তিতেই মোকদ্দমা চালান হবে। নিছক সন্দেহের ফলে কিছু করা হবে না।

তাঁর এই সতর্ক আশ্বাস বাণী নীচের তলা অবধি পৌঁছায় নাই। পৌঁছালেও তারা গ্রাহ্য করে নাই। তারা সমুদ্র মন্থন করে অমৃত হলাহল যাই উঠুক তোলার চেষ্টা করেছে। দিকে দিকে অভিযান চলেছে প্রমাণ সংগ্রহের। বঙ্গোপসাগর থেকে উত্তরে গাড়ো পাহাড় পর্যন্ত সব ঝোপেই কোপ মেরেছে। কোন পাথরই না-উল্টায়ে ছাড়ে নাই।

শেখ মুজিবরের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহের অভিযান খুব ব্যাপক।

দেশের সর্বত্র কর্মীদের নিয়ে টানাটানি হয়েছে। কোন কিছু বার করা যায় কিনা।

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, দুর্নীতি বিভাগের বেতনভুক্ত পোষ্য কয়েকটি দালাল ছাড়া আর কোন সাক্ষী কাঠগড়ায় আনতে পারে নাই।

ফল যা হবার তাই হয়েছে। পর্বতের মুষিক প্রসব। গন্ধমাদন পবত কাঁধে নিয়ে এসে দেখা গেল বিশল্যকরণীর শুক্‌না ডাল। সব পণ্ডশ্রম।

শেষ পর্যন্ত একটা মোকদ্দমা গেল জজ কোর্টে। সোহরাওয়ার্দী তার পক্ষ সমর্থন করেন। জজ বাহাদুরকে অনুরোধ করা হল, আসামীকে তাঁর উকিলের পাশে বসার অনুমতি দেওয়া হোক। মাঝে মাঝে পরামর্শ নিতে হবে, কাগজপত্র দেখাতে হবে।

ধর্মাধিকরণ প্রায় গর্জে উঠলেন, নো ও। আঙ্গুল দিয়ে কাঠ গড়ার দিকে নির্দেশ দিলেন। দশটা পাঁচটা কাঠগড়ায় দাঁড়ায়ে রইল শেখ মুজিবর রহমান।

বিচারান্তে রায় দিলেন, জেল। হাইকোর্টে আপীল হল। মহামান্য বিচারপতি তাঁকে নির্দ্দোষ খালাস দিলেন। সরকার এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল দায়ের করল। মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট প্রাথমিক শুনানীর দিনেই না-মঞ্জুর করলেন।

পর পর আরও কয়েকটি মামলা হল। ফল এক। প্রমাণ অভাবে খালাস। কোথায় পাবে প্রমাণ? থাকলে ত? অনুমানের উপর মোকদ্দমা দায়ের করা চলে, কিন্তু প্রমাণ ছাড়া সাজা দেওয়া চলে না। চলে শুধু লাঞ্ছণা গঞ্জনা নির্যাতন।

আবুল মনসুরের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চলল দীর্ঘদিন ধরে। দুইটি —একটি ঢাকায় আর একটি করাচী। প্রথম অভিযোগ, তিনি তাঁর এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়কে অন্যায়ভাবে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে নারায়ণগঞ্জের এক সিনেমা কোম্পানীকে একটি ভারতীয় ফিল্ম

আমদানী করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তার আগে তাদের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করেনা, পরে আত্মীয়ের খাতিরে আবেদন মঞ্জুর করেন।

গভীর ষড়যন্ত্রের ভিত্তিতে এই মোকদ্দমা স্থাপন করা হয়েছিল। কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ ছিল না। দু'চারটি পোষা সাক্ষী কাঠ-গড়ায় দাঁড় করায়ে অসম্ভব ও অবাস্তব সাক্ষ্য প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা হল।

আবুল মনসুর তাঁর জবাবে বলেছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে বিশেষ স্বার্থান্ধ গভীর ষড়যন্ত্র করেছিল। কতকগুলি ভূয়া প্রতিষ্ঠান লক্ষ লক্ষ টাকার বিদেশী মুদ্রার পারমিট ও বাণিজ্যের লাইসেন্স সংগ্রহ করেছিল। তিনি জানতে পেরে এ সব বাতিল করে দেন। এক জাহাজ কোম্পানীর মালিকের বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করার নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন। এই মহাজন ব্যক্তি বড় বড় মহাজনদের বিশিষ্ট বন্ধু। অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করার সাহস কেউ করে নাই। আবুল মনসুর করলেন।

এই সব লোক অবৈধ উপায়ে টাকা লুট করছিল। আবুল মনসুর সে পথ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাই তারা আবুল মনসুরের বিরুদ্ধে চার কোটি টাকা উৎকোচ গ্রহণের গল্প চারদিকে প্রচার করতে লেগে গেল। ফলে এই মোকদ্দমা দায়ের হয়েছিল।

শিল্পবাণিজ্য প্রসার লাভ করেছে পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব-পাকিস্তান বঞ্চিত রয়েছে এতকাল। শিল্পবাণিজ্য মন্ত্রী থাকাকালে তিনি নির্দেশ দিলেন, চাকা ঘুরায়ে দাও। শিল্পবাণিজ্য সব গড়ে উঠবে এখন পূর্ব-পাকিস্তানে। পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পপতিরা খুব চটে গেল। বাঙালী মন্ত্রী সবই ওদিকে নিয়ে যাবে নাকি? আমাদের মাথায় বাড়ি। তারাও ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছে।

সাক্ষীপ্রমাণ হল। তাঁর নিজের বিভাগীয় কর্মচারীরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে গেল এবং সত্য গোপন করল। তাদের প্রাপ্তির পথও বন্ধ হয়েছিল। সাক্ষী না দিয়ে করে কি?

সাওয়াল জবাব হল। রায়দানের তারিখও নির্ধারিত হল। কিন্তু ঐ তারিখে রায় বার হলনা। আবার তারিখ পড়ল। সে দিনও রায় প্রস্তুত হয় নাই। আবার তারিখ পড়ল।

হঠাৎ খবর পাওয়া গেল, বিচারক বদলী হয়ে চলে যাচ্ছেন। তাঁর পদোন্নতি হয়েছে। পরদিন তার রায়ও লেখা শেষ। এক বছর জেল ও জরিমানা। অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী শাস্তিও গুরুতর হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আসামী বৃদ্ধ ও রুগ্ন বলে দয়া পরবশ হয়ে হাকিম কম শাস্তির আদেশ দিয়েছেন। জজ বাহাদুর মন্তব্য করেছেন রায়ের শেষ পাতায়।

এর পর হাইকোর্টে আপীল। বিফলে সুপ্রীম কোর্ট। মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট তাঁকে বেকসুর খালাস দিলেন।

যত সহজ ও সংক্ষেপে এই পর্বের চিত্র আঁকলাম, অত সহজে এই নিদারুণ অভিনয় ঘটে নাই। এর পিছনে যে মর্মন্তুদ লাঞ্ছনা-গঞ্জনার ইতিহাস গড়ে উঠেছে, তা সামরিক শাসনের ইতিহাসেব এক অধ্যায়কে কলঙ্কিত করে রেখেছে।

আরও কলঙ্কময় করেছে এই সব মোকদ্দমার প্রকৃতি ও পরিণাম। সামরিক আইনের কর্তাদের প্রধান অভিযোগ যে, রাজনীতিকরা দুর্নীতিপরায়ণ, তা সম্পূর্ণ অসত্য ও দুরাভিসন্ধিমূলক প্রমাণিত হয়ে গেল।

* * *

মামলা মোকদ্দমার সাথে সাথে নিরাপত্তা আইনের প্রকোপও বেড়ে গেল। আসামীরা ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্ত ছিল। আবুল মনসুরের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ইনি বহুকাল ধরে এক গুপ্ত সমিতির সাথে জড়িত থেকে ধবংসাত্মক কার্যকলাপ পরিচালনা করে আসছেন।

হেবিয়াস কর্পাস পিটিসন শুনানীকালে কৌসুলী সোহরাওয়ার্দী এই সব অভিযোগের উত্তরে কোর্টের মাধ্যমে সরকারী উকিলকে সরাসরি প্রশ্ন করলেন : যদি বহুকাল ধরেই ধবংসাত্মক কার্যে লিপ্ত

হয়ে থাকেন, তা হলে এতদিন তোমরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমায়ে ছিলে কেন? ছাপান্ন সালে প্রাদেশিক মন্ত্রী হয়েছিলেন। ঐ বছরই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হন। কয়েকবার অস্থায়ীভাবে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর কার্যভারও গ্রহণ করেছিলেন। সরকারের আই বি ডিপার্টমেণ্ট কোন আপত্তি করে নাই। সংশ্লিষ্ট কোন কর্তৃপক্ষকে এ বিষয় জানান হয় নাই। ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্ত ব্যক্তি মন্ত্রীত্ব করেন, প্রধান মন্ত্রীত্বের কাজও করেন—কি সর্বনাশের কথা! অথচ কেউ কোন উচ্যবাচ্য করে নাই। কারণ, বলার কিছুই ছিলনা। আজ যে সব অভিযোগ আনা হচ্ছে সব মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক, এ কথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

সরকার পক্ষ এর কোন সদুত্তর দিতে পারে নাই।

গুপ্ত সমিতির সাথে জড়িত বলে যে অভিযোগ করা হয় এটাও কল্পনা-প্রসূত। কোথায় সমিতি, কারা সদস্য এ সবের উত্তর আই-বি কোন কালেও দিতে পারে নাই। দিবে কেমন করে, থাকলে ত? যদি গুপ্ত হয়ে থাকে তা হলে তোমরা কেমন করে সন্ধান পেলে? অজ্ঞাত বলা চলে, অনুমান করে—অর্থাৎ জানা নাই। যেমন অমুকের পিতার নাম অজ্ঞাত। কিন্তু গুপ্ত বলতে পারনা। এমন সব উদ্ভট ও অলীক ঘটনা এরা আবিষ্কার করে, যা শুনলে যে কোন লোক লজ্জায় মাথা হেঁট করবে।

তাজউদ্দিনকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠাল নিরাপত্তা আইনে। অভিযোগ, তুমি জুন জুলাই মাসে বিভিন্ন জেলায় ঘুরে ঘুরে ধ্বংসাত্মক কার্য করেছ। জেলখানায় তার সাথে দেখা করতে গেলাম। বলল, ভাই সাব, জীবনে ঐ সব জেলায় যাই নাই। একবার আপনার নির্দেশে সীমান্ত এলাকার সর্দার মালিকদের সাথে দু'চার জায়গায় গিয়েছি—সরকারী খরচে। কিন্তু জুন জুলাই মাসে আমার ত ঘরের বাইর হওয়ার উপায় ছিলনা—ঢাকার বাইরে ত দূরের-কথা। ঐ সময়ে আইন পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত

ছিলাম, তা আপনিও জানেন। তার পর, আমি ত আপনার দলেরই সদস্য। কার বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ চালাব? নিজের সরকারের বিরুদ্ধে? একি সেম-সাইড্ গোলের মত নাকি? তাও ত হঠাৎ ঘটে। ইচ্ছা করে নয়।

হেসে বললাম, তুমি নিশ্চয় অন্য জেলায় যাও নাই—কিন্তু ওরা যে তোমায় দেখে ফেলেছে! এই যথেষ্ট। ওদের চোখ তিনটা—শিবের মতন তৃতীয় নয়ন আছে কপালের মাঝখানে। সেই নয়ন বাণে তোমাকে মেরেছে, তুমি যেখানেই থাক, ওরা তোমাকে যেখানে কল্পনা করবে, তুমি ঠিক সেইখানে আছ! তুমি যে কাজই করনা কেন, ওরা যদি ধ্বংসাত্মক মনে করে তা হলে তোমার কার্য ধ্বংসাত্মক হতে বাধ্য। বুঝলে?

বলল, হ্যাঁ ভাই সাব, খুব পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি। তা হলে এদের হাত হতে অব্যাহতি নাই?

বললাম, একদম নাই।

কফিলউদ্দিন চৌধুরী মন্ত্রী ছিলেন। অত্যন্ত নিরীহ প্রাণী। রাজনীতিতে আগ্রহান্বিত নন। একটা দোষ, মুখের লাগাম ঢিলা। যা' খুশী বলে ফেলেন। কর্মচারীদের বকাবকি করেছেন। ফল কারাবাস।

দেখা করতে গেলাম জেলখানায়। জিজ্ঞাস করলেন, আমাকে কেন গ্রেফতার করল, জানেন? কি পেয়েছে আমার বিরুদ্ধে?

বললাম, না পেয়ে থাকলে নিশ্চয়ই মিথ্যা রিপোর্ট তৈয়ার করে পাঠায়েছে আপনার বিরুদ্ধে। উপরের স্তরের মানুষরা তাই বিশ্বাস করে হুকুম জারী করেছে।

উত্তেজিত হয়ে বললেন, মিথ্যা রিপোর্টও আমার বিরুদ্ধে দিতে পারবে না। অসম্ভব!

হেসে ফেললাম। বললাম, তা পারবে না কেন? তাদের সৃষ্টি-শক্তি অসীম। না পারে এমন কাজ নাই। সত্য সৃষ্টি করা ত বরং

কঠিন, কিন্তু মিথ্যা সৃষ্টি করা ত খুব সহজ। প্রায় বিনা পরিশ্রমেই করা সম্ভব।

সত্যিই। এদের সৃষ্টিক্ষমতা অসাধারণ। নিরাপত্তা আইন ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী। যে কোন মানুষকে যে কোন সময় এর আওতায় ফেলা যায়। আইনের প্রয়োগ অতি সহজ। ইচ্ছা করলেই প্রয়োগ করা যায়। কারণ যুক্তি এ সবের কোন বালাই নাই। হাল জমানায় অসীম ক্ষমতার অধিকারী সরকারী কর্মচারীরাই এই আইন কাজে লাগাতে পারে। তাদের সন্তুষ্টিই গভর্ণর বা গভর্ণমেণ্টের সন্তুষ্টি. এই সন্তুষ্টি মনে উৎপাদন হওয়ার সাথে সাথেই আইন আমলে আসতে পারে। কারও প্রশ্ন করার অধিকার নাই, আপনি কেন অসন্তুষ্ট হলেন।

দশ

আমার বিরুদ্ধে সরাসরি কোন মামলা দায়ের হয় নাই। তবে চেষ্টার ত্রুটি হয়েছে এ কথা বলা চলে না। রোজই গুজব এসেছে কানে, এই মামলা লাগে লাগে। এই ধরে বুঝি। রোজই বাঘ এল, এই অবস্থা।

কিন্তু মামলা না বাধলেও তিক্ততা বেদনা ও লাঞ্ছনা কম সইতে হয় নাই। খাঁচায় বন্ধ না করলেও খোঁচায় জর্জরিত করেছে। জেলখানায় যারা বন্দী তারা একদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত—আর কেউ জ্বালাতে পারবেনা। মামলা একটা না হয় দশটা হোক। কিন্তু যারা বাইরে তাদের খোঁচা দেওয়া খুব সহজ। যা' খুশী বলা যায় তাদের বিরুদ্ধে।

বন্দী বন্ধুদের দু'একজন বলেছেনও: আপনার অবস্থা আমরা অনুমান করতে পারি। আমরা বন্দী, সাগরে শয্যা, শিশিরের ভয় নাই। কিন্তু আপনি বাইরে আছেন, আপনাকে ত "বিঁধিয়াছে

পদতলে প্রত্যহের কুশাঙ্কুর, প্রিয়জন করিয়াছে পরিহাস অতি পরিচিত অবজ্ঞায়"। আপনার অবস্থা আমাদের চেয়েও করুণ।

মার্শাল ল' জারী হবার দু'তিন দিন পর দুর্নীতি বিভাগের জনৈক হোমড়াচোমড়া জেনারেল ওমরাও খাঁর কাছে আমাকে গ্রেফতার করার অনুমতি চাইল। জেনারেল কারণ জিজ্ঞাস করলেন: প্রমাণ আছে?

উত্তর দিল: উনিই ত মূল। চীফমিনিষ্টার ছিলেন। দুর্নীতির উৎস। ওর অজ্ঞাতে ত কিছু হতে পারে নাই।

একজন কর্মচারী উপস্থিত ছিল, বলল, তিনি ত এখানে নাই— করাচী।

ঠিক আছে, এলেই গ্রেফতার করা যাবে।

ওমরাও খাঁ কর্কশ স্বরে বললেন, থামুন। অত তাড়াহুড়া করে কাজ নাই। আমার হুকুম ছাড়া তাঁকে গ্রেফতার করবেন না।

ইয়েস স্যার, অলরাইট, সার্টেনলি স্যার, বলতে বলতে ঘর থেকে বার হয়ে গেল।

ইনি জাতে সৈয়দ। আটান্ন সালে একশ' তিরানব্বই ধারার আমলে এক ঈদের দিন দেখা করতে এসেছিলেন। বাসায় ছিলাম না, দেখা হয় নাই। এক খণ্ড কাগজে লিখে গেলেন, স্যার ঘাবড়াবেন ন। আপনি নিশ্চয়ই আবার বহাল হবেন। দোয়া করি, আপনি একদিন পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী হবেন। সৈয়দের দোয়া ব্যর্থ হবার নয়।

দোয়াই শুধু ব্যর্থ হয় নাই পরে যে দাওয়া এস্তেমাল করতে চেয়েছিলেন তাও ব্যর্থ হয়েছিল। গ্রেফতার আমাকে করতে পারে নাই।

গভর্ণর জাকির হোসেনের কাছে গিয়ে একদিন আমাদের কুৎসা গাইল। ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটও সেখানে ছিলেন। বললেন, কোন মুখে আপনি এসব বলছেন? দিনরাত ত তেল ঢেলেছেন মন্ত্রীদের বাড়ী গিয়ে।

দুর্নীতি বিভাগের মাঝারি দুইজন কর্মচারী সবচেয়ে বেশী উৎপাত করেছে। তারা যেন আদাপানি খেয়ে মাঠে নেমেছিল। দেশ থেকে দুর্নীতি উৎপাত করে ছাড়বে। চেহারা দেখলেই মনে হত, দেশের সবাইকে চোর সাব্যস্থ করে বসে আছে। কোর্ট কাছারী অফিস আদালতে দিনরাত আনাগোনা করেছে।

তিরানব্বই ধারার আমলে সরকারী বাড়ী ছেড়ে এক ভদ্রলোকের অসমাপ্ত বাড়ীতে আশ্রয় নেই। মালিক ব্যবসায়ী—কনট্রাক্টর। শহরের উপকণ্ঠে কয়েক বিঘা জমি আছে তার। কিনেছিল অনেক-দিন আগে।

একজন কর্মচারী একদিন গিয়ে ধরল সেই জমি বিক্রেতাকে। কার কাছে জমি বিক্রী করেছ ? সে নাম বলল। ধমক দিয়ে কর্মচারী বলল, মিথ্যা কথা। বিক্রী করেছ চীফ মিনিষ্টারের কাছে।

বলে, হুজুর তাঁকে চিনিও না—নামও জানিনা। তাঁর কাছে কেন বিক্রয় করব। বিক্রয় করেছি ইসলাম সাবের কাছে।

তা বেশ, টাকাটা কে দিয়েছে ?

তিনিই দিয়েছেন—ইসলাম সাব, যার কাছে জমি বিক্রি করেছি।

ধমক দিয়ে বলল, না, টাকাটা দিয়েছে চীফ মিনিষ্টার। বেনামা খরিদ হয়েছে ইসলামের নামে।

বেচারার রাগ হবার কথা। তবুও হেসে বলল, তা হলে স্যার, আপনিই আমার চেয়ে বেশী জানেন দেখছি। আমাকে আর কেন জিজ্ঞাস করেন ?

দুর্নীতি চটে গেল। বলল, ইয়ার্কি ছাড়। দলিল নিয়ে অমুক সময় আমার অফিসে যাবে।

হুজুর দলিল ত আমার কাছে থাকার কথা নয়।

নকল লাও।

হুজুর বলেন কি ? এত টাকা খরচ করে নকল নিতে পারব না।

আলবৎ পারে গা। নতুবা, জেল হোগা।

বেচারা ঘাবড়ায়ে দৌড়ে এল ইসলামের কাছে। ইসলাম এল আমার কাছে। সব বৃত্তান্ত বলল।

বললাম, এ সব ত হবেই, নইলে কিসের মার্শাল ল'?

ডি-আই-জিকে টেলিফোনে সব বললাম। জবাব দিল, কে যে কোথায় কি করে বসে তার খবর ত আমি রাখতে পারি না। আচ্ছা দেখি খোঁজ করে।

খোঁজ করেছে কি না জানি না। তবে দুর্নীতি বিভাগ এ বিষয় আর খোঁজ নেয় নাই, তা' জানতে পেরেছি।

এমনি সব কাণ্ড!

সিলেটের এক মাড়োয়ারীর ঘাড়ে গিয়ে চাপল একজন করিৎ-কর্মা দুর্নীতি অফিসার। সোজা জিজ্ঞাস করল, চীফ মিনিষ্টারের ছেলেদের শিলং থাকার ও পড়ার খরচ বাবদ কত টাকা দিয়েছ?

বেচারা অবাক! জিজ্ঞাস করে, কি বলেন, কিছুই বুঝতে পারি না।

বোঝার দরকার নাই। টাকা কত দিয়েছ তাই বল।

বলে, চীফ মিনিষ্টারকে চিনিই না—তাকে কোন টাকা দেই নাই।

আলবৎ দিয়েছ। খাতাপত্র দেখাও। এই বলে তার খাতাপত্র হিসাব নিকাশ তছনছ করে ফেলল। কিছুই পাওয়া গেল না। অন্ধকারে ঢিল ছুড়ল: দেখ, আমাদের কাছে অকাট্য প্রমাণ আছে, তা বার করে দেব। তোমার জেল হয়ে যাবে।

হুজুর মিথ্যা কথা বলব? জেল হবে কেন? কোন অন্যায় বা অপরাধ না করলেও জেল হবে?

একজন মুসলমান ব্যবসায়ী—যিনি পরে এই ঘটনার বৃত্তান্ত আমাকে বলেছেন—তিনি হঠাৎ সেখানে এসে হস্তক্ষেপ করায় বেচারা মাড়োয়ারী হয়রানির হাত থেকে রক্ষা পায়।

আমার দুই ছেলেকে ছাপ্পান্ন সালের প্রথম ভাগে—তখনও চীফ মিনিষ্টার হই নাই, শিলং পাঠায়ে ছিলাম। সেখানে এক বছরের

কিছু বেশী ছিল। তাদের বাৎসরিক খরচের সমুদয় টাকা ষ্টেট ব্যাঙ্কের মারফত বিদেশী মুদ্রায় পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বাইরে থেকে টাকা নেবার প্রয়োজন হয় নাই। সে প্রশ্নই উঠে না। ষ্টেট ব্যাঙ্কের হিসাব দেখলেই এটা জানা যেত। তা না করে সিলেট গিয়ে মাড়োয়ারীর উপর জুলুম চালাল।

বহুদিন পর,—সাত আট বছর পর—মোনায়েম খাঁর একটি প্রিয় অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে—দার্জিলিং কার্শিয়াং এ ছেলে পড়াচ্ছি। তাঁর ধারণা, এখনও পড়াচ্ছে। আর কোথায় দার্জিলিং কোথায় শিলং ? পড়িয়েছেও মাত্র দু'বছরের কম। ফৌজদারহাট কেডেট কলেজ স্থাপনের সাথে সাথেই ওদের নিয়ে ওখানে ভর্তি করে দেই। ভূগোল ও ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে যা' হয়। মোনায়েম খাঁ এখনও বলেন এই গল্প !

করাচীর একজন ভদ্রলোক কোরায়শী নাম, তার কাছ থেকে চাঁদা নিয়েছিলাম, আমার গ্রামের হাই স্কুলের জন্য। দিয়েছিল ক্রস্‌ড চেকে। স্কুলের অ্যাকাউণ্টে যথারীতি ব্যাঙ্কে জমা হয়েছিল।

মার্শাল ল' হওয়ার কিছুদিন পর একদিন ষ্টেডিয়ামে খেলা দেখতে গিয়ে দেখি কোরায়শী জাকির হোসেনের পাশে বসে আছে।

বহুদিন পর দুর্নীতি বিভাগের এক ইনস্পেক্টর গিয়ে হাজির আমার গ্রামে। ইস্কুলের হিসাব-নিকাশের খাতাপত্র দেখে ঢাকা ফিরে এল। দু' চারদিন পর আমার সাথে দেখা। বলল, স্যার, আপনার গ্রামে গিয়েছিলাম। ইস্কুলে গেলাম। খাতাপত্র দেখলাম।

বললাম, বিষয় কি ?

সব খুলে বলল। কোরায়শীর টাকাটা জমা আছে কিনা দেখবার জন্য আমাকে পাঠান হয়েছিল।

কি দেখলে ? টাকাটা জমা দেওয়া আছে ত ?

বলল, জি হাঁ।

বললাম, আমাকে জিজ্ঞাস করলেই জানতে পারতে। এত কষ্ট করে অতদূর না গেলেই চলত।

বলল, তা ত হুকুম ছিলনা। অতি গোপনে খবর নেবার জন্যই আমাকে পাঠান হয়েছিল।

অর্থাৎ টাকাটা জমা না থাকলে টুক্ করে আমাকে গ্রেফতার করে ফেলতে। এই আশা ছিল?

মাথা নীচু করে বলল, আমরা হুকুমের দাস।

এই রকম অনেক কাজই ঘটেছে। বড় বেশী কেয়ার করি নাই। প্রায় গা-সহা হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু কেয়ার করতে হল যেদিন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বললেন, আপনার বিরুদ্ধে মার্শাল ল' রেগুলেশনে মামলা চালাবার প্রস্তুতি চলছে।

মার্শাল ল' রেগুলেশনের মামলা! রীতিমত ভয় পাবার কথা! সরাসরি বিচার। সাক্ষী প্রমাণের বালাই বড় একটা নাই। জেল জরিমানা ত আছেই; বেত্রাঘাতের হুকুমও ত হতে পারে! এটা ত চামড়ার উপরে পড়বে!

কলেজের একটি ছাত্রের কথা মনে পড়ল। অতি ক্ষুদ্র অপরাধের জন্য বিচারে তাকে বেত্রাঘাত করার হুকুম হল। হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের হল। কিন্তু আপীলের রায় বার হবার আগেই নির্ধারিত সংখ্যা বেত মারা হল। বেত্রাঘাতের ফলে সে প্রায় পঙ্গু হয়ে গেছে। চোখের দৃষ্টি কমে গেছে। কানে প্রায় শোনেই না। অন্যান্য রোগও দেখা দিয়েছে।

নির্মম শাস্তি। বেত মারার জন্য দীর্ঘমেয়াদী কয়েদীকে নিযুক্ত করা হয়। কার্য সমাধা করলে তার সাজা বহুলাংশে মাফ হয়ে যায়। একজন সরকারী কর্মচারীর পাঁচ বছরের জেল হয়েছিল। বেত মেরে ও দু' একজনকে ফাঁসি লটায়ে সে পুরা শাস্তিটাই মাফ পেয়ে গেল।

কয়দিন পর জানা গেল, বেতমারার হুকুম আপীলে নাকচ হয়েছে। কিন্তু এদিকে তার আগেই তার দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তিও নাকচ হয়ে গেছে।

তাই ঘাবড়ায়ে গেলাম, যখন শুনতে পেলাম, আমার বিরুদ্ধে মার্শাল ল' রেগুলেশনের মামলা দায়ের হচ্ছে।

অভিযোগ হচ্ছে, আমি মাণিকগঞ্জ কলেজের গভর্নিং বডির মিটিংএ মার্শাল ল' আয়ুব খাঁ প্রভৃতির বিরুদ্ধে যা' তা' বলেছি। চব্বিশ নম্বর রেগুলেশানের অপরাধ! আরও অনেক কথা বলেছি যা' রাষ্ট্রদ্রোহিতার সংজ্ঞায় পড়ে।

চীফ মিনিষ্টার থাকা কালে কলেজের গভর্নিং বডির প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলাম। তারপরও কিছুদিন প্রেসিডেণ্ট থাকতে হয়েছিল। একটা মিটিং করতে মাণিকগঞ্জ গিয়েছিলাম। অনেক কথা সেখানে হয়েছে। সবই অতীতের কাহিনী। আমাদের মন্ত্রীত্বের আমলের কার্যক্রম ও বিফলতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছি। মার্শাল ল' বা তার উদ্যোক্তা অ[illegible] খাঁ সম্বন্ধে কোন কিছু ঘুর্ণাক্ষরেও বলেছি কিনা মনে করতে পারিনা।

অভিযোগ আঠার দফার! আমি এই বলেছি, আমি এর নিন্দা করেছি, ওর কুৎসা গেয়েছি ইত্যাদি।

কিছুই বলি নাই, যা বিন্দুমাত্র অপরাধজনক হতে পারে। আমাদের অপারগতার কথা বলেছি। দেশের অনন্ত সমস্যার সমাধান করতে পারি নাই—তার কৈফিয়ত দিয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতা সুলভ মনোভাবের কথার উল্লেখ করেছি। তারা সাহায্য করলে অনেক কিছু করতে পারতাম। ইত্যাদি।

কথা উঠেছিল ছাত্রদের নানাধরণের দাবী-দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে। দালানের ছাদ ভেঙ্গে গেছে। হোষ্টেল নাই। কমনরুম নাই। লাইব্রেরীতে বই নাই। খেলার মাঠ সংকীর্ণ, এই সব।

একজন সদস্য অনুযোগ করলেন। আপনারা নজর দিলে কলেজের অনেক উন্নতি হওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু আপনারা এদিকে দৃষ্টি দেন নাই।

নজর দিয়েছিলাম, কিন্তু কেন নজর লাগে নাই কারণ ব্যক্ত

করেছিলাম। অর্থাভাবই বড় কারণ। কেন্দ্রীয় সরকার দৃষ্টি দিলে সেইটাই শুভদৃষ্টি। তারা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি ঘোর অবিচার করেছে। পাহাড় পরিমাণ অর্থনীতিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। দাবী দাওয়ার কথা তুললেই পাকিস্তানের তথাকথিত মূল আদর্শের কথা উত্থাপন করে আমাদের বলত প্রাদেশিকতার দোষে তোমরা দোষী। বলেছে, বাঙালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, বালুচী—এদের জন্য পাকিস্তান আনা হয় নাই। পাকিস্তান হয়েছে পাকিস্তানীদের জন্য।

এই সব হিতোপদেশ শুনে খুব রাগ হত। একবার ডাক্তার খান সাহেবকে বলেই ফেললাম, দেখুন যাই বলুন, আমি আগে বাঙ্গালী তারপর পাকিস্তানী। বাঙ্গলা না হলে পাকিস্তান হত ? না ওটাকে বাদ দিয়েই চলতে পারে ?

ডাক্তার খান সাহেব যেন চমকে উঠলেন, অ্যাঃ বল কি ? ওয়াস্তাগ ফেরুল্লাহ। এ সব কি মনে করতে আছে ?

বললাম, তোবা, আস্তাগফার আপনাদের পড়া উচিত। বাংলা দেশের প্রতি কি অবিচার করেছেন, তা কোন সময় খেয়াল শরীফে আসে ? মনের কথা চেপে রেখে মোনাফেকী করা আমার অভ্যাস নয়।

আর এক প্রসঙ্গে গবর্ণর জাকির হোসেনের সাথে মনোরঞ্জন ধরের বাকযুদ্ধের গল্পও বলেছিলাম। কোন প্রসঙ্গের সাথেই আয়ুব খাঁ, মার্শাল ল'র কোন সম্পর্ক ছিলনা।

হয়ত কোন কোন উগ্রদেশপ্রেমিকের প্রাণে আঘাত লেগেছিল। তারা নিজেদের অন্য সবার চেয়ে বড় দরের দেশপ্রেমিক মনে করে থাকে। যে কোন কাজ তাদের মতে দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে। পাকিস্তান রক্ষা করার দায়িত্ব যেন তাদের স্কন্ধে এসে পড়েছে। সদা সতর্ক ভাব অবলম্বন করে থাকে। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অবিচারের অভিযোগ, আমাদের বাঙালী বলে গর্ব করা, জাকির হোসেনের সম্বন্ধে অপ্রিয় প্রসঙ্গ উত্থাপন তাদের মতে দেশপ্রেমের হানিজনক

উক্তি। মার্শাল ল' পতিতপাবন--অগতির গতি তারা ধরে নিয়েছে।

কলেজের একজন শিক্ষক টীকাটিপ্পনীসহ এক রিপোর্ট পাঠায়েছে সরকারের কাছে—সেক্রেটারিয়েটে একজন বড় কর্মচারী তার আত্মীয়। মার্শাল ল' আমলে সরকারী কর্মচারীদের বিতাড়ণের দায়িত্ব পড়েছিল তার উপর। এমনি অপরাধে আমাকে কিছু করা যাবেনা। স্থতরাং মার্শাল ল'র বিরুদ্ধে অপরাধ করেছি এই অভি-যোগ করতে হয়েছে।

তদন্ত শুরু হয়ে গেল। কলেজের ছুটি ছোকড়া প্রফেসর ঘন-ঘন ঢাকা এসে তদবির করতে লাগল। দারোগা তদন্ত করল—স্থবিধা হলনা। তারপর ইনস্পেকটর করল তদন্ত। তাতেও বিশেষ ফল হল না। আরও বড় অফিসার পাঠান হল—একই অবস্থা। কি পাবে? থাকলে ত?

হুকুম হল জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর তদন্ত করার। তিনি সহকারীদের পাঠালেন। তারাও বিশেষ কিছু সংগ্রহ করতে পারলনা। গভনিং বডির প্রায় প্রত্যেকটি সদস্য টানা হ্যাঁচড়া করা হল। এক জনকে ত জেলে ঢুকান হল। বেচারা গ্রামের স্কুলে মাষ্টারী করত। হঠাৎ সেখান থেকে ধরে এনে জেলে রেখে দিল। নিরাপদ স্থান। মাসখানেক পর ছেড়ে দিল।

ছাড়া পেয়েই দৌড়ে এল আমার বাড়ীতে। বলল, কি ব্যাপার কিছুতেই বুঝতে পারলাম না। কেন ধরল, কেনই বা ছাড়ল, কারণ জানতে পারি নাই। তবে, গভনিং বডির মিটিং-এ আপনি কি বলেছিলেন, এ সব প্রশ্ন বার বার বিভিন্ন শ্রেণীর অফিসাররা জেলে গিয়ে জিজ্ঞাস করেছে। যা সত্য তাই বলেছি। বিশ্বাস করতে চায় নাই। বলে, আপনি গোপন করছেন। আশ্চর্য। এমন জমানা এসে গেল, সত্য কথা লোকে বিশ্বাস করতে চায় না। তাদের মন মত মিথ্যা বানায়ে বললে সত্য বলে গ্রহণ করে নিত। আজ হঠাৎ মুক্তি পেলাম। আপনি জানেন কিছু?

বললাম, সব জানি। সব তোলপাড় করে ফেলল। মাণিকগঞ্জের মাটি চষে ফেলল সরকারের কর্মচারীরা।

প্রাদেশিক কর্মচারীদের প্রতি অশ্রদ্ধা হয়ে গেল। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারের খাস পুলিশ বিভাগের হাতে তদন্তের ভার দেওয়া হল। ইনি গোড়া থেকে শুরু করলেন।

গভর্নিং বডির একজন সদস্য ঢাকা থাকেন। গণ্যমান্য লোক। তাকে দু'ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদ। ভয়ও দেখাল। তিনি দমবার পত্র নন। উল্টা তর্ক শুরু করলেন, জনাব, যার বিরুদ্ধে তদন্ত করছেন বিভিন্ন অভিযোগের, তিনি কিছুদিন আগেই ত চীফ মিনিষ্টার ছিলেন। সবাই মানতেন তাঁকে। দেশের লোকও মানত। আপনি দয়া করে তাকেই সরাসরি জিজ্ঞাস করুন না কেন? মিথ্যা বলবেন বলে ত মনে হয় না। আপনার কি মনে হয়?

আমতা শুরু করলো, না হাঁ। তা, আচ্ছা তাকেও হয়ত জিজ্ঞাস করতে পারি।

হয়ত কেন? তাঁর কাছেই চলে যান। সব খুলে বলবেন। কিছু গোপন করবেন না। চারদিকে ঝোপঝাড় পিটায়ে কি লাভ? যান তাঁর কাছে।

অফিসার উঠে পড়ল। বলল, না: তাঁর কাছে যাওয়ার দরকার বোধ হয় আর হবে না। আপনার জবানবন্দী মামলার উপযোগী তথ্য কিছুটা পাওয়া গেলে তাঁর কাছে হয়ত যেতাম। এখন আর দরকার বোধ করি না।

অনেকদিন কোন সংবাদ পাই নাই। কেউ কেউ মাঝে মাঝে খবর দিত মিলিটারী অফিসার দিয়ে তদন্ত করান হচ্ছে। ছাড়াছাড়ি নাই। মামলা দায়ের করতেই হ'বে।

এই দশা ও কাটল দু'এক মাস পর। তার পর ঐ দিগন্তে সব নীরব।

এগার

রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও নিরাপত্তা আইনে বন্দী করার পরও শাসকবর্গ নিশ্চিন্ত হতে পারে নাই। তাদের রাজনীতির মাঠ থেকে অপসারণ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে একটা আইন জারী করা হল। নির্বাচন-যোগ্য সংস্থায় অংশ গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। সংক্ষেপে এই আইন এব্‌ডো নামে পরিচিত। ঠিক আইন নয়। প্রেসিডেন্টের হুকুম। অতএব আইন।

পুরাতন রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে এই হুকুম প্রয়োগ করা হবে। অনেকের নামে নোটিশ এল। তার মর্ম, তোমাদের উনিশ শ' ছয়শট্টি সালের শেষ দিন পর্যন্ত রাজনৈতিক ক্রীয়াকলাপে যোগদানের অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হবে। যদি আপত্তি কর, তা হলে ট্রাই-বিউনালের সামনে হাজির হয়ে মামলা চালাও। আর যদি নির্বিবাদে মানে মানে সরে পড়তে চাও, তা হলে লিখে দাও, মামলা চালাবেনা।

আশঙ্কা হল, আমার নামে নোটিশ আসবে। কারণ, অন্য কোন দিক দিয়ে আমাকে লাঞ্ছিত করা সম্ভব হয় নাই। ওমরাও খাঁকে জিজ্ঞাস করলাম, নোটিশ আসছে নাকি?

বললেন, না, আপনার নামে নোটিশ হবেনা। কেন্দ্রের দু'একজন বাঙালী মন্ত্রীও খুব জোর দিয়ে বললেন, তা হয় নাকি? সবাইকে যদি কেটে ফেলা হয়, তা হলে আর ত মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবেনা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

কয়দিন রইলাম নিশ্চিন্ত। তারপর পরোয়ানা এসে হাজির। এব্‌ডো আইনের। ছয় সাতটি দুষ্কৃতির অভিযোগ। কতগুলি রাজনৈতিক ধরণের মামলা—কয়েক বছর ঝুলে আছে নিষ্পত্তির কোন লক্ষণ নাই। কাগজ পত্র পড়ে দেখলাম, বিভিন্ন স্তরের

কর্মচারী—বিশেষ করে পুলিশ বিভাগের, ব্যক্তিগত ও অন্তবিধ কারণে কেস দায়ের করেছে। কিন্তু কোন্‌কালে এগুলি নিষ্পত্তি হবে কেউ বল্‌তে পারেনা। অনর্থক হয়রানীর হাত থেকে নিরপরাধ লোকদের রক্ষা করাব উদ্দেশ্যে এই সব মোকদ্দমা তুলে নিবার নির্দেশ দেই। এই অপরাধ! আমার এলাকাব টেষ্ট বিলিফের জন্য বেশী টাকা মঞ্জুব করা হয়েছিল বলে একটা অভিযোগ করা হয়েছে। আমি এ ব্যাপারে কোন খবরই রাখি নাই। সংশ্লিষ্ট বিভাগ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে টাকা মঞ্জুব করেছিল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, এস-ডি-ও, এরাই টাকা খবচ করেছেন। এব মধ্যে আমি কোথায়?

ভেবেছিলাম, মামলা চালাব! কিন্তু বন্ধু-বান্ধবরা নিষেধ করলেন। দু'একজনের মামলায় সরকারী কর্মচারীদের যা' অশিষ্ট ব্যবহারের নমুনা দেখতে পেলাম—ট্রাইবিউনালের সামনে, তারপব ট্রাইবিউনালের সামনে যাবার প্রবৃত্তি আর রইল না। দু'দিন আগের আর দু'দিন পরের ব্যবহারের তারতম্য দেখে অবাক হয়ে গেলাম। সরকারের কর্মচারী তাও আবার সামরিক সরকারের। দাপট টা ত একটু বেশী হবেই।

নেতা সোহরাওয়ার্দী ঢাকায় ছিলেন। তিনিও নিষেধ করলেন: কি লাভ ওখানে গিয়ে? সুবিচার করাব জন্য ত আর ট্রাইবুনাল স্থাপন করা হয় নাই। হয়েছে তোমাকে অযোগ্য ঘোষণা করার জন্যই। আমার উপর যদি এই বালা নাজিল হয়, তা হলে আমাকেও এই পথে যেতে হবে।

বালা নাজিল হয়েছিল। অনেক ভেবে চিন্তে তিনি মোকাবিলা করতে গেলেন। মাণিক মিঞা প্রমুখ তাঁকে পরামর্শ দিলেন যে, প্রতীক সংগ্রাম ভেবে দলের নেতা হিসাবে আপনার এটা করা দরকার। তিনি রাজী হলেন। নানা ধরণের অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে আনা হয়েছিল। তিনি নিজেই কয়েকদিন ধরে সে সব খণ্ডনের জন্য বক্তৃতা করলেন। তাঁর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ

মিথ্যা ও অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত, তা বললেন। তাঁর জীবনের কীর্তি-কলাপ, পাকিস্তান অর্জনে তাঁর অবদান, বিশ্ব-দরবারে পাকিস্তানকে পরিচিত করাব জন্য তাঁর প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা ও সাফল্য সব বিস্তারিত বললেন।

কোন ফল হলনা। ট্রাইবিউনালের যে কাজ তাই তাঁরা করলেন। অর্থাৎ যথারীতি তাঁকে অযোগ্য ঘোষণা করলেন।

এবডো নোটিশের উল্লিখিত অভিযোগের বিবরণ মালমশলা সুযোগ্য কর্মচারীরাই সংগ্রহ করে এবং অবস্থা বিশেষে সৃষ্টি বা আবিষ্কার করে দিয়েছে। নথিপত্র ঘেঁটে ঘেঁটে আবর্জনার স্তূপ থেকে মণিমাণিক্য উদ্ধার করে পেশ করেছে নয়া মনিবের হাতে। তারা এ সবের সদ্ব্যবহার করেছে রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে।

এটা সরকারী কর্মচারীদের চিরাচরিত শিক্ষা। নূন খাই যার গুণ গাই তার। আমাদের দেওয়া নূন মুছে ফেলে দিয়ে নতুন প্রসাদ লাভ করেছে নতুন রাজার হাত থেকে। সরকারী কর্মচারী ছাড়া এ হেন কাজ আর কেউ করতে পারেনা।

ওমরাও খাঁ কিছু কিছু বুঝতেন। বড় বড় অফিসার বিনা কারণেই শুধু কর্তাকে খুশী করার জন্য-মন্ত্রী ও রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করত। ফাইলপত্র এনে প্রমাণ করার চেষ্টা করত, এরা কি সব কুকীর্তি করে গেছে।

দেখেশুনে ওমরাও খাঁ বলেছেন, আরে এ সব কিছু নয়। কাজ করতে গেলে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটেই। ও সব উপেক্ষা করতেই হয়। না-ছোড় বান্দা সরকারী কর্মচারী প্রতিবাদ করে বলত, স্যার, এ সব সামান্য নয়—ভীষণ মারাত্মক।

কথা প্রসঙ্গে একদিন ওমরাও খাঁ বললেন, ওহে এটা কি তোমাদের অভ্যাস নাকি? এতদিন এইসব মন্ত্রীদের অধীনে কাজ করেছে। হুজুর হুজুর করেছে। আর আজ তারা নাই, অমনি তোমরা তাদের নিন্দাবাদ শুরু করেছ। যাকিছু করেছে সবই

ত তোমাদের বুদ্ধি পরামর্শ নিয়েই করেছে। দায়িত্ব ত তোমাদেরও কম ছিল না।

না স্যার, এ সব কুকর্ম কি আমাদের পরামর্শে করেছে? পরামর্শ উপেক্ষা করেই এ সব করেছে।

তা' যাক। এখনি বল, আমরা চলে যাওয়ার পর, যাঁরা গদীতে আসবেন, তাঁদের কাছে আমাদের শ্রাদ্ধ করবে নাকি? এমনি করে আমাদের বিরুদ্ধে নানা ধরণের অভিযোগ সৃষ্টি করে খয়েরখাহীর প্রমাণ দেবে নাকি?

মাথা চুলকায়। কাচুমাচু করে। আমতা আমতা করে বলে, না, স্যার, তা হবে কেন, তা কি করতে পারি? ইত্যাদি। ওমরাও খাঁ মুচকি হেসে অবিশ্বাস প্রকাশ করেন।

এ সব কাহিনী তাঁর মুখেই শোনা।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা না বললে অন্যায় হবে। আমাদের বিরুদ্ধে তথ্য সরবরাহ করার ব্যাপারে বাঙ্গালী কর্মচারীরাই বেশী অগ্রণী ছিল। অথচ তারাই আমাদের কাছে সুযোগ সুবিধা বেশী করে নিয়েছে। অবাঙালীরা এ ব্যাপারে উদাসীন ছিল। গায়ে পড়ে মিথ্যা সৃষ্টি ত করেই নাই বরং তারা কোন কোন সময়ে বাধা দিতে না পারলেও বিলকুল নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করেছে।

একটা ঘটনা কথা ভুলতে পারব না। স্বাস্থ্য বিভাগের সেক্রেটারী অবাঙ্গালী। আমার আমলে জয়েন্ট সেক্রেটারী ছিলেন। মার্শাল ল' হবার কয়েক মাস পর সোহরাওয়ার্দী ফরিদপুর সফরে গিয়ে হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। খবর পেয়ে আমরা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। তাঁকে তাড়াতাড়ি ঢাকা আনতে হয় কিংবা ভাল ডাক্তার এখান থেকে পাঠাতে হয়। ফরিদপুরের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত অসুবিধাজনক। ঠিক করা হল একটা ছোট বিমান যোগাড় করা। ফ্লাইং ক্লাব রাজী হল একটা অ্যাম্বু

বিমান কয়েক ঘণ্টার জন্য দিতে। ডাক্তার ইব্রাহিমকে ফরিদপুর যাবার জন্য অনুরোধ করা হল। তিনি সোহরাওয়ার্দীর চিকিৎসা পূর্বেও করেছেন। বলা মাত্র রাজী হয়ে গেলেন। কিন্তু উপরস্থ ডাইরেক্টর ডক্টর ওয়াহেদ অনুমতি না দিলে তিনি যেতে পারেন না। ডক্টর ওয়াহেদকে জিজ্ঞাস করাতে তিনি বললেন, তাঁর কোন আপত্তি নাই, কিন্তু তাঁর কথাই ত শেষ নয়। সেক্রেটারীকে বলা দরকার।

সেক্রেটারীকে টেলিফোন করি। তিনি ঢাকার বাইরে ছিলেন। তাঁর স্ত্রী জবাব দিলেন। আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে নিলেন। তারপর জিজ্ঞাস করলেন, সাহেব ফিরে এলে তাঁকে কিছু বলতে হবে নাকি? বললাম, দরকার আজই ছিল। দু'দিন পর আর প্রয়োজন হবে না।

ডক্টর ওয়াহেদ ও ডক্টর ইব্রাহিমকে জানালাম। ডক্টর ইব্রাহিম নিজের দায়িত্বেই শেষ পর্যন্ত ফরিদপুর গেলেন। সেক্রেটারী নাই, ডাইরেক্টরের আপত্তি নাই। এ অবস্থায় গেলে বিশেষ কিছু বোধ হয় হবে না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এসে জানালেন যে, নেতার অবস্থায় উন্নতি হচ্ছে। উদ্বেগের কারণ নাই।

তিন দিন পর সেক্রেটারী আমাকে টেলিফোনে জিজ্ঞাস করলেন, তাঁকে কি জন্য খোঁজ করেছিলাম! হঠাৎ ভুলে গেলাম, তাঁকে কেন খোঁজ করেছিলাম। কুশলাদি জিজ্ঞাস করার সাথে সাথেই কথাটা চট্ করে মনে পড়ে গেল। সব ঘটনা শুনে বললেন, বড় লজ্জার কথা। আমি ছিলাম না। ডাক্তার গিয়েছিল ত?

বললাম, আমি অনুরোধ করায় তিনি দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

বললেন, খুশীর কথা। আপনার আদেশই যথেষ্ট। আমার অনুমতির জন্য অপেক্ষা করে না গেলে ভয়ানক অন্যায় হত। সোহরাওয়ার্দী আমাদের নেতা—তাঁর এই বিপদে যার যা' সাধ্য করা উচিত।

কথাগুলি এমন সুরে বললেন, যেন আমি তখনও চীফ মিনিষ্টার এবং আমার আদেশই যথেষ্ট। তাঁর অনুমতি অবান্তর।

অথচ, আমার আমলে এই ভদ্রলোককে বিশেষ আমল দেই নাই। স্বল্পভাষী এবং একরোখা। দু' একবার চীফ সেক্রেটারীকে বলেছিও যে, ওঁকে না হয় পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠায়ে দিন। আমাদের এখানে এরা অচল।

অথচ তাঁর এই ব্যবহার। কিছুই করেন নাই—করার মউকাও হয় নাই। কিন্তু তাঁর এই আচরণ অনেকদিন মনে থাকবে। ইচ্ছা করলে তিনি ডক্টর ইব্রাহিমের কাছে অন্ততঃ একটা কৈফিয়ৎ তলব করতে পারতেন। তাও করেন নাই।

কয়েক বছর পর এক জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট দু'তিন ঘণ্টার জন্য তাঁর একটা জীপগাড়ী আমাকে দেওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে বাঙালী কমিশনার অভিযোগ করে। বাঙালী গভর্ণর তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি স্থাপন করে। অনেক হয়রাণী করার পর তাঁকে কেন্দ্রীয় সরকারে চাকুরীতে চালান দেওয়া হয়। এখানে থাকতে দেওয়া হয় নাই।

তাই বলছিলাম, যারা নানাদিকে উপকার পেয়েছে আমাদের কাছে তারাই নানাদিক দিয়ে অপকার করার চেষ্টা করেছে। কৃতকার্য হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে। তারাই আমাদের উপহাস বেশী করেছে। কবি ঠিক বলেছেন :

ধ্বনিটির প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে,
ধ্বনি কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।

এই ধরা পড়ার ভয়ে অনেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাজ করেও আমাদের ঋণশোধ করেছে।

বার

জঙ্গী আইন জারীর পরই ইস্কান্দার মির্যা মন্ত্রীসভা গঠন করেছিলেন। আমাকে বলেছিলেন, একটা রিভল্যুশনারী কাউন্সিল গঠন করব। তাড়াতাড়ি সেরে উঠুন হয়ত দিন পনর কি মাস খানেক পর আপনাকে ডেকে পাঠাব।

কে কাকে ডাকে! মাস খানেকের মধ্যে তিনিই বাইরের ডাকে চলে গেলেন।

তার আগে বেছে বেছে মন্ত্রীসভা গঠন করলেন। সবাই গুণী। রাজনীতিক, সামরিক কর্মচারী, প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী ও বিবিধ।

তিন তিনটা আস্ত জেনারেল, আজম খাঁ, কে, এম, শেখ ও বার্কী। আইনের সৌখিন অধ্যাপক প্রায় নাবালক জুলফিকার ভুট্টো, রাষ্ট্রদূত হাবিবুর রহমান, প্রাক্তন জজ ইব্রাহিম, উকিল মঞ্জুর কাদের, প্রাক্তন রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী এ, কে, খান, কর্মচারী হাফিজুর রহমান, শোয়েব ও এম এম খান।

চব্বিশে অক্টোবর আয়ুব খাঁ প্রধান মন্ত্রী হলেন। তখনই তাঁর কেবিনেট গঠিত হয়। তিনদিন পর তিনি প্রেসিডেন্ট পদ অধিকার করলেন। প্রধান মন্ত্রীত্বের পদ বাতিল হয়ে গেল।

মন্ত্রীরা বিভিন্ন দফতরের চার্জ্জে। ভুট্টো বাণিজ্য ও জ্বালানী। দিনরাত সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে তীব্র অনল উদ্‌গার করেছে। নানা ধরণের অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে এনেছে। সোহরাওয়ার্দী বিভিন্ন বিদেশী কূটনৈতিক মহল্লে আসা-যাওয়া দহরম মহরম করেন। সামরিক শাসনের বিরূপ সমালোচনা করেন। এই সব অপপ্রচারের ফলে কিছুদিন পর সোহরাওয়ার্দী গ্রেফতার হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন।

সামরিক শাসন প্রবর্তনের সময় আজম খাঁ প্রভৃতি আয়ুব খাঁকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, পনর কুড়ি জন টপ-লিডারকে গুলি করে শেষ করে দিলে দেশে আর কোন গণ্ডগোলের সৃষ্টি হবে না। নিরাপদে শাসন চালায়ে যাওযা যাবে। আয়ুব খাঁ অবশ্য এই পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই।

তাই সময় অসময় বড়াই করে তিনি প্রচার করেন যে, রাজনীতিকদের প্রতি অসীম করুণা প্রদর্শন করা হয়েছে। তাদের গুলি করে যে মেরে ফেলা হয় নাই, তার জন্য এদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

তা ত থাকতেই হয়। ডাকাত সর্বস্ব অপহরণ করার পর দয়া করে প্রাণে বধ না করলে গৃহস্বামীর সে জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতেই হয়।

মন্ত্রীরা সবাই যে রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও সামরিক গুণগানে ব্যস্ত ছিলেন তা নয়। তবে, বাঙালী মন্ত্রীদের দু' একজন বেশ বোলচালে অভ্যস্ত হয়ে পড়লেন। একজনের দেখা হল ইত্তেফাক সম্পাদক মাণিক মিঞার সাথে। বলল, জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া ত বেশ ভাল বলেই মনে হয়। যেখানেই যাই সবাই আমাদের অভিনন্দন জানায়। মার্শাল ল' জিন্দাবাদ বলে। আপনার কি ধারণা? মার্শাল ল' কে গ্রহণ করে নাই?

মাণিক মিঞা উত্তর দিলেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করা ঠিক হল? আমার মতবাদ আপনারা জানেন। আমি ত আর জনসাধারণ নই; তবে একটা কথা বল্‌তে পারি। যা দেখছেন সবই একতরফা। প্রতিপক্ষ মাঠে নাই। অর্থাৎ প্রতিবাদ করার কোন সুযোগ আপনারা রাখেন নাই। দয়া করে যদি আমাদের দিন সাতেক ছেড়ে দেন, মনের কথা বলার সুযোগ দেন, আর সামরিক শাসনের দোষগুণের সমালোচনা খবরের কাগজে প্রচারের অনুমতি দেন, তা হলে বুঝতে পারতেন সত্যিকার প্রতিক্রিয়া

কোন ধরণের। হলফ করে বলতে পারি, আপনাদের তল্পীতল্পা গুটাতে হবে। নেহাত গায়ের জোরে যদি টিকে থাকেন, সেটা অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু প্রতিক্রিয়া সহ্য করতে পারবেন না।

কোন কিছু না বলে মন্ত্রী মহোদয় সরে পড়লেন।

বাঙালী আর এক মন্ত্রী বললেন, দেশ এখন কলঙ্কমুক্ত হবে। জনগণ হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। দেশ এখন উন্নত হবে। ঘরে ঘরে বিজলী বাতি জ্বলে উঠবে। রেডিও বাজবে ঘরে ঘরে মাঠে ময়দানে।

তা হয়ত বেজে উঠবে। বিজলী বাতি ত গোরস্তানেও জ্বলে থাকে। দেশের মানুষ সসম্মানে বেঁচে না থাকলে বিজলী বাতি আর রেডিও বাজায়ে কি হবে?

এই ভদ্রলোক কর্মচারীও নন, রাজনীতিকও ছিলেন না। একবার রাজনীতিতে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছিলেন, কৃতকার্য হন নাই।

এক জেলায় সফরে গিয়ে অফিসারদের বললেন, তোমাদেরই এখন নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে! রাজনীতিকদের নেতৃত্ব শেষ হয়ে গেছে।

কয়মাস পর ব্যবসা উপলক্ষে ঐ জেলায় যাই। পুলিশ সুপার সাহস করে দেখা করতে এল। অভিবাদন জানায়েই বলল, স্যার, এখন কিন্তু আমরা লিডার হতে চলেছি—আপনাদেরও লিডার।

বললাম, জিতা রহো। বড় খুশীর কথা। দেশের নেতৃত্বের দারুণ আকাল। দয়া করে তোমরা যদি দায়িত্ব নিয়ে থাক তা হলে সারা দেশ তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে! একটা অভাব ত অন্তত পক্ষে তোমরা মোচন করলে।

হো হো করে হেসে উঠল। বলল, স্যার, কি উদ্ভট উক্তি। সরকারী কর্মচারীরা হবে দেশের নেতা! আরও কত শুনব তা আল্লাই জানেন। কত বড় বিপ্লবাত্মক ঘোষণা।

বললাম, এটা বিপ্লবের যুগ। সাহস করে একটা উদ্ভট কিছু বললে কিংবা করতে পারলেই বিপ্লব। সব কিছু উলট পালট করে দিলেই বিপ্লব। সিপাহিরা রাজ-তখতে, রাজনীতিকরা জেল-

-খানায় কিংবা বটতলায়, পুলিশরা গভর্ণর মন্ত্রী, সবই বৈপ্লবিক কাণ্ড কারখানা। ঘাট অঘাট, অঘাট ঘাট না হলে বিপ্লব কিসের?

বলল, আর এই কাজে আমাদেরই সাহায্য করতে হচ্ছে সব চেয়ে বেশী। এর পর লিডার হয়ে গেলে কি যে করব আমি ত অন্ততঃ ভেবে পাই না।

গল্প জুড়ে দিল: গভর্ণর আজম খাঁ এলেন আমার জেলায়। আমাদের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহল প্রকাশ করলেন। অতীতের গল্প, আপনাদের কীর্তিকলাপ, বা কুকীর্তি শুনতে চাইলেন।

বললাম, আমাদের কিন্তু বেশী ঘাঁটাবেন না। আমরা অনেক কিছু জানি। আমরা সব পারি। যত নষ্টের গোড়া আমরা আসল পাজি—রিয়্যাল স্কাউড্রেল। বৃটিশের কুপোকাৎ করেছি। আমাদের সাহায্য ছাড়া তা সম্ভব হত? রাজনীতিকদের চিৎপাত করেছি আমরা। যখন গদীতে ছিল অহোরাত্রে তাদের তোয়াজে ব্যস্ত ছিলাম। তিরোধানের সাথে সাথেই তাদের আমলনামা আপনাদের সামনে পেশ করেছি।

আজম খাঁ দরাজ দিল মানুষ। বললেন, এর পর কি হবে? আমাদের বেলায় কি হবে?

বললাম, একই পন্থা। ঐ ত আমাদের শিক্ষা। এই বিদ্যায় যে যত পারদর্শী সে তত উর্ধ্বগামী। যারা খানিকটা বোকা তারা হয় নীচে পড়ে থাকে না হয় সড়ে পড়তে বাধ্য হয়।

বললেন, কেমন করে পার এ সব?

বললাম, খুব সোজা। আমার হাতে গাঁজা ডলে দেই আপনারা ছিলিমে দম দিয়ে বুঁদ হয়ে পড়ে থাকেন। মাল কোথা থেকে এল তার খোঁজ রাখতে পারেন না। আপনাদের এই আমেজের ফাঁকে আমরা কাজ সেরে নেই।

ভেরি ইন্টরারেষ্টিং, বললেন আজম খাঁ।

'বললাম, শুনুন একটা নমুনা : সামরিক শাসন প্রবর্তনের সাথে সাথে আমাদের মাসে বা সপ্তাহে এলাকা সম্বন্ধে বিস্তারিত রিপোর্ট দিতে হয়—হাল হকিকত। এক অধীনস্থ কর্মচারী একটা রিপোর্ট তৈয়ার করে এনে দেখান। দেখতে ও পড়তে ভারী চমৎকার। জেলার সর্বত্র অখণ্ড শান্তি বিরাজ করছে। জনসাধারণ খেয়ে দেয়ে মোটা তাজা হচ্ছে। ছাত্ররা গভীর মনসংযোগে লেখা-পড়ায় ব্যস্ত। ব্যবসা বাণিজ্যের গতি উর্ধ্বমুখী ইত্যাদি।

'আমি চমকে উঠলাম। বললাম, কি ছাই ভস্ম লিখেছ। এই ত সেদিন অমুক মহকুমায় গিয়েছিলাম। গ্রামবাসী স্রেফ আলুসিদ্ধ খেয়ে বেঁচে আছে। আর তুমি লিখেছ এই সব? ঠিক ঠিক লিখে আন।

'বলল, স্যার, সর্বনাশ ডেকে আনবেন না। দিতে যদি চান-ই তা হলে আপনিই কাইগুলি কেটে কুটে দিন।

'তাই দিলাম। শুনবেন স্যার, ফল কি হল? তিন চারদিন পর মেজর কর্ণেল ক্যাপ্টেনদের হানা। কেন এসব আগে বল নাই? পর চাকুরী যায়, ওর জরিমানা, কারুর কৈফিয়ৎ তলব।

'অধীনস্থ বলল, স্যার, বলি নাই? কাজ নাই এ সব হট্টগোলে! বেশ ছিলাম, কিন্তু থাকতে দিল কই? করি ছোট্ট চাকরী—তাও বুঝি যায়। আসল কাজের কিছুই হল না। শুধু আমাদের নিয়ে টানাটানি।

গল্প শুনে গভর্ণর হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, তুমি ত ভাল কাজই করেছিলে। সঠিক খবর দেওয়াই উচিত।

'বললাম, তা স্যার, সেটা ব্যতিক্রম। চকচকে রিপোর্ট দেওয়াই ত রীতি।

পুলিশ সুপার চলে যাওয়ার পরদিন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারও এল দেখা করতে। বললাম, কি হে বড় যে বুকের পাটা—দিনে দুপুরেই এলে?

বলল, এখন লিডার হতে চলেছি—ভয় কি? তা ছাড়া অন্য পক্ষে খবরাখবর নেওয়াও ত আমাদের একটা কর্তব্য।

আগের দিনের স্পারের গল্প তাকে বললাম। বলল, আমারও ঐ রকমের অভিজ্ঞা আছে। অবশ্য আগের আমলের। তেপ্পান্ন সালের।

বলল, তখন আমি মহকুমা পুলিশ অফিসার। গভর্ণর বাহাদুর গেলেন, জেলার সদরে। আমাদের ডাক পড়ল। আমিও আর একজন পুলিশ অফিসার। উভয়েই তরুণ। নির্বাচনে মুসলিম লীগে বিজয়ের সম্ভাবনা ও তার পরিণাম সম্বন্ধে আমাদের মতামত জিজ্ঞাস করলেন।

আমরা উভয়েই বললাম, অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। মুসলিম লীগকে মানুষে চায় না। এর নেতাদের উপর জনগণের আস্থা নাই।

'গভর্ণর বসা ছিলেন। আমাদের কথা শুনেই কম্বল গায় দিয়ে শুয়ে পড়লেন। ঐ দিনে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ীতে তাঁর ডিনার। বলে পাঠালেন, ভবিষ্যৎ খারাপ। বোখার এসেছে।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশের আই-জি অনেক খোশামদ করে ডিনারে আনলেন। কথাবার্তায় তিনি তাঁর মর্ম বেদনা প্রকাশ করলেন। আমরাই তাঁর বোখারের কারণ তাও বলে দিলেন। মুসলিম লীগের আসন্ন পরাজয়ের আশংকায় তার দেহের উত্তাপ বেড়ে গেছে। আই-জি দোহা মহাখাপ্পা। আমরা তারই অধীনস্থ। জিজ্ঞাস করলেন, কেন ও সব বলতে গেলাম? 'উত্তর দিলাম: গভর্ণর জিজ্ঞাস করলেন, আমরা যা' সত্য বলে জানি তাই বলেছি।

'মুখ ভেঙ্গচায়ে বললেন, আহা-হা কি সব ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির! সত্য বলে জানি! কি সত্য বলে জান? তারপর স্বর কিঞ্চিৎ খাদে নামায়ে বললেন, সব সময় কি সত্য কথা বলতে আছে নাকি? অপ্রিয় হলে বলতে নাই। য়ুনিভার্সিটি থেকে টাটকা বার হয়ে এসেছ—ভয়ানক আদর্শবাদী! ও সব চলবে না। তোমরা সরকারী চাকর। সরকার যা চায় তাই করলে চাকর হয়—বুঝলে?'

দু'জনেই বলে উঠ্‌লাম, খুব বুঝেছি। এত সোজা কথা বুঝব না? ঘাট হয়েছে। ভেরি সরি। ভবিষ্যতে আর হবে না।

অতিরিক্ত সুপারের গল্প শেষ হওয়ার সাথেই আমারও ঐ সময়ের একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। বললাম, প্রধান মন্ত্রী একজন পুলিশ ইন্‌স্পেক্টরকে ইলেকশনের কথা জিজ্ঞাস করলেন। ইন্‌স্পেক্টর সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে, স্যার, ইলেকশনে আপনাদের জয় জয়কার।

প্রধান মন্ত্রী আবার জিজ্ঞাস করলেন, এই যে বিরোধীদলগুলি যুক্তফ্রণ্ট করল, এর প্রতিক্রিয়া কি রকম?

উত্তর দিল, কিছু না। ওদের লোকে কম্যুনিষ্ট ভারতের দালাল মনে করছে।

প্রধান মন্ত্রী ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস ফেলে শান্ত হলেন।

কয়দিন পর ঐ ইন্‌স্পেক্টরের আবুল মনসুরের সাথে দেখা। তিনিও জিজ্ঞাস করলেন ইলেকশনের ফলাফল।

ইন্‌স্পেক্টর বলল, এবার আপনাদের জয় জয়কার। মুসলিম লীগ মাঠে নামতে পারবে না। প্রধান মন্ত্রীর সাথে দেখা হয়েছিল। তাঁকেও ঐ কথা বলে দিয়েছি।

ঐ কথা মানে?

বলেছি, মুসলিম লীগের জয় জয়কার।

আবুল মনসুর চম্‌কে উঠলেন। বলেন কি? একই কথা দুই জায়গায় কেমন করে বলতে পারলেন?

—পারতেই হয় জনাব। নইলে চাকরী থাকে না। বাইশ বছর দারোগাগিরি করার পর এই পদে উঠেছি। একটা বেফাঁস কথা বলে আবার গড়াব নাকি নীচের দিকে?

—তা ত' বুঝলাম। কিন্তু ধরুন, আমরা ইলেকশনে জয়লাভ করে যদি সরকার গঠন করি, তা হলে আপনারা কি আমাদের সাথেও ঐরূপ ব্যবহারই করবেন নাকি?

—জ্বি হাঁ—হুবহু ঐ রকম করব। কোন ব্যতিক্রম হবে না। এই আমাদের শিক্ষা, অন্যথা করার উপায় নাই। আসল কথা হচ্ছে সরকারকে খুশী রাখা। সত্য বলে ফেললে যদি না খোশ হন কিংবা সরকারের ইজ্জত-আবরু হানি হবার আশংকা করেন, তা হলে ওর আশেপাশেও যাবনা। চাকরী ত রাখতে হবে ?

এই কর্মচারীদের কথার উপর নির্ভর করেই রাজনীতিক বা অন্য ধরণের শাসক শ্রেণী দু'চার দিনের জন্য বোকার বেহেশতে বাস করে। শেষ পর্যন্ত এই ভুলের মাশুল দিতে প্রাণান্ত হয়।

নব-বিধানে এরাই হয়েছে লিডার। জাতির কপালে ভবিষ্যতে কি আছে কে জানে।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে তাই বললাম, একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর।

বাঙালী মন্ত্রীদের কারও কারও স্বপ্নভঙ্গ হল কয়েক মাসের মধ্যেই। বুঝতে পারল, সবই ফাঁকি। বাঙালীর ভবিষ্যৎ অন্ধকার। বাংলার প্রতি অবিচার শুরু হয়েছে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই। এখনও ব্যতিক্রম ত হয়ই নাই বরং মাত্রা বেড়ে গেছে।

সবাই টের পায় মর্মে মর্মে। কিন্তু প্রকাশ করার সাহস হয় না। বেচারারা গিয়েছেন নেহাত চাকরী করতে। দেশের ও দশের কথা বলবার মউকা কোথায়। হকও নাই।

কিন্তু মাঝে মাঝে বিবেক ছটপট করে। দু'একটি কথা বলতে হয়। কিন্তু তাতেও বিপদ। ধমক খেতে হয়।

জজ ইব্রাহিমের বিবেকের চাড় বেশী। গোড়াতে তিনি নান্দী পাঠ শুরু করেছিলেন। সুবিধা হলনা। ঐ বিদ্যা আয়ত্ত করা সম্ভব হল না। নতুনের প্লাবনে তিনিও ভাসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভার বেশী হওয়ায় ডুবে গেলেন।

একদিন বললেন, স্যার বাংলার দিকে দৃষ্টি দেওয়ার দরকার।

নইলে সেখানে আমার মুখ দেখাবার জো থাকবে না। যাই হোক, আমি ত তাদেরই প্রতিনিধি।

আয়ুব খাঁ বললেন, প্রতিনিধি? তুমি কিসের প্রতিনিধি? প্রতিনিধি কারুর নও। বাংলার ত নওই। প্রতিনিধি শুধু আমার। বুকে হাত দিয়ে দেখালেন।

ইনি কোন কালেও রাজনীতি করেন নাই। পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান সীমাবদ্ধ। কেবিনেট মিটিং-এ চট্ করে কোথায় কি সিদ্ধান্ত হয়ে যায় তার তাল রাখা সম্ভবপর হয় নাই। কোন সিদ্ধান্ত পূর্ব পাকিস্তানীর স্বার্থ-বিরোধী তা' চট্ করে ধরতে পারেন নাই। সময় কেটে যায়। টের পান কয়দিন পর। তারপর পরবর্তী মিটিং-এ ব্যাপারটা পুনরুত্থাপন করতে গেলেই ধমক: কোথায় ছিলে সেদিন? ঘুমায়ে ছিলে নাকি? চোখের সামনেই ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল!

মাঝে মাঝে কেবিনেট মিটিং-এর কার্যাবলীর বিবরণ অন্যরূপে উল্লেখ করা হত খাতা-পত্রে। প্রতিবাদ করলে উত্তর আসে: আরে, কি যে সব আপত্তি তোল! এখানে সেখানে সামান্য ভুল-ত্রুটি ছিল। সে সব কেটে কুটে ঠিক করা হয়েছে। তাতে হয়েছে কি?

এই সব দেখে শুনে জজ ইব্রাহিম পিণ্ডি ছেড়ে ঢাকা এসে বসে রইলেন। আর ফিরে যাবার নাম করেন না। বললেন, হয়ত ইস্তাফাই দিয়ে দেবেন।

কিন্তু ইস্তফা দেন না—বরখাস্তও করা হয় না। উনিও কাজে যোগ দেন না।

একদিন বললেন, হাফিজুর রহমান ও আবুল কাসেম খান আমাকে কিছু দিন অপেক্ষা করতে বলেছেন। তারাও ইস্তফা দিবেন। বলেছেন, একা আপনি চলে গেলে কি হবে। আমরা তিনজন এক সাথে ইস্তফা দিলে একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হবে। সবুর করুন। সময় বুঝে ছাড়া যাবে।

কিন্তু বছর ঘুরে এল—তারা ছাড়ল না। অগত্যা একাই এসে ইস্তফা দিতে হল। কেন ইস্তফা দিলেন, দেশবাসী কিন্তু তা কোনদিন জানতে পারল না। ইস্তফা দেবার কারণ তিনি প্রকাশ করার অনুমতি চাইলেন আয়ুব খাঁর কাছে। অনুমতি পাওয়া গেলনা। কাজেই তিনি প্রকাশ করতে পারেন নাই।

সরকারী মহল ঘোষণা করল, তিনি অসুস্থ ছিলেন বলে কাজকর্ম প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। অফিসে যেতেন না। এ অবস্থায় বরখাস্ত না করে তাঁকে চলে যেতেই বলা হয়েছিল। তাই তিনি রিজাইন দিয়েছেন।

তের

বেশ কিছুদিন দাপাদাপি করার পর জাকির হোসেন চলে গেলেন এখান থেকে—কেন্দ্রে। স্থান পরিবর্তন। মন্ত্রী হলেন কেন্দ্রের—স্বরাষ্ট্র বিভাগের। পুলিশের মানুষ—যোগ্যস্থানে নিযুক্ত হলেন।

গভর্ণর হলেন, লেফটন্যাণ্ট জেনারেল আজম খাঁ। এতদিন কেন্দ্রে মন্ত্রী ছিলেন। এরও স্থান পরিবর্তন।

সুনাম দুর্নাম দুই-ই আছে। পূর্ব-পাকিস্তানে আসার পর সুনামের পাল্লা অসম্ভব ভারী হয়ে উঠল।

মার্শাল ল' জারী করার সময় ইনিও ছিলেন আয়ুব খাঁর দক্ষিণ বা বাম-হস্ত। সামরিক আইন ও শাসন প্রবর্তন করার দায়িত্ব পড়েছিল কয়েকজন জেনারেলের ঘাড়ে। তাদের সবাইকে মন্ত্রী করা হয়েছিল। নিজেদের মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছিল যে, এই ব্যবস্থা অধিককাল চালু রাখা যাবে না। কয় মাসের মধ্যেই সেনাবাহিনী স্বস্থলে অর্থাৎ ব্যারাকে ফিরে যাবে। দৈবাৎ যদি

বেশীদিন টিকায়ে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তা হলে সকলেই পাল্লা করে সিংহাসন দখল করবে।

সেনাবাহিনী ফিরে গেল না। মর্শাল ল' টিকে রইল। সাথে সাথে আয়ুব খাঁও বসে রইলেন সিংহাসনে। উঠবার নামও করেন না। এমন কি মার্শাল ল' উঠে গেলেও তাঁকে যেন না উঠতে হয়, তার ব্যবস্থাও সুকৌশলে ও সন্তর্পণে তিনি করলেন। জেনারেল মহলে বিক্ষোভের বাতাস বইতে শুরু করল।

আয়ুব খাঁ টের পেয়ে একে একে সবাইকে দূরে ঠেলে দিলেন। কাছে রাখা নিরাপদ নয়। কখন কে কি করে বসে বলা যায় না। পথ ত নিজেই দেখায়েছেন। সেই পথেই যদি অন্য কেউ হামলা করে তা হলে বিপদের কথা! দূরে ঠেলে দেওয়াই মঙ্গল।

সবাই নিরবে সবে পড়ল। কিন্তু আজম খাঁ কলরব করে উঠলেন। যাবেন না! চাকুরী ইস্তফা দেবেন তবুও বাংলা মুল্লুকে যাওয়া হবে না। কে জানে কেমন মানুষ ওখানে বাস করে। না জেনে শুনে বিপদের মুখে চলে যাওয়া আহাম্মকের কাজ হবে।

বন্ধুবান্ধবরা সৎপরামর্শ দিলেন—আত্মীয়েরাও। বললেন, এই অমঙ্গলের ভেতরই মঙ্গলের সুচনা হতে পারে। ভবিষ্যতেব পথ পরিষ্কার হতে পারে। বাংলাদেশ বড় ভাল। মাটি নরম: মানুষের মন আরও নরম। খুব ভাবপ্রবণ। অল্পে তুষ্টে—না পেলেও অতুষ্ট হয় না। বেশ হুজুগ প্রিয়। একবার তাল দিলে সবাই নেচে উঠবে। একটু ঘনিষ্টভাবে মেলামেশা করলেই ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ করে মর্শাল ল'র ত্রাস ও ভীতি মানুষকে যখন আতঙ্কিত করে রেখেছে, সে অবস্থায় পাশপাশি কেউ যদি খানিকটা কোমল ও অনুভূতিশীল, মনোভাব দেখাতে পারে, তা হলে স্বভাবতই মানুষ তার দিকে আকৃষ্ট হবে। মানুষ মাথায় তুলে নাচবে। এই জনপ্রিয়তা ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে।

লোভনীয় সন্দেহ নাই। তবুও মন উস্‌খুস করে। এমন সময়

আয়ুব খাঁ দিলেন একটা খোঁচা। বললেন, তুমি নাকি বাঙালীদের ঘৃণা কর, তাই যেতে চাওয়া?

বিষের ক্রিয়া হল। চট্ করে সিদ্ধান্ত করলেন, যাব বাংলাদেশে যা থাকে কপালে।

কপালে যা ছিল, তা আশাতীত। একদম ফাটা কপাল। দিন দিন প্রশস্ত হতে লাগল। এসেই জোরেসোরে কাজ শুরু করে দিলেন। কাজের চেয়ে শোরই বেশী। হুকুম-হাকুম সরাসরি। বড় বড় দালান কোঠার নকশা তৈয়ার করার হুকুম দিলেন। অট্টালিকা বা পুল নির্মাণের সময় দু'খান ইট বিছায়ে ছাতি মাথায় দিয়ে বসে বসে নির্মাণ কার্য তদারক করেন।

এ সব বাইরের কাজে তিনি সিদ্ধহস্ত। সেনাবাহিনীতেও তিনি ঐ সব কাজ করে বেড়াতেন। খেলাধূলা, পশু প্রদর্শনী, ঘোড়-দৌড়, এ সবের কর্তৃত্ব বরাবর করে এসেছেন। ঘরে মন বসেনা।

লাটগিরির ঠাঁট কমায়ে দিলেন। যত্রতত্র ঘুরে ঘুরে অনাড়ম্বরে সকলের সাথে মেলামেশা করা শুরু করলেন। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়ান—চাষী ভাই, জেলে ভায়ের খোঁজে। গাঁয়ের লোক দুই ভাগে বিভক্ত! কেউ চাষী, কেউ জেলে। এর বাইরে নাই।

সালাম আলায়কুম বলেন না। সটান গলা ধরে কোলাকোলি করেন। ধরে খানিকক্ষণ অবধি পিঠ চাপড়ান। হাল হকিকত—পরিবারের অবস্থা জিজ্ঞাস করেন গদগদ কণ্ঠে।

ধন্য ধন্য পড়ে যায়। ইনি কি ছিলেন, কেন এলেন, কি সব করেছেন এর আগে সে সব প্রশ্ন কারও মনে উঠে নাই। তারিফের বাতাস বইতে বইতে শেষ পর্যন্ত তুফান।

খবরের কাগজওয়ালারা বলল, লৌহ-মানব। ব্যস, গাঁয়ের মানুষ ছুটে এল দেখতে। লোহার মানুষও নাকি হয়! কথা কয়! হাসে খেলে! দেখি কেমন!

ইস্কুল কলেজে যাতায়াত শুরু করলেন ঘন ঘন। দেদার টাকা

দেবার ওয়াদা করেন। যাদের দেন, তারাও এত টাকা কল্পনা করতে পারেন না। এক প্রাইমারী ইস্কুলে বহু টাকা দেবার ওয়াদা করলেন। ইস্কুল কর্তৃপক্ষ অবাক হয়ে গেল। কেমন করে এতটাকা খরচ করবে। একদিন কথা প্রসঙ্গে এর উল্লেখ করলাম। বললেন, আমার ত ধারণা ওটা হাই ইস্কুল ছিল। এই বলেই চীৎকার 'করে সেক্রেটারীকে ডাকলেন এবং তাকে জিজ্ঞাস করলেন,—সেক্রেটারী বলল, ওটা প্রাইমারী ইস্কুল ছিল। আবার চীৎকার করে উঠলেন, কেন আমাকে বললে না? উত্তর দিল, স্যার, সে সময় ত ছিলনা। রাস্তার ধারে ইস্কুল। গাড়ী থামতেই আপনি নেমে পড়লেন, হেড্ মাষ্টারের সাথে দেখা হতেই তাকে বলে দিলেন, তোমাকে এত টাকা দেওয়া হবে।

আচ্ছা ভবিষ্যতে আমাকে সতর্ক করে দেবে।

বল্লাম, হাই ইস্কুল হলেই বা কি? এত টাকা দেবেন কেন? তা হলে কলেজে কত টাকা দেবেন? তবে হ্যাঁ, কোন পরিকল্পনার উপর আপনি প্রয়োজনীয় টাকা দিতে পারেন। ইস্কুলের বই, আলমারী, খেলার মাঠ—এ সবের জন্য তারা স্কীম পাঠাক আপনি টাকা দেন। আমিও চীফ মিনিষ্টার থাকা কালে বহু ইস্কুল কলেজে গিয়েছি। ছাত্ররা দাবী করেছে দু'একদিনের ছুটি। কিংবা খেলা-ধূলার সাজ সরঞ্জাম। মঞ্জুর করেছি দু'একশ টাকা। এর বেশী নয়। কিন্তু আপনি যে একদম বাদশাহী কাণ্ডকারখানা জুড়ে দিয়েছেন। অবশ্য আপনাদের আমলে অর্থের সমাগম অনেক বেশী। তাই বলে অপচয় করতে পারেন না।

মুচ্‌কি হেসে বললেন, ভাই সাব, ঠিকই বলেছেন। সেক্রেটারী, আমাকে মনে করায়ে দিয়ো।

প্রচণ্ড সাইক্লোন হয়ে গেল চাটগাঁ নোয়াখালি জেলার উপকূল অঞ্চলে। আজম খাঁ বার হয়ে পড়লেন এলাকায়। একা ঘুরে ঘুরে দেখলেন বিধ্বস্ত অঞ্চল। আর ত কেউ নাই। একাই যেতে হয়েছে। সেনাবাহিনীকেও রিলিফের কাজে নিয়োগ করা হল।

নাম আরও বেড়ে গেল। একাই সব করছেন। কে আর করবে? মন্ত্রী নাই, সহকারী নাই, পরিষদ সদস্য পর্যন্ত নাই। এ সব থাকলে কাজের ভাগাভাগি হত—প্রশংসার ও। এখন ত একা। দৃষ্টি সবখানি পড়ে তাঁরই উপর।

সরকারী কর্মচারীরাও প্রশংসায় শত মুখ। অফিসের কাজকর্ম আর করতে হয়না। গভর্ণরের সাথে সাথে ঘুরে বেড়ালেই কর্তব্য সমাধা হয়। গভর্ণর ও বাইরের কাজ পছন্দ করেন—এরাও। টেবিলে বসে কলম-পেশা কি একটা কাজ নাকি? ওতে কি আর দেশের সমস্যার সমাধান হয়! কাজটাও একঘেঁয়ে। একটু বাইরের হাওয়া বাতাস না লাগালে কি প্রাণ বাঁচে?

শত শত ফাইল জমে গেল গভর্ণরের টেবিলের উপর। সে সব দেখবার অবকাশ হলই না। রেখে গেলেন স্তূপ—পরবর্তী গভর্ণর ওসব দেখবেন।

একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী বলল, কি মহান এই ব্যক্তি। সে দিন দেখলাম, এক সভায় গিয়ে সাধারণ চাষী মজুরদের সাথে হাত মিলালেন, কোলাকুলি করলেন, অনেকক্ষণ ধরে।

বললাম, আপনার আদর্শকে খর্ব করতে চাইনা। কিন্তু কখনও রাজনৈতিক আমলের মন্ত্রীদের সাথে সফরে গিয়েছেন? দেখতে পারতেন জনসমাবেশে তাদের কি অবস্থা। হাত ধরাধরি, কোলা-কুলির কি ছড়াছড়ি। এটা তাদের স্বাভাবিক অবস্থা। অনেক সময় দু'ঘণ্টা পর্যন্ত মোসাফা করতে হয়েছে—দু'হাত দিয়ে।

কি জানি, তা ত দেখি নাই। এটা ত চোখে দেখলাম।

তাই বলে খোঁজও করেন নাই? আপনাদের ত শত শত শাখা প্রশাখা দিগন্ত-বিস্তৃত। তারাও কি কোন খবর দেয় নাই?

এমনি করে মানুষের মতামত সৃষ্টি হয়। সীমিত অভিজ্ঞতা থেকে বিস্তীর্ণ সংজ্ঞার সৃষ্টি হয়। তুলনামূলক বিচারেও নিরপেক্ষ মতের সৃষ্টি এদের হয় না।

আজম খাঁ সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা ছিল তিনি অবাঙ্গালী। কারও সাথে কোন ব্যাপারে প্রতিদন্দ্বিতার প্রশ্ন উঠেনা। তিনি দেশী নন—বিদেশী। দেশী হলে অচল হতেন। এতদূর উঠা অসম্ভব ছিল। বাইরের যে কোন মানুষ এখানে জনপ্রিয় হতে পারে।

বাঙ্গালী তাকে দেশী করে নেবার চেষ্টাও করেছিল। বাড়ী-ঘর করে এখানে বসবাস করুন। নিষ্কর ভূমি দেওয়া হবে। ইচ্ছা করলে নতুন সংসার পাতার ব্যবস্থাও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তিনি চলে গেলেন। বাঙ্গালীর চোখ ভিজে গেল।

তিনি যা চেয়েছিলেন তা পেয়েও ছিলেন। এই জনপ্রিয়তা হয়ত কাজে লাগাতে পারতেন। কিন্তু আয়ুব খাঁ বাদ সাধলেন।

আজম খাঁর কীর্তিকলাপের কাহিনী আয়ুব খাঁর কানে পৌছল। তিনি খাপ্পা হলেন। গভর্ণর তারই মানুষ—কর্মচারী বা এজেণ্ট। তাঁর আবার নিজস্ব বলতে কি থাকতে পারে? কর্মচারীরা যা কিছু অর্জন করবে—মায় জনপ্রিয়তা—সবই তাঁর ঘরে জমা হবে।

ছাত্রদের আন্দোলনে মামুলী ও চিরাচরিত হিংস্রপন্থা অবলম্বন করতে আজম খাঁ সবাইকে নিষেধ করেছিলেন। এর জন্য পেলেন অকুণ্ঠ প্রশংসা—ছাত্র মহল থেকে। আয়ুব খাঁ আরও রেগে গেলেন। দূরে সরায়েও সুবিধা হল না—একদম সরায়ে ফেলতে হবে। জেলা বারের একজন উকিল এক ভোজ-সভায় আজম খাঁকে বললেন, যদি আয়ুব খাঁ আপনাকে সরাতে চান তাহলে আমরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব।

শেষ বিরোধ লাগল শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে। আয়ুব খাঁ শাসনতন্ত্র রচনা করেছেন এখন প্রবর্তন করার সময়। আজম খাঁ বলেন, এখনও সময় আসে নাই। আর কিছুদিন মার্শাল ল' থাকুক। তারপর সব ছেড়ে ছুঁড়ে সরে পড়াই ভাল। দেশের মানুষ তাদের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করুক। আমরা এ দায়িত্ব নেব কেন?

আয়ুব খাঁ ঢাকা এসে তাঁকে চাকুরী ইস্তফা দিতে বললেন।

অন্য কোন চাকুরী চাইলে তিনি তার ব্যবস্থা করবেন। আজম খাঁ তৎক্ষণাৎ ইস্তফা লিখে দিলেন এবং ধন্যবাদ জানায়ে বললেন, অন্যত্র কোন চাকুরী করার তার খায়েশ নাই।

চৌদ্দ

মার্শাল ল'র সঙ্গীতের দ্বিতীয় সুর: গণতন্ত্র এদেশে অচল—বিশেষ করে পশ্চিমা গণতন্ত্র; সাধারণ মানুষের ধাতে সয়না, বুদ্ধিমত্তা ও মেজাজের সাথে খাপ খায়না। একবার পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র চালু করা হয়েছিল। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। আবার কেন?

এই উক্তি ও চিন্তাধারা পাকিস্তান-আদর্শের বিরোধী। জঙ্গী আইন প্রচলন করার স্বপক্ষে যুক্তি হিসাবে দাঁড় করান যেতে পারে। গণতন্ত্র চালু করা হয়েছিল, এই উক্তিও সত্যের অপলাপ। সত্যিকার গণতন্ত্র কোনদিন চালু করা হয় নাই। সে সুযোগ ও পরিস্থিতি কোনদিন উদ্ভব হয় নাই। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রচলিত শাসনতন্ত্র জারী ছিল ছাপান্ন সাল অবধি। প্রয়োজন মতে রদবদল করা হয়েছিল। এই আইনে গণতন্ত্রের একটা নক্‌শা ছিল। সেই নক্‌শা অনুশরণে কিছু কিছু গণতান্ত্রিক সংস্থা গঠনেব চেষ্টাও করা হচ্ছিল। অর্থাং মহড়া দেওয়া হয়েছিল। সত্যিকার গণতন্ত্রের মূলভিত্তি গণমতের অভিব্যক্তি ও প্রকাশ প্রতিফলন হয় সাধারণ নির্বাচনে। দশ এগার বছরে সাধারণ নির্বাচণ হয় নাই। সুতরাং সাতচল্লিশ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের বিধান মতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জনগণের কাছে হস্তান্তর করা হয় নাই। জনগণই দেশের সার্বভৌম মালিক। তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই তাদের নির্দেশ অনুসারে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করে। এরই নাম গণতন্ত্র।

কিন্তু সে ব্যবস্থা হতে পারে নাই। সাত-চল্লিশ সালে স্বাধীন হলেও পঞ্চান্ন সাল পর্যন্ত দেশের শাসনতন্ত্র প্রণীত হয় নাই। দু'একবার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের সৎ উদ্দেশ্যের অভাবের দরুণ তা পণ্ড হয়ে গেছে। ভারতের সমস্যা বহুলাংশে জটিলতর। বিভিন্ন জাতি, শতাধিক ভাষা, অনন্ত সমস্যার মোকাবেলা করেও সে দেশের গণ-প্রতিনিধিরা শাসনতন্ত্র রচনাই শুধু করে নাই, তিন তিনটা সাধারণ নির্বাচনও সম্পন্ন করে গণতন্ত্র স্থাপন করেছে। পাকিস্তানের সমস্যা শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপার অপেক্ষাকৃত সহজ ও সরল। অথচ ক্ষমতাসীনরা শাসনতন্ত্র রচনা করতে পারেন নাই। গণ-পরিষদকে আইন-পরিষদে পরিণত করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার অপচেষ্টায় কালক্ষেপ করেছেন। এই পরিবেশে গণতন্ত্র প্রচলন করা অসম্ভব ছিল।

এ সব বাধাবিঘ্ন ও বিলম্ব সত্বেও গণ প্রতিনিধিরা ছাপান্ন সালে একটি শাসনতন্ত্র রচনা করেন। সম্পূর্ণ দোষমুক্ত না হলেও এই শাসনতন্ত্রে গণতন্ত্র স্থাপনের প্রতিশ্রুতি ছিল। গণতন্ত্র স্থাপনের জন্য এইটিই পাকিস্তানে প্রথম জনমতের প্রতিধ্বনি স্বরূপ আইনানুগ দলিল। উনিশ শ' উনষাট সালে এই শাসনতন্ত্রের বিধানানুযায়ী দেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান কবার দিন তারিখ ধার্য হয়েছিল। জনগণ আশায় দিন গুণছিল। ঠিক সেই সময় সমস্ত আশা-আকাঙ্খা স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার করে বিল সামরিক আইন।

শাসনতন্ত্র কমিশনের প্রথম প্রশ্নের জবাবে বলেছিলাম, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র ফেল করে নাই। শাসনতন্ত্র বাতিল করার ফলেই ভবিষ্যৎ ও আসন্ন গণতান্ত্রিক সাফল্যের পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কমিশন প্রশ্ন করেছিলেন : কি রকম করে ও কি কারণে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র ক্রমে ক্রমে পাকিস্তানে বিফল হয়েছিল? তাঁরা অনুমান করেই নিয়েছিলেন যে গণতন্ত্র চালু করা হয়েছিল কিন্তু তা বিফল হয়েছিল।

উনিশ শ' উনষাট সালের প্রথম ভাগে যে সাধারণ নির্বাচন হওয়ার সিদ্ধান্ত সর্বদলীয় সম্মেলনে গ্রহণ করা হয়েছিল, সেটা বানচাল করার জন্যই শাসনতন্ত্র বাতিল করা হয়েছিল। এটা বুঝতে খুব বেশী বেগ পেতে হয় না।

আগেই বলেছি, ইস্কান্দার মির্যা ও তাঁর অনুচর মোসাহেবরা বুঝতে পেরেছিল যে, ইলেকশনের পর আর তাদের অস্তিত্ব থাকবেনা। মার্কিণ সরকারও টের পেয়েছিল যে, তাদের কর্তৃত্বেরও অবসান ঘটবে। হয় মুসলিম লীগ না হয় আওয়ামী লীগ ক্ষমতা লাভ করবে। দ্বিতীয়তঃ উভয়েই মার্কিণ-বিরোধী। মওলানা ভাসানী, খান আবদুল কায়ুম খান ও আমার বক্তৃতা তার প্রমাণ। আওয়ামী লীগ নেতা সোহরাওয়ার্দী মার্কিণ-বিরোধী না হলেও তাঁর সহকর্মী ও অনুগামীরা যে ঘোর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী তা তারা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল। সুতরাং এই সব কায়েমী স্বার্থবাদীরা ইলেকশন অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে ছিল।

কিন্তু কি করে ইলেকশন ঠেকান যায়? শাসনতন্ত্রের বিধান অলঙ্ঘনীয়। তাই গোটা শাসনতন্ত্রটাই বাতিল করতে হয়েছে। মাথা কেটে ফেললে, আর তার ব্যথা থাকার প্রশ্নই উঠেনা। নতুবা শাসনতন্ত্র বাতিল করার মত এমন কোন সঙ্কটজনক পরিস্থিতি দেশে তখন বর্তমান ছিল না। যেসব বিপর্যয় সঙ্কটের কথা উল্লেখ করা হয়, তার নিরসন ও মোচনের পন্থা শাসনতন্ত্রেই সন্নিবিষ্ট ছিল। এর চেয়ে অনেক বড় বিপর্যয় অনেকবার দেশের উপর দিয়ে চলে গেছে, তা আগেই বলেছি। তখন সামরিক আইন প্রবর্তন করার কথা কারুর মনে উদয় হয় নাই। স্বাধীনতার ধাক্কা সামলাতে সময় লাগে। অসীম ধৈর্যেরও প্রয়োজন হয়। গণতন্ত্রের প্রসব-বেদনা ও দন্ত উদগমের কষ্ট সহ্য করতেই হয়। এতে ঘাবড়াবার বা বেসামাল হয়ে পড়ার মত দুর্বলতার স্থান নাই। বিপর্যয় এসেছে, চলেও গিয়েছে। খানিকটা উলট পালট করে

দিয়েছে, কিন্তু দেশ জাতি টিকেই রয়েছে। দেশ গেল, জাতি গেল, দেশ ধ্বংসের মুখে পৌঁছে গিয়েছে বা গেল, এ সব কাল্পনিক ভীতির কথা কোন সত্যিকার দেশ-প্রেমিক বলতে পারে না। ইসলাম বিপন্ন, ইসলাম গেল এ সব কথা ত শিশুকাল থেকেই শুনে আসছি। কিন্তু ইসলাম বিপন্নও হয় নাই, কোথাও চলেও যায় নাই। এসব কথা ঘোর কায়েমী স্বার্থবাদীরাই শুধু বলতে পারে।

যারা ইলেকশনে ভয় পায়—জনগণের উপর যাদের বিন্দু মাত্রও আস্থা নাই, তাদের কথাই শুধু এই ধরণের হতে পারে। গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র তাদের সম্মুখে বড় বিঘ্ন। এই বিঘ্ন অপসারণ না করলে ভবিষ্যতের পথ পরিষ্কার হয় না।

শাসনতন্ত্র বাতিলের সাথে সাথেই গণতন্ত্র ও নির্বাচনের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হল : নির্বাচন প্রহসন। জনগণ ভোট দিতে জানেনা। হুজুগে মেতে গরু ছাগলের মত ভোট বাক্সে ফেলে দিয়ে আসে। মর্ম বোঝে না। মানুষ ভোট দিতে না জানলে ইলেকশন করে কি লাভ? আর গণতন্ত্রই বা কি করে স্থাপন করা চলে?

কথা ঠিক। ভোট দিতে না জানলে ইলেকশনও হতে পারেনা। গণতন্ত্রও প্রতিষ্ঠা করা চলে না। কিন্তু সত্যিই কি এদেশের জনসাধারণ ভোট দিতে জানেনা? ইতিহাসের সাক্ষ্য এই উক্তির বিরুদ্ধে।

এইসব সাধারণ মানুষগুলিই একদিন ভোট দিয়ে পাকিস্তান হাসিল করেছে। অসাধারণ মানুষগুলির টিকিও দেখা যায় নাই তখন। অনেকেই তখন লেফ্‌ট রাইট করতেন। তাও রণাঙ্গনে নয়। কোন মাঠে ময়দানে নিরাপদ স্থানে।

না জেনে না শুনে অজ্ঞানে হুজুগে মেতে গরু ছাগলের মত ভোট দিয়ে যে পাকিস্তান আনল এরা, তা হলে সেটাও ভুল?

একবার নয়। আরও একবার ভুল করেছে জনগণ। চুয়াান্ন সালে। ঐ বছর পূর্ব-বাংলায় সাধারণ নির্বাচনে শতকরা সাতানব্বই

জন অতি সাধারণ মানুষ শক্তিশালী ও ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে পর্যুদস্ত করে যুক্তফ্রন্টকে জয়যুক্ত করে অসাধারণ ও অতি চালাক লোকদের মুখে চুণকালি লেপন করেছিল।

সে অপমানের শোধও নিয়েছিল বুদ্ধিমান মানুষগুলি। জনসাধারণের বিরাট সাফল্যকে নস্যাৎ করে দিয়েছিল অগণতান্ত্রিক ক্ষমতার বলে ও কৌশলে। জনগণের জয় তাদের মাথায় বজ্রপাত হেনেছিল। গণশক্তির প্রতাপ সহ্য করতে না পেরে তারা তার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত হেনে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল। দেশ ও জাতিকে দুনিয়ার সামনে হাস্যাস্পদ করে তুলেছিল।

তবু এই দুটি বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা—জাতির জীবনে বিজয়স্তম্ভ।

অসাধারণ মানুষেরা—যারা সাধারণ মানুষের গণ্ডীর বাইরে তারা এই ঘটনা দুটির অপব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। সাধারণ নির্বাচন — যুক্তফ্রন্টের জয়, ওটা কিছু নয়। নেতিবাচক ভোট। ওকে ভোটই বলা চলে না। হুজুগে মেতে ভোট দিয়েছে। কতগুলি লোকের বাগাড়ম্বর আর অসাধু প্ররোচনার ফলে।

পাকিস্তানের ভোট সম্বন্ধে সামরিক শাসকমণ্ডলী প্রায় একই ধরণের মন্তব্য করে থাকেন। হুজুগ, স্রেফ হুজুগ। কেউ কি জানত যে ঐ ভোটেই পাকিস্তান হয়ে যাবে? জানত না। কেউ কি ভেবেছিল, লাহোর প্রস্তাব পাশের ফলে পাকিস্তান হাসেল হবে? ওটা রাজনৈতিক দলের চালবাজী। মোক্ষম দাবী করে বসে থাকা। দেখা যাক কি হয়! তারপর নেতারা দিল প্ররোচনা আর জনতাও মেতে উঠল। ভোট দিয়ে ত আর এটা হয় নাই?

যুক্ত ফ্রন্টের নির্বাচনের আঘাত কায়েমী স্বার্থবাদীরা আজও ভুলতে পারে নাই। তাই নানা রকমের ফন্দি ফিকির আঁটছে যাতে ঐ ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি আর না ঘটে।

এই সব কারণে শাসনতন্ত্র বাতিল করা হয়েছে।

গণতন্ত্র চলবে না। তা হলে কি চলবে? বাইরের জগতকে দেখাবার জন্য গণতন্ত্রের ভড়ংও রাখতে হবে।

অতএব মৌলিক গণতন্ত্র—মূল থেকে যা' গজাবে। দেশ-বিদেশে রকমারী গণতন্ত্র চালু আছে : কণ্ট্রোল্ড, গাইডেড, গ্রাসরুট—এখানে মৌলিক।

পনেরো

প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র স্থাপনের একটা শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে উঠে। বৃহৎ শক্তিসমূহ প্রায়ই যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে দুবল হয়ে পড়ে। এই সুযোগে উপনিবেশ গুলিতে মুক্তি আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। গোলামীর শৃঙ্খলে ও শোষণের যাঁতাকালে নিস্পেষিত হয়ে তাদের প্রায় মুমুর্ষ-দশা হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশিক প্রভাব মুক্ত হয়ে দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করা সময় ও উপায় সাপেক্ষ। কিন্তু তবুও মানুষ ধীরে ধীরে অগ্রসর হতেছিল অভিষ্ট পথে।

এমন সময় আবার শুরু হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। এই সর্বনাশা যুদ্ধ বিশ্বমানবের সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। মানুষের ক্ষয়ক্ষতির চেয়ে মানবতার ধ্বংসই এই যুদ্ধের বিরাট ক্ষতি।

এই যুদ্ধের পর সর্বপ্রথম হামলা শুরু হয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর। গণতন্ত্রকে অঙ্কুরেই বিনাশ করার চেষ্টা চলেছে অবিরাম। এই প্রচেষ্টার অগ্রদূত সামরিক বাহিনী। যুদ্ধে জয় বা পরাজয়ের ভেতর থেকে সামরিক বাহিনীই সর্বাধিক শক্তিশালী সংস্থারূপে বাইরে দেখা দিল। দেশ ও জাতি তারাই রক্ষা করতে সক্ষম আর কেউ নয়, এই ধারণা তাদের মনে বদ্ধমূল হল। দেশের মানুষ তাদের দাবীর প্রতিবাদ না করে বরং তাদের গৌরবে গর্ব অনুভব করল।

এই সুযোগে সেনাবাহিনী আরও শক্তিশালী ও দুরাকাঙ্খী হয়ে উঠল। শুরু করে দিল সামরিক অভ্যুত্থান। মানুষের গণতান্ত্রিক সরকার ও সংস্থাগুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে তারাই ক্ষমতায় আসীন হল। তারা ক্ষমতা দখল করতে চাইলে তা রোধ করার ক্ষমতা কারুরই থাকেনা। তাদের ক্ষমতা দখলের অর্থ হল অন্য সকলের ক্ষমতার বিলুপ্তি।

গণতন্ত্রের যাত্রা কঠিন ও গতি মন্থর। বিশেষ করে সদ্যমুক্ত দেশে। সেনাবাহিনী চলে সীমাহীন বেগে। গণতন্ত্রের স্বাভাবিক দুর্বলতা থাকতে বাধ্য। অতি সন্তর্পণে কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হয়। জনগণের সৃষ্ট গণতন্ত্র, গণমতের উপর নির্ভরশীল। সেনাবাহিনী গণমতের তোয়াক্কা করে না। সমগ্র দেশটাই তাদের যুদ্ধক্ষেত্র। তারা সর্বত্রই যুদ্ধক্ষেত্রের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে ও বজায় রাখতে দৃঢ়সঙ্কল্প। একই মাপে সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে চায়। এ ব্যাপারে শৈথিল্য-প্রদর্শন তাদের চোখে ক্ষমার অযোগ্য। গণতন্ত্র দুর্বল, সেনাবাহিনী সবল এটা তারা প্রমাণ করতে চায় এবং করেও!

বিগত দুই দশকে প্রায় প্রত্যেকটি গণতন্ত্রকামী দেশের মানুষের সর্বাধিকার হরণ করে সেনাবাহিনী একনায়ত্ব বা স্বৈরাচারী শাসনপ্রথার প্রবর্তন করেছে। ব্যক্তিস্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার সব হত্যা করা হয়েছে। গদীতে বসেই কেউ সেজেছে ইসা-মছিহ্‌, কেউ ইমাম মেহ্‌দী, পতিতপাবন, ত্রাণকর্তা, এমন কি খলিফাতুল মুস্‌লেমীন। ভক্তবৃন্দ খেতাব বর্ষণের জন্য অস্থির।

পাকিস্তানের সুনীল আকাশে এই বিপর্যয়ের কালমেঘ দেখা দিয়েছিল অনেক আগে—চুয়ান্ন সালে বা তারও আগে! মানুষের মনেপ্রাণে যখন অবাধ ও নিরঙ্কুশ গণতন্ত্র স্থাপনের আকাঙ্খা দুর্নিবার হয়ে উঠে—তখন থেকে।

নতুন দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার প্রাথমিক পর্যায়ে শক্তি দুর্বলতা উভয়ই প্রকাশ পায়। শক্তি সঞ্চয় করতে সময় লাগে কিন্তু দুর্বলতা

প্রকট হয়ে উঠতে দেরী হয়না—বিশেষ করে অনুন্নত দেশে। স্বার্থান্বেষী ও গণ-বিরোধী মানুষের চোখে দুর্বলতার প্রকাশই দেশের পক্ষে মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তারা গণতন্ত্র হত্যার ওজুহাত বার করে এবং যড়যন্ত্রের আয়োজন করে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হওয়ার সাথে সাথেই দেশের অন্তহীন সমস্যা প্রবল বেগে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। চিরবঞ্চিত মানুষের চিত্ত অধীর হয়ে উঠে। এটাকে অস্বাভাবিক মনে করবার কোন হেতু নাই। কিন্তু কায়েমী স্বার্থবাদীরা এই অস্থিরতাকে ধ্বংসাত্মক মনে করে।

যে কালমেঘ আটান্ন সালের শেষভাগে অক্টোবর মাসের সর্বনাশা কালবৈশাখীর প্রলয়ঙ্করী মূর্তি ধারণ করে সব লণ্ডভণ্ড করে দিল—সেটা আকস্মিক নয়। এর ইতিহাস চমকপ্রদ ও জ্ঞান-গর্ভ।

কেমন করে, কবে থেকে, কি কৌশলে আটান্ন সালে বিপর্যয় সংঘটিত করা হয়েছিল, তার মোটামুটি আভাস পাওয়া যায় সেনা-বাহিনীর একজন কর্মচারীর লেখা 'মাই চীফ' নামক একটি পুস্তকে। লেখক দাবী করবেন, তিনি তাঁর চীফ আয়ুব খাঁর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেছেন। তাঁর অন্তরের ধ্যানধারণা তাঁর জানা আছে।

চীফের গুণকীর্তন ও কৃতিত্বের বাখান করার জন্যই বই খানা লেখা হয়েছে। প্রতি লাইনে তাঁরই গুণগান। সত্য অসত্যের সংমিশ্রণে এক নির্লজ্জ আলেখ্য সৃষ্টি করেছেন।

লিখেছেন: আটচল্লিশ সালে পূর্ববঙ্গে এলেন জি-ও-সি হয়ে—জেনারেল আয়ুব খাঁ। এ দেশে পদার্পণ করেই বুঝতে পারলেন দেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কর্মচারীদের মনোবল ভেঙ্গে-পড়া অবস্থায়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের হাজার মাইলের ব্যবধান আরও প্রশস্ত হয়ে গেছে। ছাত্রসমাজ বিদেশী ধ্বংসাত্মক প্রভাবে আচ্ছন্ন। সব কাজ বন্ধ করে দিয়ে উর্দু না বাংলা রাষ্ট্রভাষা হবে—এই নিয়ে তারা আন্দোলনে মগ্ন। চীৎকার করে আর শোভাযাত্রা বার করে।

কায়েদে আজমের যোগ্যতর সহযোগীদের অন্যতম খাজা নাজিমুদ্দিন তখন এদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বলেই শাসনব্যবস্থা একদম অচল হয়ে যায় নাই।

জি-ও-সি হয়ে আসার পরই জেনারেল আয়ুবের প্রথম ও প্রধান কাজ হল, দেশ ও দেশের যাবতীয় সমস্যা জানবার ঐকান্তিক আগ্রহ। এই প্রদেশের মানুষের মনে দেশাত্মবোধের গব অতি ক্ষীণ। তাই এদের অন্তরে তীব্র জাতীয়তা বোধ গড়ে উঠে নাই। চিরজীবন হিন্দু মাড়োয়ারীরা তার অর্থনীতিক জীবন-প্রবাহ রুদ্ধ করে রেখেছিল। করাচী বা লাহোরের চেয়ে দিল্লী তার কাছে অনেক নিকটে। এমতাবস্থায় রাতারাতি উচ্চ দরের দেশপ্রীতি তাদের কাছে আশা করা পাগলামি।

লেখক পূর্ব বাংলার মানুষের দেশপ্রেম সম্বন্ধে কত অজ্ঞ এটা তার প্রমাণ। সারা ভারতের মুসলমান যখন ঘুমের ঘোরে অচেতন, পূব-বাংলার মুসলমানই তখন পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপায়ে পড়ে তাকে জোরদার করে তুলেছিল। পাকিস্তান ইস্যুর উপর ছয়চল্লিশ সালে যে ভোট হয়েছিল তাতে পূর্ব বাংলা দেখায়ে দিয়েছিল দেশপ্রেমের অপূর্ব নিদর্শন, যা আর কোন অঞ্চল দেখাতে পারে নাই। দেশের অর্থনীতি তার আয়ত্তাধীনে ছিলনা কিন্তু তার প্রাণশক্তি কোন শিকলে বাঁধা ছিল না। ছিল সম্পুর্ণ মুক্ত নির্মল ও অশান্ত। সামরিক কর্মচারী ইতিহাসের এই অধ্যায় বাদ দিয়ে পড়েছেন।

তার পর বই-এ লিখেছেন: দেশে চরম অব্যবস্থা। রাজনীতিকরা নীতিভ্রষ্ট, দুর্নীতিপরায়ণ। দলীয় কোন্দলে সদাব্যস্ত। দেশের কথা ভাববার তাদের ফুরসুৎ কোথায়? এই সব দেখে দেশের ভবিষৎ চিন্তা করে জেনারেল আয়ুব আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

পূর্ব-বাংলার সব নেতৃবৃন্দ পাকিস্তান সংগ্রামের অগ্রদূত। যাঁরা চরম ত্যাগ ও তিতিক্ষার মাধ্যমে পাকিস্তান হাসিল করেন

পাকিস্তান হওয়ার পরক্ষণেই, মাত্র এক বছরের মধ্যে তাঁরা কোন্ যাদুমন্ত্রবলে দুর্নীতিপরায়ণ, কোন্দলপ্রিয় ও নীতিভ্রষ্ট হয়ে পড়লেন, সেটা গভীর চিন্তা ও গবেষণার বিষয়। লেখক সে গবেষণা না করে পাকিস্তানের সৃষ্টিকর্তাদেরই অপমান করেছেন।

তারপর লিখেছেন আয়ুব খানের কীর্তিকলাপের কথা। জেনারেল আয়ুব সর্বদাই লাট-বেলাট, মন্ত্রী ও কর্মচারীদের সৎ উপদেশ খয়রাত করেছেন। তারা যেন ঠিকপথে চলেন—পথভ্রষ্ট না হন, সে দিকে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলেন। মন্ত্রীসভার বৈঠকে অহরহ তাঁর ডাক পড়ত। ছোট বড় সবাই তাঁর সান্নিধ্য, সাহচার্য ও উপদেশ লাভের আশায় অধীর ছিল। আটচল্লিশ সালে কায়েদ আজম যখন ঢাকা এলেন, তখন আয়ুব খাঁ তাঁকে বহুমূল্যবান ও তথ্যপূর্ণ উপদেশ দান করেন। দেশের বাস্তব ছবি তুলে ধরলেন তাঁর সম্মুখে।

বিপুল গর্বে বুক ফুলে উঠেছে গ্রন্থকারের! কায়দে আজম কি তখন কল্পনা করতে পেরেছিলেন যে ঠিক দশ বছর পর এই ব্যক্তি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন?

পঞ্চাশ সালে আয়ুব খাঁ সৈন্যাধ্যক্ষ হন। তাঁর মানমর্যাদা তখন আরও উর্ধ্বে উঠে গেল।

এদিকে রাজনীতিকদের চরম ঔদাসীন্য ও দুরবস্থা দেখে তিনি হতাশ হয়ে পড়েন। অগত্যা সাব্যস্থ করলেন, দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে হলে রাজনীতিকদের উপর নির্ভর করা চলবে না। সৈন্যবাহিনীকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। এবং তিনি সেই দিকে মন দিলেন।

সামরিক শাসনের আদি-কথাটি লেখক এখানে প্রকাশ করে ফেললেন। পাকিস্তান অর্জন করা পর্যন্ত রাজনীতিকদের উপর নির্ভর করার প্রয়োজনীয়তা ছিল। এখন আর তাদের দরকার কি? তারা বিশ্রাম গ্রহণ করুক। সৈন্যসামন্তরাই এ দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

'কিন্তু বিরাট বিঘ্ন এসে পড়ল। একান্ন সালে সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কিছু সংখ্যক কর্মচারী বলপ্রয়োগে পাকিস্তান সরকারের উৎখাত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। প্রধান লক্ষ্য ছিল জেনারেল আয়ুবকে ধ্বংস করা।

কিন্তু লেফটেন্যান্ট জেনারেল বি, এম, কাউলের বই পাঠ করলে জানা যায় যে জেনারেল আয়ুব আটান্ন সালে যা করেছেন, জেনারেল আকবর আট বছর আগে হুবহু তাই করতে চেয়েছিলেন। উভয়েরই মনোভাব ও চিন্তাধারা এক! রাজনীতিকরা দেশ পরিচালনার অযোগ্য। সেনাবাহিনীই শুধু পারে দেশের উন্নতি সাধন করতে। তাই চেয়েছিলেন রাজনীতিকদের হটায়ে দিতে—যা করেছেন আয়ুব খাঁ আট বছর পরে।

এটা অপরাধজনক না হলে ওটা কেন হবে? একমাত্র তফাৎ হচ্ছে, তুমি কেন করবে? আমি করব।

পরবর্তী ইতিহাস 'মাই চীফে' লেখা আছে: ষড়যন্ত্রকারীরা ধরা পড়ে গেল। সবাইকে বিচারের সম্মুখীন করা হল। শাস্তি হয়ে গেল।

'অসংখ্য ধন্যবাদের চিঠি এলো আয়ুব খাঁর নামে। পাকিস্তানকে নির্ঘাৎ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। সবাই জানাল, তিনি পাকিস্তানের ত্রাণকর্তা।

'আর এক অসুবিধা ছিল। সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করার পথে এক বিরাট অন্তরায়। দেশরক্ষা বিভাগের কোন মন্ত্রী ছিলনা। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলীর হাতেই ঐ বিভাগের দায়িত্ব ছিল। তাঁর পর আর কেউ এদিকে দৃষ্টি দেন নাই। যোগ্যতার চেয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই ছিল মন্ত্রী-নিয়োগের মাপকাঠি। দৌলতানা খুড়ো পর পর দেশরক্ষা মন্ত্রী হয়েছেন—নামে মাত্র। তাঁরা কোন কাজ করেন নাই। আয়ুব খাঁ প্রস্তাব করলেন, সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ককে দফতরের মন্ত্রী করা উচিত। তা না হলে

সেনাবাহিনীর অভাব অভিযোগের কোন প্রতিকার হবে না। কিন্তু রাজনীতিকরা তাঁর এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছে।

তারপর: শুধু আভ্যন্তরীণ নয় বৈদেশিক নীতির ব্যাপারেও আয়ুব খাঁ তার প্রজ্ঞা ও মনীষার পরিচয় দিয়েছেন। জন ফস্টার ডালেস একবার এশিয়া ভ্রমণ করার পর বলেছিলেন যে, আয়ুব খাঁর মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আর একটি লোকও তাঁর নজরে পড়ে নাই।

তেপ্পান্ন সালে আয়ুব খাঁ মার্কিণ দেশে সফরে গেলেন। তখন তিনি মার্কিণ সরকারের সাথে এক সামরিক চুক্তির বিষয় আলোচনা করেন। তিনি প্রায় সব ঠিক করে ফেলেছেন এমন সময় বড়লাট গোলাম মহম্মদ ওয়াশিংটন গিয়ে হাজির। কি আস্পর্দ্ধা। সবাই অতি মাত্রায় বিব্রত হয়ে পড়ে। এ সব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার বড়লাটের কি অধিকার। মার্কিণ সরকার বিগড়ে গেল, বলল, সাহায্য দেবেনা।

তারপর বহু চেষ্টাচরিত্র করে জেনারেল আয়ুব তাদের মত পরিবর্তন করান। ফলে চুয়ান্ন সালে আইসেনহাওয়ার এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন। অথচ পাকিস্তান সরকার বা মার্কিণ দেশস্থ দূতাবাস আয়ুব খাঁর এত বড় কৃতিত্বের কোন স্বীকৃতিই দেয় নাই।

তারপরই সরাসরি রাজনীতি ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের অভিযোগ! 'মাই চীফে' বলা হয়েছে: চুয়ান্ন সালের এক দারুণ শীতের রাতে ডরচেষ্টার হোটেলে বসে কাগজ কলম হাতে নিয়ে জেনারেল আয়ুব পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের একটা খসড়া রচনা করলেন। রাজনীতিকরা এ কাজে ব্যর্থ হয়েছে। তাই তাঁকেই দায়িত্ব নিতে হল।

খসড়া শাসনতন্ত্রে লিখলেন: পাকিস্তানে বিভিন্ন জাতের লোক বাস করে। পূর্ব বাংলার অধিবাসী সম্ভবত: আদিম ভারতীয় অধিবাসীদের সমগোত্রীয়। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার কাল পর্যন্ত তারা স্বাধীনতা বা সার্বভৌমত্বের আস্বাদ লাভ করে

নাই। হিন্দু, মোগল, পাঠান, বৃটিশ একের পর এক তাদের উপর প্রভুত্ব করেছে। অধঃপতিত জাতিসুলভ মনোভাব তারা মুছে ফেলতে পারে নাই—তাই নবলব্ধ স্বাধীনতার সাথে নিজেদের খাপ খাওয়ায়ে নিবার মনোবৃত্তি গঠিত হওয়া সম্ভবপর হয় নাই। অদ্ভুত সহজাত-সংস্কার, ও উগ্র আত্মরক্ষামূলক মনোভাব তাদের মধ্যে জন্মলাভ করেছে। কারণটা অবশ্য ঐতিহাসিক। আমাদের এদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে, তাদের সমান অংশীদারের মত করে নিতে হবে।

এই খসড়া পরিকল্পনায় এক যুনিটের পরিকল্পনাও ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলিকে একত্রীভূত করে এক য়ুনিট করার প্রস্তাব তিনিই আবিষ্কার করেছেন। অথচ পঞ্চান্ন সালে গণপরিষদে এই প্রস্তাব পেশ করার কালে অনেক বড় বড় নেতা এই প্রস্তাবের উদ্ভাবকের কৃতিত্ব দাবী করেন। জেনারেল আয়ুবের মস্তিষ্ক উদ্ভূত, একথাটা ঘুণাক্ষরেও তাঁরা স্বীকার করেন নাই।

'মাই চীফে এই পরিকল্পনা উদ্ধৃত করা আছে।

তারপরই চুয়ান্ন সালের এক দুর্যোগের কাহিনী। বড়লাট গোলাম মহম্মদকে রাজনীতিকরা এক চালে মাত করে ফেলল। তিনি ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে গেলেন। দেশ চমকে উঠল। রাজনীতিকদের দুর্নীতি চরমে উঠে গেছে। শহরবাসী বলে, সেনাবাহিনীর দেশ শাসনের ভার নেওয়া উচিত। সরকারী কর্মচারী কানাঘুষা করে, সেনাবাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। সবাই বলে, জেনারেল আয়ুব কেন দায়িত্ব নিচ্ছেন না। কতদিন বসে তামাশা দেখবেন। ইত্যাদি।

এর পরই ডাক এল, বড় লাটের কাছ থেকে। তিনি হুকুম করলেন জেনারেলকে শাসনভার গ্রহণ করার। জেনারেল দৃঢ়কণ্ঠে অস্বীকার করলেন। বললেন, আমি ও আমার সেনাবাহিনী রাজনীতির বেড়াজালে আবদ্ধ হওয়াকে ঘৃণা করি। সেনাবাহিনী দেশরক্ষার কার্যে ব্যস্ত থাকুক। আপনি অন্য পথ দেখুন।

কিন্তু অবস্থা সঙ্কটজনক হয়ে উঠল। জনসাধারণ রাজনীতিক-দের ঘৃণা করতে লাগল। চারদিক থেকে ডাক উঠল আয়ুব খাঁব। তিনি ছাড়া কে রক্ষা করতে পারেন? তিনি কিন্তু নির্বিকাব চিত্তে ও গম্ভীরভাবে আপন কাজে ব্যস্ত রইলেন।

দেশ বিদেশে পাকিস্তানের মর্যাদা বলতে কিছুই ছিলনা। জেনারেল আয়ুব বিদেশে সফর করতে গিয়ে পাকিস্তানের মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করলেন।

দেশে নেতৃত্ব বলতে কিছুই ছিলনা। সাহস, ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদায় আয়ুব খাঁ তখন সকলের মাথার উপরে। বিদেশী রাজনীতিবিদ সাংবাদিক, সেনাবাহিনী, কুটনীতিবিদ, শিল্পপতি, সবাই একমাত্র আয়ুব খাঁকেই বিশ্বাস করে।

ছাপান্ন সালে মে মাসে প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মহম্মদ আলি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরীব সাথে আয়ুব খাঁ ইরাণে সফরে যান। ইরাণের প্রত্যেকটি নরনাবী আয়ুব খাঁর প্রশংসায় শতমুখ। ঐ বছব নভেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দি প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মির্যার সাথে সৈন্যাধ্যক্ষ আয়ুব খাঁ ইরাণ, ইবাক ও সওদী আরব সফরে যান। সেখানেও ঐ এক অবস্থা। আকর্ষণ সব তাঁর দিকে। অন্য কেউ নজরে পড়ে নাই। রাজা, বাদশা, উজির, আমির ওমরাহ সব আয়ুব খাঁকে ঘিরে নাচানাচি। তাঁর উপস্থিতিই সফরের গুরুত্ব বাড়ায়ে দিল।

এমনি করে দেশ বিদেশে পাকিস্তানের সমৃদ্ধি ও মর্যাদা বৃদ্ধি করাব একক প্রচেষ্টা তিনি চালায়ে যেতে লাগলেন। ঐ সময় আয়ুব খাঁর অতি নিকটে থাকলে তাঁব অন্তরের আর্তনাদ শোনা যেত: আমি কি করি! আমি কি করি!

তিনি প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী সবাইকে উপদেশ পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁরা নিজেদের নিবুর্দ্ধিতার দরুণ যে বিপদে পতিত হয়েছেন, সেখান থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা তিনি করেছেন। কিন্তু

তাঁরা চাইলে ত ; তাঁরা যে বিষবৃক্ষ রোপন করেছেন, তার অবশ্য-ম্ভাবী ফল তাঁদের ভোগ করতেই হবে। নিয়তির হাত থেকে কে তাদের রক্ষা করতে পারে ?

তাঁরা এলেন এক য়ুনিট ভাঙ্গাব প্রস্তাব নিয়ে। সাতান্ন সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রশ্চিম পাকিস্তান পরিষদে এক শ সত্তর ভোট যুনিট ভাঙ্গার পক্ষে ও মাত্র চারটি ভোট ভাঙ্গার বিপক্ষে দেখা গেল। কি নির্লজ্জ অস্বাস্থ্যকর পার্লামেণ্টারী রাজনীতির পরিচয় এরা দিল !

এরপর শুরু হল ইসকান্দার মির্যা ও সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে কোন্দল। আয়ুব খাঁ উভয়কে ডেকে মৃদু ভৎসনা করে শাসায়ে দিলেন। তাঁরা যেন ঠিকমত চলেন। বাধ্য হয়ে তাঁরাও স্বীকার করেন। অতঃ রেডিও পাকিস্তান মারফত একটি যুক্ত-বিবৃতি প্রচার করেন। এই বিবৃতির প্রতিটি অক্ষর আয়ুব খাঁর প্রেরণায় লেখা হয়েছিল।

তারপর যুক্ত ও পৃথক নির্বাচনের বিতর্কে মন্ত্রীসভার পতন হল দু মাসের মধ্যে।

পূর্ব-পাকিস্তানের রুদ্ধদ্বার অভিযান শুরু করা হল আয়ুবের প্রচেষ্টায়। সাতান্ন সালের ডিসেম্বর মাস থেকে। স্বার্থবাদীরা সরকারের উপর চাপ দিতে লাগল। সৈন্যবাহিনী নানা রকমের আপোষ ব্যবস্থায় রাজী হতে বাধ্য হয়। ফলে জনগণ সেনা বাহিনী ও রাজনীতিকদের ঘৃণার চোখে দেখতে লাগল। দেশ বিদেশে পাকিস্তানের মানমর্যাদা একদম তলায় নেমে গেল।

এই সময় সাংবাদিকরা একদিন আয়ুব খাঁকে ধরে বসল পিণ্ডিতে। সবাই একবাক্যে অনুরোধ করল, আপনি একটা কিছু করুন। দেশ রসাতলে গেল। দুষ্কৃতীদের হটায়ে শাসন ভার নিজ হাতে নিন। দেশকে বাঁচান।

তিনি অস্বীকার করলেন, না তা হয়না। তোমরা বরং

রাজনীতিকদের ধমকায়ে দাও। বলে দাও কি ভাবে তাদেব চলা উচিৎ। তাদের ভাষা তোমরা জান। আমি জানিনা।

কিছু দিন পর পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ভীষণ খবর এল, ডেপুটি স্পীকাব শাহেদ আলিকে পরিষদ কক্ষে হত্যা করা হয়েছে। কি সাংঘাতিক ব্যাপার!

সবার ধৈর্যেব বাধ ভেঙ্গে গেল। আব ত বসে থাকা যায় না। মির্যা. আয়ুব খাঁ পরামর্শ কবে মার্শাল ল' ঘোষণা করলেন। সারা পাকিস্তানে।

চারদিক থেকে ধ্বনি উঠল: আয়ুব খাঁ জিন্দাবাদ! মার্শাল ল' জিন্দাবাদ! নেমে এল গভীব দুর্যোগ।

বইখানা পাঠ করলে স্বভাবতই সন্দেহ জাগে যে, লেখক এই পুস্তক রচনাব সময প্রকৃতিস্থ ছিলেন কি না। কাবণ সুস্থমনে এত সব উদ্ভট অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য কাহিনী বচনা করা সম্ভবপর হতে পাবে না।

বইখানাব প্রধান বৈশিষ্ট্য আয়ুব খাঁর এক তরফা গুণগান। বশংবদ ও অধীনস্থ কর্মচারী কর্তাব গুণগান করবে সেটা হয়ত অন্যায়ও নয়, আশ্চর্যজনকও নয়। কিন্তু দেশের নেতৃবৃন্দ, সর্বজনমান্য নেতাদের অযথা অন্যায ভাবে অপমান কববে এটা অমার্জনীয় ধৃষ্টতা। সমস্ত নেতৃবৃন্দেব স্কন্ধে চড়ে এক ব্যক্তিকে সমস্ত মর্যাদার অধিকারী করে তোলা গুরুতব অন্যায়। ঘটনাবলী ও ইতিহাসেব প্রতি লেখকের কোন শ্রদ্ধা নাই। জ্ঞানও হয়ত নাই। সাধারণ শালীনতা ও শিষ্টতার অভাব ফুটে উঠেছে বই এর পাতায় পাতায়। আয়ুব খাঁ না হয় জন্মের সাথে সাথে সর্বগুণের অধিকারী হয়েছিলেন। প্রখর বাজনৈতিক প্রজ্ঞা, অসীম সাহসিকতা, জনগণের প্রতি অকৃত্রিম দরদ ইত্যাদি জন্মগত গুণ তাঁর ছিল। কিন্তু দেশের সকলের উপর টেক্কা মেরে একা উন্নত শির হয়ে উঠলেন, এই সব কথা ছাপার অক্ষরে বার করার স্পর্দ্ধা এই আমলেই সম্ভব।

সৈনিক হয়ে তিনি সবাইকে শাসন করেছেন। প্রধান মন্ত্রী বড়লাট প্রেসিডেণ্ট সবাইকে সঠিক পথে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। বিদেশ সফবকালে তাদেব বাদ দিয়ে সৈন্যাধ্যক্ষের উপর সকার দৃষ্টি পড়েছে এই সব কথা বলে সাময়িক বাহাতুরী নেওয়া যেতে পাবে কিন্তু যাবা গোড়াথেকে আয়ুব খাঁর সিপাহীজীবন অনুধাবন কবে এসেছে পদে পদে তাঁব কীর্তিকলাপ দেখাব বা জানার সুযোগ যাদেব হয়েছে, তাদের কাছে এই আবব্য উপন্যাসের কাহিনীব কি মূল্য হতে পারে?

পূর্ব-পাকিস্তান সম্বন্ধে সব চেয়ে মাবাত্মক কথা লিখেছেন ইতিহাসেব বিরুদ্ধে। ঘৃণা ও করুণা উভয়ই ফুটে উঠেছে। উনিশ শ চৌষট্টি সালে নির্বাচনেব প্রাক্কালে মিস ফাতেমা জিন্নাহ এক বাণীতে চুয়ান্ন সালেব অক্টোবব মাসে ডবচেষ্টার হোটেলে বচিত দলিলেব প্রণেতা আয়ুব খাব পূর্ব পাকিস্তানেব প্রতি উৎকট মনোভাবেব কথা উল্লেখ কবেন ও তাব নিন্দা কবেন।

মিস ফাতেমা জিন্নাহ ঐ সময়ে এক বক্তৃতায় বলেছেন, দেশবক্ষা দফতরে আয়ুব খা নিজেই স্বীকাব কবেন যে দীর্ঘ আট বছব তিনি ক্ষমতা দখলেব চিন্তা কবেছিলেন। হিসাব কবলে দেখা যায়, সেনাপতি হবাব ঠিক আট বছব পব অর্থাৎ আটান্ন সালে তিনি সত্যি সত্যিই ক্ষমতা দখল কবেন।

গ্রন্থকাবও এ বিষয়ে একটা উপকাব কবেছেন। আয়ুব খাঁকে বারবার অনুরোধ কবা সত্ত্বেও ইতিপূর্বে শাসনভাব গ্রহণ করতে তিনি অস্বীকাব করেছেন, তাঁর এই অসাব দর্প খর্ব হয়ে যায় এই বই পড়লে। তিনি যে অতি সন্তর্পণে ও সুকৌশলে পাকিস্তানের ভাগ্যবিধাতা হবার চেষ্টা করেছেন গোড়া থেকে, এ কথাটা গোপন করা সম্ভব হয় নাই। সুযোগ ও সুবিধার অপেক্ষায় ছিলেন। ধীরে ধীরে শাসন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ, রাজনীতিকদের সাথে মেলামেশা, সর্বত্র নাক ঢোকাবার অভ্যাস ও অনুপ্রবেশের

প্রচেষ্টা পুস্তকের প্রতি পৃষ্ঠায় ফুটে উঠেছে। দেশে নেতা নাই, নেতৃত্ব নাই, দেশপ্রেমিক নাই, এই জিকির তুলে নিজের ও পার্শ্বচরদের মনে বিশ্বাস জন্মাবার চেষ্টা করেছেন যে, দেশের অবস্থা সত্যিই গভীর সঙ্কটজনক। সেনাবাহিনী ছাড়া এই সঙ্কট পরিত্রাণের অন্য কোন পন্থা নাই।

মিস জিন্নাহ আরও বলেছিলেন, কর্মচারী হয়েও দেশের কোন সরকারের প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল না। সর্বদাই সুযোগ ও সুবিধাজনক মুহূর্তে ক্ষমতা দখলের চিন্তা করেছেন। উনিশ শ সাতচল্লিশ সালে বাউণ্ডারী ফোর্স গঠন করা হয় দেশ বিভাগের সময়। তখন আয়ুব খাঁকে লেফটেনান্ট কর্ণেল থেকে কর্ণেল পদে উন্নীত করা হয়। তারপর সাময়িকভাবে তাঁকে ব্রিগেডিয়ার পদে প্রমোশন দিতে হয়। তাঁর ঐ সময়ের কীর্তিকলাপ পাকিস্তানের ইতিহাসের একটি নিকষ কাল অধ্যায়। তাঁর বিরুদ্ধে অসংখ্য জঘন্যতম অপরাধের অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তান সরকার অত্যন্ত কঠোর মনোভাব গ্রহণ করে এবং সম্পূর্ণ বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের গোচরে আনে, ইত্যাদি।

আয়ুব খাঁ অবশ্য এর প্রতিবাদ করেন। কিন্তু তাতে দোষস্খালন হয়না।

রাজনীতিকরাই পাকিস্তান অর্জন করেছেন। সংগ্রাম করেছেন জনগণ, নেতৃত্ব দিয়েছেন রাজনীতিক। ত্যাগ-তিতিক্ষা তাঁরাই করেছেন। তারা দেশের কল্যাণ, দেশের মঙ্গল চিন্তা করবেননা, চিন্তা করবেন বাইরের একজন জাঁদরেল মানুষ, স্বাধীনতা অর্জনে যাঁর বিন্দুমাত্র অবদান নাই।

স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশের নেতৃবৃন্দ যে কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন তা অবর্ণনীয়। সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা তাঁরা করেছেন। কৃতকার্যও হয়েছেন। দেশের অনন্ত সমস্যার চাপে অভিভূত হয়ে পড়েছেন। অবস্থা বিশেষে তাঁদের দুর্বলতা দোষত্রুটি

প্রকাশ পেয়েছে। এ সব ব্যাপার গভীর সহানুভূতির চোখে না দেখে এক তরফা তাঁদের অন্যায়কারী ও দুষ্কৃতী বললে ইতিহাসের অবমাননা করা হয়।

সভ্যজগতের ইতিহাসের পুস্তকে এই ধরণের ধৃষ্টতাপূর্ণ ছবি আর একটিও পাওয়া যাবে না। সরকারী কর্মচারী হয়ে সরকারকে হটায়ে ক্ষমতা দখলের চেষ্টাকে প্রশংসা করা হয়েছে। এটাকে একটা অপরাধ মনে করা হয় নাই।

আর একটি কাহিনীর বিবৃতি দেওয়া হয়েছে ঃ জেনারেল আয়ুব পূর্ব-পাকিস্তানে রুদ্ধদ্বার অভিযানের উদ্যোক্তা—তাঁর প্রচেষ্টায় এটা হয়েছিল। কথাটা সম্পূর্ণ অসত্য। চুন্দ্রীগড় মন্ত্রীসভার আমলে এই ব্যাপারে একটা সম্মেলন আহ্বান করা হয় করাচীতে। জেনারেল ওমরাও ও আমি বসে একটা খসড়া পরিকল্পনা তৈয়ার করি। আমিই প্রথম রুদ্ধদ্বার অভিযানের প্রস্তাব করি ও পরিকল্পনা সম্মেলনে পেশ করি। এবং সেনাবাহিনীকে এই কাজের ভার গ্রহণ করতে বলি। আয়ুব খাঁ প্রতিবাদ করেন। সেনাবাহিনীকে এ সব কাজে নিয়োগ করার তিনি ঘোর বিরোধী। তারা কাঁচা টাকার লোভ সম্বরণ করতে পারবে না। এমন সুন্দর একটা সেনাবাহিনীকে আমরা যেন বাজে কাজে লাগায়ে নষ্ট করার চেষ্টা না করি, তার জন্য তিনি অনুরোধ করলেন।

অনেক বলে কয়ে তাঁকে রাজী করান হয়েছিল। তিনি রাজী হলেন, কিন্তু শর্ত করলেন, সেনাবাহিনীকে মাত্র দুই মাসের জন্য নিয়োগ করা হবে। তারপর তাদের ছেড়ে দিতে হবে।

এই অভিযানের বিরুদ্ধে স্বার্থবাদীরা সরকারকে চাপ দিয়েছিল এই অভিযোগও সত্য নয়। প্রতিবাদ উঠেছিল, সেনাবাহিনীর অত্যাচার ও বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে। তা-ও পরিষদের ভিতর। সব অভিযোগই যে সত্য ছিল তা বলি না। কিন্তু অনেকগুলি প্রমাণিত হয়েছিল এবং ওমরাও খাঁ অপরাধীর শাস্তি বিধান করেছিলেন।

সেনাবাহিনী আপোষ-ব্যবস্থায় রাজী হতে বাধ্য হয়েছিল এটাও বাজে কথা। সেনাবাহিনীর কাজে কেউ কোন হস্তক্ষেপ করে নাই। সরকারী সূত্রে ত নয়ই।

নতুন রাষ্ট্র, নয়া ধরণের শাসন পদ্ধতি পরিচালনায়, গণতন্ত্র স্থাপনের কঠিন সংগ্রামে শতসহস্র বাধাবিঘ্ন, ঝগড়া কোন্দল—এ সবই ত ইতিহাসের শিক্ষা। কোন্ দেশে জনগণের এ সব দুর্যোগের সম্মুখীন হতে না হয়েছে? এই সব উপসর্গ পাকিস্তানের ধ্বংসের মূল এ কথা প্রকাশ করা গভীর অজ্ঞতার পরিচায়ক।

এক ইউনিট ভাঙ্গার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে নির্লজ্জ প্রহসন বলা হয়েছে। কিন্তু বাঙ্গালী এক জনমতের বিরুদ্ধে একটি প্রদেশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার যে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল, তাকে এই পুস্তকে নিন্দা করা হয় নাই। অগণতান্ত্রিক পন্থায় এক ইউনিট বিল পাশ করা হয়েছিল—সংখ্যালঘু প্রদেশগুলির আশা-আকাঙ্খা প্রতিহত নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছিল, সে সম্বন্ধে কোন বিরূপ মন্তব্য করা হয় নাই।

বইখানার ভূমিকা লিখেছেন আয়ুব খাঁ নিজে। গ্রন্থকার তাঁর প্রভুর এত গুণাগুণ কীর্তন করেছেন কিন্তু তিনি তাতে সন্তুষ্ট হন নাই। তাই তিনি লিখেছেন যে, বইয়ে অনেক লেখা আছে। কিন্তু দু'চারটে বিশেষ গুণ বাদ পড়ে গেছে। উল্লেখ করা হয় নাই। তিনি নিজেই সে গুলো সন্নিবেশিত করে দিলেন।

এই পুস্তকের প্রচলন হঠাৎ অতি সংগোপনে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে জনগণ মূল্যবান একটি জীবন-কাহিনী শ্রবণে বঞ্চিত হয়ে গেল!

তবে নিরাশ হবার কারণ নাই। কয়েক বছর পর আয়ুব খাঁর অনুচররা তাঁর নামে আর একখানা বই প্রণয়ন করেছেন। 'বন্ধু-নয়-প্রভু' বইখানার নাম। 'মাইটীকের' ছায়া অবলম্বনে। একই ছাঁচে ও সুরে লেখা। তবে পরিবর্দ্ধিত ও অধিক তথ্য সম্বলিত। পাকিস্তানীদের জন্য এটা অমূল্য সম্পদ। জ্ঞানের আকর।

বুদ্ধির উৎস হিসাবে সর্বজন পাঠ্য বলে প্রচার করা হয়েছে। স্কুল-কলেজেরও পাঠ্য।

দেশবাসী একটা শিক্ষা লাভ করবে নিঃসন্দেহে। তিনি ছাড়া আর কোন গতি নাই। অন্য সবাইকে এজমালি ভাবে নিন্দা করা হয়েছে।

খেল

এই আমলে আর কিছু হোক না হোক গুণ্ডামি, দুর্নীতি ও ধৃষ্টতা সর্বদেশের সর্বকালের সীমা লঙ্ঘন করেছে। মানুষের স্পর্ধা অতিমাত্রায় বেড়ে গিয়েছে। অশিষ্টতা প্রগতির লক্ষণ বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে! মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধার মাত্রা একদম নীচে নেমে গিয়েছে।

প্রেসিডেণ্ট দফতরের এক সেক্রেটারী ইস্কান্দার মির্যার আমলেও সেই দফতরে ছিল। লায়ালপুর এক কলেজে বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রিত। হঠাৎ মনে এসে গেল রাজনীতিকদের কথা। সোহরাওয়ার্দীর নাম উল্লেখ না করেও তাঁর বিরুদ্ধে জঘন্য মিথ্যা মন্তব্য করল। 'পাকিস্তান হয়ে যাবার পর, সবাই নবলব্ধ রাষ্ট্রগঠনে আত্মনিয়োগ করল। কিন্তু একটা কাল মেষ (ব্ল্যাক শীপ) রয়ে গেল কলকাতায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকতে পারল না। ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেণ্ট দাবী করল বহু টাকার। অগত্যা পালাতে বাধ্য হল। পাকিস্তানে নিল আশ্রয়। সরকার দয়াপরবশ হয়ে তাকে আশ্রয় দিল। কিন্তু এই দয়ার প্রতিদানে সে ব্যক্তি পাকিস্তান ধ্বংস করার কাজে মেতে উঠল।'

সরকারী কর্মচারী। কিন্তু কি রকম মাথামোটা। দেশের একজন শ্রেষ্ঠ নেতার বিরুদ্ধে কি জঘন্য ইঙ্গিত! সোহরাওয়ার্দী ছিলেন

কলকাতায় রয়ে গেলেন, তা এই কেরাণী-জ্ঞান সর্বস্ব কর্মচারীর মোটা মাথায় কিছুতেই প্রবেশ করতে পারেনা। তিনি কলকাতা ছেড়ে দিলে মুসলমানদের অবস্থা কি শোচনীয় হত এ কথাও ভাববার প্রয়োজন কর্মচারী মনে করতে পারে না। তার একমাত্র উদ্দেশ্য কি কলাকৌশলে ধাপে ধাপে উপরে উঠে আত্মমর্যদা বৃদ্ধি করা যায়। নিজের ও গোষ্টির সম্যাত্মক উন্নতি হয়, সে লক্ষ্য অর্জনে ক্ষমতাশীল ব্যক্তির মনস্তুষ্টি করার শিক্ষাই তার একমাত্র শিক্ষা। মুসলমান রইল কি না রইল তাতে তার কি আসে যায়?

সোহরাওয়ার্দী যখন প্রধান মন্ত্রী, তখন এই সরকারী কর্মচারীকে দেখেছি অদ্ভুত তোষামোদ করেছে। কর্মচারীর এটাই হচ্ছে ধর্ম। বাকী সব বাহ্য আচরণ।

পুলিশ বিভাগের একটি সাময়িকী—মাসিক কি ত্রৈমাসিক মনে নাই। নজরে পড়ল বিপ্লব সংখ্যা—বোধ হয় বাষট্টি সালের। মানে, সাতাশে অক্টোবর যে কাণ্ডটা ঘটে ছিল তারই স্মরণে বিপ্লব সংখ্যা।

কৌতুহল হল। খুলে দেখলাম, এক তরুণ পুলিশ অফিসার একটা প্রবন্ধ লিখেছে। নয়া জামানার এক অধ্যায় রচনা করেছে। আয়ুব খার নান্দীপাঠ করেছে—তা করুক—কিন্তু সেখানেই ইতি হয় নাই। তারপরই লিখেছে: কায়েদে আজমের তিরোধানের পর, কায়েদে মিল্লাতের শাহাদতের পর দেশে আর কোন নেতা রইল না। যত সব বাজে লোক নেতৃত্বের দাবী করে, ক্ষমতার কোন্দলে দেশটাকে ধ্বংসের শেষ প্রান্তে নিয়ে ফেলেছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কত মোটা চোখের পর্দা! দেশের কোন নেতা তার নজরে পড়ে নাই। শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দী তখনও জীবিত। কিন্তু কর্মচারীর রায় মতে তাঁরা নেতাই নন। বাঙালী নেতা আবার নেতা নাকি?

এমনি করে কিছু সংখ্যক নির্লজ্জ লোক দেশের নেতৃবৃন্দ তথা দেশকে অপমান করেছে। নেতা এখন মিশে গেছে—খাঁটি ও

নির্ভেজাল। চিরস্থায়ী। ক্ষমতার দ্বন্দ নাই। সবাই নিষ্কাম পরমহংস। ক্ষমতার প্রতি কোন লোভই নাই নেতার।

অফিসাররা দেশের নেতৃত্ব পেয়ে গেছে। কাজেই, যা' মনে আসে তাই লিখতে পারে। নতুন নেতার আবির্ভাব হয়েছে। তাঁকে খুশী করতে হলে অন্যান্য নেতাকে অগ্রাহ্য করতে হয়। হেনস্তা করতে হয়। মূল আদর্শ হচ্ছে এক ব্যক্তিকে খুশী রাখা।

খুশী রাখার বা তোয়াজ করার একটা চরম দৃষ্টান্ত, বরিশালের অশ্বিনী কুমার হলের নাম পরিবর্তন।

মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত পাক-ভারত উপমহাদেশের একজন কৃতী সন্তান। ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। কৃতজ্ঞ দেশবাসী তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে তার নামে টাউন হল প্রতিষ্ঠিত করেছিল বহুদিন আগে।

অবাঙালী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের এটা পছন্দ হল না। এমনিতেই তারা হিন্দুদের প্রতি সদয় নয়। পাকিস্তানে একটা হিন্দুর নামে একটা টাউন হল থাকা বিসদৃশ। যত বড়ই হোক না কেন হিন্দু ত। এটা দূর করতে হবে। চট করে মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। আয়ুব খার স্মরণার্থে একটা কিছু করা উচিত। পয়সা খরচ করে একটা কিছু করতে নানা অসুবিধা আছে। 'হল' ত একটা আছে। এটারই নাম বদল করে আয়ুব খার নাম কপালে বসায়ে দিলেই হয়। এক ঢিলে দুই পাখী।—দেবতাও খুশী। একদম বিনা পয়সায় বিপ্লব!

অশ্বিনীকুমার হয়ে গেল আয়ুব খা। আদ্যাক্ষর কিন্তু দুই নামের একই—এ, কে, হল। দুই নামই বোঝায়! কি চমৎকার সৃষ্টি!

পাকিস্তানের ইতিহাসে একটা কলঙ্কের রেখা অঙ্কিত হয়ে রইল। এটা করার সময়ে অনেকে আপত্তি করেছিল। একজন প্রবীণ উকিল একটু জোরেশোরে আপত্তি করায় তাঁকে নিরাপত্তা আইনে বন্দী করে উনিশ মাস জেলে রাখা হয়।

ব্যাপারটা আয়ুব খাঁর কর্ণগোচর হয়েছিল। তিনি আর কি

করবেন ? দেশবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি আর কত কাজ করবেন। আর কর্মচারীদের কাজে হস্তক্ষেপ করাও অনুচিত। ওটা করত রাজনীতিকরা। সেই কারণে তাদের নির্বাসিত করা হয়েছে।

তেষট্টি সালে চাটগাঁ যাই একবার। এক হোটেলে খান কয়েক বই দেখতে পাই। নানা ধরণের। সাময়িকী, বার্ষিকী ইত্যাদি। কোন কোনটা সরকারী খরচে ছাপা।

বিভিন্ন ধরণের প্রবন্ধে ভর্তি। লিখেছেন সরকারী কর্মচারীরা। অর্থ দফতরের একজন বড় কর্মচারীর একটা প্রবন্ধ পড়লাম, দেশের উন্নয়ন প্রসঙ্গে। প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায়ই আয়ুব খাঁ। আদি ও অন্তে আয়ুব খাঁ। দেশের যা কিছু এই ব্যক্তি করেছেন। বিরাট বিরাট কাজ করেছেন। আরও করবেন। পারত এ সব রাজনীতিকরা ?

কায়েদে আজম কিংবা লিয়াকত খাঁর আমলে কোন কোন কর্মচারী কালে ভদ্রে দেশের সমস্যা বিষয়ক দু' একটি প্রবন্ধ লিখেছে। তাতে সমস্যা ও সমাধানের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু কেউ উক্ত নেতৃদ্বয়ের প্রশংসা করার স্পর্ধা দেখাতে পারে নাই। তাঁদের প্রতি সম্মান বোধ কম ছিল, তা নয়—তাদের নাম বা স্তুতিপাঠ নেহাত অবাস্তব বলেই উল্লেখ করা হয় নাই।

আর আজ ? রীতিমত প্রতিযোগিতা চলেছে কে কার চেয়ে বেশী স্তোকবাক্য ব্যবহার করতে পারে। ব্যক্তি-পূজা চরমে উঠেছে। বড় বড় কর্মচারীরা অহোরাত্র নান্দীপাঠে মগ্ন।

গোলাম ফারুক এখানে গভর্ণর থাকা কালে একদিন বলছিলেন, কি বলব ?, যা দেখছি, তাতে চোখ বুঁজে থাকতে হয়। অনেক অফিসার, এমন কি সামরিক একজন বড় কর্মচারীকে আয়ুব খাঁর কদমবুসি করতে দেখেছি।

গভর্ণর কালাবাগ একদিন বললেন, আয়ুব খাঁ আজ পর্যন্ত যা কিছু করেছেন সবই দেশের কল্যাণের জন্য করেছেন—সবই মঙ্গলজনক।

মোনায়েম খাঁ দেখলে : পিছে পড়ে গেলেন। তিনি বললেন, যা করেছেন, তা ত মঙ্গলজনক বটেই। ভবিষ্যতেও যা কিছু করবেন, সবই দেশের পক্ষে কল্যাণ কর হবে।

ইদানীং মোনায়েম খাঁ প্রচার করে বেড়াচ্ছেন, আয়ুব খাঁ খলিফা হয়েছেন। কার খলিফা তা অবশ্য বলেন নাই। খলিফাতল মুসলেমীন বা আমিরুল মোমেনীন নিশ্চয়ই মনে মনে ভাবেন। বলার সাহস হয়ত নাই।

অনেকদিন পর একজন বড় কর্মচারী আয়ুব খাঁর সামনে বললেন, স্যার, রসুলুল্লাহ বলেছেন, লা নবী বাদি—আমার পর কেউ নবী হবেনা। যদি এই নিষেধাজ্ঞা না থাকত তা হলে পাকিস্তানের মুসলমান নতুন ভাবে এই প্রশ্ন চিন্তা করতে শুরু করত।

ষ্টালিনের আমলে সমগ্র রুশ দেশ ষ্টালিনময় হয়ে গিয়েছিল। গাছ পালা, শহর বন্দর, পাহাড় পর্বত নদ নদীর নাম ষ্টালিনের নামে হয়েছিল। আয়ুব খাঁর আমলে দেশ আয়ুবময় হতে দোষ কি? সরকারী রাস্তাঘাটের নাম আয়ুব খাঁ, আয়ুব অ্যাভেন্যু। পাহাড় পর্বত আয়ুব খাঁ। তথাকথিত জাতীয় পরিষদের বৈঠকখানার নাম আয়ুব খাঁ। পাকিস্তানকে এখন আয়ুবিস্তান করা শুধু বাকী। তা হলেই ষোল কলা পূর্ণ।

একমাত্র ভরসা ও সান্ত্বনা এই যে, 'এই দুনিয়া ফানা হবে জেনেও জান না'। যারা আজ আয়ুব সুরে সঙ্গীতের তাল ধরেছে, কাল তারাই গাইবে উল্টা সুরে। ইতিহাসের পাতা উল্টালে এর নজির পাওয়া যায় ভুরি ভুরি! আজকার দেবতা, কালকের অপদেবতা।

সতর

গণতন্ত্র এদেশে অচল সুতরাং অন্য তন্ত্র স্থাপন করতে হবে। স্বৈরতন্ত্র। একব্যক্তির হাতে সমস্ত শাসন ক্ষমতার ভার নিতে হবে। জনগণের হাতে থাকলে কোন্দল সৃষ্টি হয—হট্টগোল হয়। এ সব রোগের মহৌষধ এক নায়কত্ব বা স্বৈরতন্ত্র। বহু পরিক্ষীত। অন্যান্য দেশেও এর মহড়া চলছে এবং কৃতকার্য হয়েছে বলেই ত মনে হয। এখানে কেন চলবে না?

চলছেই ত। তবে কতদিন আর বলা শক্ত। অন্যান্য দেশের নজির এদেশে অচল। যে সব দেশে রাজতন্ত্র সামন্ততন্ত্র সাম্রাজ্য বাদ খতম করে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হযেছে, সে দেশের জনগণ গণতন্ত্রের স্বাদ পায নাই। কাজেই এই পরিবর্তনে তারা আপত্তি করে নাই। পরিবর্তনকে তারা মঙ্গলের আগমনী বলে সম্বর্ধনা জানায়েছে।

কিন্তু আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদ থেকে মুক্তি লাভ করার পর জনগণ নিরঙ্কুশ গণতন্ত্র স্থাপনের প্রতিশ্রুতি পেয়েছিল। তার পূর্বাভাসও তারা পেয়েছিল। গণতান্ত্রিক জীবন-ধারণের অর্থ তাদের কাছে সুস্পষ্ট। গণতন্ত্রের সংজ্ঞা তাদের পরিচিত। এই আশা ও ভরসায তারা নতুন দেশ সৃষ্টি করার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। দশ এগার বছরে শাসনতন্ত্র ভুলভ্রান্তি ত্রুটি বিচ্যুতি অতিক্রম করে দেশ অগ্রসর হতেছিল সেই দিকে। হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে গেল সমস্ত দুযার। কায়েম হল একনায়কত্ব। প্রথমে সামরিক তার পরে আধা সামরিক। এই ব্যবস্থার ভিত্তি হল ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ ও আমলাতন্ত্র। পুঁজিপতি শিল্পপতিরাই এই শক্তির উৎস। এবং সে শক্তি কায়েম করার দায়িত্বভার গ্রহণ করে আমলাতন্ত্র।

কিন্তু জনগণকে গণতন্ত্রের কথাও বলতে হবে। তাই সমাজতন্ত্র বাদে প্রশংসা করা হয়। একানায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেও গণতন্ত্রের গুণ গান করতে হয়। শুধু তাই নয়, স্বৈরতন্ত্র প্রথার মারফত সর্ব উত্তম গণতন্ত্র দেশে স্থাপন করা হয়েছে, এই দাবীও করা হয়। এই সর্বোত্তম গণতন্ত্র হচ্ছে বেসিক ডেমোক্রাসী। মৌলিক বা বুনিয়াদি গণতন্ত্র। গণতন্ত্র কথাটা বর্তমান সময়ে সারা বিশ্বে এত জনপ্রিয় যে, যে কোন শাসনব্যবস্থাই প্রবর্তিত হোক না কেন তার আগে পরে ঐ শব্দটা যোগ করতেই হয়। নইলে বেয়াড়া প্রশ্নের মোকাবেলা করতে হয়।

যেমন, বিদেশী বন্ধুরা প্রশ্ন করে: পাকিস্তানে মিলিটারী ডিকটেটারশীপ? ধমক দিয়ে জবাব দিতে হয় থাৎ বাজে কথা। জবাব দেওয়া হয়, কিন্তু কথাটা ভাল শোনায় না—কাণে বাজে।

তা হবে কেন? হতে পারে, ডেমোক্রাটিক ডিকেটরশীপ। গণতান্ত্রিক স্বৈরাচার। অদ্ভুত সংমিশ্রণ! কিন্তু নতুন দর্শন।

ভিত্তি হচ্ছে মৌলিক গণতন্ত্র। মূল থেকে যার উৎপত্তি উদ্ভিদের মত। নতুন দর্শন। গণতন্ত্রের গলা কেটে কবন্ধের উপর একটা বিশেষণ বসায়ে দিলেই নয়া গণতন্ত্র—অর্থাৎ মৌলিক গণতন্ত্র সৃষ্টি হয়।

কানা ছেলের নাম নজর আলি। জরাগ্রস্ত কঙ্কালসার মানুষকে অনেকে রসিকতা করে পালোয়ান বা তালপাতার সিপাই বলে ডাকে। সিপাই ত! হোক না তালপাতার! গণতন্ত্র ত! হোক না মৌলিক বেসিক বা আরও কিছু! বর্ণগন্ধহীন গণতন্ত্রকে মৌলিক গণতন্ত্র আখ্যা দেওয়া গণতন্ত্রকে উপহাস করা ছাড়া আর কি হতে পারে? উদ্দেশ্যও তাই।

দেশের মানুষ মোটামুটি দুভাগে বিভক্ত হয়েছে, গণতন্ত্রী আর অগণতন্ত্রী। সংখ্যায় বেশুমার তারতম্য। এতেই গণতন্ত্রীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রত্যেক অংশে চল্লিশ হাজার করে দুই অংশে মোট আশি হাজার গণতন্ত্রী। দেশের জনগণ এদের নির্বাচিত করে। এরা নির্বাচিত হওয়ার পর য়ুনিয়ন কাউন্সিল গঠন করল বিভিন্ন এলাকায়। এলাকার সীমা ও আয়তন আগের আমলের য়ুনিয়ন বোর্ডের সমান। নাম বদল হয়ে বোর্ডের জায়গায় হল কাউন্সিল।

য়ুনিয়ন বোর্ড এদেশে প্রবর্তিত হয়েছিল উনিশ শ' উনিশ সালে। তার আগে ছিল গ্রাম্য-পঞ্চায়েৎ প্রথা। স্মরণাতীত কাল থেকে। বৃটিশের আগমনের পর তারা দেশে স্বায়ত্তশাসনের প্রথা প্রচলন করার উদ্দেশ্যে আঠার শ' একাত্তর সালে চৌকিদারী পঞ্চায়েৎ প্রথার প্রবর্তন করে। কতগুলি গ্রামের সমষ্টি য়ুনিয়ন। তার উপর কর্তৃত্ব করার জন্য পাঁচ জনের কমিটি স্থাপন করা হয়। তারপর আঠার শ' চুরাশি সালে স্বায়ত্তশাসন আইন পাশ হয়। জেলা বোর্ড লোকাল বোর্ড স্থাপিত হয় এই আইনের বিধানানুযায়ী। কিন্তু জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে এই সব সংস্থার চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। অর্থাৎ জনগণের প্রতিনিধির উপর সরকারী কর্তৃত্ব বহাল রাখা।

এরপরই উনিশ শ' উনিশ সালে গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন আইন পাশ হয় এবং য়ুনিয়ন বোর্ডের সৃষ্টি হয়, প্রত্যেক য়ুনিয়ন বোর্ড কয়েকটি গ্রাম বা মৌজার সমষ্টি। য়ুনিয়ন বোর্ডে ছয়জন সদস্য নির্বাচিত এবং তিনজন সরকার কর্তৃক মনোনীত। এদের ভেতর থেকে সদস্যরা ভোট দিয়ে একজনকে প্রেসিডেন্ট করে নিত।

সাতান্ন সালে আমাদের আমলে সরকারী মনোনয়ন প্রথা বাতিল করা হয়। নয়জন সদস্যই নির্বাচিত। আর প্রেসিডেন্ট সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত না হয়ে সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবার ব্যবস্থা করা হয়। একজন ভাইস প্রেসিডেন্টও ঐ ভাবে নির্বাচিত হবে।

য়ুনিয়ন বোর্ডের উপর ছিল লোকাল বোর্ড জেলা বোর্ড।

লোকাল বোর্ডগুলি বেশ কিছুদিন আগেই বাতিল করা হয়েছিল কিন্তু জেলাবোর্ড সেদিন পর্যন্ত চালু ছিল। রীতিমত নির্বাচনের মাধ্যমে জেলাবোর্ড গঠিত হত। জেলার আভ্যন্তরীণ, ছোটখাট রাস্তাঘাট, ফেরী, প্রাইমারী স্কুল দাতব্য চিকিৎসালয়, পশু-খোঁয়াড়, পুষ্করিণী প্রভৃতি স্থাপন ও সংরক্ষণের দায়িত্ব ছিল জেলাবোর্ডের উপর। নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান জেলাবোর্ডের কর্মকর্তা। জেলাবোর্ড যুনিয়ন বোর্ডের কার্যক্রম তদারক করত।

জনসাধারণ এইসব বোর্ডের মাধ্যমেই গণতন্ত্রের শিক্ষা নিতে শুরু করেছিল। পূর্ব পাকিস্তানে জেলাবোর্ড ও যুনিয়ন বোর্ড ছিল বলেই পাক-ভারত উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা এই অঞ্চলের জনসাধারণ অধিক রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন বলে স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

পশ্চিম পাকিস্তানে এ সব ছিল না। সেখানে স্বায়ত্তশাসিত গণতান্ত্রিক কোন সংস্থার অস্তিত্বই ছিল না গণতন্ত্রের শিক্ষায় সে এলাকার মানুষ অনেক ধাপ নীচে। দু'একটি প্রতিষ্ঠান যা' গড়ে উঠেছিল তা সরকারী বা আধা সরকারী। রাজনৈতিক চেতনা এই কারণে অনেকটা অপরিস্ফুট।

সেসিল বার্টন মার্শাল—যার মন্তব্য আগে উল্লেখ করেছি—পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিগত পার্থক্য ও প্রভেদের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, এক কথায় পূর্ব পাকিস্তান পলিটিক্যাল—রাজনৈতিক ; আর পশ্চিম পাকিস্তান গভর্ণমেন্টাল—সরকারী। অর্থাৎ, পূর্ব-পাকিস্তান রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ ব্যক্তি গোষ্ঠি বা সমাজ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে রাজনৈতিক প্রভাবে। পশ্চিম পাকিস্তানে পক্ষান্তরে এ সব গড়ে উঠেছে সরকারী প্রভাবে—তারা সরকারী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। ঐ অঞ্চলের মানুষ প্রতিটি ব্যাপারে সরকারের মুখাপেক্ষী।

তাই দুই অংশের চিন্তাধারায় মৌলিক পার্থক্য রয়ে গেছে।

আমার মন্ত্রীত্বের আমলে আমার নিজ গ্রামে ভিলেজ এইড অফিস স্থাপন উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট দফতরের সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীসহ গ্রামে যাই। কিছুক্ষণ পর নাশতা খাওয়ার সময় সেক্রেটারীকে পাওয়া গেল না। কোথায় গেল? অনেকক্ষণ পর এসে হাজির। সারা দেহ ঘমাক্ত। জিজ্ঞাস করলাম, কোথায় গিয়েছিলে? বলল, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর বাড়ী দেখেছি। আজ পুর্ব-পাকিস্তানের চীফ মিনিষ্টারের বাড়ীটাও ঘুরে দেখে এলাম। তুলনাই হয় না।

বললাম, এক নম্বর, আমরা গরীব মানুষ, ভাল বাড়ী করার শক্তি কোথায়? দুই নম্বর, গ্রামে প্রায়ই থাকা হয় না। কালে ভদ্রে আসি। বাড়ীঘর এমনি পড়ে থাকে। চারদিকে আবর্জনার স্তুপ হয়ে আছে।

বলল, স্যার, এই অবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানে আপনি কিছুতেই চীপ মিনিষ্টার হতে পারতেন না। সেখানে ইলেকশনের আগে চীপ মিনিষ্টারের বাড়ীর ছবি ব্লক করে হাজার হাজার প্রচার পত্রে সন্নিবেশ করে বিলি করা হয়। মানুষ দেখেই মনে করে, হ্যাঁ, মন্ত্রী হবার যোগ্য বটে। আলীশান এমারত, রাজা বাদশার প্রাসাদের মতই দেখতে। এ মন্ত্রী হবে না ত কে হবে!

একবার মন্ত্রীত্বের আমলে এক জেলায় সফরে যাই। পশ্চিম পাকিস্তানের একজন খ্যাতনামা কর্মীও সঙ্গে ছিল। জনসভায় বক্তৃতার সময় উপস্থিত ছিল। বক্তার পর জিজ্ঞাস করল, আপনি কি সব বললেন যে এত হাততালি পড়ল?

বললাম, অনেক কথাই ত বলেছি। সব কি মনে আছে? তাদের মানপত্রের জবাব দিয়েছি। দাবী দাওয়া সম্বন্ধে বলেছি: যা সম্ভব তা' করা যাবে। তবে একটা কথা খুব জোর দিয়ে বলেছি: আমি আপনাদেরই একজন। আপনারা নির্বাচন করেছেন

আমাকে, আপনাদের আস্থাই আমার সম্বল। আমি এখানে আর আপনারা ওখানে এটা আকস্মিক—প্রভেদ নয়। আমাকে আপনাদের থেকে আলাদা মনে করবেন না। যে দিন আমাকে আপনাদেরই একজন বলে চিনতে বা ভাবতে অসুবিধা হবে, সেদিন আর আমার এই আসনে থাকার অধিকার থাকবে না।

বন্ধু বলে উঠল, হয়েছে, হয়েছে। আমাদের ওদিকে এ ধরণের সব উক্তি অচল। কেউ আপনাকে মানবে না। বলবে, তুমি আর আমরা যদি একই হবে থাকি, তা হলে তুমি ওখানে আর আমরা এখানে কেন? আমাদেরই একজন ওখানে যাক তুমি নেমে এস।

বললাম, ধ্যেৎ কি যে সব বলছ? এমন হতে পারে নাকি?

বললাম, চলুন, আমাদের যে কোন এলাকায়। দিন বক্তৃতা ঐ সুরে। তারপর দেখুন তার প্রতিক্রিয়া।

কি জানি।

একবার পিণ্ডি থেকে আসার পথে গভর্ণর গুরমানীর নিমন্ত্রণে লাহোর লাট ভবনে অবস্থান করি।

বিকালের দিকে মাঠে একা হেঁটে বেড়াচ্ছি। প্রকাণ্ড বড় মাঠ। দেখলাম, কয়েকজন যুবক এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। আমি কাছে এলে, আমাকে জিজ্ঞাস করল, পূব-পাকিস্তানের উজিরে আলা কি এখানে তশরীফ রাখেন?

'বললাম, রাখেন।'

'তাঁর সাথে দেখা করা যায় কেমন করে?'

'দেখা ত হয়েই গেছে।'

'জি, না, দেখা হয় নাই। কিছু আলাপ করতে চাই তাঁর সাথে। আমরা প্রেসম্যান। খুব বেশী সময় নেব না। মাত্র দু'চারটি কথা।'

হেসে বললাম, আলাপ ত শুরু হয়েই গেছে।

আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করল। বিশ্বাস করতেই চায় না।

একে ত চেহারা নেহাত মামুলি। তার আবার পোষাক আরও মামুলী। পা-জামা আর কুর্তা।

ঢোক গিলে সামনে এল। আস্সালাম-ও-আলায়কুম—মাফ কিজিয়ে। তবুও আরও দু'চারটি কথাবার্তা বলে নিশ্চিন্ত হয়ে নিল যে সত্যি চীফ মিনিষ্টারের সাথে কথা বলছে! এমন করে মাঠে হাটা ত চীফ মিনিষ্টারের পক্ষে শোভন নয় বলেই তাদের ধারণা। বিশেষতঃ নিজের এলাকার বাইরে।

বলে, আপনি এমন সাফ উর্দু বলেন যে ধরবারই উপায় নাই। মনে হয় মাদারী জবান।

বললাম, আমার মাতৃভাষা উর্দু নয় কিন্তু অনেকদিন উর্দু পড়েছি।

সাতান্ন সালের শেষ ভাগে বাহাওলপুরের আল্লামা আরশাদ একদিন সন্ধ্যা বেলা আমার সরকারী বাসভবনে এলেন। ঘরে ঢুকেই বলেন, আরে, এ যে দরবারে আম। চারদিকেই লোকজন। বারান্দায় সিঁড়িতে, ঘরে, সামনের মাঠে সর্বত্র।

বললাম, কি আশা করেন আপনি? মানুষের প্রতিনিধি বলে দাবী করি আমরা। তাদের ভোটেই মন্ত্রী। তাদের জন্য দ্বার অবারিত।

বললেন, আমাদের ওদিকে এ সব চলবে না। চীফ মিনিষ্টারের বাড়ী ঢুকতে একে একে চারটি গেইট পার হতে হয়। তাও তিনি যদি অনুমতি দেন তবেই।

বললাম, আমাদের এখানে এ ব্যবস্থা অচল।

* * *

এমনি ভাবে গড়ে উঠেছে ঐ অঞ্চলের রাজনৈতিক চিন্তাধারা। কারণটা ঐতিহাসিক। বর্তমানে সামান্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু অতি সামান্য। রাজনৈতিক ক্রীয়াকলাপ প্রায়ই জমিদার-জায়গীরদারদের আওতাধীনে ছিল। তাদের হাত ছাড়া করার চেষ্টা-

শুরু হয়েছে কিছুকাল আগে থেকে। কিন্তু এখনও তারা আঁকড়ায়ে আছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলতে ওখানে কিছু নাই। যারা সর্বহারা, নির্বিত্ত তারা ছোট ছোট আন্দোলন করে কিন্তু নেতৃত্বের অভাবে বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেনা।

নব বিধানে এই দুই অংশকে একই ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা হচ্ছে। সাধু প্রচেষ্টা সন্দেহ নাই। দুই অংশ একই লয়তানে অগ্রগতি লাভ করবে। আগে পরে চলবেনা। বেসুরা হয়ে যাবে। কিন্তু এই নীতি সর্বত্র প্রয়োগ করার কোন চেষ্টা আজ পর্যন্ত হয় নাই। অর্থনীতিক ক্ষেত্রে ত নয়ই। রাজনীতির ক্ষেত্রে সুবিধালাভের জন্য সাম্য সৃষ্টি করার অর্থ হয় না।

আমরা হেঁটে চলি—দৌড়াই। কিন্তু যারা হাঁটতে শিখে নাই, তাদের শামিলে আমাদের ফেলে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। তাদের সহগামী হওয়া মানে আমাদের পিছনে চলে যাওয়া। অর্থাৎ হয় বসে থাকব না হয় হামাগুঁড়ি দিব।

গণতন্ত্রের ব্যাপারে হামাগুঁড়ির যে কসরৎ চলছে তাকে টেনে এনে আমাদের যোগ দিতে হচ্ছে কারণ এক সাথে চলতে হবে। আমাদের রাজনীতিক গতিবেগ হ্রাস করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। এইটাই মৌলিক দর্শন এবং সেই জন্যই মৌলিক গণতন্ত্র।

বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করা হল, ইট হ্যাজ কাম টু ষ্টে—অর্থাৎ বেসিক ডেমোক্র্যাসী টিকে থাকবেই।—আগে শুনতাম পাকিস্তান হ্যাজ কাম টু ষ্টে। এখন বেসিক ডেমোক্র্যাসী। অর্থাৎ পাকিস্তান যতদিন আছে—ইনশাল্লাহ চিরদিনই থাকবে—ততদিন বেসিকও বেঁচে থাকবে। আর থাকবে গণতন্ত্রী ও তাদের কাউন্সিল।

মৌলিক গণতন্ত্রের গুণাবলী প্রচারিত হল। পাকিস্তানের জনগণের বুদ্ধিমত্তা ও মেজাজ মর্জির সাথে খাপে খাপে মিলে যায়। এমন সুন্দর প্রথা বাদ দিয়ে বিদেশী মাল নিয়ে মাতামাতি করা নিছক পাগলামি। সে সব আমাদের ধাতে সইবে কেন?

এও বলা হল, এই প্রথম জনগণের প্রতিনিধি শাসন-প্রশাসনের ব্যবস্থার সাথে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত হল। জনগণই সরকার, সরকারই জনগণ। কি চমৎকার ব্যবস্থা। আগের সব বদলে গেল—নাম ধাম পরিচয়। বোর্ড হল কাউন্সিল, প্রেসিডেন্ট, চেয়ারম্যান। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি কমিশনার ইত্যাদি।

য়ুনিয়ন কাউন্সিলের নির্বাচন হয়ে গেল। যারা য়ুনিয়ন বোর্ডে নির্বাচিত হত তারাই কাউন্সিলে নির্বাচিত হল। নতুন বোতলে পুরাতন মদ। সংক্ষেপে নাম হল, বি-ডি। য়ুনিয়ন কাউন্সিল সরকারেরই একটা অঙ্গ। কোন্ অঙ্গ তা অবশ্য বলা হলনা। কাউন্সিলারেরা মনে করল বিশেষ অঙ্গ এবং ব্যবহারে সেই পরিচয়ই দিতে লাগল। সরকারের সাথে অঙ্গাঙ্গি জড়িত হওয়ায় সত্যিকার গণতন্ত্র এরাই স্থাপন করল।

উপরে আরও কয়েকটা ধাপ আছে। পিরামিডের মত থাকে থাকে। জেলা কাউন্সিল, বিভাগীয় কাউন্সিল। সবার উপরে প্রাদেশিক উপদেষ্টা পরিষদ। সবগুলিই সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ। সরকারী কর্মচারী ও সরকার-নিযুক্ত সদস্যের সংখ্যাই এই সব কাউন্সিলে বেশী—প্রাধান্য সম্পূর্ণ তাদের। তারাই এই সব সংস্থার চেয়ারম্যান সেক্রেটারী।

যুনিয়ন কাউন্সিলগুলিকে এলাকার মহকুমা অফিসার—এস-ডি-ও কন্ট্রোল করবে। তারাই কন্ট্রোলিং অথরিটি। তাও সার্কেল অফিসারের মারফত। এরা ইচ্ছামত কাউন্সিলার অপসারণ করতে পারেন। জেলা ও বিভাগীয় কাউন্সিলের কন্ট্রোলিং অথরিটি ও কমিশনার। থানা কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট সার্কেল অফিসার।

আগের আমলে য়ুনিয়ন বোর্ডের সদস্যদের স্বাধীনতা বেশী ছিল। সরকারী কর্মচারী তাদের সরাতে পারত না। এখন পারে। সরকারের অঙ্গ—তাই ইচ্ছামত বিচ্ছিন্ন করা চলে।

য়ুনিয়ন কাউন্সিলের উপর হুকুম হল, বাজেটের অঙ্ক বাড়াও।

অর্থাৎ ট্যাক্স বাড়াও আর নতুন ট্যাক্স লাগাও। গরু ঘোড়া, ঘরবাড়ী, গাছ-পালা, হাসমুরগী, নৌকা, গরুর গাড়ী, সাইকেল সবার উপর ট্যাক্স। প্রায় উনত্রিশ রকমের।

ট্যাক্সের হার বেড়ে গেল চার পাঁচ বা দশগুণ। কাউন্সিলের আমদানী বেড়ে গেল। বাজেটের অঙ্কও বাড়ল। কম টাকার বাজেট এস-ডি-ও মঞ্জুর করেন না। তিনি মঞ্জুর না করলে বাজেট শুদ্ধ হয় না।

কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সরকারী কর্মচারী—বেতনভুক্ত। মাসিক পঞ্চাশ টাকা। বাড়াবার চেষ্টা হচ্ছে। তারা বলে, এই ক'টা টাকায় কি হয়। সরকার বলে, সবুর কর। তোমরা আমাদের অঙ্গ বিশেষ। মজবুত করার দায়িত্ব আমাদের।

ঘরে বাইরে মৌলিক গণতন্ত্রের প্রচার চলল পুর্ণোদ্যমে। বাইরের সমর্থনের প্রয়োজনই অধিক। বিদেশী ছাপ না থাকলে কোন বস্তুর মূল্য বৃদ্ধি পায় না।

পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী মুরুব্বীদের সমর্থনের প্রয়োজন অধিক। তাঁরাই বিশ্বের নেতা।

মার্কিণ দেশ হুজুগের দেশ। যে কোন ব্যাপারে খুব হৈ চৈ করা তাদের অভ্যাস। সংবাদ পত্র পত্রিকা গরম খবর পরিবেশনের জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব। সেসিল বার্টন মার্শাল বলেছেন, মার্কিণ সাংবাদিক-তার প্রধান খাদ্য: শক্ত মর্দ আর নতুন ঝাড়ু। ট্রুম্যান নতুন ঝাড়ু দিয়ে পুরাতন জঞ্জাল সব ঝাটায়ে পরিষ্কার করে ফেলল—এই সংবাদ পেলে এরই উপর তারা নভেল, নাটক এমন কি ইতিহাসও রচনা করে ফেলতে পারে।

পাকিস্তানে সামরিক আইন জারীর কথা শুনে মার্কিণ দেশ লাফায়ে উঠল। কাগজ ভর্তি করে ফেলল নানা ধরণের সংবাদে। এর পর যখন মৌলিক গণতন্ত্রের খবর পেল, তখন আর একবার। খুব প্রশংসা করল। জনগণ গণতন্ত্র শাসনতন্ত্র, এ সব কিছুই চায়না—

বোঝেও না। তারা চায় আয়ুবতন্ত্র অর্থাৎ মার্শাল ল' কিংবা এক-নায়কত্ব। রাজনীতির বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে তারা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলতে চায়।

বৃটিশের সুরও প্রায় তাই। স্যার পার্সিভাল গ্রিফিথস একজন বৃটিশ। এ দেশে বিভিন্ন দফতরে চাকরী করার পর অবসর নিয়েছেন। সাতান্ন সালের শেষ ভাগে বৃটিশ ডেপুটি হাই কমিশনারের বাসায় আমার সাথে দেখা। কিছু বাংলাও বলতে পারেন। আমার সাথে বাংলায় দু'চার কথা বলে প্রমাণ করলেন। আমাদের তারিফ করলেন। বললেন, আমরা ভাবতেই পারি নাই যে আপনারা দেশ চালাতে পারবেন। ভয় ছিল, এত সমস্যার সামনে আপনারা হেরে যাবেন। কিন্তু দেখে বড় আনন্দ হচ্ছে যে, আপনারা প্রাথমিক বিপদ-সঙ্কট কাটিয়ে উঠেছেন। এখন আশা করা যায়, অতি শীঘ্রই আপনারা একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন। তার পর কলকাতায় গিয়ে এক দফা উৎসাহ ও ধন্যবাদ দিয়ে একখানা চিঠি লিখলেন।

মার্শাল ল' জারী হবার কিছুদিন পর এলেন পাকিস্তানে। মৌলিক গণতন্ত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অনেক কিছু লিখলেন এই প্রসঙ্গে। রাজনীতিকরা দেশ প্রায় ধ্বংসই করে দিয়েছিল। এরা কি কিছু বোঝে গণতন্ত্রের? অথচ স্থাপন করতে গেল গণতন্ত্র। নতুন পদ্ধতি অতি চমৎকার। দেশের পক্ষে উপযুক্ত ব্যবস্থা।

এর পর এলেন রাশব্রুক উইলিয়ামস্। ইনিও বিলাতী। ঐতিহাসিক। ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের অধীনে বহুদিন চাকুরী করেছেন। বর্তমান পাকিস্তান সরকারের বেতনভুক্ত শোনা যায়। ইনিও মৌলিক গণতন্ত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এমন চমৎকার ব্যবস্থা কোন কালে কোথাও প্রচলিত হয় নাই।

স্বৈরাচারী প্রথা আর মৌলিক গণতন্ত্রের প্রশংসায় কয়েক বছর পরও তার মৌলিক আনন্দ শিহরণের কথা ভুলতে পারেন

নাই। ছয়ষট্টি সালে আর একবার শিহরণের কথা প্রকাশ করেন। সব দেখে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল তার দেহ মনে।

আরনল্ড টয়েনবি নামকরা ঐতিহাসিক। আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন। আমার আমলে ইনিও ঢাকা এসেছিলেন। আটান্ন সালের জানুয়ারী মাসে। নানা বিষয়ে আলাপে আমাদের কার্যকলাপের ভুয়সী প্রশংসা করেন। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, গণতন্ত্রের অগ্রগতি' বৈদেশিক নীতি ইত্যাদি ব্যাপারে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করলেন। খুলনা ভ্রমনে গেলেন সরকারী প্লেনে। তার পর বৃটিশ কাউন্সিল থেকে একখানা চিঠি লিখে ধন্যবাদ জানালেন। ভবিষ্যৎ কামনা করেছেন।

মার্শাল ল' জারী হবার কিছুদিন পর এলেন পাকিস্তানে। নতুন ব্যবস্থা দেখে আর এক দফা আনন্দ প্রকাশ করলেন। মৌলিক গণতন্ত্র নতুন দর্শন, অভিনব আদর্শ। নতুন রাষ্ট্রের পক্ষে এই ব্যবস্থাই অধিক মঙ্গলজনক। পুরাতন চিন্তাধারা বর্জ্জন করাই কল্যাণকর ইত্যাদি। তিনি আমাদের শাসন-ব্যবস্থার সাথে সম্যক পরিচিত কিনা জানিনা, কিন্তু মন্তব্য করার সময় মৌলিক গণতন্ত্রের বাস্তব রূপায়ণ ও কার্যক্রম দেখবার সৌভাগ্য তাঁর নিশ্চয়ই হয় নাই। নাম শুনেই অজ্ঞান।

এই দুই ব্যক্তির আগমন ধুমকেতুর মত। সাময়িক আবির্ভাব এবং ঠিক মুহুর্তে। বিশেষ করে রাশব্রুক উইলিয়ামসের। বুনিয়াদী গণতন্ত্র, মার্শাল ল' পাকিস্তানের বিস্ময়কর অগ্রগতি, সর্বোপরি আয়ুব খাঁর ব্যক্তিগত কৃতিত্বের প্রশংসামূলক প্রবন্ধ লেখেন ও সব সংবাদপত্রে (পাকিস্তানী) প্রকাশ করেন। বিলাতে নাকি তিনি পাকিস্তান বিরোধী প্রবন্ধ লেখেন বিনামিতে।

খাঁটি গণতান্ত্রিক দেশের মানুষ কেমন করে কপট গণতন্ত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হযে উঠেন এটা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। যে দেশে শত সহস্র বাধাবিঘ্ন সত্বেও গণতন্ত্র জন্ম লাভ করেছে এবং

দেশকে কল্যাণকামী রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তুলেছে, সে দেশের লোক গণতন্ত্রের পরিবর্তে ভূয়া গণতন্ত্রকে আদর্শ রাজনৈতিক পদ্ধতি বলবেন, এটা খুব অদ্ভুত বলে মনে হয়। অবশ্য, নিজের দেশে গণতন্ত্র, আর বাইরে সাম্রাজ্যবাদী এটা ছিল বৃটিশের রাজনৈতিক আদর্শ। উপনিবেশিকতামুক্ত অনুন্নত দেশ সরাসরি তাদের দেশের প্রচলিত গণতান্ত্রিক পর্যায়ে উন্নীত হয় এটা তারা নিশ্চয়ই কল্পনা করতে পারেনা। তাদের কৌলিন্য ও আভিজাত্য বজায় রাখতে হলে কেউ তাদের কাছাকাছি ঘেঁসে দাঁড়াবে এটা তারা পছন্দ করতে পারেনা। একটা নিম্নস্তরের ব্যবস্থা গণতন্ত্রের নামে চালু করে দেশের ব্যাপারে তারা উৎসাহী ও আগ্রহান্বিত হবেন এটা স্বাভাবিক। সামন্ত প্রথায় নিম্নস্তরের মানুষের সামাজিক ব্যবস্থা আচার অনুষ্ঠান ভাষা-সংস্কৃতিকে প্রভুরা কৃত্রিম উৎসাহের সাথে রক্ষা করার চেষ্টা করেন। নিজস্ব গণ্ডীর উর্ধ্বে তারা যেন উঠে প্রভুদের পর্যায়ে না এসে পৌছে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। নিজেদের আচার অনুষ্ঠানকে আভিজাত্যের কঠিন বেষ্টনে নিরাপদে রেখেছেন। প্রজাপুঞ্জ সন্তুষ্ট হত—সামন্ত প্রভুরাও নিশ্চিন্ত থাকতেন।

বৃটিশ সেদিন আমাদের প্রভু ছিল—দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আমরা আদিম অসভ্য জাতি। সভ্যতার দ্বার তারাই উন্মুক্ত করেছেন আমাদের জন্য। সেই মহান ব্রত পালনের উদ্দেশ্যেই এ দেশে রাজ্যস্থাপন করেছিলেন। বর্তমান যুগের বৃটিশের পক্ষে হঠাৎ সে মনোভাব পরিত্যাগ করা কঠিন; সুতরাং, মধ্যযুগীয় রাষ্ট্র প্রথার অনুকরণে কোন ব্যবস্থা আমরা অনুকরণ করলে তারা পিঠ চাপড়ায়ে বলবে, বেটা খোশ রাহো। আমরা এখনও কমেনওয়েলথের ভেতর রয়ে গিয়েছি। বন্ধু না হয়ে প্রভুর মনোভাব রাখা কি খুব অন্যায় ?

এই সব লেখক আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের প্রতীক। সম্রাজ্য-

বাদের ভক্ত। তাঁদের কাছ থেকে বর্তমান যুগের নতুন আদর্শ আশা করা যায় না।

সকলের উপর টেক্কা মারলেন, ভারতের একজন প্রখ্যাতনামা সাংবাদিক—প্রেম ভাটিয়া। রাজনৈতিক প্রবন্ধ লেখায় পটু।

নিমন্ত্রণ পেয়ে গেলেন রাওয়ালপিণ্ডি। দু'চারদিন খানাপিনা হল—খানার চেয়ে পিনাই বেশী। বড় বড় কর্মচারীদের সাথে ঘোরাফেরা করে একটি বিবৃতি দিলেন। আয়ুব খাঁর রাজত্বে দেশবাসী পরম সুখে বসবাস করছে। তাদের কোন অভাব অভিযোগ নাই। আয়ুব খাঁ যে সব আইনকানুন প্রচলন করেছেন, তা' তারা অম্লানবদনে গ্রহণ করেছে। মৌলিক গণতন্ত্র নামক ব্যবস্থার সৃষ্টি করে তিনি দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

এখানে শেষ করলে আপত্তি করার বিশেষ কিছু ছিলনা। তিনি দু' ধাপ আগে চলে গিয়েছেন। বলেছেন, আমি অনেক ঘুরেছি। দেখেছি রাজনীতিকদের নাম কেউ শুনতে চায়না। কোন কোন রাজনীতিকের নাম উল্লেখ করলেই মানুষ মুখে কাপড় গুঁজে—নাক সিটকায় ও ঘৃণাভরে থুথু ফেলে। রাজনীতিকরা ফিরে আসতে পারে, এ কথা ভাবতেও তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

ঠিক ধরেছেন। শলুক চিনে ফেলেছেন গোপালঠাকুর। প্রেম ভাটিয়া মানেই ত গোপাল ঠাকুর। আয়ুব খাঁ নিজেও এতটা বলেন নাই।

এই ভদ্রলোক কোথায় গেলেন? দেবলোকে। পিণ্ডির দেবলোকে দেবতা অপদেবতার বাস। সেখানে দৈনন্দিন সমস্ত দেশপ্রেমিক রাজনীতিকদের পিণ্ডি চটকান হয়। সেই সব জায়গায় গেলেন ইনি প্রেম-বিস্তার করতে। তারা যা বলেছে তাই বেদবাক্য বলে গ্রহণ করেছেন। নরলোকের দু'একটি প্রাণীর সাথেও তাঁর দেখা হয় নাই। বোধ হয় সে সুযোগ তিনি গ্রহণ করেন নাই। কিংবা সুযোগ দেওয়াই হয় নাই। তা'হলে

যে উদ্দেশ্যে তাঁকে পয়সা খরচ করে নেওয়া হয়েছিল, সে উদ্দেশ্য মাটি হয়ে যায়।

এই সব মনোবৃত্তি নিয়ে এরা বিদেশে যান সংবাদপত্রের রিপোর্টার হিসাবে। বিদেশী রাষ্ট্রের ঘরোয়া ব্যাপারে মন্তব্য প্রকাশ করা যে নীতিবিরুদ্ধ তা' কি তাঁরা জানেন না? জানেন নিশ্চয়ই! কিন্তু দালালী করা যাদের পেশা তাদের নীতি আলাদা। উচ্চস্তরের নীতিবোধ আশা করা যায় না।

দেশী চাটুকারদের দৌরাত্ম্যেই আমাদের প্রাণ ওষ্ঠগত। এর পর যখন বিদেশী, বিশেষ করে মার্কিণ ও বিলাতী দালাল আমদানী করা হল তখন ত জাকাঁন্দানি। তারিফের ডুবড়ি ছুটল। এই দেখ, বিদেশীরাও প্রশংসা করে এই পদ্ধতির। এর পর আয়ুব খাঁর নাগাল আর পায় কে? তাঁর মনে আর কিছুমাত্র সন্দেহ রইল না যে তিনি যা যা করেছেন সবই দেশের জন্য উত্তম।

* * * *

আটান্ন সালে ইসকান্দার মির্যাকে হটায়ে আয়ুব খাঁ গদীতে বসেছিলেন সেটা তাঁর বাহুবলে ও কৌশলে। কেউ প্রস্তাব করে নাই, অনুরোধ করে নাই। নির্বাচিতও হন নাই।

মিলিটারী ডিক্টেটর নাম ঘুচাতে হলে নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁকে প্রেসিডেন্ট হতে হবে। কিন্তু কে তাঁকে নির্বাচন করবে। দেশবাসীর কাছে যাওয়া যাবে না। ভোট সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞানগম্য নাই। তাদের কাছে ভোট চাওয়ার কোন অর্থ হয় না।

মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে নির্বাচিত হওয়া সহজ। সংখ্যায় কম। প্রেসিডেন্টের সৃষ্ট জীব। তাদের উপর ভরসা করা চলে। সুতরাং তাদেরই নির্বাচক মণ্ডলী বা ইলেক্টোরাল কলেজ বলে ঘোষণা করা হল।

এটাও বিপ্লব। কেউ জানতে বা বুঝতে পারে নাই গোপন উদ্দেশ্য। গণতন্ত্রীরা নির্বাচকমণ্ডলী হবে জানলে অনেক ভাল লোক য়ুনিয়ন কাউন্সিলের নির্বাচনে যোগদান করত। শুধু শুধু য়ুনিয়ন কাউন্সিলে নির্বাচিত হয়ে লাভ কি?

দেশবাসীর কাছে একটা নতুন হলেও আয়ুব খাঁ গোড়া থেকেই এটা ভেবে রেখেছিলেন। আমাদের রাষ্ট্রদূত আজিজ আহমদ তাই বললেন। তিনি তৎকালে মার্কিণ দেশে ছিলেন। মৌলিক গণতন্ত্র বিষয়ক সরকারী কাগজপত্র তাঁর কাছে পাঠান হয়েছিল। তাতে নাকি লেখা ছিল, এই সংস্থাই ভবিষ্যতে পাকিস্তানের ইলেক্টোরাল কলেজে পরিণত হবে।

একদা ঘোষণা করা হল, আয়ুব খাঁ প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত হতে চান। সে নির্বাচনও নতুন ধরণের। আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না আয়ুব খাঁ একাই নির্বাচনে প্রার্থী হবেন আর গণতন্ত্রীরা তাঁকে ভোট দিবেন।

নাম হল আস্থা ভোট। আয়ুব খাঁর উপর আস্থা আছে কি না তার যাচাই হবে। সে আস্থাও দেশবাসীর নয়। মৌলিক গণতন্ত্রীদের! তারা যখন নির্বাচিত হয় তখন আস্থা অনাস্থার প্রশ্নই উঠে নাই। সুতরাং দেশবাসী এ ব্যাপারে গণতন্ত্রীদের কোন নির্দেশ দেয় নাই।

ভোট হবে ইঙ্গিতে। হাঁ আর না। লোক প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকলেও একটা কাল বাক্স প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে রাখা হয়েছিল। 'হাঁ' ভোট পড়বে আয়ুব খাঁর বাক্সে আর 'না' ভোট কাল বাক্সে।

মনে হয়, খুব সহজ ও সরল রাজনৈতিক খেলা। কিন্তু তলে

তলে অতি সুক্ষ্ম প্রচার কার্য চলছিল। প্রেসিডেণ্টের পক্ষে 'হাঁ' ভোট দিলে তার মানে, সামরিক আইন প্রত্যাহার করে গণতান্ত্রীক শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের নির্দেশ বা ম্যাণ্ডেট। আর উল্টা ভোট দিলে অর্থাৎ 'না' ভোট দিলে মনে হবে শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের কোন প্রয়োজন নাই। মার্শাল ল' সামরিক শাসন ব্যবস্থা জারী থাকুক।

কি অদ্ভুত ছলনা! প্রেসিডেণ্টের উপর আস্থার অভাব প্রমাণিত হলে তিনি সামরিক আইন জারী রাখতে পারবেন যতদিন খুশী। তিনিই ব্যবস্থা দেন, আর মর্ম ও তাৎপর্য নিজের ইচ্ছামত ব্যাখা করে দেন।

'হাঁ' ভোট অবশ্য অনেক বেশী হল। 'না' ভোটও নেহাৎ কম হল না। কয়েক হাজার। প্রেসিডেণ্টে মনে করলেন, তাঁর উপর আস্থার নির্ভুল ইঙ্গিত। অতএব তিনি নির্বাচিত হলেন। সামরিক ডিক্টেটর রইলেন না। জনগণের নির্বাচিত ডিক্টেটর হলেন!

যারা 'হাঁ' ভোট দিল তারা মনে করল, মার্শাল ল' উঠে যাবে। আমাদের জান বাঁচবে। একটা গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র যদি দেন তা হলে জনগণের রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থা কায়েম হবে। অর্থাৎ সামরিক শাসনের উপর অনাস্থা। আর যারা 'না' ভোট দিল, তারা মনে করল, আয়ুব খাঁর উপর অনাস্থা দিলাম। সামরিক আইনও চাই না, তাঁর দেওয়া শাসনতন্ত্রও চাই না। তাঁকেই চাই না।

যে যা' বোঝে।

আঠার

মৌলিক গণতন্ত্র প্রচলনের পর জনমত যাচাই করার জন্য আয়ুব খাঁ দিগ্বিজয়ে বার হলেন—পূর্ব ও পশ্চিম দিকে। রেল গাড়ী চড়ে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সফরে রওনা হলেন। গাড়ীটার নাম দেওয়া হল 'পাক জমহুরিয়াত'। পবিত্র বা খাঁটি গণতন্ত্র। কিংবা পাকিস্তানী গণতন্ত্র। দুটিই সার্থক নাম। তবে পাকিস্তানী গণতন্ত্র বললেই ভাল হয়। দুনিয়ার অন্য সব গণতন্ত্র থেকে স্বতন্ত্র। পাকিস্তানের নিজস্ব উৎপত্তি।

গাড়ী চলল। থেমে থেমে চলে। যেখানে খুশী থেমে যায়। মানুষকে দর্শন লাভের সুযোগ দিতে হয়। খুব ভিড় হয় প্রত্যেক স্থানে। প্রেসিডেন্টের বাণী শ্রবণ করে।

প্রকাণ্ড বড় একটা দল সাংবাদিকদের—দেশী ও বিদেশী। পাক জমহুরিয়াত থেকে তারা দেশে বিদেশে রিপোর্ট পাঠায়। পান আহার ফ্রি। নিদ্রাও। সচিত্র ও বিচিত্র উভয় রকমের তথ্যই সরবরাহ করে। এই ভ্রমণ নিরস নয়—রোমাঞ্চকর। তবে চারদিক ভ্রমণের পর আয়ুব খাঁ ঘোষণা করলেন, তাঁব ভ্রমণ সার্থক হয়েছে। সবাই তাঁকে সমর্থন করে। তাঁর নীতি ও পন্থা গ্রহণ করেছে। তার প্রবর্তিত গণতন্ত্র দেশবাসী স্বীকার করে নিয়েছে অকাতরে। এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে জনসাধারণ শাসনতন্ত্র চায়না। বোঝেও না ওটা কি পদার্থ। তারা চায় আয়ুব খাঁ—শক্তিমান পুরুষ।

ঠিক বিদেশী সমর্থকদের উক্তির প্রতিধ্বনি! তারাও তাই বলেছেন, সুতরাং এটা বলা চলে।

কিন্তু তবু তিনি মনে করলেন, শাসনতন্ত্র একটা দিতে হবে। এটা তাঁর উদারতার পরিচয়। সামরিক শাসন আর কতকাল

চালু রাখা যায়। সিপাইদের চিরকাল আবদ্ধ রাখা চলে না তাদের ছেড়ে দিতে হবে দেশরক্ষার কাজে। শাসনভার তুলে দিতে হবে দেশী লোকদের হাতে।

এই শাসনতন্ত্র কে রচনা করবে? গণপ্রতিনিধিরা করে, কিন্তু তারা ত দুষ্কৃতী। এ কাজের ভার দিতে হয় কমিশনের উপর। সুপ্রিম কোর্টের চীফ জাষ্টিস শাহাবউদ্দিনকে চেয়ারম্যান করে সরকারী ও বেসরকারী কয়েকজন সদস্য নিয়ে শাসনতন্ত্র কমিটি গঠিত হল।

সবাই সরকার নিয়োজিত। আয়ুব খাঁর দিকে দৃষ্টি রেখেই কমিশনের রিপোর্ট তৈয়ার করা হয়েছে। তিনি চিরকালই প্রেসিডেন্ট থাকবেন এটা ধরেই নেওয়া হয়েছে।

বহুদিন ধরে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে কমিশন সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণ করলেন। সরকারী বেসরকারী লোকের সাক্ষ্য নিলেন। বিভিন্ন পর্যায়ের। পূর্ব-পাকিস্তানের প্রায় সকলেই—সরকারী কর্মচারী ছাড়া—পার্লামেন্টারী শাসন প্রথা, সার্বজনীন ভোটাধিকার, প্রত্যক্ষ নির্বাচনে পার্লামেন্ট গঠন ও স্বায়ত্ব শাসনের ভিত্তিতে ফেডারেল শাসনতন্ত্রের পক্ষে রায় দিলেন। কমিশনের দু'একজন সদস্যের মুখে শুনলাম চাঁটগায়ের একজন স্বনামধন্য উকিল রাজতন্ত্র স্থাপনের পক্ষে এবং সিলেটের জনৈক আধা-রাজনৈতিক ব্যক্তি প্রেসিডেন্সিয়াল প্রথার অনুকূলে রায় দিয়েছে।

প্রশ্নাবলীর উত্তর দেবার জন্য কমিশন আমাকেও ডেকেছিলেন। বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে একটি প্রবন্ধ পেশ করেছিলাম। তা ছাড়া প্রায় ঘণ্টা দুয়েক প্রশ্নোত্তরের মোকাবিলা করেছিলাম। গোড়া থেকে শেষপর্যন্ত রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারার বিবরণ দিয়েছিলাম।

একজন সদস্য জিজ্ঞাস করেছিলেন, চীফ মিনিষ্টার থাকা কালে

জনগণ ও প্রতিনিধিদের দৌরাত্ম্যে প্রতিদিন যে আপনার গায়ের রক্ত এক-পোয়া পরিমাণ নিঃশেষ হত, সেটা এত শীগ্‌গীর ভুলে গিয়ে আবার সেই প্রথার জন্য জোর দাবী জানাচ্ছেন এটা আশ্চর্যের বিষয়।

বলেছিলাম, তা হোক, কিন্তু গনতন্ত্র স্থাপনের দ্বিতীয় আর কোন পন্থাও ত নাই। আমার বা কারও ব্যক্তিগত সঙ্কট ও বিরক্তি দিয়েই একটি প্রথার ভালমন্দ বিচার করা চলে না। আর এটা কোন যুক্তিও নয়।

আলাপ আলোচনায় বোঝা গেল, পার্লামেণ্টারী প্রথা বিফল হয়েছে, তা কমিশন ধরেই নিয়েছেন। তারা শুধু বিফলতার প্রকৃতি ও কারণ নিরূপণ করতেই নির্দেশ পেয়েছেন।

নানাজাতীয় লোকের মুখে নানা রকমের মতামত শুনেছেন। রাজনৈতিক দলাদলিও বিদ্বেষ যে বিদ্যমান ছিল তা কমিশন বুঝতে পেরেছিলেন। এবং এটাও পার্লামেণ্টারী প্রথার বিফলতার একটা কারণ বলে ধরে নিয়েছেন। সত্যিকার পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র এ দেশে পুরাপুরি চালু হতেই পারে নাই, কমিশন এই মতবাদ অগ্রাহ্য করেছেন।

কমিশন পার্লামেণ্টারী প্রথার অনুকুলে রায় দেন নাই। কারণ একবার ব্যর্থ হয়েছে। দেশে ঘন ঘন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে দোষত্রুটি দুর্বলতা দূর হয়ে যেত, কমিশন এ কথাও বিশ্বাস করতে পারেন নাই।

রিপোর্টে কমিশন বলেছেন যে, একদলের মত হচ্ছে যে ভূতপূর্ব শাসনতন্ত্রে নানা দোষত্রুটি ছিল এবং রীতিমত নির্বাচনের ব্যবস্থা না থাকার ফলে গণতান্ত্রিক প্রথা বিফল হয়েছে; আর একদল বলে, রাষ্ট্রপ্রধানের মন্ত্রী ও রাজনৈতিক দলের উপর অবৈধ হস্তক্ষেপ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাদেশিক সরকারের কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করার দরুণ পার্লামেণ্টারী প্রথা কার্যকরী হয় নাই। তৃতীয় এক

দলের অভিমত, উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল গঠিত না হওয়ার ফলে এবং সাধারণভাবে রাজনীতিকদের চরিত্রবলের অভাব ও প্রশাসন ব্যবস্থায় তাদের অন্যায় হস্তক্ষেপের ফলে পার্লামেণ্টারী শাসন প্রথা বিফল হয়েছে।

কমিশনের মতে প্রথম দুই দলের মতের চেয়ে তৃতীয় দলের মতই বিফলতার প্রকৃত কারণ। এ বিষয় ভিন্ন মতাবলম্বী রাজনীতিকদের মতামত থেকে কিছু কিছু দৃষ্টান্তও রিপোর্টে সন্নিবেশ করেছেন।

আয়ুব খাঁরও মত তাই। সুনিয়ন্ত্রিত রাজনীতিক দল ছিলনা। নেতা ছিলনা। তারা প্রশাসন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করেছে, এই সব অভিযোগ আয়ুব খাঁ গোড়া থেকেই করে এসেছেন। সুতরাং কমিশন তাঁরই প্রতিধ্বনি করেছেন।

আমার সম্বন্ধে রিপোর্টে দুইটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। দুইটিই অসত্য ও ভুল বর্ণনার উপর নির্ভব করে লেখা হয়েছে বলে মনে হয়। বলেছেন, চীফ মিনিষ্টার সামরিক বাহিনীর সাহায্যে রুদ্ধ-দ্বার অভিযান শুরু করেন এবং একমাসের মধ্যে এক কোটি টাকার মালামাল ধৃত করেন। কিন্তু সংখ্যালঘু হিন্দুদের এক অংশের চাপে এই পরিকল্পনা পরিত্যাগ করা হয়। চীফ মিনিষ্টার ওদের সমর্থনের উপর নির্ভর করতেন।

কথাটা মিথ্যা। পরিকল্পনা পরিত্যাগ করা হয় নাই। সামরিক বাহিনী দু'মাসের অঙ্গীকারে নিয়োগ করা হয়েছিল। এর পরই সামরিক কর্তৃপক্ষের তাড়নায় আমাদের ঘোর প্রতিবাদ ও আপত্তি সত্বেও তাদেব ছেড়ে দিতে হয়েছিল। পরিত্যাগ করার প্রশ্নই উঠেনা। সামরিক বাহিনী প্রত্যাহারের ফলে আমরা বেশ বিপদগ্রস্ত হই। অতি তাড়াতাড়ি বিকল্প সংস্থা গঠন করতে বাধ্য হই। কারণ সামরিক বাহিনী চলে যাওয়ার পর যে শূন্যতা বিরাজ করার আশঙ্কা ছিল তা অত্যন্ত মারাত্মক। এই বিকল্প সংস্থা সংগঠনের জন্য যে সময়ের দরকার তাও সামরিক কর্তৃপক্ষ দিতে রাজী হন নাই।

আরও বলেছেন, অনুরূপ চাপের ফলে, পূর্ব-পাকিস্তানে সামরিক বাহিনীর পরিচালন কৌশল সম্বন্ধে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে গোপন তথ্য সরবরাহের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আনীত মোকদ্দমা প্রত্যাহার করার নির্দেশ দেন।

এটাও সম্পূর্ণ গুজব ও বিদ্বেষমূলক তথ্যের ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রে গোপণ তথ্য সরবরাহ করার অভিযোগ মিথ্যা। কয়েকজন নিরীহ প্রকৃতির মানুষকে ধরে এনে আটক রাখা হয়েছিল। একজন বেশ খ্যাতনামা। তিনি স্থানীয় ক্লাবের কর্মকর্তা বরাবর রয়েছেন। স্থানীয় কর্মচারীরা ক্লাবের নির্বাচনে তাঁকে পরাজিত করার সম্ভাবনা না থাকায় তার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করে। সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন। আমি সমস্ত কাগজপত্র ও সম্ভাব্য সাক্ষ্যপ্রমাণ পরীক্ষা করে পুলিশ বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, যে সব জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়েছে তার অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর কিনা। তিনি বলেন, তা সম্ভব নয়। জিজ্ঞাসা করি এই তথ্যের উপর কোন কোর্ট এদের দোষী সাব্যস্থ্য করতে পারে না। তার উত্তরও তিনি বলেন, তা পারে না। তিনি মাত্র একটি আপত্তি করেছিলেন যে, ব্যাপারটা প্রতিরক্ষা সম্পর্কীয় সুতরাং সামরিক কর্তৃপক্ষের সমর্থন নিলে ভাল হয়। বলেছিলাম, তার দরকার নাই। সামরিক অপরাধ বলে গণ্য করা হলে তারা নিজেরাই বিচার করত, তা না করে যখন আমাদের হাতে দিয়েছে, তখন আমরাই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি।

এ ব্যাপারে কেউ চাপ দেয় নাই। সংবাদ পত্রের রিপোর্ট দেখেই সমস্ত ফাইলটা এনে পুলিশ কর্মচারীর মোকাবেলায় প্রকাশ্যে আলোচনা করেই মামলা প্রত্যাহারের নির্দেশ দেই।

কমিশন বলেছেন, এর আগেও কয়েকজন গণ-প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে সরকারী অর্থ তছরুফের অভিযোগে মামলা আনা হয়। চীফ

মিনিষ্টার এ সব প্রত্যাহার করেন। সম্পূর্ণ ভুল তথ্যের উপর নির্ভর করে কমিশন এই মন্তব্য করেছেন। সরকারী তহবিল-তছরুফের কোন মামলাই কারু বিরুদ্ধে করা হয় নাই। অন্ততঃ যে সব মামলা প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছিলাম, তাতে ঐ অভিযোগ ছিলনা। বিনা কারণে বিদ্বেষমূলক মোকদ্দমা বহুদিন যাবৎ ঝুলায়ে রাখা হয়েছিল বলেই তা প্রত্যাহার করার নির্দেশ দেই। সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারীদের সাথে আলাপ আলোচনা করে তাদের মতামত নিয়েই এই নির্দেশ দিয়েছিলাম। কিছু প্রতিবাদ কেউ করে নাই। পরে অবশ্য তারাই মনের দুঃখে এই সব তথ্য সরবরাহ করেছে এবং তাতে বানোয়াটি গল্প সংযোগ করেছে।

আমাদের দেশের ফৌজদারী মামলা সৃষ্টি, তদন্ত ও পরিচালনায় নিযুক্ত পুলিশ কর্মচারীদের কীর্তিকলাপ ও নৈতিক মান সম্বন্ধে যাদের বিন্দুমাত্র ধারণাও আছে তারা জানে কি অবস্থায় শত্রুতা সাধনের উদ্দেশ্যে কত নির্দোষী লোককে জেল ও হাজতে পচতে হয়। তাদের সক্রিয় ক্রীয়াকলাপে কত নির্দোষ ব্যক্তি শাস্তি ভোগ করে আর দোষী মুক্তিলাভ করে। নিম্ন পর্যায়ের ফৌজদারী আদালতে বিচারের প্রহসন হয়। তারপর বিচারের যে পদ্ধতি তাতে পুলিশের সহায়তায় বিচার বিভ্রাট ঘটাও অসম্ভব নয়। যে কোন ব্যক্তির মান মর্যাদা নিরাপদ থাকতে পারে না। শাসন ও বিচার বিভাগ যতদিন পৃথক না হবে ততদিন এই আশঙ্কা বিদ্যমান থাকতে বাধ্য।

অসংখ্য মামলা পরিচালনা করেছি। বিচারক আক্ষেপ করে বলেছেন, কি করব, উপায় নাই। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। আপনারা উপর আদালতে গিয়ে এর প্রতিকার সন্ধান করুন। তদন্তকারী বিভাগের মুখেও হরদম ঐ কথা শুনেছি।

যে কয়টি মামলা প্রত্যাহার করার নির্দেশ দিয়েছিলাম, তার প্রত্যেকটার পিছনে ছিল ষড়যন্ত্র, শত্রুতা বা বিদ্বেষ কিংবা লোভ।

এ অবস্থায় এই আসামীগুলি ঝুলতেই থাকবে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ; তাদের রক্ষা করার কোন দায়িত্বই কি আমার ছিলনা ?

অতি উচ্চ আদর্শের মানদণ্ডে যদি এটাকে সমীচিন মনে করা না হয় তা হলে আমার বলার কিছু নাই। কোথায় সে মান ? না তদন্ত বিভাগে, না বিচার বিভাগে। এ অবস্থায় মানের প্রশ্ন না তোলাই ভাল। তবে কমিশনের একটি মন্তব্যের প্রতিবাদ করতে হয়। যা করেছি, তা নিজেই করেছি। কারও অনুরোধ বা চাপে বা কাউকে সন্তুষ্ট করার জন্য করি নাই। সে প্রবৃত্তি আমার কোন কালেই ছিল না। কমিশন ভাসা ভাসা ভাবে বিরোধীদলীয় লোকজনের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করেই এই সিদ্ধান্ত করেছেন। এটা পরিতাপের বিষয়। বাজারের গুজবও ঘটা করে প্রচার করা হয়। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

কমিশনের মতে শাসনভার একই ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হওয়া উচিত। অবশ্য সেই ব্যক্তিকে একটি স্বাধীন পার্লামেণ্ট সংযত করে রাখবেন। কিন্তু পার্লামেন্টের সদস্য ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে প্রশাসন ব্যবস্থার উপর কোনরূপ রাজনৈতিক চাপ না দিতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। মার্কিণ দেশে প্রেসিডেন্সিয়াল প্রথায় সে ব্যবস্থা আছে।

প্রেসিডেন্ট প্রথা কালক্রমে একনায়কত্বে পরিণত হতে পারে বলে যে কোন কোন মহল আশঙ্কা প্রকাশ করেছে, কমিশন তা অমূলক বলে উপেক্ষা করেছেন। একজন ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদের জন্য কমিশন সোপারেশ করেছেন।

অবশ্য কমিশন সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন যে প্রেসিডেন্ট প্রথাই যে সর্বোত্তম এবং ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক সংকট থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ তা বলা চলেনা। তবে গত কয় বছরের অভিজ্ঞতার ফলে কমিশন এই প্রথাকেই পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেছেন।

কমিশন ভারত ও কানাডার মত ফেডারেল সরকার স্থাপনের রায় দিয়েছে। এবং মাত্র দুইটি য়ুনিট নিয়ে এই ফেডারেশন গঠিত হবে। স্বায়ত্ব শাসনের দাবী কমিশন অগ্রাহ্য করেছেন।

সার্বজনীন ভোটাধিকারের প্রশ্নে কমিশন বলেছেন, ইংলণ্ডে যেমন শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে ভোটাধিকার বিস্তার করা হয়েছে এখানেও সেই ব্যবস্থা করা দরকার। অর্থাৎ বর্তমান অবস্থায় সার্বজনীন ভোটাধিকার দেওয়া চলেনা। তবে প্রেসিডেন্ট ও পরিষদকে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত করতে হবে বলে কমিশন সোপারেশ করেছেন।

মোটামুটি ভাবে কমিশন প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার স্থাপনের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন কিন্তু সরাসরি জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষপাতী নন। অথচ জনগণের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা না হলে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠন করা সম্ভবপর নয়, কমিশন এটা বিবেচনা করেন নাই। অর্থাৎ জণগণকে সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করতে রাজী হন নাই।

কমিশন উপসংহারে বলেছেন, প্রেসিডেন্টের (আয়ুব খাঁর) নিজস্ব নির্দিষ্ট মতামত আছে এবং তিনিই একমাত্র শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের ক্ষমতা ধারণ করেন। তিনি এক বক্তৃতায় বলেছেন, 'আমার মতামত থেকে ভিন্ন হলেও কমিশনের সোপারেশ আমরা (অর্থাৎ আমি) গ্রহণ করব। তবে শর্ত এই যে, সে সব প্রস্তাব আমার নির্দিষ্ট মতামত হতে উত্তম এবং দেশের জন্য কল্যাণকর।' কমিশন এই কথা সর্বদা মনে রেখে তাঁদের সোপারেশ পেশ করেছেন।

গ্রামের শালিসের গল্প: বাড়ীর বড় ঘর নিয়ে দুই ভাই-এ বিবাদ। শালিস বসল। বড় ভাই বলল, শালিসে গ্রামের মুরব্বীগণ উপস্থিত—তাঁদের রায় নিশ্চয়ই মানব, তবে বড় ঘরটা আমাকে না দিলে আমি মানব না।

ছোট ভাই বলে, আমারও সেই দাবী। বড় ঘর

শালিস বলে, এদের দাবী যদি একই হয় আর বিরোধ কিসের?

উনিশ

কমিশন রিপোর্ট প্রাপ্তির কিছু দিন পর আয়ুব খাঁ ঢাকা এলেন—একষট্টি সালের মাঝামাঝি। আমাকে ডাকালেন তাঁর সাথে দেখা করার জন্য। কমিশনের রিপোর্টের সারাংশ জানতে পেরেছিলাম, সংবাদপত্রের মারফত। ভাবলাম, এই বিষয়ই আলোচনা করবেন।

কুশলাদি জিজ্ঞাসা করার পর মুচকি হেসে বললেন, একটা শাসনতন্ত্র শীগগীরই রচনা করব স্থির করেছি।

বললাম, উত্তম কথা। কি ধরণের হবে, তার আভাস পেতে পারি ?

'নিশ্চয়ই। খুব সহজ ও সরল। সাধারণ মানুষ অক্লেশে বুঝতে পারবে এবং কার্যকরী করতে সক্ষম হবে।

বললাম, শুনছি নাকি, প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র গঠন করতে চান ? ওটা কিন্তু দেশের লোক গ্রহণ করবে না। তারা চায় পার্লামেন্টারী প্রথা। এতদিন দেখে এসেছে। সহজে বোঝেও।

হঠাৎ গরম হয়ে উঠলেন, কারা ? দেশের লোক ? দেশের লোক ও-সব কিছুই বোঝেনা। গোটা কয়েক রাজনীতিক—যারা শহরে বাস করে, তারা এই ধুয়া তুলেছে কমিশনের কাছে। তা' আমি জানি। কারণ তাদের পক্ষে ওটাই লাভজনক। কমিশন এই দাবী গ্রাহ্য করে নাই। আমিও করিনা। ওটা অচল। পার্লামেন্টারী প্রথা দেশের সর্ব অমঙ্গলের জন্য দায়ী। এতদিন চেষ্টা করা হয়েছে, ফেল করেছে।

বললাম, চেষ্টা আদৌ করা হয় নাই। প্রাথমিক অবস্থায় দোষ-ত্রুটি ভুলভ্রান্তি হতে পারে—হয়েছেও। দেশ কিন্তু ধাপে

ধাপে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হতেছিল। নানা কুচক্র ও ষড়যন্ত্রের পাল্লায় সে চেষ্টা দ্রুতগতি লাভ করতে পারে নাই। অবশেষে আপনারা এসে দয়া করে সে গতি একদম রুদ্ধ করে দিলেন। এখন বৃথা দোষারোপ করে লাভ কি?

উত্তেজিত হয়ে বললেন, করব না? একশ' বার করব! দেশের মানুষ গণতন্ত্র বোঝে? তারা ভোট দিতে জানে? শিক্ষার মান ও পরিমাণ এত নিম্নস্তরের যে এখানে গণতন্ত্র স্থাপন করতে যাওয়া পাগলামি। আপনারা অবশ্য এইসব লোকের মূর্খতার সুযোগ নিয়ে ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা করেছেন। ধরা পড়ে গিয়েছেন!

বললাম, আমাদের দোষারোপ করেন তাতে আপত্তি নাই। কিন্তু দেশের লোক ভোট দিতে জানে না এ কথা স্বীকার করব না। ভোট দেবার জন্য বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। মানুষ নিজের কল্যাণ সম্বন্ধে সচেতন থাকলেই ভোট দেবার অধিকারী হয়। বহু শিক্ষিত লোক অপাত্রে ভোট দান করে থাকেন। কিন্তু অশিক্ষিত লোক পারতপক্ষে ভুল করে না। পাকিস্তান অর্জন করা হয়েছে এদেরই ভোটে। শিক্ষিত লোকের ভোটে নয়। তাই বলে অশিক্ষার গৌরব আমি করছি না। পাশ্চাত্য জগতের সাধারণ মানুষের চেতনাবোধ, উপলব্ধি অনুভূতি, সহজ ও সাধারণ জ্ঞান অপেক্ষা আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের সহজ ও সাধারণ জ্ঞান, অনুভূতি ইত্যাদি অনেক প্রখর ও উচ্চমানের। এই সহজ জ্ঞান দিয়েই পুথিগত শিক্ষার অভাব তাদের পূরণ হয়। সুতরাং শিক্ষাদীক্ষা না থাকলে ভোট দেবার অধিকার জন্মে না, এই ধারণা ভ্রান্ত। পাশ্চাত্য দেশের বেলায় অযোজ্য হতে পারে কিন্তু আমাদের দেশে এই যুক্তি খাটে না। অতি সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপারেও তাদের বই খুলে দেখতে হয়, যা আমাদের দেশের লোক প্রকৃতির কাছে শিখে নেয়। মাঠ-ময়দান বন, জঙ্গল, নদী-নালাই সাধারণ জ্ঞানার্জনের উৎস।

বোধ হয় বিরক্তি বোধ করলেন। কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আমি কথা বন্ধ কবায় তিনিও থেমে গেলেন।

বললাম, চুয়ান্ন সালের নির্বাচনেব খবর রাখেন? দেশের জনগণ কি ভোট দিয়েছিল! দেশ-বিদেশের লোক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়েছে! এরা লেখা-পড়া জানে না কিন্তু তাই বলে মুর্খ নয়। লেখা-পড়া জানা লোকেরা প্রায়ই ভোটকেন্দ্রে যায় নাই। বড় কথা হচ্ছে রাজনৈতিক চেতনা ও সমস্যা সম্বন্ধে সচেতনতা। এইটাই একমাত্র মাপকাঠি।

বিদ্রুপের হাসি হেসে বললেন, চুয়ান্ন সালের ভোটের বড়াই করবেন না। ওটা কি ভোটাভোটিন মাপকাঠি নাকি? ওটা ছিল নিগেটিভ ভোট। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে উৎকট প্রচারণা, ফজলুল হকের বাগাড়ম্বব এই সব মিলে ভোটাভোটি হয়েছে। ও-সব দিয়ে গণতন্ত্রের বিচাব চলে না।

চৌষট্টি সালে প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশনের প্রাক্কালে তিনি নিজেই রাজশাহীর এক জনসভায় বলেছিলেন, আমি একথা বলতে চাইনা যে, গত চুয়ান্ন সালের নির্বাচনে জনসাধারণ ভোটের অপপ্রয়োগ করেছিল। ঐ সময় মুসলিম লীগ সরকার জনগণের আস্থা হাবায়ে ফেলেছিল। তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা জনসাধারণের কর্তব্য হয়ে পড়েছিল··· ··· ···জনসাধারণ ঠিকই করেছিল।

তিন চার বছরে চিন্তাধারা ও মতামতের আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল।

যাক, যে কথা বলছিলাম। আমি হেসে বললাম, আপনি দেখছি পরের মুখে ঝাল খাওয়ার অভ্যাস করেছেন। সে ইলেকশন ত দেখেন নাই? দেখলে বুঝতে পারতেন, মানুষের মনে সত্যিকার গণতন্ত্র স্থাপনের কি অনুপ্রেরণা, কি দুর্জ্জয় নেশা জেগেছিল। কারও বাগাড়ম্বর, কোনই প্রচার ক্রিয়া করতে পারে নাই—ঘরের কুলবধু, কোনদিন চাঁদ-সুরুজ তার

মুখ দেখে নাই, দলে দলে তিন চার মাইল গ্রাম্যপথে হেঁটে এসেছে ভোট কেন্দ্রে। কোন বক্তৃতা, কোন প্রলোভন কিংবা ভীতি পারত এত বড় একটা বৈপ্লবিক কাণ্ড ঘটাতে? তাদের ঘরের বাইরে আনতে? হাজার নজির দেওয়া যায়। শুনবেন আমার নিজের অভিজ্ঞতা? একটা মাত্র।

ভোটের দিন বিকালে পৌঁছলাম এক ভোটকেন্দ্রে। লোকে লোকারণ্য। সাইকেল থেকে নামতেই কতকগুলি মেয়েলোক ঘিরে ফেলল। এক বৃদ্ধা—মাথায় জট. মুখের চামড়ায় টোল পড়ে গেছে। খুব কাছে এসে হাত ধরে জিজ্ঞাস করল, বাবা তুমিই নাকি ভোট চাও?

বললাম, চাই-ই ত।

মাথায় হাত দিয়ে বলল, দেখছ, মাথার হাল? ছয়মাস তেল দেই নাই। দাম আগুন। ছয় টাকা সের। তুমি দাম কমাতে পারবা?

বাধা দিয়ে আয়ুব খাঁ বললেন, আর আপনিও চট্ করে ওয়াদা করে ফেললেন?

'জি হাঁ করলাম এবং পালনও করেছি। আমার আমলে তিন টাকার বেশী হয় নাই। আড়াই টাকায়ও নেমেছিল। যাক, সে কথা—বৃদ্ধাকে বললাম, হাঁ নিশ্চয়ই চেষ্টা করব এবং পারব বলে মনে হয়।

হেসে আস্তে হাত ঝাঁকনি দিয়ে বলল, তা'লে তোমারেই বেবাক ভোট দিমু। দিয়েও ছিল। দলবল সহ। আর ঠিকই দিয়েছিল—অন্যায় করে নাই। বৃদ্ধার মনে বিশ্বাস হল, আমি —আমরা তার একটি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য কমায়ে দেব। এই বিশ্বাসই ভোটদানের ভিত্তি। এর চেয়ে বেশী কেউ বোঝেনা। আপনিও এই বিশ্বাসে ভোট দিবেন।

তারপর বলল, আসল কথা বাদ দিয়ে আমরা অনেকদূর এসে পড়েছি।

শাসনতন্ত্র রচনা করা সহজও, আবার বেশ কঠিন। কমিশনের রিপোর্ট কতটুকু আপনি গ্রহণ করবেন আর কতটুকু বাদ দিবেন তা আমাদের জানা নাই। জনগণের রচিত একটা শাসনতন্ত্র আপনারা বাতিল করেছেন। ভাল হোক মন্দ হোক প্রায় সবাই গ্রহণ করেছিল এবং তারই বিধানানুযায়ী সাধারণ নির্বাচনের দিন তারিখও ঠিক হয়েছিল। তাও বাতিল হয়ে গেছে। জনগণের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে শাসনতন্ত্র রচনা করা দরকার। জনগণের সমর্থন এবং তাদের মঙ্গলসাধনের প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত না হলে সে শাসনতন্ত্র কার্যকরী করা কঠিন হয়। শাসনতন্ত্র রচনার পূর্বে তার মূলনীতিগুলি নির্ধারিত করে নিলে রচনা সহজ হয় এবং ভবিষ্যত বিরোধের পথও বন্ধ হয়। আপনি একাই শাসনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব নিয়েছেন। জনগণের এতে কোন হাত নাই। কিন্তু তাদের প্রতিনিধি বলে যাঁরা এতকাল স্বীকৃত হয়ে এসেছেন তাঁদের সাথে বসে পরামর্শ করলে কি ভাল হয়না? তাঁদের নিয়েই মূলনীতি নির্ধারণ করুন।

বললেন, মূলনীতি আবার কি? আপনাদের আমলে কয়বার কমিটি হয়েছে মূলনীতি নির্ধারণ করার জন্য। কিন্তু তারা কি কৃতকার্য হতে পেরেছে, না মূলনীতি চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়েছে? সুতরাং ঐ করে সময় নষ্ট করার কোন অর্থ হয় না।

বললাম, আনুষ্ঠানিক ভাবে কমিটি করার কথা বলছি না। এমনি ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হয়ে আলাপ আলোচনা করব।

'কি বিষয় আলোচনা করব?'

বললাম, রাজনৈতিক ও অর্থনীতিক সমস্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকের মতামত আপনার জানা দরকার। দেড় হাজার মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত দুইটি ভূখণ্ড নিয়ে পাকিস্তান গঠিত। আচার ব্যবহার, প্রকৃতি, ইতিহাস সবই স্বতন্ত্র। দুই খণ্ডের রাজনৈতিক সমান অধিকার না থাকলে একসাথে থাকা চলে না। যুগে

মুখে অধিকার স্বীকার করার কোন অর্থ হয় না। বাস্তবে পরিণত করতে হয়। অর্থাৎ দৃশ্যতঃ ও কার্যতঃ দুইটি অংশকে একই স্তরে আনলে পর সংহতি স্থাপিত হয়। অন্যথায় বিবাদ বিসম্বাদ অনিবার্য। যে পর্বতপ্রমাণ বৈষম্য উভয় অংশের মধ্যে বিরাজ করছে, তার মূলোচ্ছেদ না করলে পূর্ব-পাকিস্তানের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। হিংসা দ্বেষ রেষারেষি যা দেখছেন এর মূলে এই বৈষম্য। পার্লামেন্টারী প্রথায় কেবিনেট সরকার ব্যবস্থায় এসব বৈষম্য দূরীভূত করা সহজ। সেই জন্যই এই পদ্ধতির দাবী এত জোর। আমার অনুরোধ, এই সমস্যার সমাধান করে শাসনতন্ত্র রচনা করুন। জোর করে একটা চাপায়ে দেবেন না।

চক্ষু বন্ধ করে এতক্ষণ শুনছিলেন আর মিটমিট করে হাসছিলেন। চোখ খুললেন। বললেন, আমার এই শাসনতন্ত্রে এই সব সমস্যার সমাধান থাকবে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ গঠিত হবে। এই ত পার্লামেন্টারী প্রথার প্রাথমিক অবস্থা। ভালকথা, পরিষদের সদস্য-সংখ্যা সম্বন্ধে আপনার মত কি? কত হলে ভাল হয়?

সব চাপা দিয়ে হঠাৎ একটা প্রশ্ন করলেন। বুঝলাম সব এড়ায়ে যেতে চান। তাই বললাম, যা খুশী করুন। তবে মনে হয় প্রদেশে অন্ততঃ পক্ষে আড়াই শ হওয়া দরকার। কেন্দ্রেও তাই, তবে তিন শ হলে আরও ভাল হয়।

বললেন, মেলা বড় হয়ে, যাবেনা? সামাল দেওয়া কঠিন। পয়সাও অনেক খরচ হবে। আমি মনে করছি, দুই পরিষদেই দেড়শ করে সদস্য থাকবে।

বললাম, সেটা অনুচিত হবে। কোন দেশে এমন ব্যবস্থা নাই। চারশ পাঁচ কোটি লোকের দেশে আড়াই শ' হচ্ছে ন্যূনতম সংখ্যা। তা না হলে দেশ অসম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্বহীন হয়ে যাবে। যে কোন দেশের দৃষ্টান্ত দিয়ে এটা প্রমাণ করা চলে।

মাথা নাড়তে লাগলেন। আমাদের মত দরিদ্র দেশের

পক্ষে এটা বিলাসিতা হবে। অন্য দেশের নজির টেনে লাভ কি?

বুঝলাম, তর্ক করা বৃথা। বললাম, আপনি বলছেন, পরিষদ গুলিই দেশের সমস্যা সমূহের সমাধান করবে। এটা কি সম্ভব, না, কোন দেশে হয়েছে? তাদের কি ব্যবস্থা করবেন, সত্যিকার ক্ষমতা তাদের হাতে কতটুক দিবেন, না দিবেন, আপনিই জানেন। কিন্তু পরিষদের হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে দেশের সত্যিকার সমস্যার সমাধান হবে, এটা বিশ্বাসই হতে চায়না। তারপর সদস্যারা কোন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হবেনা বলে কোন রাজনৈতিক কর্মপন্থা বা নির্দেশের প্রতি তাদের কোন আনুগত্যও থাক্‌বেনা। এ অবস্থায় সেখানে বাস্তবিক কোন কাজকর্ম হবে কিনা বলা শক্ত। আপনিও ত আর সেখানে বসে বসে নির্দেশ দিতে পারবেন না।

হেসে বললেন, আপনাকেই না হয় পরিষদের লীডার বানায়ে দেব!

বললাম, অনেক ধন্যবাদ। ক্ষমতা হাতে আছে লীডার বানাতেও পারেন, বিনাশও করতে পারেন। এ অবস্থায় ঠাট্টা বিদ্রুপও করতে পারেন!

হো হো করে হেসে উঠে বললেন, আরে চটে গেলেন কেন? আপনাকে ঠাট্টা করব। আপনাকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি।

বললাম, তা করুন। আবার ধন্যবাদ। কিন্তু সমস্যার সমাধান ত হচ্ছেনা।

'তা ত হবেই না। অত সহজে ও অল্প সময়ে সমস্ত আবর্জনা জঞ্জাল কি পরিষ্কার হতে পারে নাকি? ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে। এই জন্যই ত তাড়াতাড়ি শাসনতন্ত্র দিতে চাই।'

বললাম, তাড়াতাড়ির প্রয়োজন কি? এতকাল অপেক্ষা করেছি, না হয় আরও ছয়মাস অপেক্ষা করব। দের আয়েদ, দোরস্ত আয়েদ।

'আপনার পরামর্শ কি?'

বললাম, দেশের যে অবস্থা তাতে সব কিছু সমাধা করা একলার কাজ নয়। যত গালাগালই দেন না কেন, নেতৃবৃন্দ এখনও জীবিত আছেন। তাঁরা ভুল করে থাকতে পারেন—কে না করে? কিন্তু তাঁরা খাঁটি দেশপ্রেমিক। তাঁদের ডেকে আলাপ-আলোচনা করুন। দেশেব লোকেব পূর্ণ আস্থা আছে তাঁদের উপর। তাঁদের বাদ দিয়ে কোন কিছু সফল হবে কিনা বলা যায় না।

'তাই নাকি? অবিশ্বাসের হাসি হেসে বললেন, বেশ ত তাঁদের ডাকা হবে। একবাব হট্টগোল কবে দেশ ধ্বংস করে দিতেছিল।

এবার আমি হেসে বললাম, তাই নাকি? এদের গুলি করে মারা উচিত ছিল।

বললেন, কোন কোন দেশ কিন্তু করেছে। আমি করি নাই যদিও অনেকে প্রস্তাব করেছিল।

তারা বর্বর যারা এসব করেছে। বর্বব শাসক তাই গুলি করে মানুষ মারে। করুন না আপনিও। ইতিহাসে নাম থেকে যাবে।

'আহা-হা বললামই ত আমি। গুলিব কথা ত আপনিই তুলেছেন।'

'যাক, ভুল হয়ে গেছে। যা বলছিলাম। আপনি ত হেসেই উড়ায়ে দিলেন। গুরুত্ব মোটেই দিচ্ছেন না।'

'কেন দেবনা? বলছি ত সবাইকে ডাকব। কিন্তু অযথা সময় নষ্ট হবে।'

'সময় বড় কথা নয়। সমস্যাটাই বড়।'

'বেশ ত, নাম বলুন—কাকে ডাকব পরামর্শ করার জন্য।'

বললাম, সেটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি নিশ্চয়ই সবাইকে মোটামুটি চিনে ফেলেছেন। কার কি গুণ,দোষ তা এতদিনে নিশ্চয়ই জানতে পেরেছেন। দশ, বার কিংবা পনর জনকে ডাকুন।

একটু যেন আগ্রহ দেখায়ে বললেন, কুড়ি পচিশ হলেও ক্ষতি নাই।

'জি না,। তাই ডাকুন। হয় এক সাথে সবাইকে ডাকুন না হয় দুই অংশের নেতৃবৃন্দকে আলাদা ভাবে ডাকুন। তারপর এক সাথে বসে সিদ্ধান্ত নিন। আমার বিশ্বাস মূল সমস্যাগুলির সমাধান এইভাবেই হতে পাবে। দেশেব সংহতিও দৃঢ় হবে।

'বেশ ত ভাল কথা। প্রস্তাবটি সুষ্ঠু বলে মনে হয়, ভেবে দেখি।'

বিদায় নিলাম। কিছু স্বস্তি বোধ কবলাম মনে। যদি ইনি দেশেব নেতৃবৃন্দকে এক জায়গায় একত্রিত কবে বৈঠকে মিলিত হন, তা হলে দেশের মঙ্গল অনিবার্য। নেতৃবৃন্দ গত জীবনের ভুলভ্রান্তিব বিশ্লেষণ করে পুনবায় দেশের মঙ্গল সাধনে ব্রতী হতে পারেন। সকলে একমত হলে আয়ুব খাঁ তা অগ্রাহ্য নাও কবতে পারেন। হয়ত বা গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করতে রাজী হয়ে যেতে পাবেন। দেশেব জনমত সম্পূর্ণ উপেক্ষা কববেন বলে মনে হয না।

উপহাস বিদ্রূপ তিনি করলেন। তবুও বিশ্বাস ছিল তিনি সত্যিকাব দেশেব কল্যাণকামী। পথ ভুল হতে পারে। সৈনিক মানুষ। ভেবেছেন এই পথেই দেশেব কল্যাণ সম্ভব। সবার সাথে আলাপ-আলোচনা কবলে তিনি তাঁব পথ পবিবর্তন কবতেও পারেন।

এই বিশ্বাস তখন ছিল। কিন্তু সে বিশ্বাস ভেঙ্গে গেল। কিছুদিন পরই তাঁব ইচ্ছামত শাসনতন্ত্র বচিত হল। জনসাধারণের দাবী দাওয়া আশা-আকাঙ্খাব নাম গন্ধও তাতে বইল না।

দেশের মঙ্গল, দেশের কল্যাণ, উন্নতি অগ্রগতি—এ সবের দায়িত্ব তিনি একাই গ্রহণ করেছে। অন্য কাউকে তিনি অংশীদার করতে রাজী নন। অন্য কোন পরামর্শ গ্রহণ করতে তিনি রাজী হতে পারেন না। এ বিষয় চিন্তা করারও অধিকার অন্য কারুরই নাই। দায়িত্বও তাঁর।

কুড়ি

রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, তাদের উপর লাঞ্ছনা নির্যাতন অব্যাহত রাখা হয়। নেতা ও কর্মীরা নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

সরকারী মহল এই সুযোগে পুনরায় রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে নতুন ধরণের অভিযোগ শুরু করল। কোথায় গেল সব নেতার দল? তাঁদের বক্তৃতা থেমে গেল? আয়ুব খাঁর ভয়ে তাঁরা ঘরের কোণে ঠাঁই নিয়েছেন?

নেতা সোহরাওয়ার্দী মাঝে মাঝে ঢাকা যাতায়াত করেন। হাইকোর্টে মামলা পরিচালনা করেন। কিন্তু যে কয়দিন এখানে থাকেন তাঁর পেছনে কেউ লেগেই থাকে—টিকটিকি। একটা জীপ গাড়ী চব্বিশ ঘণ্টা মোতায়েন। যেখানেই যান পেছনে ছোটে।

বাষট্টি সালের জানুয়ারী মাসে একবার ঢাকা এলেন। রাজনৈতিক আবহাওয়া আবার তখন গরম হতে শুরু করেছে। মার্চ মাসে শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করা হবে। এপ্রিল মাসে ইলেকশন। জুন মাসে মার্শাল ল' উঠে যাবে। সঙ্গে সঙ্গেই পরিষদের বৈঠক।

নেতা প্রস্তাব করলেন, সবাইকে নিয়ে একটা বৈঠক করার। আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করা দরকার।

চব্বিশে জানুয়ারী রাত্রিকালে আমার বাড়ীতে বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সব দলের নেতৃবৃন্দই উপস্থিত হলেন: আবু হুসেন সরকার, হামিদুল হক চৌধুরী, শেখ মুজিবর রহমান, মাহমুদ আলি, নান্না মিঞা, মাণিক মিঞা প্রভৃতি। নূরুল আমিন ঢাকা ছিলেন না। মোহন মিঞা তাঁর মতামতের দায়িত্ব নিলেন।

নেতা বললেন, দেশে রাজনীতি নাই—রাজনৈতিক দলও নাই। এ অবস্থায় সকলে একসাথে মিলেমিশে করা ছাড়া

উপায় নাই। দলাদলি কোন্দল বিগত জীবনের হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে যদি আমরা একত্রে একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারি তা'লে এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে আমরা পথের সন্ধান পাব। যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে কোন ব্যক্তি গোষ্ঠি বা দল একক ভাবে কিছুই করতে পারবে না।

সবাই স্বীকার করলেন, আমাদের তথা দেশের মুক্তির আর দ্বিতীয় কোন পথ নাই।

সোহরাওয়ার্দী বললেন, আগামী নির্বাচনে আমাদের অংশ-গ্রহণ করা উচিত। ভেতরে ও বাইরে আমাদের সংগ্রাম চালাতে হবে। বেছে বেছে ভাল লোক আমরা দাঁড় করাব। আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শে যারা বিশ্বাসী তাদেরই আমরা মনোনীত করব।

কিন্তু প্রশ্ন হল, কেমন করে আমাদের মতবাদ ও আদর্শ প্রচার করা যায়? পত্র-পত্রিকার মারফত সম্ভব নয়। দলগত প্রচার নিষিদ্ধ। এমন কি নির্দলীয় হলেও। ব্যক্তিগত বিবৃতিরও সেই অবস্থা। সরকারের মনঃপুত না হলে তা' ছাপাতে দেবে না। উপায় কি?

সোহরাওয়ার্দী বললেন, উপায় বার করতেই হবে। হাত পা গুটায়ে চুপ করে বসে থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তা হলে মৃত্যু অনিবার্য। শরিয়তের পথ যদি বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে আমরা মারফতের তরিকায় চলব। কিন্তু চলতেই হবে। লোক মারফত আমাদের উদ্দেশ্য ও মতবাদ ঘরে ঘরে পৌঁছাবার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রত্যেক জেলা মহকুমায় কমিটি গঠন করতে হবে। অত্যন্ত সংগোপনে। তারাই নিম্নস্তরে প্রচার করার দায়িত্ব নেবে। কে আমাদের মনোনীত প্রার্থী, কি উদ্দেশ্যে নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি, এ সব খবর সবার কানে পৌঁছায়ে দেওয়া খুব কঠিন হবে না। সময়ের প্রয়োজন। সেই জন্য এখন থেকেই কাজে লেগে যেতে হবে এবং বিভিন্ন স্থানে লোক পাঠাতে

হবে। সবাই রাজী এই প্রস্তাবে। খুব আগ্রহের সাথে সবাই বলল, যে ভাবেই হোক এই উদ্দেশ্য সফল করতে হবে।

নেতা বললেন, সবচেয়ে বড় কথা এবং যেটা সর্বপ্রথমে প্রচার করা দরকার, সেটা হচ্ছে, আমাদের ভেতরে দলগত পার্থক্য নাই। সব দল বিলুপ্ত। দলহীন দল নিয়ে আমরা কাজে অগ্রসর হব।

হামিদুল হক বললেন, দল সত্যি সত্যি নাই-ই ত। আয়ুব খাঁ আইনের বলে সব দল বিলোপ করে দিয়েছেন।

সোহরাওয়ার্দী বললেন, ওটা আমরা স্বীকার করব কেন? তাঁর কি অধিকার? আমরা নিজেরা যদি দেশের কল্যাণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দল বিলুপ্তির কথা ঘোষণা করি, তা হলে মানুষের মনে অভূতপূর্ব প্রেরণা জেগে উঠবে।

সবাই খুব উৎসাহিত হল। আমি ত উৎসাহের আতিশয্যে দাঁড়ায়ে পড়লাম। আবেগ দমন করতে না পেরে বক্তৃতাই দিয়ে ফেললাম: স্যার, যদি এটা করতে পারি, তা হলে দেশে সত্যিকার বিপ্লব হয়ে যাবে। মানুষ সব দাঁড়ায়ে যাবে আমাদের সাথে এক কাতারে। একটা অখণ্ড শক্তি আমরা স্থাপন করতে পারব। গোটা জাতির ঐক্য। মানুষ দেখেছে আমাদের কোন্দল কোলাহল। হতাশ হয়ে পড়েছে। তাদের হতাশার অবসান হবে। আবার আশায় বুক ফুলে উঠবে। তাদের মনে প্রধান এক অদম্য উৎসাহ উন্মাদনার বাণ ডেকে যাবে। এই বিশ্বাস, এই ঐক্যই আমাদের লক্ষ্য পথের সীমান্তে পৌঁছে দেবে।

একটা বিবৃতির মারফত দল-বিলুপ্তির ঘোষণা করার কথা কেউ কেউ প্রস্তাব করলেন, কিন্তু বিবেচনা করে-দেখা গেল সেটাও সম্ভবপর হবে না।

সোহরাওয়ার্দী বললেন, তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন দলের নেতাদের সঙ্গে মোটামোটি আলোচনা করেছেন। আবার

গিয়ে তাঁদের সাথে এই ধারায় আলোচনা করে কর্মপন্থার একটা খসড়া তৈয়ার করে ওদের দস্তখত নিয়ে নিবেন। তারপর এখানে ফিরে এসে বাস্তব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। এই প্রসঙ্গে একটা খসড়া পরিকল্পনার মুসাবিদা তিনি করবেন এবং হামিদুল হক চৌধুরীকেও একটা লেখার জন্য অনুরোধ করলেন।

রাত বারটায় সবাই বিদায় নিলেন। নেতা সকলের শেষে। টিকটিকির হাত এড়ায়ে এক ফাঁকে একটা অচেনা গাড়ীতে চলে এসেছিলেন। তাই, যাবার সময়ও পায়ে হেঁটে বার হয়ে গেলেন অনেক দূর। তারপর হয়ত গাড়ীতে উঠলেন।

দুইদিন পর কোন এক অভ্যর্থনা সভায় দেখা নেতার সাথে। একবার আঁত কাছে এসে চুপিচুপি বললেন, লিখে ফেলেছি। ভালই হয়েছে। তোমরা দেখলে খুশী হবে।

বললাম, আপনি মন দিয়ে লিখলে নিশ্চয়ই ভাল হবার কথা।

'না হে না—সব সময় হয়ে উঠেনা। তবে এবার সত্যি এখন যদি কাজ করতে পার তা হলে দেখাবে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

পরদিন করাচী চলে যাবেন। ওখান থেকে লাহোর যাবেন। সাতদিন পর ফিরে আসবেন। লেখাটা মাণিক মিঞার কাছে রেখে গেলেন বললেন। সাতদিন পর আর ফেরা হল না।

এখান থেকে যাওয়ার পর তিরিশে জানুয়ারী তিনি গ্রেফতার হলেন। বিনা বিচারে তাঁকে জেলে আটক করা হল।

সারা দেশে স্তম্ভিত হয়ে গেল। ঘটনার আকস্মিকতায় ও হঠকারিতায় আমরা বিমূঢ় হয়ে গেলাম। জনগণের অবিসংবাদিত নেতা—পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা, গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী, এই বৃদ্ধ বয়সে স্বৈরাচারী শাসকের নির্দেশে কারাবরণ করতে বাধ্য হলেন? কোন দোষে?

যে আশার আলো আমাদের চোখের সামনে জ্বলে উঠেছিল মাত্র কয়েকটি দিন আগে, তা দপ করে নিভে গেল। চারদিক যেন

আচ্ছন্ন হয়ে গেল। অন্ধকার নেমে এল রাজনৈতিক আকাশে। আমাদের সংগ্রাম কি বন্ধ হয়ে গেল?

কিন্তু সংগ্রাম যে শুরুই হয় নাই। শুধু পাঁয়তারা চলছিল। প্রস্তুতির পক্ষে দুই একটি পদক্ষেপ মাত্র। আয়ুব সরকার অঙ্কুরেই বিনাশ করে দিল। এই সংগ্রাম কবে শুরু হবে—হবেই কিনা তা কে বলতে পারে?

দেশের জনমতের বিরুদ্ধে একটা শাসনতন্ত্র দেশে চাপায়ে দেওয়া হবে। দেশের মানুষ এটা গ্রহণ করতে রাজী নয়। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। আন্দোলন শুরু হবে এই জবরদস্তীর বিরুদ্ধে। সোহরাওয়ার্দী এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন। তিনি গণতন্ত্রকামী মানুষের আশা-আকাঙ্খার প্রতীক। গণ-বিরোধী শাসন ও শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য সারা দেশ তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াবে। এই আন্দোলন দমন করা সরকারের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়বে। এই ভয়ে তাঁকে বিনা বিচারে বন্দী করা হল। তাঁকে বন্দী করলে দেশ নিঃস্তব্ধ হয়ে যাবে, শাসকবর্গ এই ধারণাই করেছিল।

কিন্তু তা কি হয়? মানুষকে ক্ষণেকের তরে আণবিক শক্তি প্রয়োগে দমন করে রাখা যেতে পারে। কিন্তু চিরদিনের জন্য সেটা সম্ভব নয়। কোন দেশেই তা হয় নাই।

ঘরে ঘরে প্রতিবাদ উঠল এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে। বাইরে প্রকাশ করা সম্ভব না হলেও মানুষের অন্তর উত্তপ্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। এই হঠকারিতার জবাব দেবার জন্য সবাই প্রস্তুত হতে লাগল।

ছাত্রসমাজ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তাদের উপর জুলুম অত্যাচার চলেছে নির্বিবাদে। তারাও প্রতিবাদ করেছে কিন্তু নির্যাতন অব্যাহত হয়েছে। কাঁহাতক আর বরদাশত করা যায়? সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করায় তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে

পড়ল। তাদের বিক্ষোভ প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মত ফেটে পড়ল। প্রদেশ ব্যাপী মিছিল, বিক্ষোভ প্রদর্শন প্রতিবাদ সভা করে তারা সরকারকে জানায়ে দিল তাদের গণ-বিরোধী কার্য্যকলাপ ও নেতৃবৃন্দের অপমান নির্যাতন দেশবাসী সহ্য করতে রাজী নয়।

সরকারও আইনশৃঙ্খলার নামে লাঠিচার্জ, টিয়ারগ্যাস প্রয়োগ ও গ্রেফতার করে তার জবাব দিল। কিন্তু আন্দোলন থামে নাই—

একুশ

সোহরাওয়ার্দীকে বন্দী করার পর পরই আয়ুব খাঁ এলেন, পূর্বাঞ্চলে গ্রেফতারের প্রতিক্রিয়া স্বচক্ষে দেখতে এলেন। এসেই আমাকে ডাক্‌লেন। যাবার প্রবৃত্তি ছিলনা। মাণিক মিয়া ও আবুল মনসুর বললেন, যাওয়া উচিত। দেখুন, কি বলে।

আয়ুব খাঁ আজম খাঁকে নিয়ে বাইরে বেড়াতে গিয়েছিলেন। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ফিরে এলেন। আজম খাঁ বিদায় নিতে চাইলেন, আয়ুব খাঁ নিষেধ করলেন। আমাদের দু'জনকে বসায়ে আয়ুব খাঁ ইনজেকশন নিতে চলে গেলেন ভেতরে। ডাক্তার অপেক্ষা করছিল।

এই ফাঁকে আজম খাঁকে জিজ্ঞাস করলাম, শেষ পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার না করে ছাড়লেন না?

অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্তে বললেন, ভাইসাব এর বিন্দুবিসর্গও আমি জানি না। খবরের কাগজে প্রথম দেখলাম।

বললাম, যে-ই করে থাকুক, কাজটা যে গর্হিত, তা বুঝতে পারছেন ত?

'নিশ্চয়ই। স্বগত বলতে লাগলেন, কার প্ররোচনায় করলেন ইনি? না, নিজেরই দায়িত্ব? সন্দেহ হচ্ছে, জাকিরের হাত

আছে। ভুট্টোও তাল দিতে পারে। আল্লাহ মালুম। কিন্তু, যেই পরামর্শ দিক না কেন, কাজটা নেহাত জঘন্য এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিশ্বাস করুণ, আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

আয়ুব খাঁ এসে পড়লেন। মুখে হাসি কিন্তু ম্লান। অপরাধীর মুখের হাসি। বসেই বললেন, ক্যা হাল চাল, খাঁ সাহেব?

আমিও হাসবার চেষ্টা করে বললাম, হাল ত ছিল ভালই। কিন্তু আপনার চালে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি।

হো হো করে হেসে উঠলেন। আজম খাঁর দিকে চেয়ে বললেন, খান সাহেব ত বেশ রসিক মানুষ বলে মনে হয়।

বললাম রস আর রইল কোথায়? তাই অগত্যা রসিকতা করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছি। শুধু ভাবছি, এর পর কি করবেন!

'কেন, ব্যাপার কি? কি হয়েছে?

বললাম, কি হয় নাই? শেষ পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দীকে বন্দী করলেন? কি দোষ করেছিলেন তিনি?

'ও—এই ব্যাপার? তা কি করব, উপায় ছিলনা। তিনি না করছেন কি? দেশের দুশমনী করেছেন। দেশকে ধ্বংসের মুখে নিবার চেষ্টা করেছেন। কওম কা দুশমন!

'বটে? অদ্ভুত আবিষ্কার! কেমন করে টের পেলেন এতদিন পরে? যে কওম তিনি সৃষ্টি করলেন, সেই কওমের তিনি দুশমন হলেন? আপনাদের গবেষণা মাহাত্ম্য। তা হলে আমরা সবাই কওমের দুশমন! আমাদেরও আটক রেখে দিন। নিশ্চিন্তমনে কওমের সেবা করুন।'

'দেখুন, অত উত্তেজিত হবেন না। আমাদের কাছে ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। আমার দফতরে এই উচাঁ— হাত প্রায় হাতখানেক উঠায়ে উচ্চতার পরিমাণ দেখালেন—'দলিল দস্তাবেজ জমা আছে। শুধু শুধু বলছি?'

হেসে ফেললাম। বললাম, এ সব কাগজ পত্র নিশ্চয়ই গোয়েন্দা বিভাগ কারও ইঙ্গিতে সৃষ্টি করেছে। বিরোধী দলে থাকা কালে আমাদের সম্বন্ধে যে সব বিরাট দলিলের স্তূপ সৃষ্টি করেছিল, মন্ত্রী হয়ে সে সব পরবর্তী কালে ঘেঁটে দেখেছি। নিছক কল্পনা। গাঁজা। অলীক ভিত্তিহীন গুজবের উপর নির্ভর করে বিশাল ইতিহাস রচনা করেছে। কবি সাহিত্যিকের কল্পনাও এদের কাছে হার মেনে যাবে। কিন্তু সবাই রাবিশ। এক বর্ণও সত্য নয়। ধ্বংসস্তূপে নিক্ষেপ করার যোগ্য।

'অল রাবিশ?' তীব্র কণ্ঠে জিজ্ঞাস করলেন।

'জি, হাঁ, অলমোষ্ট অল।'

'তা হলে সরকার চালাতেন কেমন করে?'

বললাম, আই-বি গোয়েন্দার রিপোর্টের উপর নির্ভর করে সরকার পরিচালনা করার দুর্ভাগ্য আমার হয় নাই। নিজেদের অভিজ্ঞতা, সীমাবদ্ধ জ্ঞানবুদ্ধি, আর বিবেকের উপর নির্ভর করেই কাজ করতে হয়েছে।

'আশ্চর্য!' তারপর চক্ষু বন্ধ করে প্রায় অস্ফুটকণ্ঠে বললেন, আচ্ছা, বেশ। এ সব না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু কমনওয়েলথ কনফারেন্সের সময় লণ্ডন গিয়ে যা শুনলাম, তা ত আর রাবিশ বলে মনে করতে পারেন না। সে সব শুনলে কানে আঙ্গুল দিতে হয়।

বললাম, তা দিন। শেষ পর্যন্ত দেশ ছেড়ে বিদেশে গেলেন? কিন্তু কি সব শুনলেন? কার কাছে?

'বলেছেন ম্যাকমিলান সাহেব' বলেই থেমে গেলেন। ঢোক গিলে বললেন, আপনার নেতা, তাঁর গোপন কথা আপনাকে বলতে লজ্জা বোধ হয়। মাফ করবেন। আপনার বিশ্বাস হচ্ছেনা বলেই এটা বলতে বাধ্য হচ্ছি। ম্যাকমিলান বললেন, যে দেশের প্রধানমন্ত্রীর চরিত্র এই ধরণের সে দেশের ভবিষ্যৎ

কি হতে পারে? গড সেভ দি কান্ট্রি। লণ্ডনে থাকাকালে একদিন গভীর রাতে রক্ষীদলকে ফাঁকি দিয়ে পালায়ে গেলেন—প্যারিস। সেখানে কার কাছে টাকা পাওয়া ছিল, তা আদায় করলেন, আর ঘণ্টা দু'একের মধ্যে টাকাটা উড়ায়েও দিলেন,। যে পথে উপার্জন সেই পথে অপচয়। তার পর ফিরে এলেন লণ্ডনে। এদিকে আমরা তাঁকে খুঁজে হয়রান। রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম।

বললাম, কে এই ম্যাকমিলান লোকটি?

মুখ ব্যাদান করে বললেন, তাও জানেন না? বৃটিশ প্রাইম মিনিষ্টার!

হেসে বললাম, তা কি আর জানিনা? কথা তা নয়। কথা হচ্ছে, আপনারা ওদের কথা বিশ্বাস করতে অভ্যস্ত বহুকাল থেকে। আমরা তা করিনা। কিন্তু বৃটিশ মোটামুটি রক্ষণশীল ও নিয়মতান্ত্রিক জাত। ওরা এ সব আলোচনা করেন। তবে কি আপনাদের সোহবতে তাদের চরিত্রও বদলে গেল?

প্রায় চীৎকার করে উঠলেন, বলেন কি? উনি মিথ্যা গল্প বানায়ে বলবেন?

বলালাম, অসম্ভব কি? সাধারণতঃ সৎ ও ভদ্র হলেও নিজের স্বার্থের ব্যাপারে ওরা অনেক নীচে নেমে যায়। ন্যায়নীতির প্রশ্ন অবান্তর।

বেশ উষ্মা প্রকাশ করে বললেন, এখানে কি স্বার্থ আছে?

'একেবারে নিষ্কাম নিঃস্বার্থে তাও বলা চলেনা। সোহ্‌রাওয়ার্দীসহ সমস্ত রাজনীতিক এখন আপনার শ্যাণদৃষ্টিতে পড়ে আছে। তাঁদের সম্বন্ধে নিন্দাসূচক উক্তি কেউ করলে আপনি খুশী হবেন, এটা তারা বোঝেন। ম্যাকমিলান নিজে ঘটনা দেখেন নাই। লণ্ডন থেকে প্যারিস যাওয়া সত্য হতে পারে। বাকীটা কল্পনায় পূরণ করে দিলেন। অথচ এই ম্যাকমিলান

সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রীত্বের আমলে কতই না তাঁকে প্রশংসা করেছেন।

'অল নন্সেন্স। ম্যাকমিলানের মত লোক মিথ্যা গল্প বানায়ে বলতে পারেন না।'

'ভাল কথা! আপনি বিশ্বাস করেছেন, এই যথেষ্ট। আমার মনে আছে সাতান্ন সালে আপনি ঢাকা এসে আমার সাথে দেখা করে সোহরাওয়ার্দীর প্রশংসা করেছিলেন। বলেছিলেন, সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের সর্বোত্তম প্রধান মন্ত্রী। আরও বলেছিলেন, এর আগে তাঁর বিরুদ্ধে অনেক কথা শুনেছিলেন কিন্তু সে সব মিথ্যা। আজ আবার সেই জাতীয় মিথ্যা গল্পের উপর নির্ভর করে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। এ সব কেরামতি আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত।'

একটু বেকায়দায় পড়লেন। বললেন, যাক্, এ সব পুরাতন কথা উঠায়ে কি লাভ? আপনি এমন সুরে কথা বললেন যে কোন আলাপ আলোচনা করাই সম্ভব হয়না। কাউকে বিশ্বাস করতে চাননা। ভাল কথা, যার জন্য ডেকেছি। আমরা একটা কনাষ্টিটিউশান তৈয়ার করেছি। আগামী মার্চ মাসে ঘোষণা করতে হবে। জুন মাস থেকে চালু করা হবে।

বললাম, দেশের লোক কিন্তু এই শাসনতন্ত্র মানবে বলে মনে হয় না।

চক্ষু বিস্ফারিত করে চললেন, আপনিই ত আর দেশ নন।

'তা ত নই-ই। কিন্তু দেশের খবর হালহকিকত মানুষের মতামত মোটামুটি জানি।'

'আমি ও আমরাও জানি।'

'হয়ত জানেন। হয়ত জানেন না। কিংবা জানলেও মানুষের মতামত বড় একটা গ্রাহ্য করেন না। কতগুলি দালালের মুখের কথাই বিশ্বাস করেন।'

'মতামত কি?' প্রায় ধমক দিয়েই বললেন, যা তা বললেই

মানতে হবে নাকি? তাকেই কি মতামত বলে নাকি? এরই উপর বিশ্বাস করে নির্ভর করে আপনারা দেশ ডুবায়ে দিয়েছেন।

বললাম, দেশ ডুবে নাই—ডুবতে পারেনা। ডুবেছি আমরা এবং আপনার অনুগ্রহে। যাক্ সে কথা, গতবার আপনার সাথে আলাপ আলোচনা করেছিলাম। শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব আপনার খেদমতে পেশ করেছিলাম। আপনি বিবেচনা করে দেখবেন বলে আশ্বাসও দিয়েছিলেন। বোধ হয় ভুলে গিয়েছিলেন।

'কি ব্যাপার? ঠিক মনে পড়েনা!'

বলেছিলাম, একটা গোলটেবিল বৈঠকে দেশের নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ আলোচনা করে—

বাধা দিয়ে বললেন, ও, সেই কথা? তা কি শাসনতন্ত্র? যতদূর মনে পড়ে, আর্থনীতিক সমস্যা সম্বন্ধে সকলের সাথে বসে আলোচনার কথা বলেছিলেন।

বললাম, আপনি অবাক করে দিলেন। এত কথা হল। সবই শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে। আপনি বলেছিলেন, প্রস্তাবটি সুষ্ঠু মনে হয়। সব ভুলে গেলেন?

'না—ঠিক তা নয়। আমার ধারণা ছিল অন্য ব্যাপারে প্রস্তাব করেছিলেন। সে যাই হোক, এত হাঙ্গামা করে লাভ কি? শুধু সময় নষ্ট। নেতারা কখনও একমত হতে পারবেনা। তার চেয়ে যে কনষ্টিটিউশন দিচ্ছি এটাকে কার্যকরী করার চেষ্টা করুন। সব সমস্যার সমাধান ওতেই আছে।'

বললাম, যত সহজ বলছেন, আসলে অত সহজ নয়। সমস্যার সমাধান করা অতি কঠিন কাজ। তবে সার্বিক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আপনার হাতে। ইচ্ছা করলে সে ক্ষমতা প্রয়োগ করে যে কোন ব্যবস্থা কার্যকরী করতে পারবেন। কিন্তু তাতে দেশের মঙ্গল হবে ত?

বললেন, দেখুন, আপনাদের একটা বদঅভ্যাস। কোন কিছু ভাল করে না দেখেই তার বিরুদ্ধে মতামত ঠিক করে বসে থাকেন। নিরক্ষেপ দৃষ্টিতে কোন কিছু বিচার করতে চান না।

কোনটা ভাল কোনটা মন্দ নির্ভর করে ফলাফলের উপর। ফলাফল হচ্ছে দেশের কল্যাণ। দেশের দুর্ভাগ্য আটবছর ধরে চেষ্টা চরিত্র করে একটা শাসনতন্ত্র তৈরী হল—দোষত্রুটি যে তাতে ছিলনা তা বলা যায়না, কিন্তু গণতান্ত্রিক পন্থায়ই সে সব দূর হয়ে যেত। কিন্তু সে শাসনতন্ত্র পুরাপুরি কার্যকরী করার আগেই বাতিল করে দিলেন। ভালমন্দ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগও দিলেন না। এখন আপনি দিচ্ছেন আবার নয়া ধরণের একটা। অন্য কেউ এটা যে বাতিল করে দেবেনা তা'ও জোর করে বলা যায়না। এই ভাবে চলতে থাকলে এর শেষ কোথায় হবে? কেন গ্রহণযোগ্য হবে না, এ প্রশ্ন জিজ্ঞাস করতে পারেন। আমরা পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। ওটা দেখেছি, বুঝেছি,। দুই অংশের ভৌগলিক দূরত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রথা অপরিহার্য। প্রেসিডেন্সিয়াল প্রথা এই দেশে মঙ্গলজনক হতে পারে না। যদি এই বিভাগ ও দূরত্ব না থাক্‌ত, তা হলে প্রেসিডেন্সিয়াল প্রথায় আপত্তি করার কোন কারণ ছিলনা, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় ঐ প্রথা চালু করলে পূর্ব-পাকিস্তান একটা কলোনীতে পরিণত হতে বাধ্য।

চীৎকার করে উঠলেন, কলোনী, কলোনী। কান ঝালাপালা হয়ে গেছে ঐ কথা শুনে শুনে। কলোনী মানে কি?

বললাম, শান্ত হোন। কলোনী মানে কলোনী। সংজ্ঞা অনেক আছে। বর্তমান প্রসঙ্গে এক কথায় গণতন্ত্র-বিরোধী শাসন ব্যবস্থা, যা উপর থেকে চাপায়ে দেওয়া হয়। কোন একটি রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ক্ষমতার আজ্ঞাধীন জনপদ। শোষণের লীলাভূমি। তার স্বাধীনতা নাই। নিজস্ব সত্তা বলতে কিছুই নাই। হুকুমের

তাবেদার। আইন কানুন শাসনব্যবস্থা তার নাগালের বাইরে। এই হচ্ছে কলোনীর মোটামুটি রূপ। আর পক্ষান্তরে, দেশের মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সর্ব ক্ষমতার অধিকারী হয়ে দেশ শাসনের ভার যদি গ্রহণ করে তা হলে সেটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয়।

বললেন, আশ্চর্য কথা! এই দেশ দেশীয় লোকেরা চালাচ্ছেনা তবে কে চালাচ্ছে? প্রেসিডেন্ট, গবর্ণর, কর্মচারী সবই ত দেশীয়। এরাই ত দেশের প্রতিনিধিত্ব করে।

হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু দমন করে বললাম, আপনি আপনার গবর্ণর, আপনার কর্মচারী সবই দেশী। কিন্তু তারা কি প্রতিনিধি? কে তাদের নির্বাচন করেছে?

হাত নেড়ে বললেন, তারা প্রতিনিধি নয় ত কি? নির্বাচিত না হলে বুঝি আর প্রতিনিধিত্ব করা চলেনা? তাদেরই পরিচালিত রীতিমত দুটি গবর্ণমেন্ট দুই অংশে বিদ্যমান আছে।

বললাম, তা ত আছেই। কিন্তু তাদের কি গবর্ণমেন্ট বলা চলে? তারা ত ঘানি টানে। তার প্রশাসনব্যবস্থা অর্থাৎ অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন। আপনার কনষ্টিটিউশনে তাদের ক্ষমতাই বা কি রেখেছেন? স্বাধীন মত বা পলিসি নির্ধারণ করার ক্ষমতা তার কি আছে? মন্ত্রীরা ক্ষমতাহীন সাক্ষীগোপাল। তাও আবার আপনার মত ছাড়া নিযুক্ত করার উপায় নাই। আইন-পরিষদ রাবার-ষ্ট্যাম্প। সেখানে তর্কবিবাদ বাদানুবাদ চলতে পারবে। কিন্তু তারাই বা প্রতিনিধিত্বের দাবীর কতটুকু পালন করতে পারবে।

কণ্ঠস্বর ঈষৎ উত্তপ্ত। বললেন, তা হলে কেন্দ্রীয় সরকার বা শক্তি বলে কোন পদার্থ থাকবে না বলতে চান? দেশ চলতে পারে এই ব্যবস্থায়?

বললাম, পারে। কারণ, কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিহীন করার প্রশ্নই উঠে না। তাই বলে তার এমন ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার পক্ষপাতী আমি নই, যার প্রতাপে তার অংশ বা য়ুনিটের

ক্ষমতা বলতে কিছুই থাকবে না। য়ুনিটের শক্তিই কেন্দ্রের শক্তি। য়ুনিটই কেন্দ্রের শক্তির উৎস। য়ুনিটকে দুর্বল করলে কেন্দ্রও দুর্বল হতে বাধ্য।

একটু থেকে বললাম, এই ছিল লাহোর প্রস্তাবের মূল কথা। সেই জন্যই ত লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করার জোর দাবী উঠেছে।

দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, লাহোর প্রস্তাব! ওটা কি হাতী নাকি? ওটা কি ছিল মনে করেন? ওটা ছিল রাজনৈতিক দলের চরম দাবী—বিদেশী সরকারের কাছে। একটা ষ্টাণ্ট বা ভাঁওতাও বলতে পারেন। কেউ কি ভেবেছিল ঐ প্রস্তাবের ভিত্তিতে সত্যি সত্যি পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়ে যাবে? কোন্ বোকারা পাশ করেছিল ঐ প্রস্তাব? হু ওয়্যার দি ফুল্‌স্, হু মেইড দি রিজুলিউশান?

বলে কি? রাগের মাথায় এমন কথাও লোকে বলে?

উত্তর দিলাম, জিন্নাহ্, লিয়াকত, ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী প্রভৃতি বড় বড় বোকারা পাশ করেছিলেন, আর আমরা ছোট ছোট বোকারা তা বিশ্বাস করেছিলাম।

সম্বিৎ ফিরে পেলেন। বললেন, না, না, আমি কি তাই বল্‌ছি নাকি? কাউকে বোকা বলতে যাব কেন? বলেছি, ওটা অমনিই হয়েছিল, যেমন রাজনৈতিক দলের দু'শতটা প্রস্তাব পাশ হয়ে থাকে। অবস্থার পরিবর্তনে ঐ প্রস্তাবের এমন কোন মূল্যই নাই। ওটা ছেড়ে দিন।

বল্‌লাম, তাহ'লে বাঁচালেন। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান হয়েছিল বলে আমাদের বিশ্বাস। ওটা ছেড়ে দিলে ভিত্তিই ভেঙ্গে পড়ে। আপনি পিণ্ডির আর আমি ঢাকার। কোন যোগসূত্র নাই, কোন বন্ধন নাই। এক দেশও আর বল্‌তে পারেন না।

'কেন পারবনা? আপনি একটা কদর্থ করলেই কেউ মেনে নিবে নাকি সেটা? বলে দিলেন, আমি পিণ্ডি আর আপনি ঢাকা!'

বললাম, আপনি রাগ করতে পারেন। কিন্তু মনের কথা বলতে গেলে সত্যি কথাই বলতে হয়। এই লাহোর প্রস্তাব কার্যকরী না কবার দরুণ পাকিস্তানের বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের অশেষ দুর্গতি হয়েছে। দেশে নেতৃবৃন্দের কোন্দল, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে রেষারেষি, সবই এক কারণে।

এক অংশ ফেঁপে উঠছে আর অন্য অংশ হাড্ডিসার হচ্ছে ঐ সকল কারণে। বলেছিলাম, পূব পাকিস্তান কলোনীর পর্যায়ে এসে পড়েছে—কলোনী নাম শুনলে অবশ্য আপনি চটে যান। কিন্তু লাহোরেব প্রস্তাবের প্রতি উপেক্ষাই এই ভুখণ্ডকে কলোনীর স্তরে পরিণত করেছে। আব আপনার নব বিধানে ওটা পাকাপাকি করতে চান।

'বলেন কি? আমি ত আপনাদের সব দাবী-দাওয়া মেনে নিয়েছি। বৈষম্য দুর করাব জন্য কত টাকা অতিরিক্ত দিয়েছি তার খবর রাখেন? ফি বছর পঞ্চাশ থেকে ষাট কোটি। দরকার হলে আরও দেব। এর পরও বলবেন কলোনী?

'বলব, সেই জন্যই বেশী করে বলব। আপনি দিচ্ছেন আমরা নিচ্ছি। আপনি দাতা আমরা গ্রহীতা—এই ত সম্পর্ক? এর বেশী নয়। কলোনী আর কাকে বলে? অথচ উভয়ে সমান অংশীদার হিসাবে পাকিস্তানের বুনিয়াদ রচনা করা হয়েছিল? কেউ বড় কেউ ছোট, কেউ দাতা কেউ গ্রহীতা, একে অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে এই ভিত্তিতে নিশ্চয়ই পাকিস্তান সৃষ্টি করা হয় নাই। ভৌগলিক দূরত্বের সুযোগে বা অন্য কোন কারণে কেউ কারও প্রতি অবিচার করবে না, এই ছিল মূল নীতি। কোথায় গেল সে সব অঙ্গীকার আশ্বাস?

আমরা সংখ্যায় অনেক বেশী বলে সংখ্যানুপাতে সব কিছুরই অর্ধেক অংশ দাবী করতে পারি। কিন্তু করি নাই। এই দাবী পশ্চিম পাকিস্তানীদের মনে আতঙ্ক বা সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে, এই ভেবে আমরা স্বেচ্ছায় প্যারিটি স্বীকার করে নিয়েছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাও কাগজে কলমে রয়ে গেছে! খুব জোর পরিষদে সদস্য সংখ্যার বেলায় ঠিক রাখা হয়েছে। কারণ ওটা ওদিকের পক্ষে সুবিধাজনক। আর্থনীতিক ডিসপ্যারিটি পূর্ব-পাকিস্তানকে পঙ্গু করে দিয়েছে। বৈষম্য দূর করার ওয়াদা ও মুদ্দতও নির্দিষ্ট করা হচ্ছে, কিন্তু দূর করার পন্থা আজ পর্যন্ত গ্রহণ করা হয় নাই।

টাকার কথা বলছেন? আমাদের আমলে—বিশেষ করে আমি ক্ষমতাশীল থাকা কালে কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় সত্তর কোটি দুই বছরে ধার্য করেছিল পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য। প্রায় সবই অবশ্য ঋণ হিসাবে। খরচও হয়েছিল ঠিকঠিক। দেশে যা কিছু দেখছেন, এ সবই রাজনীতিক সরকারের আমলেই হয়েছিল। আপনারা বড় একটা কিছু করেন নাই।

চোখ বুজে এতক্ষণ শুনছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, কিছুই না?

বললাম, তেমন ত নজরে পড়েনা। আমাদের আবদ্ধ কাজ সম্পন্ন করে আপনারা বাহবা নিচ্ছেন। অবশ্য মৌলিক গণতন্ত্রীদেব জন্য যে টাকা ধার্য করেছেন তা দিয়ে যে সমস্ত কাজ হচ্ছে তা ত ফওজুল—স্রেফ অপচয়। আপনি যে পঞ্চাশ ষাট কোটি দিচ্ছেন প্রতি বছর, এটাও ত মঙ্গলজনক নয়। পাঁচ দশ বছর পরে প্রতি বছর যে দু' তিন শ' কোটি বার হয়ে যাবে—আমরা হয়ত টেরও পাবনা। ঐ টাকা এই দেশের মানুষের পেটে যাবে না। যাবে বাইরে, আর মোটা হবে পুঁজিপতি শিল্পপতির দল।

অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, কি বলতে চান, বুঝতে পারছিনা।

'খুব সোজা কথা। দেওয়া নেওয়ার ব্যাপার। আপনারা

দান আমার গ্রহণ। আমি ত বলতে পারছিনা, আমার এত দরকার, নিয়ে নিলাম।'

'বললেই হয়।'

'জি না' হয় না। কে মানবে আমার কথা? কোন ক্ষমতা আছে আমার হাতে—রাজনীতিকদের কাছে? সরকার পরিচালনায় কোন সংযোগ আছে আমাদের সাথে? সব চাবিকাঠি আপনার হাতে।'

'এত করার পরও এ সব কথা বলা চরম অকৃতজ্ঞতার লক্ষণ। আপনাদের কেউ সন্তুষ্ট করতে পারবেনা।'

বসলাম, বড় একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। ডকটর বি. আর, মুঞ্জে লণ্ডন গিয়েছিলেন রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে। বৃটিশকে নানাভাবে অপবাদ দিলেন। উত্তরে এক মুখপাত্র বললেন, আপনারা বড় অকৃতজ্ঞ! কি না করেছি আমরা আপনাদের জন্য? জঙ্গল থেকে বার করে আলোতে এনেছি। আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার সমস্ত উপাদান আপনাদের দেশে পাঠায়ে দেশকে উন্নত সভ্য ও সমৃদ্ধিশালী করেছি! এত সব করেও আপনাদের মুখ থেকে ভাল কথা শুনতে পারব না? উপকারের কি এই প্রতিদান?

ডকটর মুঞ্জে জবাব দিলেন, আমরা কিছুই ভুলি নাই। আমরা অকৃতজ্ঞও নই। আপনাদের কথা অহোরাত্র মনে করি। কিন্তু কেন এত সব করেছেন? নিছক প্রেম না আরও কিছু? একটা গল্প বলে আপনাদের ভারত-প্রেমের ব্যাখ্যা করি: এক ছিল কৃষক, তার ছিল একটি গাভী। কৃষক দিবারাত্র তার সেবাযত্ন করে—পেট ভরে খাওয়ায়। কেন? গভীর প্রেমে? মোটেই নয়। উদ্দেশ্য, পরদিন প্রচুর-পরিমাণে দুগ্ধ প্রাপ্তি। ভারতের প্রতি স্নেহ ও কৃপাদৃষ্টি আপনাদের তেমনি। ভারত অর্থের খনি—রাজস্বের উৎস। তাকে উন্নত না করলে টাকা আসবে কোথা থেকে?

আপনাদের এই ক্ষুদ্র দ্বীপখণ্ডের শ্রীবৃদ্ধি হবে কেমন করে? ভারতের অর্থই আপনাদের সমৃদ্ধির উৎস।

আয়ুব খাঁ গল্প শুনে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, কি সব বক্‌ছেন? আমরা কি আপনাদের লুট করার মতলবে উন্নত করতে যাচ্ছি? আর বোঝা যাচ্ছে আপনারা বাইরের পুঁজি আমদানী ও নিয়োগের বিরোধী।

বল্‌লাম, হ্যাঁ, তবে............

বাঁধা দিয়ে বললেন, হ্যাঁ? আশ্চর্য। বলেন কি?

বললাম, বাইরের পুঁজির দরকার নাই একথা বলছি না। বলছি বাইবের পুঁজি বা কোন মূলধন নিয়োগের ফলাফল যদি পূর্ব পাকিস্তানীরা ভোগ করতে না পারি তা হলে দরকার নাই সে পুঁজি নিয়োগের।

'অথচ দেশকে আপনারা অমনিই উন্নত করতে চান। সেটা কেমন করে হবে?'

বললাম, উন্নয়ন নিশ্চয় চাই। কিন্তু শোষণ মুক্ত উন্নয়ন চাই। উন্নয়নের নামে মুদ্রাস্ফীতির চাপে দেশবাসীর মেরুদণ্ড-ভেঙ্গে যাওয়া উন্নয়ন আমরা চাই না। ব্যবসাদার শিল্পপতি ব্যবসা করবে এখানে আর লাভের মোটা অঙ্ক চলে যাবে অন্যত্র সেটা আমরা কিছুতেই চাই না। এ দেশের লোক চিরকাল কুলি কামিনের জীবন যাপন করবে এটাকে কেউ উন্নয়ন বলবে না।

'এই শর্তে কোন পুঁজিপতি আপনাদের এলাকায় পুঁজি-নিয়োগ করতে রাজী হবে না। আপনারা চাষবাস ক্ষেতখামার নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুন।'

একটু চড়া সুরে বল্লাম, তাই যদি অদৃষ্টে থাকে তবে মেনে নেব। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান লুট-তরাজের ক্ষেত্র হবে, দেশের দরিদ্র জনসাধারণ পুঁজিপতির করুণা নির্ভর হয়ে থাকবে, এটা আমরা চোখে দেখ্‌তে পারব না। প্রাণপণে বাঁধা দেব। হতভাগ্য

দেশ যুগ যুগ ধরে শতাব্দীর পর শতাব্দী শোষিত লুণ্ঠিত হয়েছে। সে লুণ্ঠন আজও অব্যাহত।

চুপ করে যেন কি ভাবতে লাগলেন। আমার চিন্তা স্রোত উল্টা বয়ে দু' তিনশ বছর পিছনে চলে গেল। ভেসে উঠল লুণ্ঠনের ছবি। ডাচ্, পুর্তুগীজ, ফ্রান্স, বৃটিশ, বর্গী, মায় মোগল পাঠান ভাইয়ারা। ব্যবসার নামে স্রেফ লুট করেছে এ দেশের অর্থ-সম্পদ। বিদেশী লুণ্ঠনের ফাঁকে ফাঁকে দেশী শোষকরাও কম শোষণ করে নাই। সেই সত্তর শতাব্দীতে শায়েস্তা খাঁ এসে টাকা জমা করে প্রায় চল্লিশ কোটি নিয়ে এ দেশ ত্যাগ করলেন। সেটা আমরা ভুলে গেছি। কিন্তু গর্বভরে স্মরণ করি, তাঁর আমলে টাকায় আট মণ চাল বিক্রি হত। মানুষের হাত খালি। টাকা পয়সা উধাও। সমস্ত অর্থ দাক্ষিণাত্য ও অন্যান্য স্থানে যুদ্ধের যোগান দিত। অর্থ না থাকলে দ্রব্যমূল্য কমতে বাধ্য। একেবারে যে বিনা মূল্যে বিতরণ হয় নাই সেইটাই আশ্চর্য। ঘটা করে গেইট বানায়ে বলে গেলেন, যতদিন পর্যন্ত টাকায় আটমণ চাউল বিক্রি না হবে এই দরজা কেউ খুলতে পারবে না।

তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাদশাহ আওরংজেবের নাতি আজিমুশ শান নিজস্ব তহবিল গড়ে তুললেন। ব্যবসা জুড়ে দিলেন—সওদায়ে খাস। নিজস্ব ব্যবসা। বাদশাহ খবর পেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে ফরমান জারী করলেন, বন্ধ করে দাও এই ব্যবসা। ব্যবসা বন্ধ হল কিন্তু এই অবসরে তহবিল ভর্তি হয়ে গেল। কয়েক কোটি টাকা নিয়ে তিনি কেটে পড়লেন। তবুও মানুষ চীৎকার করে নাই।

বিদেশীরা অকাতরে লুণ্ঠন করে জাহাজ বোঝাই করে অর্থ ও মালামাল নিয়ে গেছে। একদিন দু'দিন বা এক বছব দু'বছর নয়—দশ বছরের বেশী। বাংলার বুক চিরে মণিমাণিক্য ধনরত্ন সব লুট করে নিয়ে গেছে। বাংলা শ্মাশানে পরিণত হয়েছে।

ইতিহাসের কি নির্মম পুনরাবৃত্তি!

আয়ুব খাঁ এতক্ষণ কি যে বলে যাচ্ছিলেন, তা' আমার কানে যায় নাই।

হঠাৎ ফিরে এলাম হালজমানায়। আগের কথার সূত্র ধরে বললাম, আপনি চটে যান, কিন্তু এই পূর্ব-পাকিস্তান কি সত্যিই কলোনী নয়? হংকং দেখেছেন নিশ্চয়ই! কি সুন্দর দেখতে। পাহাড়ের উপর দালান-কোঠার বিজলীবাতি আকাশের তারকা-রাজির সাথে মিশে অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে। দ্রব্যমূল্য অত্যন্ত কম। ট্যাক্স নাই। খেয়ে মানুষগুলি সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। কিন্তু আসলে ত কলোনী। পেট পালনই বড় কথা নয়। জীবন ধারণের ব্যবস্থা খুব সহজ কিন্তু এতে গর্বের কিছু নাই। বলতে পারে না এটা আমার দেশ, এই মাটি আমার। এই বৃক্ষলতা, নদ নদী আকাশ বাতাস, সবকিছুতে আমার অধিকার আছে। সমান অধিকার। সনদ-পাওয়া অধিকার নয়, জন্মগত অধিকার। কোথায় তার স্বাধীনতা? তবু ও কায়িক সুখ প্রচুর পরিমাণে পাচ্ছে। আমাদের তাও নাই।

অধৈর্যের লক্ষণ আয়ুব খাঁনের চোখে-মুখে ফুটে উঠল। তিনি এদিক ওদিক তাকান, আবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন আমার মুখের উপর। যেন মনোযোগ দিয়ে শুনছেন।

দম নিলাম।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস টেনে বললেন, ভাবছিলাম ময়দানে বক্তৃতা শুনছি······এ বুঝি আর থামবে না।

হেসে বললাম, মাফ করবেন, না বলে পারছিনা—আবার এও বুঝি, বলেই বা কি লাভ? কার কাছে বলল? কে শুনবে দরদ দিয়ে?

'কেন, এইত শুনছি। বলুন, আরও বলুন।'

'শুনছেন হয়ত ঠিকই, কিন্তু কাজ করছেন কোথায়?

মুচকি হেসে বললেন, কেন? কি চান আপনি—আপনারা?

বললাম, এতক্ষণ ধরে বললাম। সংক্ষেপেঃ পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসন। অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীভূত করে দুই অঞ্চলে দুইটি ভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ। একীভূত অর্থনৈতিক ভিত্তি বজায় রাখলে বৈষম্য কোন কালেও দূর হবেনা কাজ কর্মে সর্বত্র প্যারিটির পূর্ণ মর্যাদাদান এবং অবিলম্বে জনগণের হাতে তাদের রাজনীতিক অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ভোট দানের অধিকার ফেরৎ দিয়ে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা সার্বভৌম পরিষদ গঠন।

অসীম বিরক্তিভরে বললেন, আর বাকী রইল কি? দুই অর্থনীতি মানে দুই ধরণের ব্যবসা বাণিজ্য এবং শেষ পর্যন্ত দেশ দুই ভাগে বিভক্ত।

বললাম, বড় চট করে সিদ্ধান্তে পৌছে গেলেন। ও-রকম হবার কোন আশঙ্কা নাই। মুদ্রার মান দুই রকমের ত আছেই। দ্রব্য মূল্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দুই রকমের। মুদ্রার মান ত নির্ভর করে তার ক্রয়ক্ষমতার উপর। দুই অংশের তারতম্য ত দেখতেই পাচ্ছেন। আর দুই ধরণের অর্থনীতিও এদেশে বিদ্যমান। যে সমস্ত উপকরণের উপর অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপিত হয়, তাও দুই খণ্ডে দুই ধরণের। একে অন্যের উপর নির্ভরশীল নয়—সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন শ্রম ও পুঁজির চলাচল সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ বলে এক খণ্ডের শ্রম ও পুঁজির কোন প্রভাব অন্য খণ্ডে বিস্তার হয়না—হতে পারেনা। কাজে কাজেই দু'টি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অর্থনীতিক ভিত্তি স্থাপন না করলে অর্থনীতিক বৈষম্য দুর করা ত সম্ভব হবেই না, পুর্ব পাকিস্তানের উন্নতি সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হতে বাধ্য হবে।

'কিন্তু আমার আশঙ্কা হয় দেশ দু'ভাগ হয়ে যাবে।'

'আপনার আশঙ্কা অমূলক। এটা না করলেই বরং আশঙ্কার উদয় হতে পারে। কিংবা অন্য কারণে যদি দেশ দু'ভাগ হয় তবে

সে আলাদা কথা। এটা পুর্ব-পাকিস্তানের বাঁচা মরার প্রশ্ন। সর্ব বিষয়ে সমতা রক্ষা করে চললেই ত দেশের সংহতি দৃঢ় হবে। সংহতি-বিনষ্টকারী কার্যক্রম অনুসরণ করেই আপনারা তার মূল কেটে দিচ্ছেন আর দোষ দিচ্ছেন অন্যের ঘাড়ে। কৃত্রিম পন্থায় সংহতি রক্ষা করা কখনও সম্ভব হতে পারেনা।

ঘুরে ফিরে আবার সেই কথায় এলেন, কেন্দ্রীয় শক্তি বললেন, আপনার প্রস্তাব মেনে নিলে কেন্দ্রের ক্ষমতা বলে কিছুই থাকবেনা। দেশ দুর্বল হয়ে পড়বে। শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারবেন না।

'কিন্তু যে অবস্থায় রেখেছেন আর ভবিষ্যতে যা হবার আভাস দেখছি তাতে বেশীদিন এক সাথে অবস্থান করাও সম্ভব হবে কিনা কে বলতে পারে। বৈষম্য ও ব্যবধান দিন দিন বেড়েই চলছে। এই অবস্থার কথা চিন্তা করে কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টি করা হয় নাই। বর্তমান পরিস্থিতি পাকিস্তান আদর্শের পরিপন্থী।'

ফিল্ডমার্শাল চুপ করে রইলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, বুঝতে পেরেছি আপনার যুক্তি। আকার ইঙ্গিতে বলতে চাইছেন, আলাদা হতে চান। সোজা কথায় না বলে ঘুরায়ে ফিরায়ে বলছেন। হুঁ হুঁ···শরীরে মৃদু কম্পন দেখা গেল।

আমারও রাগ হল। কি বলি আর কি বোঝেন। একটা নির্দিষ্ট বিরুদ্ধ ও বিরূপ ধারণা আমাদের সম্বন্ধে করেই যেন বসে আছেন। বললাম, সোজা করে বলতে পারিনা, ভয়ে। কিন্তু কথা তা নয়। আমরা কখনও চাইনা আলাদা হতে। আপনারা বাধ্য করছেন বলে বলি। আর খামাখা দোষ চাপাচ্ছেন আমাদের ঘাড়ে। যেমন কুকুরকেও নাকি গালি না দিয়ে ফাঁসী দেওয়া যায় না। আমরা কাঁহাতক সইব অবিচার? আমাদের আর উপায় কি? আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা ত বেশ বলে বেড়ান অন্যান্য প্রসঙ্গে। দিন না আমাদেরও সেই ক্ষমতা। সেইটার নামই স্বায়ত্তশাসন। কপালে

জুটে খাব, না হয় ভুখা থাকব। কিন্তু ভিখারীর লা'নতের তক্তা গলায় ঝুলায়ে দ্বারে দ্বারে কীর্তন গাইতে পারবনা।

ঠোঁট বাঁকা করে বললেন, দেখুন, এ সব বাগাড়ম্বর অনেক শুনেছি। আলাদা হবেন! একদিনও টিকতে পারবেন না। পশ্চিম পাকিস্তানের কোন ক্ষতি হবেনা। তারা টিকে থাকবে। তারা সংগ্রামী সাহসী ও শক্তিশালী। আপনারা কিছুই নন। শুধু বাগাড়ম্বরবাগীশ। আটচল্লিশ সালে ভারত হায়দারাবাদ দখল করার পর পূর্ব-পাকিস্তানের দিকেও নজর দিয়েছিল। কিন্তু অগ্রসর হতে সাহস করে নাই কেন জানেন? আমি ছিলাম এখানে, তাই। নিজের বুকে কয়েকটা টুকা মেরে বললেন।

খুব দম্ভভরে বললেন। এর ত উত্তর দেওয়া চলে না। মনে মনে বললাম, সাবাস!

তারপর বললেন, আপনাদের চারদিকে শত্রু, কেমন করে দেশ রক্ষা করবেন?

কোন কূল কিনারা পাচ্ছিনা। আমি বলছিলাম, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, আর ইনি বলছেন, আলাদা হয়ে যাচ্ছেন, চারিদিকে শত্রু।

বললাম, কোথায় শত্রু? কেউ শত্রু নয়।'

শত্রু নাই? কেউ শত্রু নয়? আশ্চর্য! প্রায় লাফায়ে উঠলেন। ইণ্ডিয়া আপনার চারদিক ঘিরে রয়েছে, আপনি তাকে শত্রু মনে করেন না। যে কোন সময়ে হামলা করতে পারে।

বললাম, তা' পারে হয়ত। কিন্তু কেন করবে? আমাদের সাথে ঝগড়া কোথায়? প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে শান্তি ও বন্ধুত্ব বজায় রাখা অবশ্য কর্তব্য। আমাদের বৈদেশিক নীতির মর্মও তাই। আপনিও মাঝে মাঝে ওদের সাথে জয়েণ্ট ডিফেন্স গঠন করার প্রস্তাব করে থাকেন। ঝগড়াটা হচ্ছে কাশ্মীর ও পানি নিয়ে। ওটা আপনাদের, আমাদের নয়। কাশ্মীর প্রশ্ন অত্যন্ত জটিল।

কিন্তু আপনাদের নীতি আরও জটিল। গোড়াতে বলা হল দেশীয় রাজ্য সমূহ স্বাধীন ও সার্বভৌম থাকবে। তার পরই বলা হয় কাশ্মারিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে হবে। আমাদের দেশী লোকেরা মনে করে কাশ্মীর পাকিস্তানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ভারত প্রবঞ্চনা করে ওটা দখল করেছে, ফিরায়ে আনতেই হবে।

বললেন, কিন্তু কাশ্মীরিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী আমাদের সমর্থন করতেই হবে। এটা একটা মর‍্যাল অব্‌লিগেশন—নৈতিক দায়িত্ব।

'তাত নিশ্চয়ই, কিন্তু বেশী বাড়াবাড়ি করতে গেলে পাকিস্তানকেই হয়ত বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া হবে। পঞ্চাশ লক্ষ লোকের জন্য দশকোটি লোককে বিপন্ন করার কোন যুক্তি নাই।'

বললেন, না না তা হবে কেন? পাকিস্তানকে বিপন্ন করতে হবে কেন?

বল্‌লাম, আপনি হয়ত সেটা বলেন না কিন্তু অনেক উগ্রপন্থী ব্যক্তি আছে যারা কথায় কথায় জেহাদের ডাক দিয়ে বসে। গাজী বা শহীদ হবার আহ্বান জানায়। অত্যধিক ভাবপ্রবণতা, অচেতন বিশ্বাসী মনোভাব তাদের বিহ্বল করে ফেলে। তারা আপনাকেও হয়ত উত্যক্ত করে তুলবে তাই ভয়।

মার্শাল ল' হবার পর পরই বালুচিস্তানের এক বন্ধু বলেছিলেন যে, কাশ্মীর নিয়ে একটা যুদ্ধ বেধে যাবার আশঙ্কা আছে। কারণ সৈনিক এখন কর্তৃত্বভার নিয়েছেন, একটা কিছু হয়ে যেতে পারে। কারণ ইনি যুদ্ধে বিশ্বাস করেন।

'ইয়েহ্‌ জংবাজ হ্যাঁয়—মুল্‌ক কো খাতরা মে ডাল দেগা।' এই কথাটা মনে পড়ে গেল।

আয়ুব খাঁ হেসে বললেন, আর আমি পাগল নাকি? একটা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। দুঃখের

বিষয় ইণ্ডিয়া কিছুতেই যুক্তির পথে পা বাড়ায় না। ওদের এক গুয়েমি মনোভাবই এই অচলাবস্থার জন্য দায়ী।

বললাম, রাজনীতিকরাও এতদিন তাই বলেছে। কিন্তু কাশ্মীর প্রশ্ন সমাধান করতে অক্ষম বা অপারগ হওয়ার জন্য তাদের কষে গালাগাল দিয়েছেন। এখন চট্ করে সমাধান করে ফেলুন। গেল ত কয়েক বছর। সমাধানের কোন লক্ষণ ত দেখছি না। শেষ পর্যন্ত অস্ত্রধারণ করে নিষ্পত্তি করবেন কিনা কে জানে। আপনারা সৈনিক মানুষ—অন্য পন্থার চেয়ে যুদ্ধ পন্থাই বেশী বিশ্বাস করেন।

হেসে ফেললেন, বললেন, ও নো, নো।

বললাম, সে যা ইচ্ছা করুন। ও সব-কথা নিয়ে আপনি মাথা ঘামান। আমি বলছিলাম পূর্ব পাকিস্তানের কথা। আমাদের সাথে ইণ্ডিয়ার বিবাদ-বিসম্বাদ ছোটখাট ধরণের। সীমানা সরহদের ব্যাপার। দেশ জয় বা দখলের নয়। সে সব নিষ্পত্তি করা খুব কঠিন কাজ নয়। আমি চেষ্টা করছিলাম, সময় পেলে হয়ত কৃতকার্য হতে পারতাম।

বিদ্রূপের হাসি হেসে বললেন, ওহ্ আপনি মস্তবড় একটা মানুষ—নিশ্চয়ই পারতেন।

বললাম, ঠাট্টা যত ইচ্ছা করুন। কিন্তু সত্যিই অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিলাম। ভারতের রাষ্ট্রদূতকে নিয়ে দরবার করেছি, তিনি তাঁর সরকারের অনুমতি নিয়ে ফিরে এলেই আমরা সীমানা ঠিক করে ফেলতে পারতাম। আমি ত খুব আশাবাদী ছিলাম। কিন্তু আয়ু ফুরায়ে গেল আমার। সে যাক—যা হবার তা হয়ে গেছে। বলছিলাম, আমাদের সাথে ঝগড়া ছোট ধরণের। এ নিয়ে বিরাট একটা যুদ্ধের কোন আশঙ্কা থাকতে পারেনা। আর যদি থাকেই, তবে আমরাও দেখে নেব। একটা দেশ জয় করা খেলার কথা নয়।

খুব জোরে মাথা নেড়ে বল্‌লেন, না না, আমি কি সত্যিই যুদ্ধের বা আক্রমণের কথা বলছি ? সে সাহস হয়ত কোনদিন ভারত করবে না। তা হলে ভারতেরও দুর্দশার সীমা থাকবে না। আমি বলছিলাম অন্যভাবে তারা আপনাদের ধ্বংস বা পঙ্গু করে দিতে পারে। আপনাদের অর্থনীতি পঙ্গু করে দেবে। তা হলেই ত অবস্থা কাহিল।

বললাম, তাও সম্ভব নয়। আমাদের অর্থনীতি তাদের কাছে বাঁধা নাই, না আছে কোন অর্থনীতিক সংযোগ তাদের সাথে। তাদের উপর নির্ভর করারও কিছু নাই আমাদের।

'না না, তা নয়। অনেক উপায় আছে। যে সব হিন্দুরা এ দেশ থেকে চলে গেছে তাদের যদি ঠেলে ফেরৎ পাঠায়ে দেওয়া হয়, তা হলেই ত একটা বিরাট সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হবে আপনাদের। দেশ বিভাগের সময় যে সব মোহাজের এখানে এসে পড়েছিল, তাদেরই সুরাহা এখন পর্যন্ত করে উঠ্‌তে পারেন নাই। এরপর যদি হিন্দুরা আসতে শুরু করে দেয় তা হলে কেমন করে তাদের সামলে নিবেন ? আপনাদের অর্থনীতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়বে।

'তা হবে না। যারা ফিরে আসবে তারা বাস্তুহারা মোজাহের নয়। অনেকেরই বাড়ীঘর জায়গা-জমি, ব্যবসাও এমনি পড়ে রয়েছে। অন্যরা জবর দখল করে বসে আছে। তারা ফিরে এসে সে সব উদ্ধার করতে পারবে। বহু লোক ছিল, তারা বিভিন্ন রকমের কারিগরী কাজ করে জীবিকা অর্জন করত। এখানে তাদের অভাব অনুভব করি। তারা এলে সরকারের উপর কিংবা আমাদের অর্থনীতির উপর কোন বিশেষ চাপ পড়বে বলে ত মনে হয় না।'

বললেন, একটা কাল্পনিক অবস্থার কথা চিন্তা করে তৃপ্তি লাভ করা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে ?

বললাম, আপনিও ত কাল্পনিক ভীতির ছবি দেখায়ে মনে ত্রাস সৃষ্টি করছেন।

আবার এ কথা ছেড়ে দিলেন। কথাবার্তার গতি এমনিই চলছিল। বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত।

বললেন, এ দেশ থেকে কত কোটি টাকার মাল চোরাচালান হয়ে যায়, তার হিসাব ত আপনিই একবার আমাদের দিয়েছিলেন। পাট, ধান, চাউল, সোনা, মায় গরু, ছাগল, মুরগী, আণ্ডা, মাছ, ভারতে পার হয়ে যায়। হিন্দু ব্যবসায়ীরা তাদের লভ্যাংশ পাঠায় ভারতে। উকিল, মোক্তার, ডাক্তার—তারাও উপার্জিত টাকার অধিকাংশ ভারতে পাঠায়—সেখানে তাদের পরিবার। এতে যে কত ক্ষতি হচ্ছে তা ত নিশ্চয়ই বুঝতে পারেন।

বললাম, এ সব সত্য—স্বীকার করি। কিন্তু এ সব বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করার উপায় উদ্ভাবন করাও যে-কোন সরকারের অবশ্য কর্তব্য। অন্যান্য সমস্যার মত এটাও একটা সমস্যা—এবং গুরুতর সমস্যা। সমাধান করতেই হবে।

মাথা ঝেঁকে বললেন, আপনারা করবেন মোকাবেলা—আপনারা একদম সর্বস্বান্ত হয়ে যাবেন।

রাগ হল। বললাম, কি আর বাকী আছে? কি আছে আমাদের? সবই ত নিয়ে গেছেন। ধন দৌলত ত বটেই—মানুষের মৌলিক অধিকারগুলিও বাদ দেন নাই। বাইরের ঠাট দেখে বোঝাই যাবে না ভিতরটা কি পরিমাণ ফাঁপা। এর চেয়ে শোচনীয় অবস্থা আর কি কল্পনা করা যায়?

একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আপনার কথাবার্তা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। তবে, আপনার এই সব অদ্ভুত মতবাদ দেশের জনসাধারণ সমর্থন করে বলে মনে হয় না—এই একটা সান্ত্বনা।

বললাম, কেমন করে বুঝলেন? দেশের প্রত্যেকটি চিন্তাশীল ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষই আমার এই মতের প্রতিধ্বনি করে। হুজুগ প্রিয় আর গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসমান ব্যক্তিদের কথা আলাদা। তাদের বেশ কিছু সংখ্যক আপনার দলে ভিড়েছে—আর

আরও ভিড়বে। কারণ ওখানেই ত হালুয়া রুটি। তারা জ্ঞানপাপী। জানে, বলেনা। বললে তাদের ক্ষতি। কিন্তু জানে, পূর্ব-পাকিস্তান সর্বহারা, রিক্ত, নিঃস্ব।

চট্ করে বোধ হয় কম্যুনিষ্টের চেহারা মনে এসে গেল। বললেন, বুঝতে পাচ্ছি, কম্যুনিষ্টরা কি পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করেছে এখানে।

হেসে বললাম, আচ্ছা, তাও বুঝতে পারছেন? দারুণ আবিষ্কার!

'কেন বুঝবনা? সর্বহারা, রিক্ত—এ সব ত তাদেরই।'

'মনে পড়ে গেল, বন্ধু ফজলুর রহমানও একদিন মুসলিম লীগের সভায় 'মেনিফেষ্টো' শব্দ ব্যবহার করতে আপত্তি করেছিলেন। বলেছিলেন ওটা কম্যুনিষ্ট শব্দ—ওটা বাদ দিতে হবে।'

বললাম, সত্য কথাও কি বলবনা?

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বলবেন! কিন্তু বলার ধরণটা ত কম্যুনিষ্টদের মত। আপনাদের আওয়ামী লীগই ত ওদের তালে তালে সমর্থন করে সবল করে তুলছেন।'

'আবার আওয়ামী লীগের ঘাড়ে চাপালেন কেন? ওটাকে ত মেরে ভূত করে ফেলেছেন। আবার টানাটানি কেন?

'না, এখনকার কথা বল্‌ছিনা—আগের কথাই বলছি।'

বল্‌লাম, জনাবে আলি, আপনি জানেন না—এই আওয়ামী লীগই কম্যুনিজম ঠেকায়ে রেখেছিল। বিরোধিতা করে নয়। প্রকাশ্যে নিন্দা করেও নয়। কাজ দিয়ে কম্যুনিষ্টরা চেষ্টা করেছে আওয়ামী লীগে অনুপ্রবেশ করতে, কিন্তু অবস্থা বেগতিক দেখে সরে পড়েছে।

চমকে উঠ্‌লেন যেন, বললেন, অবাক করলেন আপনি! আপনারা কম্যুনিজম ঠেকায়েছেন? আমি জানি, আওয়ামী লীগের বিশেষ উদ্দেশ্য ও নীতি ছিল চারটি: পাকিস্তান আদর্শ বিরোধিতা, হিন্দুপ্রীতি, কম্যুনিজম সমর্থন এবং পাকিস্তান দ্বিখণ্ডী-

করণ। হাতের চারিটি আঙ্গুলের মাথায় টোকা দিয়ে দেখালেন।

খুব কষ্ট হল মনে। আবেগ জড়িত কণ্ঠে বললাম, আপনি এখন সব বলতে পারেন। আপনার মুখে সবই শোভা পায়। আমরা পড়েছি খুব বেকায়দায়—অসহায় অবস্থায়। আর আপনি সর্বক্ষণ তার অধিকারী। মাটিতে পড়ে গেছি, পা দিয়ে দুটি আঘাত করলেও জবাব দেবার উপায় নাই।

বোধ হয় বুঝতে পারলেন, আঘাতটা খুব কড়া হয়েছে। চেহারা নিষ্প্রভ হয়ে গেল। খুব কাছে এসে কাঁধে হাত দিয়ে কৃত্রিম সোহাগ ভরে বললেন, আমি সত্যি দুঃখিত। আপনাকে আঘাত দেওয়ার জন্য বলি নাই। বিশ্বাস করুন।

সহজ হওয়ার চেষ্টায় বললাম, তা করি। এ সব কথা খুব বেশীক্ষণ মনে রাখতে পারি না। অনেক শুনেছি, গা সহা হয়ে গেছে। তবুও আপনার মুখ থেকে শুনতে আশা করি নাই। সোহরাওয়ার্দীকে নিন্দা করছেন? তার চেয়ে বড় দেশপ্রেমিক কেউ হতে পারেনা। আপনি যে দফাওয়ারী নীতির হিসাব দিলেন, সোহরাওয়ার্দী এর প্রত্যেকটির ঘোর বিরোধী। পূর্ব-পাকিস্তানীরা তাই বলে থাকে পাকিস্তানের দুটি দূরবর্তী অংশের সংযোগ ও সংহতি রক্ষা করবে, সোহরাওয়ার্দী আর পি আই-এর বিমান। আপনাদের মনে দুর্বলতা ও সন্দেহ থাকলেও সোহরাওয়ার্দীর মনে পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি ও আদর্শ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ বা দুর্বলতা নাই। আমাদের কেউ যদি কোনও সময়ে খেদোক্তি করে যে, এত অন্যায় অবিচার সহ্য করে আর একসাথে থাকা যায়না, তাহলে তিনি রেগে আগুন হয়ে যেতেন। বলতেন, দাবী আদায়ের জন্য সংগ্রাম কর। অবিচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোল। কিন্তু আলাদা হয়ে যাবে এ কথা যেন তোমাদের মুখে কোনদিন না শুনি।

তিনি আমাদের নেতা-প্রধান। তাঁর নীতি ও মতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানের মতামত গড়ে উঠতে পারে না। আপনি

যে চারটি নীতির কথা বললেন, সোহরাওয়ার্দী এ সবের তীব্র বিরোধিতা করেন, তা' আপনিও নিশ্চয়ই জানেন। তবুও দুষ্ট-মতি লোকদের মুখে আওয়ামী লীগ সম্বন্ধে নানা কথা শুনে একটি ভ্রান্ত ধারণা পোষণ ক'রে আছেন।

চুপ করে শুনলেন, বিশ্বাস করলেন কি করলেন না, তা' চেহারা দেখে বোঝা গেলনা। প্রতিবাদও আর করলেন না।

হঠাৎ অন্য কথা তুললেন, আচ্ছা বলুন ত, এই যে ছাত্রদের গোলমাল চল্‌ছে, এর কারণ কি? এসব বন্ধ করার ব্যাপারে আপনাদের কোন দায়িত্ব নাই? পড়াশোনা মাটি হয়ে গেল। আপনারা দাঁড়ান—কিছু করুন।

বললাম, কিছু করার পথ ত আপনি বন্ধ করে দিয়েছেন। নেতৃত্বের দাবী আমরা এখন কেউ করি না—করতে পারি না। আমাদের যে বিকট ছবি দেশের সামনে আপনি তুলে ধরেছেন ও আপনার সাঙ্গপাঙ্গরাও সুর ধরে রং চড়ায়ে সবাইকে দেখাচ্ছে, তাতে মানুষ সাধারণতঃই বিভ্রান্ত হতে বাধ্য। দেশের সাধারণ মানুষ স্বভাবতঃই সরল ও বিশ্বাসপ্রবণ। একটা কথা প্রচারিত হলে তারা সেটা অকাতরে গ্রহণ করে, যতদিন না তার পাল্টা প্রচার কেউ করতে পারে। এখানে এক তরফা অপবাদ কুৎসা প্রচার করা হচ্ছে। কেউ প্রতিবাদ করে না—করতে পারে না। কারণ প্রতিবাদ নিষিদ্ধ। ছাত্রসমাজও দেশের জনগণের এক অংশ। তারা একটু বেশী মাত্রায় ভাবপ্রবণ। তাদের মনে সব কিছুই অতি দ্রুত প্রভাব বিস্তার করে। আমাদের সম্বন্ধে কি ধারণা আপনাদের অপপ্রচারের ফলে ওদের মনে সৃষ্টি হয়েছে, তা না জেনে শুনে হঠাৎ ওদের সামনে যেতে সাহস হচ্ছে না।

দ্বিতীয়ত, ওদের কাছে গেলে আর এক দিক দিয়ে বিপদ। ওদের সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ রক্ষা করতে গেলেই, আপনারা সেই পুরাতন গীত গাইতে শুরু করেন: রাজনীতিকরা,

বর্তমানে ধিকৃত, রাজনীতিকরা ছাত্রদের উস্কানি দিচ্ছে। নিজেদের স্বার্থে ছাত্রদের ব্যবহার করছে। পড়াশুনায় দারুণ বিঘ্ন সৃষ্টি করে ভবিষ্যৎ মানুষের ইহকাল ধ্বংস করে দিচ্ছে, ইত্যাদি। অথচ এই সব অভিযোগ মিথ্যা। ছাত্রদের অন্তরে উৎসাহ ও আবেগ বেশী মাঝে মাঝে আবেগ দুর্বার হয়ে উঠে। ঝোঁকের মাথায় অনেককিছু করে বসে। তা' কারও উস্কানিতে নয়। ওদের অত ছোট ভাবেন কেন?

'ছোট ভাবর কেন? ওরা' ভাবপ্রবণ, আপনি বললেন। ভাল-মন্দ বিবেচনা করার সময় এখনও হয় নাই। এখন শুধু দরকার পড়াশুনা করার। নইলে তাদের ভবিষ্যৎ কোথায়? তাদের আবেগ সংযত করে আপাততঃ একটি মাত্র কর্তব্য অর্থাৎ বিদ্যালাভে তাদের মগ্ন হওয়া উচিত। আর অন্যান্য ব্যাপার, মায় রাজনীতি তাদের অভিভাবকদের উপর ছেড়ে দিক্।

বললাম, রাজনীতি ত অভিভাবকরাই করে। ছাত্রদের প্রতি দরদ তাদের চেয়ে অন্য কারুর বেশী থাকার কথা নয়। বর্তমান অবস্থায় ছাত্ররা দেখতে পাচ্ছে যে তাদের অভিভাবক, 'যারা রাজনীতি করত, দেশের মঙ্গল-অমঙ্গলের কথা চিন্তা করত, তাদের হাতে পায়ে বেড়ি লাগায়েছেন—মুখে তালা। নিন্দা অপবাদ নির্যাতন লাঞ্ছনা চালায়ে যাচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে। দেশের অনন্ত সমস্যা সমাধান করা ত দূরের কথা এ কথা তারা উত্থাপনও করতে পারছেনা। বাধ্য হয়ে তারা নিশ্চুপ। সবকিছু করার দায়িত্ব একলা গ্রহণ করেছেন আপনি। দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ছাত্র সমাজ একেবারে উদাসীন নয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে তারা দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখছে। কোথায় যাচ্ছে দেশ? কোথায় যাবে তারা? এইসব চিন্তা স্বভাবতই তাদের বিক্ষুব্ধ করে তুলছে। তাই তারা নানা রকমের দাবী দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করছে, বা করতে বাধ্য হচ্ছে। তারা ভবিষ্যতের

মানুষ। সম্মুখে যাত্রা শুরু করতে চায়। অথচ দেশের গতি পশ্চাৎ দিকে। আমি অবশ্য এসব অনুমান করেই বলছি। তারা নতুনের সন্ধান চায়। আপনিও নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে চান। পুরাতনের বিলুপ্তি সাধন প্রায় করেই ফেলেছেন। এখন নিন এদের গ্রহণ করে নতুন নেতৃত্ব হিসাবে। এরাই হবে নেতা।

আজম খাঁ পাশে বসা—নিশ্চুপ। সব শুনছিলেন। মাঝে মাঝে আমার কাঁধে চাপ দিচ্ছেন অলক্ষ্যে—বোধ হয় উৎসাহের ইঙ্গিত। আয়ুব খাঁ তাঁর গায়ে টোকা দিয়ে বললেন, শুনলে, শুনলে আজম খাঁ, ছাত্ররা নেতৃত্ব গ্রহণ করবে?

আজম খাঁ চোখ মেলে চাইলেন। অত্যন্ত নির্বিকার চিত্তে বললেন, খাঁ সাহেবের ত তাই ধারণা।

প্রায় চীৎকার করে উঠলেন, অদ্ভুত কথা। তাঁর ধারণা! কি সর্বনাশের কথা!

তাঁর ধমকে আমার ভয় পাবার কথা। কিন্তু হেসে ফেললাম এবং একটু জোরেই বললাম, অত উত্তেজিত হবার ত কোন কারণ দেখছি না। কারণ, ওরা সত্যি সত্যিই নেতা হয়ে গেল না। আর হলেও বর্তমানে সে প্রশ্ন উঠে না। আমি বল্‌ছি, ভবিষ্যতের কথা। ওরা ভবিষ্যতের মানুষ ত আপনিও স্বীকার করেন। এবং ভবিষ্যতে এরাই নেতৃত্ব করবে। এখন একটু আধটু মশ্‌ক করে। ওরা আজই নেতৃত্বের দাবী করছেনা। করলেও হতে পারবে না। আপনিও হতে দেবেন না। আমার ধারণা, বর্তমান অবস্থায় ছাত্রসমাজ যে আন্দোলন করে তাতে ওদের পড়াশোনার খানিকটা ব্যাঘাৎ হওয়া ছাড়া দেশের পক্ষে ক্ষতিজনক নয়। ওদের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ জোর করে বন্ধ করে দিলে দেশের নেতৃত্ব এমন অবাঞ্ছিত দায়িত্ব-জ্ঞানহীন লোকদের হাতে পড়তে পারে, যেখান থেকে দেশকে উদ্ধার করা সম্ভব হবেনা। যারা দেশকে ভালবাসে না, বাইরের আদর্শে যারা উদ্বুদ্ধ অনুপ্রাণিত

তারাই মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। সেটা দয়া করে বন্ধ করার চিন্তা করুন। জেল, বেত, জরিমানা টিয়ারগ্যাস এসবের মোকাবিলা ছাত্রসমাজকে করতে হয় নেহাত দায়ে পড়েই। এরা নেতা হতে চায়না। সোহরাওয়ার্দী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতীক। সুখী সমৃদ্ধিশালী জাতি গঠনের তাঁর প্রবল আকাঙ্খা। দেশ দেশকর্মীর কাছে অজ্ঞাত নয়। তাঁকে গ্রেফতার করাতেই ছাত্রসমাজ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। গণ-বিক্ষোভের প্রতিধ্বনি করছে তারা। তারা বুঝতে পারছে আপনি কোন্ দিকে যাচ্ছেন। তাই তারা আন্দোলন করছে। গণতন্ত্রের আন্দোলন। বেঁচে থাকার আন্দোলন।

চোখ বড় বড় করে বললেন, বক্তৃতা ত দিলেন বেশ। গণতন্ত্রের আন্দোলন। আর আমি যে গণতন্ত্রের কথা বলছি, সেটা বুঝি পছন্দ হয়না? আপনাদের ট্রেডমার্কা গণতন্ত্র না হলে বুঝি আর কোন সংস্থাই গণতন্ত্র হয়না?

বললাম, তা হতে পারে। কিন্তু জনগণকে বাদ দিয়ে, তাদের অধিকার খর্ব করে এক কথায় তাদের অবিশ্বাস করে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাকে আমরা গণতন্ত্র বলে মানতে পারিনা।

রাগ করে বললেন, না করুন। তাতে কিছু আসে যায় না। এতক্ষণে বোধ হয় ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হল। চুপ করে রইলেন প্রায় মিনিট খানেক। তারপর দেহটাকে ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, ছাত্ররা নেতৃত্ব করবে? দেখা যাক্। আপনি কি মনে করছেন, সব ছাত্রই এক মতের?

বললাম, দুঃখের বিষয় তা মনে করিনা। দিন দিন ছাত্রসমাজে ভাঙ্গন এসে যাচ্ছে। দলাদলি কোন্দল শুরু হয়েছে। একটা দল প্রায় সব সময়ই সরকার সমর্থক। সরকারী সাহায্যপুষ্ট। নানা ধরণের সুযোগ সুবিধা পায় সরকারের তহবিল থেকে। শুনতে পাচিছ, দু'একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এই কাজে নিযুক্ত

আছে। ছাত্রদের হাত করার চেষ্টা করা হয় সেই কর্মচারী মারফত। সে কর্মচারীটিকে আমরাও চিনি।

অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, কি সব বাজে বকছেন? অল ননসেন্স।

বললাম, ঠিকই বলছি স্যার।

পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠল দেখে উদারায় নেমে এলাম। বললাম, এসব তর্ক করা বৃথা। এর শেষ কখনও হবেনা। বড় দুঃখে কথাগুলি বলে ফেললাম। মাফ করবেন। একটা কথা বলে আজকের আলোচনা শেষ করতে চাই। আপনাকে অনেকে ত্রাণকর্তা আখ্যা দিয়েছে। পূর্ব-পাকিস্তান যদি আপনার হাতে মহানির্বাণ লাভ করে, তা হলে আপনারই কলঙ্ক। বহুকালের পুঞ্জীভূত অবিচারের বোঝা আর বাড়াবেন না।

রুক্ষ কণ্ঠে বললেন, এর জন্য কি আমি দায়ী? যারা এত দিন গদীতে ছিলেন, তাদের ধরুন। আপনিই ত ছিলেন।

বললাম, ছিলাম। কে দায়ী সে প্রশ্ন এখন অবান্তর। আমরা কি করেছি, না করেছি, আমি নিজে কি করেছি, তাও এখন ইতিহাসের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে। আল্লাহ সাক্ষী। দেশবাসীও জানে। কথা সেটা নয়। কি হয়েছে এটাই দেখুন। যে পদ্ধতি, যে শাসন-প্রণালী, অবিচার, বৈষম্য সৃষ্টি করেছে এবং করছে, তার অবসান আপনি ঘটাতে পারতেন এবং সেই জন্যই গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব করেছিলাম। আপনি সেটা অগ্রাহ্য করেছেন।

নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ট্রাই দি কনাষ্টিটিউশন।

বললাম, তা ত করতেই হবে। যারা করবার তারাই করবে। ফলাফল কি হবে জানিনা।

উঠে পড়লেন। চলে আসার ইঙ্গিত। আমিও উঠে পড়লাম। হাঁটা শুরু করার আগে বললাম, সোহরাওয়ার্দীকে ছাড়বেন না?

দু' হাত উপরে উঠায়ে বললেন, অসম্ভব। ছাড়ার প্রশ্নই উঠে না।

আজম খাঁ আমার সাথে সাথে দরজা পর্যন্ত এলেন। বললেন, ভেরি সরি। অত্যন্ত দুঃখিত। আপনি স্পষ্ট কথাগুলি বললেন, শুনে খুশী হলাম। অনেক বিষয় আপনার সাথে আমি হয়ত একমত নই, তাতে কিছু আসে যায় না।

বার হবার মুখে দেখলাম, তমিজউদ্দিন খাঁ ও হামিদুল হক চৌধুরী সাক্ষাতের অপেক্ষায় বসে আছেন।

পরদিন শুনলাম, আয়ুব খাঁ এদের কাছে বলেছেন, লোকটাকে ত মোটামুটি ভাল বলেই জানতাম। হঠাৎ ক্ষেপে গেল কেন? পাগলের মত যা' তা' বকে গেল।

বাইশ

নেতার গ্রেফতারে আমরা হতভম্ব হয়ে গেলাম। হঠাৎ কিছু স্থির করা অসম্ভব। আরও কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হল নিরাপত্তা আইনে: আবুল মনসুর আহমদ, মাণিক মিঞা, শেখ মুজিবর রহমান ও ছোট বড় আরও অনেককে।

আবহাওয়া বেশ গরম। চারদিক নিস্তব্ধ। মার্শাল ল' জারির সময় যেমন হয়েছিল, আবার তেমনি। ঘরে বসে আলাপ-আলোচনা করাও বিপজ্জনক। টিকটিকির দালাল বৈঠকে শামিল কিনা তাই বা কে জানে। তবুও আলাপ-আলোচনা করতে হয়। কথাবার্তা বলতে হয়। না হলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাবার উপক্রম। ভীষণ অবস্থা!

বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ আমরা করতে পারি নাই বলে আইন-কানুন শৃঙ্খলা মেনে কাজকর্ম করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

তাই, রোজ বিকালে আমার বাড়ীতে কিছু রাজনীতিকদের সমাবেশ হতে লাগল। বিভিন্ন দলের প্রায় সবাই উপস্থিত

হত। শুধু আলাপ-আলোচনা। অনিশ্চিত ও উদ্দেশ্যবিহীন। ভবিষ্যতে কি করা যেতে পারে তার একটা অস্পষ্ট নক্শার আভাসও মাঝে মাঝে ফুটে উঠত।

চারদিকে টিকটিকি ঘুরে বেড়ায়। চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। তাদের সন্দেহ দূর করাব জন্য আমরাও ঘর ছেড়ে বাইরে খোলা মাঠে বৈঠক করি। কথাবার্তাও বেশ জোরে শোরেই চলে, যেন চোরাদের শুনতে কষ্ট না হয়। ওদের ত আবার রিপোর্ট করতে হয়।

আজম খাঁর সাথে একদিন দেখা। হেসে হেসে জিজ্ঞাস করলেন, আপনার ওখানে বুঝি হররোজ খুব আড্ডা জমে? ছাত্র ও রাজনীতিকরা মিলে খুব সলা-পরামর্শ হয়?

বললাম, তা ত হয়ই। কিন্তু এ সব খবরও আপনার কানে এসে পৌঁছায়?

বললেন, না—না তা হবে কেন? তবে কেউ কেউ বোধ হয় অনুমান করেই একথা বলে।

বললাম, সত্যও হতে পারে।

'তা জানিনা, তবে অনেকেই অনুমান করে ও বলে।'

'তা ত বলবেই। এই ত বলার সময়। লগ্ন বয়ে যায়। আচ্ছা, আপনি এসব খবর বা অনুমান বিশ্বাস করেন?

'না, সব করিনা।'

'এটা করেন কিনা? ছাত্র-ছাত্রী রাজনীতিক সবাইকে নিয়ে আমরা গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছি?'

সজোরে আমার হাত ধরে বলেন, কি মুশকিল! উকিলের পাল্লায় পড়েছি। নিস্তার নাই।

আশ্বস্ত করে বললাম, যা-ই করিনা কেন, আপনাদের ঘাবড়াবার কোন কারণ নাই। আমার এখানে সব জাতের লোকই আসে—জগন্নাথ ক্ষেত্র। মক্কেলও আসে। নানা জাতের গল্প হয়। তবে ধ্বংসাত্মক নয়—একদম অহিংস।

খুব হেসে বললেন, ভাগ্যিস।

আমরা সাব্যস্থ করলাম একটা বিবৃতি লিখে যদি সংবাদ পত্রে কোন রকমে প্রকাশ করা যায় তা হলে সরকারী প্রতিক্রিয়ার একটা আভাস পাওয়া যেতে পারে। অল্প কথায় দেশের পরিস্থিতিকে বর্ণনা আর রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী।

খবরের কাগজের সাথে পরামর্শ করা হল। একমনা কাগজগুলি যদি একই দিনে বিবৃতিটা প্রকাশ করে ফেলে, তা হলে সবার বিরুদ্ধে একযোগে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সরকারের পক্ষেও একটু কঠিন হবে। এই বলে আশ্বাস দেওয়া হল। তারা রাজী হল।

মুসাবিদা একটা করা হল। তারপর নানা মুনির নানামতে কাটছাট করে বিবৃতি তৈয়ার করা হল। নুরুল আমিন, হামিদুল হক চৌধুরী, পীর মোহসীনউদ্দিন, সৈয়দ আজিজুল হক, মাহমুদ আলি, আবু হুসেন সরকার ও আমি দস্তখত করলাম।

বাষট্টি সালের তেরই এপ্রিল বিবৃতি লিখে চৌদ্দই এপ্রিল খবরের কাগজে প্রকাশ করা হল। দারুণ প্রতিক্রিয়া হল মানুষের মনে। নেতৃবৃন্দ কয়েক বছর পর মুখ খুললেন। তা হলে এরা মরে যায় নাই। দরকার হলে জনগণের শামিলে দাঁড়ায়ে তাদের দুঃখদৈন্যের কথা প্রকাশ করতে পারবেন। রাজনীতিকদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন বলে শাসনকর্তারা দাবী করে থাকেন, তা সর্বৈব মিথ্যা।

মানুষ আবার নাজাত চায়। চার বছর আগের নাজাত বাসি হয়ে গেছে। তার রসগন্ধ শুকায়ে গেছে। আবার চায় মুক্তি।

দালাল শ্রেণী আর কায়েমী স্বার্থবাদীরা আতঙ্কিত হয়ে উঠল। এরা আবার এল কোত্থেকে? কবর থেকে উঠে এল নাকি? কবে মরে ভূত হয়ে গেছে—ফাতেহাখানি সমাপ্ত। আবার রাজনীতির ক্ষেতে ঢুকে আমাদের পাকাধানে মই দিবে নাকি।

করাচীর 'ডন' সম্পাদকীয় স্তম্ভ খাড়া করল। সাত ভাই

চাম্পা জাগে। সাতজন আবার জেগে উঠল। আরও কত জাগবে কে জানে। আবার দেশে অনাসৃষ্টি আনবে। ছিলাম ভাল আয়ুবের রাজত্বে। তাঁকে হটাবার চেষ্টা করা অন্যায় ইত্যাদি।

আজম খার সাথে দেখা লাটভবনে। বললেন, ভাইসাব, কি করেছেন আপনারা? কে আপনাদের এই বুদ্ধি দিল?

বললাম, কি করেছি? কিছুই ত করি নাই। দুটি সত্য কথা বলেছি। দু' একটি দাবী পেশ করেছি আপনাদের কাছে। তাতে আপনি রাগ করেন কেন?

'না না, আমি রাগ করব কেন? বলছিলাম, আবহাওয়া বুঝে সুজে করা উচিত। আপনাদের এখন কিছু না বলাই ভাল। প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছেন?' এই বলে কয়দিন আগের 'ডন' কাগজখানা টেনে বের করলেন।

বললাম, রেখে দিন ওটা। দেখেছি। ওরা চিরকাল কায়েমী স্বার্থবাদীদের সমর্থক। গণতন্ত্র ও জনগণের বিরোধী। কিছুতেই স্বভাব বদলাতে পাবে না।

বললেন, না, না, ওদের মতামত একেবারে উড়ায়ে দেবেন না। উপরের তলায় ওদের মতামতের মূল্য খুব বেশী। আমার কথা হচ্ছে, আপনারা চুপ করে থাকলেই ভাল হয়। অমঙ্গল ডেকে এনে লাভ কি।

বললাম, মঙ্গলের লক্ষণ ত কোনদিক দিয়ে দেখতে পাচ্ছিনা। আমাদের একটা কর্তব্য আছে, দায়িত্ব আছে। অবশ্য অনেক সঙ্কটমুহূর্তে আমরা দুর্বল হয়ে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েছি। কিন্তু যখন সাহস সঞ্চয় করতে পারি, তখন আমাদের যা' কর্তব্য তা' করে যাব। ফল যাই হোক।

নির্বিকার চিত্তে বললেন, কি জানি। আমি এ সব বেশী বুঝিও না। আপনারা যদি ভাল বুঝে থাকেন, তা হলে করুন যা' ইচ্ছা।

এক হাজার নয় শ' বাষট্টি সালের পয়লা মার্চে, ছিয়াত্তী

মোতাবেক এক হাজার তিন শ' একাশি সনের তেইশে রমজান আয়ুব খাঁর প্রণীত শাসনতন্ত্র ভূমিষ্ট হল।

আল্লাহর নামে শুরু ও নিজের নামে শেষ করে ভূমিকা করেছেন—

'এক হাজার নয় শ' ষাট সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পাকিস্তানের জনগণ আমাকে যে ম্যাণ্ডেট দিয়েছে, তারই বলে বলীয়ান হয়ে, পাকিস্তানের উত্তরোত্তর অগ্রগতি লাভ, বিশ্ব দরবারে মর্যাদার আসন গ্রহণ, আন্তর্জাতিক শান্তি, মানবতার কল্যাণ সাধনে পাকিস্তানের জনগণের যথাযোগ্য সহায়তা প্রদান, ইত্যাদি শুভ ইচ্ছায় প্রণোদিত হয়ে আমি অমুক, হিলালে পাকিস্তান, হিলালে জুর'আত, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট অদ্য তারিখে এই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করলাম।'

এক ব্যক্তির দেওয়া শাসনতন্ত্র! পাকিস্তানের 'জনগণ' উল্লেখ অবান্তর। তারা কোন ম্যাণ্ডেট দেয় নাই

শাসনতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট—এক: সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত। প্রেসিডেন্ট—যিনি এর প্রণেতা তিনিই সর্বক্ষমতার অধিকারী। বাকী সব হুকুম বরদার।

দুই: জনগণের উপর পূর্ণ অনাস্থা। এরই ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচিত। জনগণকে বিশ্বাস করা চলে না। গণতন্ত্রীরাই ভোটবাট দিয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবে। পরিষদও তারাই নির্বাচন করবে।

গণতন্ত্রের বর্হিবাস বহাল করা হয়েছে। অন্তর অসার। কেন্দ্রে ও প্রদেশে পরিষদ হবে। তাদের অধিবেশনও হবে। সেখানে বক্তৃতা, তর্ক বিতর্ক, প্রশ্নোত্তর সবই হবে। তার জন্য আইন কানুনও প্রণীত হবে। অর্থাৎ সংবাদপত্রের খাদ্য পুরাপুরি থাকবে। পরিষদে সব বিষয়ের আলোচনা হবে। দেশী ত বটেই—বিদেশীও। এমনি বাজেটও আলোচনা করা চলবে। কিন্তু তার উপর ভোটাভুটি চলবে না। স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়ে যাবে।

অর্থাৎ, পরিষদ রবারষ্ট্যাম্প, পঙ্গু ও ক্লীব। তবুও সদস্যদের মানমর্যাদা আছে। পদাধিকার আছে। বেতন আছে। ভাতা আছে। রাহা খরচও আছে। আপ খোরাকী নয়।

মন্ত্রীমণ্ডলী থাকারও ব্যবস্থা আছে। তারা মণ্ডলে ঘুরে বেড়াবে। প্রয়োজন বোধে মন্ত্রণাও দিতে পারবে। তাদের গাড়ী বাড়ী, তার উপর জাতীয় পতাকা উড্ডীন থাক্‌বে। আরদালী চাপরাসীও থাক্‌বে। থাক্‌বে না শুধু ক্ষমতা। দেশের কোন কাজ করার কোন শক্তি তাদেব থাক্‌বে না। ক্ষমতা থাক্‌বে প্রেসিডেণ্টের হাতে, এবং তাঁরই হুকুমে গভর্ণর ও কর্মচারীরাও ক্ষমতার অধিকারী হবেন।

সদস্য অসদস্য যে কোন ব্যক্তি মন্ত্রী হতে পারবে। তবে সদস্য মন্ত্রী হয়ে গেলে, তার সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে।

দেশে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নাই। প্রতিষ্ঠান বা দলের নামে কেউ নির্বাচন চালাতে পারবে না। নির্বাচনে বক্তৃতার ব্যবস্থা নাই। কেন্দ্রে প্রায় পাঁচ ছয় শ', প্রদেশে প্রায় আড়াই শ' তিনশ ভোটার মৌলিক গণতন্ত্রী। তাদের জন্য জনসভাব কি প্রয়োজন? সরকারই তার ব্যবস্থা করবে। প্রজেকশন বা পরিচিতি সভা। প্রার্থীরা নিজেদের প্রজেকট অর্থাৎ, বিস্তাব করবে সেই সভায়। তাদের গুণগান, খ্যাতি, কৃতিত্ব, এ সবেব বর্ণানা দেবেন। গণতন্ত্রীরা প্রশ্ন করতে পারবে। বিচাব বিভাগীয় কর্মচারীরা এইসব সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

এক হাজার নয়শত ষাট সনে ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত গণ ভোটের ফলাফল মতে, শাসনতন্ত্রে অনুরূপ বিধান থাকা সত্বেও ফিল্ড মার্শাল মহম্মদ আয়ুব খাঁ হিলালে পাকিস্তান, হিলালে জুর'আত, নতুন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেণ্ট হবেন। এটাও শাসনতন্ত্রের বিধানভুক্ত হল।

গণভোট নামে যে আস্থা-অনাস্থা ভোট হয়েছিল—সেইটা।

আরও বিধান আছে: শাসনতন্ত্র চালু হবার পরদিন থেকে তিনি তিন বছর ষাট দিন, ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন।

ছাপান্ন সালের শাসনতন্ত্রে ইসলামিক রিপাবলিকের ইসলামিক কথাটা বাদ দিয়ে শুধু রিপাবলিক অব পাকিস্তান করা হয়েছে। এই পরিবর্তনের বিরুদ্ধে একটি প্রাণীও উচ্চবাচ্য করে নাই। খবরের কাগজওয়ালারাও না। কয়েক বছর আগে আওয়ামী মুসলিম লীগের 'মুসলিম' শব্দটা বাদ দেওয়ার জন্য যে সব রাজনীতিক ও সাংবাদিকরা আমাদের এক হাত নিয়েছিল, তারাও না। 'মুসলিম' বাদ দেওয়ায় কষ্ট হয়েছিল কিন্তু 'ইসলাম' বাদ দেওয়ায় আক্ষেপও নাই।

কিংবা সময় খারাপ, তাই বলার সাহস হয় নাই।

এতকাল পাকিস্তানের রাজধানী ছিল করাচী। সেটা বাতিল হয়ে গেল। দেশের এক প্রান্তে রাওয়ালপিণ্ডি ছাড়ায়ে একটি অনাবাদী স্থানে রাজধানী স্থাপন করা হবে। নাম দেওয়া হবে ইসলামাবাদ। পাকিস্তানের 'ইসলাম' কেটে রাজধানীর মাথায় চড়ায়ে তাকে ইসলামে দীক্ষিত করা হল। কি কারণে এতকালের রাজধানী বাতেল করা হল তার কারণও কেউ জানতে পারে নাই। সেনাবাহিনীর হেড কোয়াটারের নিকটবর্তী স্থানে থাকা নিরাপদ মনে করা হতে পাবে। বলা হল, করাচীর আবহাওয়া গরম। ঠাণ্ডা হাওয়ার প্রয়োজন। তাই এই পরিবর্তন।

কয়েক শ' কোটি টাকা খরচ করে করাচী গড়ে তোলা হয়েছিল। পূর্ব-পাকিস্তানের দানও ছিল মোটা রকমের। করাচী এখন পশ্চিম পাকিস্তানের এলাকাভুক্ত একটি শহরে পরিণত হল। পূর্ব-পাকিস্তানের দেওয়া টাকার কি হবে, তার কোন উল্লেখ নাই কোথাও।

সুপ্রিম কোর্ট ও হাই কোর্টের ক্ষমতা বিপুলভাবে খর্ব করা হয়েছে শাসনতন্ত্রে। তাদের উপরও কি আস্থার অভাব?

জনসাধারণের কোন অংশের উপরই আস্থা নাই, এই কথাটাই অত্যন্ত প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে শাসনতন্ত্রে। সব ক্ষমতা এক ব্যক্তির হাতে, এ কথা বুঝতে কষ্ট হয় না। কাজেই শাসনতন্ত্রে খুব সরল ও সহজ কথাও বলা চলে। বিভিন্ন পর্যায়ে ও সংস্থায় ক্ষমতা বিকেন্দ্রীভূত হলে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। জটিলতা বাড়ে। মানুষের মনে দ্বিধা-সংকোচ বৃদ্ধি পায়। শাসনতন্ত্রে সে সব সাবধানে এড়ায়ে চলা হয়েছে। এই সব কারণে শাসনতন্ত্র সাধারণ মানুষের বুদ্ধিমত্তার সাথে খাপে খাপে মিলে গেছে।

শাসনতন্ত্র প্রকাশিত হওয়ার পর পরই ইলেকশনের গুঞ্জনধ্বনি উঠল। কিছুদিন যেতে না যেতেই চারদিক মুখর হয়ে উঠল নির্বাচনের কলরবে।

আমাদের দেশের মানুষ নির্বাচন বলতে পাগল। অদ্ভুত ব্যাপার! ইলেকশনের কি উদ্দেশ্য, ফলাফল হিতাহিত এ সব চিন্তা না করেই ইলেকশনে মেতে উঠে। নেশার মত মোহগ্রস্ত করে তুলে ইলেকশন।

কর্মী ও অকর্মী এমনকি অকর্মণ্যও কর্মব্যস্ত হয়ে উঠে। কিছু লাভ না হলেও নির্বাচনটাই লভ্য। ঘুরাফেরা, সাইকেল মোটর-গাড়ী চড়া, নৌকাবিহার, চুঙ্গা ফুঁকা, এ সব ব্যাপারে তরুণ ও বালকরা মাতোয়ারা হয়ে উঠে। এ ছাড়া পোষ্টার প্ল্যাকার্ড বিজ্ঞাপণ হ্যাণ্ডবিল ছাপার ব্যবস্থাও করতে হয়। হাতে আঁকা ছবি, নক্‌শা, ব্যঙ্গচিত্র এসব করতে লেগে যায় নবিশ শিল্পীর দল। সবাই কর্মব্যস্ত। যে যা পারে তাই করে। কিছু না-কিছু করতেই হয়।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও ভাল। প্রার্থী ধনী হলে ত কথাই নাই। গরীব প্রার্থীর পয়সাও জুতে জোগায়। কর্মীদের কাছে ত দুর্বলতা প্রকাশ করা চলেনা। তার উপর পাওনা-গণ্ডা। বেশ

ভিড় জমে ইলেকশন ক্যাম্পে। মনের স্বাভাবিক অবস্থা কারুরই থাকেনা।

এটা জনসাধারণের নির্বাচন নয়, এবং তাদের ভোটাধিকার নাই, তা সত্বেও তাপমাত্রা কম উঠে নাই।

রাজনৈতিক দল জীবন্ত না থাকলেও রাজনৈতিক কর্মীরা জীবন্ত। উপদেশ ও নির্দেশের জন্য আমাদেরও উত্ত্যক্ত করে তুলল।

অগত্যা আমরা সব দলের নেতৃবৃন্দ যারা ঢাকা ছিলেন তাদের নিয়ে বৈঠক করলাম। মার্শাল ল' উঠে গেলে বাইরে ভিতরে দু-ধারি সংগ্রাম চালাতে হবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য। এই যুক্তিতে অনেকেই ইলেকশনে অংশ গ্রহণ করার পক্ষে রায় দিলেন।

জেলে যাবার আগে সোহরাওয়ার্দীও এই অভিমত দিয়েছিলেন।

চুরান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে বিরাট বাধা এসে পড়ল। তারা ইলেকশনের ঘোর বিরোধী। বলল, আমরা এই শাসনতন্ত্র বিরোধী। আপনারা এই শাসনতন্ত্রের বিধানমতে কেমন করে নির্বাচনে যোগদান করতে পারেন।

মহা মুশকিল! ছাত্রদের বক্তব্য ও আপত্তি উপেক্ষা করা চলে না। তারাই বর্তমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোভাগে। মার্শাল ল' আমলের বিরোধিতা করে শাস্তিও কম ভোগ করে নাই।

জেলখানায় গেলাম পরামর্শ করতে। মাণিক মিঞা, আবুল মনসুর ও শেখ মুজিবের সাথে। মুজিবের সাথে সাক্ষাৎ হল না। আর দু'জনকে পেয়ে গেলাম। তাঁদের ব্যক্তিগত মতামত যাই থাকুক না কেন, ইলেকশনের বিপক্ষে রায় দিলেন। বললেন, আপনারা ঘরে বসে আছেন। কাজ যা করার ছাত্ররাই করছে। ওদের প্রস্তাব উপেক্ষা করা চলেনা। বাদ দেন ইলেকশন।

অন্যান্য নেতৃবৃন্দের কানে যখন এই খবর পৌঁছল, তাঁরা মহা খাপ্পা হলেন। দোষটা তারা সরাসরি আমার ঘাড়েই চাপল তাঁরা বললেন, একবার মতামত দিয়ে অন্যের প্রভাবে তারা পরিবর্তন

এটা আমরা পারব না। এ রকম নেতৃত্ব আমরা করিনা।

কিন্তু শেষপর্যন্ত ইলেকশন বিরোধী রায়ই বহাল রইল। ছাত্ররা অনেক নেতার বাড়ীতেই হানা দিল। অসন্তুষ্ট হলেও শেষ পর্যন্ত তাঁরা রাজী হলেন।

দায়িত্ব হল এখন আমার—ইলেকশন বর্জনের। সর্বত্র লোক পাঠায়ে দলীয় প্রার্থীদের বারণ করে দিতে হল। অনেকে আমাদের নির্দেশ মানল। অনেকে বলল, ওরা কে? রাজনীতি নাই, নেতৃত্ব এল কোথেকে? কে নেতা, কেবা হাই কমাণ্ড। সুতরাং হুকুম তামিল করা চলবে না। তারা ইলেকশন করল। যারা বেশী গরম ছিল তাদের অনেকেই হেরে গেল। কয়েকজন মাত্র জয়লাভ করল।

তেইশ

ইলেকশনে আমাদের অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্তে সরকারপক্ষ বিচলিত হল। দেশে রাজনীতি নাই, রাজনৈতিক দলও নাই—দলীয় ভিত্তিতে ইলেকশনও হবে না। তবুও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের ইলেকশন যোগদান না করা শাসনতন্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা। শাসকবর্গ এটা বুঝতে পারল। নতুন শাসনতন্ত্র, নব বিধান, অভিনব দর্শন—দেশবাসীর সার্বিক কল্যাণের জন্য এসব করা হচ্ছে অথচ তাদের কোন উৎসাহ নাই, শুভ প্রতিক্রিয়ার লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। এটাও ভাল লক্ষণ নয়।

নানাদিক থেকে অনুনয় বিনয় শুরু হল। অনেকেই খুচরা ও পাইকারী উপদেশ বিতরণ করল। বৃটিশ আমলে কংগ্রেস কি করেছে না করেছে, আর তার ফল কি দাঁড়ায়েছে এসব

নজিরও দেখান হল। মাঝে মাঝে কর্মীরা এসব শুনে শুনে মনমরা হয়ে যেত। বলত, কাজটা বোধ হয় ভাল হয় নাই।

সান্ত্বনা দিয়েছি। যদি ভুল হয়েই থাকে ত হয়েছেই। এখন ত শোধরাবার উপায় নাই। রাজনৈতিক জীবনে অনেক ভুল করেছি, না হয় আর একটা বাড়ল।

সেনাবাহিনীর এক মাঝারি অফিসার একদিন এসে হাজির। বলল, মার্শাল ল' উঠে যাচ্ছে। এই ত সুযোগ আপনাদের। আবার প্রতিষ্ঠিত করুন আপনাদের নেতৃত্ব। এখন কি অভিমানের সময়? আপনাদের স্থান আপনারা দখন করুন।

বললাম, বড় আশ্চর্যের কথা! আমরা ফিরে আসব? এ প্রলোভন আপনি দেবেন না! বড় ক্ষতি হবে। আপনারা জান্নাতুল ফিরদৌস গড়ে তুলেছেন। মধ্যে শয়তানের ওসওয়াসা ঢুকে পড়লে সব মাটি। জান্নাত জাহান্নাম হয়ে যাবে। আর আপনি সামরিক বাহিনীর একটা ছোটখাট স্তম্ভ হয়ে আপনি কেমন করে এই কুপরামর্শ দিতে এলেন?

একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বললেন, একজন পাকিস্তানী হিসাবেই বলছি। কুপরামর্শ বলছেন কেন? সত্যিই বলছি।

বললাম, তা হয়ত বলছেন। কিন্তু আমরা কি আর কোন কালেও নেতৃত প্রতিষ্ঠা করতে পারব? দয়া করে ওটা বলে লজ্জা দেবেন না। নতুন নেতৃত্ব জন্মলাভ করছে। আমরা সেই নব সৃষ্টির মহা উল্লাসে দিন কাটাতে চাই। মৌলিক গণতন্ত্রী আর তাদের নির্বাচিত পরিষদ সদস্য—এদের নেতৃত্ব লাভ করে দেশ ধন্য হবে। আমরা অনধিকার প্রবেশ না-ই করলাম। সেটা বাঞ্ছনীয়ও হবে না।

অনেক কথা হল। রাজী করতে না পেরে বেজার হয়ে চলে গেলেন। এর পরও অনেকে এসেছে। কথাবার্তা একই ধরণের হয়েছে।

ইলেকশনের কয়দিন আগে থানায় প্রজেকশন মিটিং হল; প্রত্যেক প্রার্থীই ওয়াদা করল, নির্বাচিত হতে পারলে তারা সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম চালাবে। জনগণের ভোটাধিকার ফিরায়ে আনবে। শাসনতন্ত্র আমূল সংশোধন করবে।

গণতন্ত্রী ভোটাররা উল্টা প্রশ্ন করেছে: তা হলে মৌলিক গণতন্ত্র প্রথার কি হবে? ওটা উঠায়ে দিবেন নাকি?

সবাই উত্তরে বলেছে, তা হবে কেন? আপনারা ত থাকবেনই। আপনারা নির্বাচিত হয়েছেন বলেই ত ভোটার। যদি ফেল করেন, তা হলে ভোটার থাকছেন না। এইটা আমরা চাই না। আমরা চাই চিরদিনের জন্য আপনারা ভোটার থাকুন। একবার ভোটার হলে সেটা যেন আর বাতিল হতে না পারে। শুধু তাই নয়, আপনি মরে গেলে আপনার সন্তান সন্ততি, ওয়ারীশানক্রমে ভোটার হয়ে যাবে।

গণতন্ত্রীবা কি বুঝল বলা যায়না। তবে ভোট দিল।

ভোট পেয়ে মেম্বর হয়ে সদস্যরা মূর্তি ধারণ করল। গণতন্ত্র স্থাপনের ওয়াদা অনেকেই ভুলে গেল। ব্যক্তিগত স্বার্থ, পদ বা পদের মোহ তাদের অন্ধ করে দিয়েছে। ভোটাররা দতমত নির্বিশেষে ভোট দিয়েছে। দেশে সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এটা তারাও চেয়েছে। সবাই যদি ভোটের অধিকার লাভ করে তা হলে তাদের কি ক্ষতি! লাভ লোকশানের আবর্তে তখনও তারা পড়ে নাই। অর্থই কাম্য, অর্থই মোক্ষ, এই নতুন দর্শন তখন পর্যন্ত তাদের জ্ঞানায়ত্ত হয় নাই। সেটা পরে।

বাষট্টি সালের আটাশে এপ্রিল নির্বাচন শুরু হল। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ভোটার, কিন্তু ভোটপ্রার্থীর সংখ্যা কম হয় নাই। এর মধ্যে অরাজনীতিকের সংখ্যাই বেশী। য়ুনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানেরাও প্রার্থী। নতুন রাজনৈতিক খেলা। অনেকেই খোয়োয়াড় সাজল। অল্পসংখ্যক ভোট—ভাগাভাগি করে কিছু

পেলেই লাভ। হলও তাই। অনেক জায়গায় তিরিশ বত্রিশ ভোট পেয়েই পরিষদ সদস্য হল। দু'এক জায়গায় সব চেয়ে বেশী ভোট পেয়েও জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। নির্বাচিত শতকরা আটভাগ ভোটও অর্জন করতে পারে নাই।

টাকা পয়সার খেলাই আসল খেলা। জমেছেও ভাল। কম ভোটের বাজারে অল্প পুঁজিতেই কাজ ফতে। ভোটাররা যা পায় তাই নেয়। কুঁড়ার দেবতা খুদে তুষ্ট।

পশ্চিম পাকিস্তানের ধন-দৌলত অনেক বেশী। বড় লোকেই বেশী প্রার্থী হয়েছে। কাজেই টাকার খেলা সেখানে খুব জোরদার হয়েছে। কেউ দশ লাখ, কেউ বিশ লাখ পর্যন্ত খরচ করেছে। ভোটকেন্দ্র রীতিমত খোলা দোকান। দু' হাজার থেকে পাঁচ হাজার ফি ভোটার। প্রকাশ্য ময়দানে লেনদেন। কেউ কোন আপত্তি করে নাই।

ভোটার হতে না পেরে অনেকেই দুঃখ প্রকাশ করছে। একটা মহা সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে গেল।

চব্বিশ

ইলেকশনের আগের দিন শেরে বাংলা ফজলুল হক ইন্তেকাল করলেন। তাঁর বৈচিত্রময় জীবনে কত উত্থান-পতন, কত বিপর্যয় দেখেছেন। কত ইলেকশন জয় করেছেন। কত ভোট সংগ্রহ করেছেন। তাঁর ভোট নাই, এ কথা যখন তাঁর কানে গেল তখন মৃত্যুপথযাত্রী বিরাট মানুষটাকে অধীর করে তুলল। বড় ব্যথায় কাতর হয়ে বললেন, বল কি? আমারও ভোট নাই? এটাও কেড়ে নিয়েছে?

দুইহাত উপরে তুলে সজল নয়নে বলে উঠলেন, আল্লাহ্, যে

দেশে আমার ভোট নাই সে দেশে বাঁচার ইচ্ছাও আমার নাই। আমাকে তুমি তুলে নাও।

আল্লাহ্ তাঁর মোনাজাত কবুল করলেন। ঠিক ইলেকশনের আগের দিন তাঁকে উঠায়ে নিলেন।

শেরে বাংলা একটা ইতিহাস, একটা প্রতিষ্ঠান। বাঙালীর গৌরব। বাঙালীর অন্তরের মণিকোঠায় তাঁর স্মৃতি চিরদিনের জন্য অম্লান থাকবে। গ্রাম বাংলার আদরের দুলাল, আশা ভরসার উৎস, তাদের একান্ত নিজস্ব ফজলুল হক—অতি নিকটতম বান্ধব-দরদী। শত সহস্র দুঃখ বিপদ সঙ্কটে রয়েছেন চির উন্নত-শির। ও শির কোনদিন নত হয় নাই কারও কাছে। স্বার্থবাদীরা তাঁর কুৎসা নিন্দা অপবাদ অজস্র বর্ষণ করেছে। কিন্তু মানুষের কাছে তিনি পেয়েছেন অকৃত্রিম ভক্তি শ্রদ্ধা। কায়েদে আজম থেকে শুরু করে মহম্মদ আলি বোগরা পর্যন্ত তাঁকে গাদ্দার দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু মানুষ একথা বিশ্বাসই করে নাই। তাদের কাছে শেরে বাংলার প্রতি ভক্তি ভালবাসা এক বিন্দু কমে নাই। মানুষের হৃদয়-আসন থেকে তাঁকে এক তিল পরিমাণেও হটাতে পারে নাই।

তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী। বাঙালীর কাছে বাঙালীর মর্যাদা লাভ করার গৌরব তিনিই একা লাভ করেছিলেন। কম আশ্চর্যের কথা নয়। বাঙালীর চরিত্র তিনি পরিবর্তন করে দিয়েছেন।

তিনি চ'লে গেলেন। মর্মন্তুদ দুঃসংবাদ বিদ্যুতের মত ছড়ায়ে পড়ল দেশের সর্বত্র। রাস্তায় জনসমুদ্রে তাঁর লাশ ভেসে চলেছে বাসভবনের দিকে। রেডিও ঘোষণা করেছে বিকালে জানাজা হবে। বাসভবনেই লাশ দাফন হবে।

রাস্তায় গিয়ে লাশের নাগাল পেলাম। রেডিওর ঘোষণা শুনলাম। এটা হতে পারে না। আমরা কিছুদিন আগে থেকেই

স্থির করেছিলাম তাঁকে এমন জায়গায় দাফন করতে হবে যেখানে দেশের মানুষ সব সময়ই জেয়ারত করতে পারে। কার্জন হলের প্রাঙ্গণ য়ুনিভার্সিটির মাঠের প্রান্ত কিংবা হাইকোর্টের সংলগ্ন মাঠের যে কোন স্থান।

বললাম এই কথা। সবাই আনন্দধ্বনি করে সমর্থন করল। বললাম, আজ তাঁর দফন হবেনা। জানাজা হবে কাল বেলা দশটায়। গ্রামের বহু লোক তাঁর জানাজায় শামিল হওয়ার জন্য অস্থির। তাদের বঞ্চিত করা চলবেনা। রেডিও মারফত পাল্টা ঘোষণা করে আগের ঘোষণা বাতিল করতে হবে।

চীপ সেক্রেটারীকে টেলিফোনে বললাম। তিনি রাজী হলেন কিন্তু স্থান সম্বন্ধে গভর্ণরের মতামত প্রয়োজন বললেন। নান্না মিঞার নেতৃত্বে কয়েকজনকে লাটভবনে পাঠায়ে গভর্ণরের অনুমতি আনা হল। স্থান নির্দিষ্ট হল, হাইকোর্টের সংলগ্ন ভূমি।

পরদিন ভোর থেকেই আউটার ষ্টেডিয়ামে লোকে লোকারণ্য। তিলধারণের স্থান নাই। রাস্তায়, দালানের ছাতে, গাছের ডালে সর্বত্র মানুষ। গভর্ণর আজম খাঁ মিছিলে যোগদান করে লাশ নিয়ে এলেন। জানাজার পর দাফন করা হল।

পল্টন ময়দানে শোকসভা করবার প্রস্তাব করলাম আমরা। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি নিতে হয়। দরখাস্ত করলাম—অর্থাৎ চিঠি দিলাম। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সরকারী চাঁই—খয়ের খাঁ। এতে তিনি রাজনীতির গন্ধ পেলেন। রাজনীতি তৎকালে হারাম। সভা বন্ধ করার নানা বাহানা তিনি খুঁজতে লাগলেন।

জানাজা ও দফন মহাসমরোহে হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি দফন করার প্ল্যানটাও ব্যর্থ হয়ে গেছে। মৃত্যুর গৌরবের ঔজ্জল্য ম্লান করা গেলনা। এখন কি করা?

চিঠি দিয়েছিলাম লোক মারফত। খয়ের খাঁ প্রাথমিক আপত্তি তুললেন: দরখাস্ত আইন মাফিক হয় নাই। নাম ধরে

চিঠি দেওয়া চলবে না। নামের আগে প্রিয় ব্যবহার করলেও না। সরকারী কায়দায় লেখতে হবে। তাই লিখে দিলাম চিঠি নয়, আবেদন। পত্রবাহককে জানায়ে দিলেন, তাঁর আদেশ পরে জানাবেন।

সন্ধ্যার সময় টেলিফোনে জিজ্ঞাস করলাম, কি হয়েছে?

তিনি অবাক করে দিলেন। বললেন, আরও দরখাস্ত পড়েছে। মিউনিসিপ্যালিটির কর্তাও একই উদ্দেশ্যে দরখাস্ত করেছেন!

খুব রেগে গেলাম। এই ব্যবহারে রাগ না হয়ে পারে? বললাম, দরখাস্ত পড়েছে? চাকুরীর বাজার নাকি? তারপর মুখে যা' এল বললাম। এখন মনে নাই কি বলেছি। বললাম, দরখাস্ত পড়ে থাকলেও আমার দরখাস্তের পরে। সুতরাং গ্রহণযোগ্য নয়।

শেষপর্যন্ত বললাম, এখন কি করতে চান?

অতি ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দিল, কমিশনার সাব মাঠের মালিক, তাকেই জিজ্ঞাস করুন!

থেমে যাওযা রাগ আবার জ্বলে উঠল। বললাম, এতক্ষণ তা হলে আমার সাথে তামাশা হচ্ছিল? সোজাসুজি বলে দিলে এই গালিগুলি শুনতে হত না।

কমিশনার ঢিলা ঢালা মানুষ। চেহারা ও হাসি উভয়ই মনোমোহন। জিজ্ঞাসা করলাম, কি করতে পারেন? সব শুনে অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বিজ্ঞজনোচিত ভাষায় বললেন, একটা সভার ব্যবস্থা যখন হয়েই গেছে, তা হলে ওখানেই আপনারা যোগদান করলেই ভাল হয়।

তাহ'লে মিউনিসিপ্যালেটির দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছে—আমারটা বাতিল।

বললাম, কি অমূল্য উপদেশ আপনি বিতরণ করলেন। আমার মোটা মাথায় এতক্ষণ এ কথাটা ঢোকেই নাই। ধন্যবাদ।

ঝগড়া আর কাহাঁতক করা যায়। কর্মচারীরা রাজত্ব [illegible]

করেছে। তারা চক্রান্ত সৃষ্টি করে আমাদের প্রচেষ্টাকে বানচাল করে দিল। রাজনীতিকরা কোন উপলক্ষ নির্ভর করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে এটা শাসকশ্রেণী বরদাশ্‌ত করতে পারে না।

খবরের কাগজে বিবৃতি দিয়ে পরদিন সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলাম।

সভা একটা হল ময়দানে। কমিশনার সভাপতি। এ, টি, মোস্তফা ও আরও দু'একজন বক্তৃতা দিল। বক্তারা কেউ না জানে ফজলুল হকের জীবনাদর্শ, না আছে তাঁর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা-ভক্তি। লৌকিকতা বজায় রেখে বক্তৃতা দেওয়া হল। হাজার দুই তিন দর্শক বা শ্রোতা। ও মাঠে বিকাল বেলা এমনি হাজার দু'হাজার লোক জমায়েত হয়। নানা উদ্দেশ্যে।

আমরা অতঃপর প্রস্তাব করলাম, শেরে বাংলাব নামে একটা স্মৃতিসৌধ করার। একটা শক্তিশালী কমিটি গঠন করার চেষ্টা করা চলছে, হঠাং দেখা গেল, খবরের কাগজে ঘোষণা—একটা সরকারী কমিটি গঠিত হয়ে গেছে। কমিশনার তার চেয়ারম্যান।

শেষ তুড়ুক। আমাদের কিস্তি মাৎ হয়ে গেল। আমরা একটা কমিটি গঠন করলে সরকারেব নাক-কান কাটা যাবার আশঙ্কা থাকত, সেই জন্য নিমকহালাল কমচারীরা নাক ও কান অক্ষত রাখার দায়িত্ব নিল। কমিটি গঠন করে দায়িত্ব শেষ। শোনা যায় টাকা কিছু উঠেছে। স্মৃতিসৌধ উঠবে কিনা কে জানে।

নির্বাচনের পালা শেষ হবার পর বিজয়ী সদস্যদের পালা শুরু হল। তারা নির্বাচিত হওয়ার ফলে দেশের আবহাওয়া সম্পূর্ণ বদলে যাবে, আর একটা বিপ্লব দেশে সংঘটিত হবে, এই সব বাগাড়ম্বর তারা শুরু করে দিল।

বগুড়ার মহম্মদ আলী চাটগাঁ এক সমাবেশে গরম বক্তৃতা দিলেন—বামপন্থীদের মত। তাঁর বক্তৃতা শুনে অনেকেই ভাবল,

পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রদূত। ছুটি নিয়ে দেশে এসে ইলেকশনের তোড়জোড় দেখে নেমে পড়লেন। জয়লাভ করলেন। বক্তৃতায় বললেন, একটা নতুন কিছু করে ফেলবেন তিনি। সে জন্যই ইলেকশনে যোগদান করেছেন। অজস্র ধন্যবাদ জিন্দাবাদ পেলেন বিভিন্ন সম্বর্দ্ধনা সভায়।

খুলনার আব্দুস সবুর খাঁ—স্বনামধন্য। তিনিও গরম। আয়ুব শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে কি বলবেন, তার মহড়া দিলেন ঢাকা এসে। শাহ আজিজের সাহায্যে একটা খসড়া বক্তৃতাও রচনা করলেন। কিন্তু পিণ্ডি যাত্রার সময় ভুলে সেটা রেখে গেলেন বন্ধুর কাছে।

চাটগাঁর ফজলুল কাদের চৌধুরী, লাঠি হাতে উচ্চাহাস্যে সবাইকে জানায়ে দিলেন, গরু ছাগলের দামে ভোট কিনে মেম্বর হয়েছেন। দেখায়ে দেবেন কেমন করে এরা টিকে থাকে। এক বন্ধুকে বললেন, মেম্বার কি সাধে হয়েছি? আয়ুব শাহীর অবসান ঘটানের জন্যই ত এলাম। ইত্যাদি।

ভাবভঙ্গি বোলচাল দেখে মনে হল, একটা কিছু হতে যাচ্ছে। অন্ততঃ জনগণ যদি তাদের ভোটাধিকার ফিরে পায়, তা হলেই সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে আমরা একধাপ অগ্রসর হতে পারব।

কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য। যারা বেশী গরম বক্তৃতা দিলেন তারাই অতি তাড়াতাড়ি ভিড়ে গেলেন আয়ুব খাঁর সাথে। পদার্থ বিজ্ঞানের ধারাই নাকি তাই। সেই পুরাতন রাজনৈতিক খেলা শুরু হল—অর্থাৎ মন্ত্রীত্বের কোন্দল। কে মন্ত্রী হবে, এই নিয়ে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

পিণ্ডি রওনা হবার আগে ময়মনসিংহের আব্দুল মোনায়েম খাঁ বাড়ী বসে অযথা বিনা কারণে সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে বিষোদগার করে এক বিবৃতি দিলেন। ছাত্র সমাজের বিরুদ্ধে কটূক্তি করলেন। এসব ব্যাপারে বরাবরই তিনি সিদ্ধহস্ত।

সরকারের সাথে থাক্‌তে হলে কি করা দরকার তা তিনি ভালই বুঝতেন।

বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল ঢাকা এয়ারপোর্টে। ছাত্ররা ঘিরে ফেলল। নানা ধরণের প্রশ্ন, এমনকি রসিকতাও করল। কেউ কেউ চাটি মেরে মাথার টুপি ফেলে দিল। হাত পা' ধরে টানাটানি করল। এক পর্যায়ে তাল সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়েও গেলেন।

তিনি কিন্তু নির্বিকার। যেন বিশেষ কিছুই হয় নাই। বুঝতে পারা গেল, নির্ঘাৎ মন্ত্রী হবেন। এত ত্যাগ ব্যর্থ হবার নয়।

সবুর খাঁ মার্শাল ল' আমলে জেল খেটেছেন। এটাও সার্টিফিকেট—মন্ত্রী হবার। জেল খেটেছেন এইটাই ত্যাগ। কি কারণে সেটা অবান্তর। আমার থানার একজন দালাল শ্রেণীর ছোকড়া—রাজনীতিক কর্মী বলে পরিচয় দিয়ে বেড়ায়। টিন চুরি করে বছর খানেক জেল খাটে। বাইরে এসে যে কোন দরবারে বলে বেড়াত, এই ত আমরা জেলে ছিলাম ভাসানী, মজিবর রহমান প্রভৃতি এক সঙ্গে। অনেকেই মনে করে এও একজন দেশ-দরদী।

এই সব মহারথীরা পিণ্ডি পৌঁছে একই কাজে লেগে গেলেন—কেমন করে মন্ত্রী হওয়া যায়। বগুড়ার মহম্মদ আলী, ফজলুল কাদের চৌধুরী, এমনকি ফরিদ আহম্মদ নামের তালিকা প্রস্তুত করতে লেগে গেলেন। কার দলে কত।

বাঙালী স্পীকার করা হবে। তার সমর্থনে সদস্যদের তালিকা সৃষ্টি করা হল।

এটা কাজে লাগালেন মহম্মদ আলী। আয়ুব খাঁকে দেখায়ে বললেন, তাঁর দলে এত লোক আছে। এই দলিলের বলেই মন্ত্রিত্ব গঠিত হল।

কিন্তু মহম্মদ আলি প্রমুখ আপত্তি তুললেন। আইনের বিধান

মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করলে সদস্যপদ বাতিল হয়ে যায়। এরা ভয় পেয়ে গেলেন। মন্ত্রিত্ব অনিত্য, কখন কি হয় বলা যায় না। এক ব্যক্তির খেয়ালের উপর নির্ভরশীল। মেম্বরশিপ স্থায়ী, অন্তত আগামী ইলেকশন পর্যন্ত।

শাসনতন্ত্রে ব্যবস্থা আছে, প্রেসিডেন্ট ইচ্ছা করলে শুধুমাত্র আদেশের বলে বিশেষ অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্রের বিধানে সংশোধন করতে পারেন। বাঙালী সদস্যরা এই ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য আয়ুব খাঁকে ধরল। তিনি বাধ্য হয়ে সম্মত হলেন এবং শাসনতন্ত্রের বিধান সংশোধন করলেন। এদের শঙ্কাও দূর হল। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করলেন।

পরবর্তীকালে এই সংশোধনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। হাইকোর্ট রায় দিলেন, প্রেসিডেন্ট ঐ বিধান প্রয়োগ করার অধিকারী নন। সুতরাং সংশোধন অবৈধ ঘোষিত হল। এর বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল দায়েরও হল। সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের রায় বহাল রাখলেন। অর্থাৎ এঁদের মন্ত্রিত্ব বহাল রইল, কিন্তু সদস্যপদ বাতিল হয়ে গেল।

আয়ুব খাঁরও খুশী হবার কথা। তাঁর ইচ্ছা ও নীতির বিরুদ্ধে চাপ দিয়ে তাঁকে বাধ্য করা হয়েছিল এই সংশোধন করতে। কিন্তু দেখা গেল, তাঁর রায়ই ঠিক। তাঁর রায় অনড়। তিনি নিজেও বদলাতে পারেন না।

ঐ অবস্থায় চাপ দিয়ে বহুকিছু আদায় করা যেতে পারত। এরা যদি বেঁকে বলত যে, জনগণের মৌলিক অধিকার স্বীকার না করলে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করতে পারিনা, তা হ'লে আয়ুব খাঁ বাধ্য হয়ে তাদের এই দাবী মানতেন। কারণ, পূর্ব-পাকিস্তানীরা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ না করলে শাসনতন্ত্রে অচলাবস্থার সৃষ্টি হতে বাধ্য। আয়ুব খাঁর গত্যন্তর ছিল না।

কৌতূহলী মহল, যারা সেকালে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এরা এইরূপ

লীলাখেলা মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা অত্যন্ত দুঃখ করে বলেছেন, বাঙালী সদস্যরা মন্ত্রিত্বের লোভে জনগণের দাবী দাওয়া নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। নিজেদের প্রতিশ্রুতিও ভুলে গিয়েছিলেন। নিজেদের স্বার্থের প্রশ্নই তাদের চোখের সামনে বড় হয়ে দেখা দিল, এবং মাত্র সেই ব্যাপারেই তারা আয়ুব খাঁকে চাপ দিয়ে কাজ হাসিল করলেন। তারা যদি আর একটা দিন মাত্র ধৈর্য ধরে ঝুলে থাকতে পারতেন, তা হ'লে অনেক কিছু আদায় করা যেত। কিন্তু তারা ধৈর্য ধরতে পারেন, সে সাহস কোথায়? তাদের ভয় ছিল বেশী টানাটানি করলে দড়িই না ছিঁড়ে যায়, অর্থাৎ আসলই হাতছাড়া হয়ে না যায়। কাজেই তাদের অসুবিধা দূরীভূত হওয়ায় তারা মনের আনন্দে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করতে গেলেন।

মহম্মদ আলী বোগরা, ফজলুল কাদের চৌধুরী, সবুর খাঁ, ওহীদুজ্জমান আর মোনায়েম খাঁ মন্ত্রী হলেন পূর্বাঞ্চল থেকে। সবুর খাঁর নাম বদলে গেল—হল খান এ-সবুর, সাধারণ লোক বলে খানে সবুর—পাঠানী সংস্করণ। তার প্রকৃতিও তাই। মোনায়েম খাঁ হলেন—মুনীম খাঁ, উর্দু সংস্করণ। মহম্মদ আলি হলেন লীডার অব দি হাউস—দলের সর্দার।

মোনায়েম খাঁর টুপিও বদলে গেল। এয়ারপোর্টে যে টুপি পরে গিয়েছিলেন, সেটা ছেড়ে দিয়ে ধরলেন কিস্তি। সে কিস্তি সেই যে মাথায় চড়ল তা আর নামে নাই।

বহুলোক ছিল মন্ত্রিত্বের উমেদার। বহুদিন পর্যন্ত আশায় আশায় দিন কাটল।

এখানে গোলাম ফারুক গভর্ণর হয়ে এলেন। খুব করিৎকর্মা মানুষ। সরকারী চাকুরী আর বেসরকারী তদবীর করে বহু অভিজ্ঞতা ও প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেছেন। একবার আয়ুব খাঁর সাথে মতানৈক্য হওয়ায় চাকুরী ছেড়ে দিয়েছিলেন। বিশাল

পুঁজিপতিদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে বলে আয়ুব খাঁ তাকে গভর্ণর করে নিলেন।

গভর্ণর হওয়ার কিছুদিন আগে ঢাকা এসে আমার সাথে দেখা করেন এবং বলেন যে তাকে লাটগিরির অফার দেওয়া হয়েছে। আমার মত কি?

বললাম, আমার মতামত সম্পূর্ণ অবান্তর। আপনি টিকে থাকতে পারবেন কিনা। আব একবার ত মতান্তব হয়ে যাওয়ায় ছেড়ে দিতে হয়েছিল চাকুরী।. বাঁরবার মতান্তবের কারণে চাকুরী ইস্তফা দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

বললেন, না, এবার বোধ হয় মতান্তর হবেনা। আমার কাজে তিনি বাধা দেবেন না, এই আশ্বাস আমাকে দিয়েছেন। আর তার পবই আমি রাজী হয়েছি।

বললাম, বেশ করেছেন।

বললেন, সোহরাওয়ার্দীর মতামত নিবার খুব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু জেলখানা থেকে ত খবর নেওয়া যাবে। তাই ভাবলাম, আপনার সাথে দেখা করে আপনার মতামত জেনে নেই। কথাপ্রসঙ্গে মর্ণিংনিউজের কথা উঠল। তিনি বললেন, এই কাগজখানা অনর্থক বাঙালী বিদ্বেষী। অর্থ সরবরাহ কবে গুল মহম্মদ—তিনি কিন্তু ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন না, কি পরিমাণ বদনাম তাঁর নামে কেনা হচ্ছে তাঁরই অর্থে। তাই তাঁকে পরিষ্কার বলেছি, এসব চলতে পারে না। এই দেশে ব্যবসা করছেন, এই অঞ্চলের মানুষের শুভেচ্ছা আপনাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এদের আলাদা জাত মনে করলে এদের সহানুভূতি কখনও পাবেন না। ফলে এখানে বাস করা দুষ্কর হয়ে পড়বে। এই খবরেব কাগজখানা অন্য কারুও হাতে ছেড়ে দিন। গুল মহম্মদ রাজী হয়েছেন। আমি ভাবছি, আপনাদের হাতে এটা দিলে কেমন হয়। বাঙালীর স্বার্থ-রক্ষার সংগ্রামে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁদের কাছেই

হস্তান্তর হওয়া উচিত। সাথে সাথে একখানা বাংলা কাগজও বার করতে হবে। প্রয়োজন হলে মর্নিংনিউজ নামটা বদল করে অন্য নাম দিলেই বোধ হয় ভাল হয়। নামটার প্রতি লোকের বিতৃষ্ণা এসে গেছে। গুল মহম্মদ সব তাতেই রাজী।

বললাম, খবরের কাগজ সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতা নাই। এ ব্যাপারে যাদের সাথে আলাপ করা উচিৎ তারা সব জেলে। দেখি তাদের সাথে আলাপ আলোচনার জন্য সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে পারি কিনা। তারপর আঁপনাকে জানাব।

বললেন, ফিবে এসে একটা চুড়ান্ত ব্যবস্থা করব।

দিন কয়েক পরই ফিরে এলেন। এলেন গভর্ণর হয়ে। একদিন দেখা হল। আবেকদিন সাথে বসে 'লাঞ্চ'ও খাওয়ালেন। কিন্তু সংবাদ পত্রের ব্যাপারে আর কিছু করেন নাই।

গোলাম ফারুক উন্নয়নমূলক ও সৃজনশীল পরিকল্পনার দিকে মন দিলেন। নিজে আমলা ছিলেন বলে আমলাদের শ্রদ্ধাভাজন হলেন।

সরকারী কর্মচারীরা উচ্চশিক্ষা লাভের অজুহাতে অজস্র বিদেশী মুদ্রা অপব্যয় করে ভ্রমণ বিলাস করে ফিরে আসে। এটা তিনি অত্যন্ত আপত্তিজনক মনে করেন। অনর্থক বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণের তিনি বিরোধী। প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয়ে গভর্ণমেণ্ট হাউস নির্মাণকে তিনি অপরাধজনক কার্য মনে করেন। পঞ্চাশ লাখ টাকা ব্যয়ে সায়েন্স লেবরেটরির কথা উল্লেখ করে একদিন বললেন, এত অর্থব্যয়ে যে অট্টালিকা নির্মাণ করেছে, এতে হয়ত পাঁচ লাখ টাকার যন্ত্রপাতিও থাকবে না, অথচ অল্প টাকা ব্যয়ে গৃহ নির্মাণ করে তাতে বেশী টাকার কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করাই উচিত ছিল। গরীব দেশের পক্ষে এসব চাকচিক্য-আত্মপ্রবঞ্চনা সামিল।

মন্ত্রীরা গাড়ীর মাথায় ঝাণ্ডা উড়ায়ে আরদালী চাপরাশী

সমভিব্যহারে ভ্রমণ ও বিলাসে কালাতিপাত করেন, এটারও তিনি নিন্দা করেন।

তিনিও একটা মন্ত্রীসভা গঠন করলেন, অর্থাৎ সভ্যমন্ত্রী। মন্ত্রীরা শুধু আসর জাঁকায়ে গল্প করেন। ক্ষমতা সব সেক্রেটারীদের হাতে। ক্ষমতা না থাকায় এরা নিষ্ফল আক্রোশে বৃথা আস্ফালন করেন।

এখানেও মন্ত্রী হবার জন্য অসম্ভব রকম তদবীর। পাগলের মত চারদিকে দৌড়াদৌড়ি। একজন ত পাগল হতে হতে বেঁচে গেল। টাকা পিণ্ডি উড়াউড়ি করল। শুধু মানুষই নয়, দ্রব্য সম্ভারও। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

গোলাম ফারুক চলে যাবার পর মোনায়েম খাঁর আমলেও তার তদবীর অব্যাহত রয়েছে। একদা নুরুল আমিনকে গিয়ে ধরল। বলল, তদবীর সব হয়েই গেছে এখন আপনি একটু বলে দিলেই হয়ে যায়। আমাদের এলাকায় একজন লোক গভর্ণমেণ্ট হাউজে বাবুরচি। তাকে ধরেছি। কিছু খরচও করেছি। সে মউকা মত কথাটা বলে ফেলবে। এখন আপনি একটু বললেই হয়ে যায়, স্যার।

নুরুল আমিন বললেন, তদবীরের সেরা, মোক্ষম তদবীর করেছ। আমাকে দিয়ে বলায়ে ওটা নষ্ট করো না। গুলি এবার লাগবেই।

গুলি লাগে নাই ফস্‌কে গিয়েছে।

মন্ত্রিত্বের জন্য পাগল হওয়ার নজির আছে আগের আমলে। মুসলিম লীগ আমলে এক ব্যক্তি মন্ত্রী হতে না পেরে সত্যিই বদ্ধ পাগল হয়ে গেল। ঐ অবস্থায় কিছুদিন জীবনযাপন করার পর একদিন সর্বলীলা সম্বরণ করে মুক্তি লাভ করে।

আর একজন ঐ আমলের মন্ত্রীদের আশায় দিন গুণে গুণে অসুস্থ হয়ে পড়ে। [illegible] [illegible] [illegible] সদরঘাটে বজরা [illegible]

করে দিনপাত করে। হঠাৎ একদিন খবর এল, তাকে বাদ দিয়ে অন্য একজন মন্ত্রী করা হয়েছে। ক্ষোভে দুঃখে অমনি বজরা থেকে ঝুপ্ করে পানিতে পড়ে গেল। উদ্দেশ্য: এ দেহ আর না রাখিব। বন্ধুরা সে উদ্দেশ্য পূরণ হতে দিল না। টেনে টুনে নৌকায় তুলল প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায়।

তারপর ইনি মন্ত্রী হয়েছিলেন। এই আমলেও একবার হলেন। জোর কপাল। পানি থেকে ঐ দিন টেনে না তুললে, তার মন্ত্রিত্ব কে করত?

পঁচিশ

মার্শাল ল' উঠে যাবার সময় এসে গেল। বাষট্টি সালের আটই জুন জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন। তার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে মার্শাল ল' উঠে যাবে।

আটান্ন সালে মার্শাল ল' জারী হওয়ার সাথে সাথে সমস্ত রাজনৈতিক দল অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। মার্শাল ল' বিলোপ করার সাথে সাথে আবার যদি বিলুপ্ত দলগুলি পুনরুত্থিত হয় তা হলে বিপদ—এই আশঙ্কায় মে মাসে আয়ুব খাঁ এক অর্ডিনান্স জারী করলেন। তার বিধান হল, জাতীয় পরিষদের বৈঠকে এই বিষয়ে আলোচনা না হওয়া পর্যন্ত এবং পরিষদ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা পর্যন্ত সমস্ত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নিষিদ্ধ। অর্ডিনান্সে রাজনৈতিক দলগুলির নামও উল্লেখ করা হল। এরা এই নামে বা অন্য কোন ছদ্মনামে রাজনীতি করতে পারবেনা—আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগ, কম্যুনিষ্ট পার্টি (সে ত অনেক আগে থেকেই নিষিদ্ধ) জামাতে ইসলামী, কৃষক-প্রজা, ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ (এটা কি? এর অস্তিত্ব ত আমাদের

জানা নাই) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, নেজামে ইছলাম ও রিপাবলিকান পার্টি।

আটই জুন মার্শাল ল' উঠে গেল। কাল আঁধারের একটা পর্দা উঠে গেল। মানুষ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু আঁধারের পর আলোর রশ্মি ত কোথায়ও দৃষ্টিগোচর হল না! চারদিকে হতাশার নিঃশ্বাস। গণমনে কোন সাড়া নাই—প্রাণচাঞ্চল্য নাই। সবই আড়ষ্ট অবসাদগ্রস্ত। যুদ্ধের পর যেমন অবসাদ নেমে আসে। বুকের উপর থেকে ভারী পাথর নেমে গেছে কিন্তু বুক ফুলায়ে কোমর সোজা করে দাঁড়াবার সামর্থ্য কই?

এই হতাশা নিরাশার মধ্যে আমাদের ইতিকর্তব্য কি? মানুষের মনে আশার সঞ্চার করতে হবে। ম্লান মুখে হাসি, মৌন মুখে ভাষা দিতে হবে। মানুষ হতাশগ্রস্ত হয়ে পড়লে জাতির পতন অনিবার্য।

বাধা নিষেধ থাকা সত্ত্বেও আমরা যা পারি, তা' করা উচিত। বর্তমান পরিস্থিতি ও জাতির কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের চিন্তাধারা মানুষকে বলে দিতে পারি। পরামর্শ করা হল, আমরা কয়জনে মিলে আনুপূর্বিক ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত একটা বিবৃতি সংবাদপত্রে যদি প্রকাশ করি, তা হলে হতাশাগ্রস্ত মনে আশার আলোক ফুটে উঠতে পারে। একটা মুসাবিদা তৈয়ার করা হল।

গড়িমসি করে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। তারপর চব্বিশে জুন সংবাদপত্রে দেওয়া হল। পঁচিশে জুন প্রকাশিত হল। দস্তখত করলেন, নুরুল আমিন, হামিদুল হক চৌধুরী, আবু হুসেন সরকার, য়ুসুফ আলি চৌধুরী, সৈয়দ আজিজুল হক, পীর মোহসেন উদ্দিন, মাহমুদ আলি ও আমি। শেখ মুজিবুর রহমান দু'দিন আগে জেল থেকে মুক্তিলাভ করেছেন। তিনিও দস্তখত দিলেন।

এই নয়জনের বিবৃতি পরবর্তীকালে নয়-নেতার বিবৃতি বলে

আশ্বাস্বিত হয়েছে। এই বিবৃতিই ছিল তৎকালে পাকিস্তানী জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতিধ্বনি।

বিবৃতিতে বলা হল, সত্যিকার গণ-প্রতিনিধি ছাড়া কোন ব্যক্তি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করার অধিকারী নয়। করলে তা স্থায়ী সহজ ও কার্যকরী হতে পারে না। জনগণ সার্বভৌম—এই হচ্ছে গণতন্ত্রের সার কথা। জনগণই সমস্ত ক্ষমতার উৎস। তাঁদের ইচ্ছা অনুযায়ী সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে। এই ইচ্ছার স্বতঃস্ফুর্ত, বাধাবিঘ্ন, ও অবাধ বিকাশের একান্ত প্রয়োজন।

শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সময় গণ-প্রতিনিধির লক্ষ্য থাকে যাতে কালের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে শাসনতন্ত্র টিকে থাকতে পারে এবং সম্ভাব্য বাধাবিপত্তি ও সঙ্কট মুক্ত হয়ে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে—এমন একটি শাসনতন্ত্র রচনা করা।

শাসনতন্ত্রকে স্থায়িত্বের বৈশিষ্ট মণ্ডিত ও গুণসম্পন্ন হতে হলে সমগ্র জাতির ইচ্ছা ও বিচার-বুদ্ধির প্রতিফলন অবশ্যই হতে হবে। এই পদ্ধতিতে প্রণীত বিধানগুলিই বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভাবী বংশধরদের মনে অকৃত্রিম আনুগত্য, ও আবেগের প্রেরণা দিতে পারবে। এই আনুগত্য ও আবেগই শাসনতন্ত্রের প্রধান অবলম্বনও দুর্ভেদ্য বর্মবিশেষ। জনমতের উপর নির্ভর না করে বাইরে থেকে চাপানো শাসনতন্ত্র বিপর্যয়ের মুখে জনসমর্থন লাভ করতে পারেন না।

বর্তমান শাসনতন্ত্রে এই গুণাবলী না থাকায় একটা অন্তঃসারশূণ্য।

যতই প্রচার করা হউক না কেন, জনমতের প্রতি উপেক্ষা ও অনাস্থাই হচ্ছে এই নয়া শাসনতন্ত্রের ভিত্তিমূল। আট কোটি (তখন যা ছিল) জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র আশি হাজারকে দেওয়া হয়েছে ভোটের অধিকার। আবার এই অতি কম সংখ্যক ভোটারের ভোটে নির্বাচিত যে পরিষদ তাকেও সত্যিকার কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। মাত্র তিন সপ্তাহের অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আমূল পরিবর্তন না করলে এই শাসনতন্ত্র কাজের অনুপযোগী।

সরকারী নীতি ও কার্যকলাপ নির্দ্ধারণ বা নিয়ন্ত্রণের কোন ক্ষমতা সদস্যদের না থাকার ফলে শুধুমাত্র সরকারের তীব্র ও চরম সমালোচনার মাধ্যমে সদস্যরা নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে প্রলুব্ধ হবে। যোগ্য ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তিরা এই ধরণের সরকারে যোগ দিতে কোন আগ্রহ বোধ করবে না। ফলে, শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে নিষ্প্রাণ আমলাতন্ত্রের হাতের মুঠার মধ্যে গিয়ে পড়বে।

যথাসম্ভব দ্রুত নির্বাচনের মাধ্যমে একটি বিশেষ সংস্থা গঠন করে, দেশবাসী বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারে, এমন একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করার আহ্বান আমরা জানাই। ছয় মাসের মধ্যে একটি সুষ্ঠু শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সম্ভব বলে আমরা মনে করি।

শাসনতন্ত্র প্রেসিডেন্সিয়াল না পার্লামেন্টারী হওয়া উচিৎ সে প্রশ্নের জবাব আমরা এখন দিতে চাই না। তবে দেশের জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ পার্লামেন্টারী ধরণের সরকার কায়েমের পক্ষপাতী, কেননা বহুকাল ধরে ঐ ধরণের শাসন পদ্ধতির সাথে আমাদের পরিচয় ঘটেছে এবং তার অভিজ্ঞতা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

শাসনতন্ত্র ফেডারেল না য়ুনিটারী হবে, এ প্রশ্নেরও জবাবের প্রয়োজন হবে না। বিচিত্র ভৌগলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে ফেডারেল শাসনতন্ত্রই গ্রহণযোগ্য হবে, এতে সন্দেহের অবকাশ নাই

একটি জ্বলন্ত সমস্যার সমাধান করা একান্ত কর্ত্তব্য। সেটা হচ্ছে দুই অংশের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান অর্থনৈতিক ও উন্নয়নমূলক বৈষম্য। উভয় অংশের জনগণের সদিচ্ছার অভাব নাই। তাই আমরা মনে করি গণ-প্রতিনিধিদের সত্যিকার দায়িত্বভার দিলে, তারা সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে, দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের কার্যে মনোযোগ দেবে আর অনুন্নত অঞ্চলগুলির দিকে অধিক দৃষ্টি-নিবদ্ধ করবে এটা সুনিশ্চিত।

এত কাল ধরে রাষ্ট্রের নীতি নির্দ্ধারণের ব্যাপারে জনগণের কোন কথা বলার সুযোগ না থাকায় সঙ্কীর্ণ-মনা ও শ্রেণীস্বার্থের রক্ষকদের হাতে পড়ে দুই অংশের ভেতর উন্নয়ন ক্ষেত্রে পর্বত প্রমাণ বৈষম্য সৃষ্টি হয়ে পড়েছে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে একবার যদি রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনমত প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে, তা হলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও কায়েমী স্বার্থের দিন শেষ হয়ে যাবে। পূর্ব-পাকিস্তান অর্থনীতিক ব্যাপারে সাত্যিকার রাজনৈতিক ক্ষমতায় অংশীদার হওয়ার সুযোগ পায় নাই বললেই চলে। এইসব কারণেই দুই অঞ্চলে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। আজাদী লাভের পর সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতার সমাবেশ হয়েছিল, মুষ্টিমেয় সরকারী অফিসারদের হাতে। তার উপর দেশে একটিও সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান না হওয়ার ফলে জনগণ রাষ্ট্র চালনার ব্যাপারে কথা বলার সুযোগই পায় নাই।

এমতাবস্থায় অন্তবর্তী কালে কি করণীয়, সেটাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। সামরিক শাসন উঠে যাওয়ার ফলে দেশে যে সদিচ্ছার উদ্ভব হয়েছে তাকে আরও জোরদার করে তোলার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার। জন সাধারণ ও সরকারী শাসনতন্ত্রের ব্যবধানের প্রাচীর আর গড়ে উঠতে দেওয়া হবে না। প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের দায়িত্ব অপরিসীম। আমরা আশা করি, তিনি এটা বুঝতে অক্ষম নন।

আমাদের প্রস্তাবিত পদ্ধতিমতে একটি স্থায়ী শাসনতন্ত্র প্রণীত হওয়া সাপেক্ষে দেশের সরকার পরিচালনার কাজও চালায়ে যেতে হবে।

তাই আমাদের প্রস্তাব : উনিশ শ' ছাপান্ন সালের শাসনতন্ত্র মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত অধ্যায়গুলি নয়া শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত করে জনসাধারণের মৌলিক অধিকার আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত করতে হবে।

যে পরিষদ বর্তমান বিধানুযায়ী গঠিত হয়েছে তার উপর সরকারের আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। লাভজনক পদ-বণ্টন করে ভাগ্যবান সদস্যদের দিয়ে পরিষদগৃহ ভর্তি করার আসক্তি বর্জন করতে হবে। তা' না হলে যে ক্ষীণমাত্র স্বাধীনতা পরিষদের আছে তাও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এ কথা ভুললে চলবেনা যে, বিশ্বাসেই বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

দেশে আস্থার পরিস্থিতি যাতে ফিরে আসে তার জন্য বিনা বিচারে আটক সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে গৃহীত যাবতীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বাতিল করে দিতে হবে।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের প্রাণবায়ু। দেশে অবাধে রাজনৈতিক দল গড়ে উঠার পথে যতকিছু বাধা-অন্তরায় আছে তার অবসান ঘটাতে হবে।

দেশের সকলকে সমবেতভাবে এই সব সমস্যা সমাধানের কাজে আগায়ে আসতে হবে।

দেশ এক বিরাট পরীক্ষার মুখে। এক অস্থির অবস্থায় দেশ সম্মুখের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

আমাদের শেষ আহ্বান: আসুন, সকলে মিলে যতশীঘ্র সম্ভব শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে সমস্ত বিতর্ক বন্ধ করে দেশকে অভিষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যাবার এক দুর্জয় সংকল্প নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করি।

আমাদের এই বিবৃতি দেশে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিদ্যুৎ প্রবাহের মত দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সকল শ্রেণীর মানুষের মনে অভিনব প্রেরণার সৃষ্টি করে। হাজার হাজার অভিনন্দন বাণী বর্ষিত হতে থাকে। দেশ মরে যাই নাই—মানুষ আজও বেঁচে আছে—বেঁচে থাকবে। কায়েমী স্বার্থের হাত থেকে, স্বার্থবাদী কুচক্রপরায়ণের অক্টোপাস থেকে

দেশ মুক্তিলাভ করবে। এই হল অভিনন্দনের সারমর্ম। মানুষের মনে দুর্বার সর্বজয়ী অনুপ্রেরণা—উদ্দীপনা জেগে উঠল। পাথরচাপা কিশলয় আবার মুখ তুলে সূর্যের আলো দেখতে পাবে, সবার মনে এই বিশ্বাস জেগে উঠল।

কায়েমী স্বার্থবাদীরা প্রমাদ গণল। আতঙ্কিত হয়ে উঠল। গালাগালি শুরু করল। 'ডন' ও 'মর্নিং নিউজ' চিরদিন গণ-বিরোধী মতবাদের ধারক ও বাহক। তারা সম্পাদকীয় লিখল। বিদ্রূপ উপহাস, শেষ পর্যন্ত কুৎসা রটনায় মনোনিবেশ করল।

সবুর খাঁর মাঝে মাঝে বোমা নিক্ষেপ করার অভ্যাস। বললেন, ব্যাবিলনের নয়জন জ্ঞানী দিয়েছেন বিবৃতি! দেশকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ে এখন জ্ঞানগর্ভ বিবৃতি দিচ্ছেন।

সব চেয়ে চটলেন আয়ুব খাঁ। তারই ত মাথায় বাড়ি। সরাসরি লাভ-লোকশান ত তারই একার। তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। ঘোড়ার মুখ থেকে শোনা: দু'দিন ধরে তিনি শুধু এই বিবৃতি নিয়েই জল্পনা কল্পনা করেছেন। একটু বেসামাল হয়ে পড়েছিলেন, যা তাঁর সৈনিক জীবনে কোন দিন দেখি নাই।

খুব কষে গাল দিলেন ধিকৃত রাজনীতিকদের। বিশেষ করে পূর্ব-পাকিস্তানীদের। এদের জন্য কি আমি কিছু করি নাই? কি হয়ে গেল এদের? এত নিমকহারাম এরা! কেন এমন অদ্ভুত আচরণ করল? কেন আবার এরা ধিকৃত রাজনীতিকদের পিছনে গিয়ে দাড়াল?

এটা স্বাভাবিক। ক্রোধের উচ্ছ্বাস, ভয়েরও। রাজনীতিকরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়, দেশের জনগণ তাদের পিছনে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য। তা হলেই খাঁ সাহেবের স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। নিরাপদে সিংহাসনে বসে দশ কোটি মানুষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা সেজে আছেন। এসব ভেঙ্গে পড়ে ধূলিস্যাৎ না হয়ে যায় এই চিন্তায় তিনি অধীর হয়ে উঠলেন।

যেমন করেই হোক এই সংহতির চেষ্টা অঙ্কুরেই বিনাশ করতে হবে, স্থির করলেন। তখন থেকেই আজ পর্যন্ত গণ ঐক্যের পিছনে লেগে আছেন।

বিবৃতির সমর্থনে প্রথম জনসভা হল ঢাকার প'টন ময়দানে। লক্ষাধিক লোকের সমাবেশে অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্যময় পরিবেশে বিরাট জনসভায় নেতৃবৃন্দ তাঁদের বক্তব্য মানুষের সামনে পেশ করেন। দেশের লোক আয়ুব শাসনতন্ত্র গ্রহণ করে নাই। গণ-প্রতিনিধিরা নতুন পরিষদ গঠন করে শাসনতন্ত্র রচনা করবেন। প্রত্যেক মানুষ এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছে।

তারপর বিভিন্ন স্থানে জনসভা হয়। চাটগাঁ, বরিশাল, টাঙ্গাইল, সিলেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এই সব জায়গায় অল্প কয়েকদিনের মধ্যে বিরাট বিরাট জনসভা হয়ে গেল। গণ মনে সাড়া একই রকমের। আমরা দেশবাসীকে 'মহাসমরে' যোগদানের আহ্বান জানাই। তারা অকুণ্ঠ চিত্তে সাড়া দেয়।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ একই প্লাটফর্মে দাঁড়ায়ে একই সুরে কথা বলেন এটা সত্যিই আশ্চর্য ঠেকেছে মানুষের কাছে। এটাই তাঁরা এতদিন চেয়েছে, কিন্তু হয় নাই দেখে হতাশাগ্রস্ত হয়েছিল। আজ তাদের মনে অপূর্ব উন্মাদনা এনে দিল। ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনাময় সুখ সমৃদ্ধির রঙীন ছবি ভেসে উঠল তাদের চোখের সামনে। এতদিন পথ খুঁজে পায় নাই। এখন তার সন্ধান পেয়েছে।

সোহরাওয়ার্দী করাচীর কারাগারে নিঃসঙ্গ বন্দী। দু'একজন বন্ধু তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করল। আমাদের বিবৃতি পড়ে তিনি গভীর আনন্দ প্রকাশ করেছেন। আন্তরিক সমর্থনও জ্ঞাপন করেছেন। তাঁর সমর্থন জানতে আমাদেরও উৎসাহ বেড়ে গেল।

ছাব্বিশ

বাষট্টি সালে জাতীয় পরিষদের বৈঠকের সময় আয়ুব খাঁ লাহোর এক জনসভায় বক্তৃতা করে বললেন, দলহীন রাজনীতি দেশ গ্রহণ করতে রাজী নয়। আমার উদ্ভাবিত মৌলিক গণতন্ত্র এখনও অঙ্কুরে। ভাল করে শিকড় গাড়তে পারে নাই দেশের মাটিতে। এমতাবস্থায় রাজনৈতিক দল গঠন করা ছাড়া উপায় নাই।

অ্যাঁ, বলেন কি? এই না কয়দিন আগে রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে মহাখাপ্পা ছিলেন! নাম শুনতে পারেন নাই। আর এখনই মত-পরিবর্তন! ব্যাপার কি?

এমনিই হঠাৎ এই ঘোষণা করেন নাই। বেশ ভেবে চিন্তে এই পন্থা আবিষ্কার করেছেন। এখন আর তিনি মিলিটারী ডিক্টেটর নন। শাসনতন্ত্রই তাঁকে প্রেসিডেন্ট কায়েম করে দিয়েছে নির্বাচিত হওয়ার প্রয়োজন নাই। এখন শাসনতন্ত্র প্রচলিত হয়েছে; জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ গঠিত হয়েছে। এ সবই ত প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী গণতন্ত্রের উপসর্গ। তাঁকে এখন গণতান্ত্রিক ডিক্টেটর হতে হবে।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চালু করা হয়েছে, একেবারে মূল থেকে। রাজনীতি ছাড়া গণতন্ত্র চলতে পারেনা। রাজনীতি চালু করার অনুমতি দিলে রাজনৈতিক দল গঠনে বাধা দেবার কোন উপায় নাই। দলগঠন করতেই হয়।

আয়ুব খাঁ খোদ এই গণতন্ত্রের জনক। গণতান্ত্রিক ব্যক্তি হতে হলে তাঁকেও রাজনৈতিক দল খুঁজতে হয়। কিন্তু তিনি কোথায় যাবেন? দেশে যে সব রাজনৈতিক দল ছিল তা ত তিনি কয়েক বছর আগে বিলোপ করে দিয়েছেন। তাঁদের নেতৃত্ব ধিকৃত—

অবাঞ্ছিত। তারা যদি পুনর্জীবন লাভ করে, তা হলে ঐসব নেতৃবৃন্দই তার কর্তৃত্বের আসন গ্রহণ করে ফেলবে। এই সব দলে আয়ুব খাঁর যোগদানের প্রশ্নই উঠে না। অথচ রাজনৈতিক দল তাঁর চাই-ই।

'মুসলিম লীগ' নামটা মুখ রোচক। পাকিস্তান অর্জন করেছে মুসলিম লীগ। এই লীগের ফাণ্ডে বহু টাকা জমা আছে, কায়েদে আজমের আমল থেকে। কোটি টাকার কাছাকাছি। সে টাকাটা প্রতিষ্ঠানের গঠন কার্যে ব্যয় করা যেতে পারে। মুসলিম লীগের 'সাইন বোর্ড' ও গুড-উইল দু'টাই অতি প্রয়োজনীয়। অথচ সে দলও অবাঞ্ছিত রাজনীতিকদের কবলে। জবর দখল করা ত চলে না।

অথচ নামটা চাই। প্রেসিডেন্ট নিজে রাজনৈতিক দল গঠন করলে, অন্যান্য রাজনীতিকদেরও দল গঠন বা পুনরুজ্জীবনের অধিকারও দিতে হয়।

অতএব, বাষট্টি সালের মে মাসে রাজনৈতিক দল গঠন অবৈধ বিবেচনা করে যে অর্ডিন্যান্স জারী করা হয়েছিল ছ' মাস পরেই সে অর্ডিন্যান্স বাতিল করে জাতীয় পরিষদের দ্বারা পলিটিক্যাল পার্টিজ অ্যাক্ট নামে একটা আইন পাশ করায়ে নেওয়া হল। যে কোন ব্যক্তি রাজনৈতিক দল গঠন করার অধিকারী হবে। তবে ইসলামী আদর্শ ও পাকিস্তানের সংহতি বিরোধী মতামত প্রচার কিংবা কার্যকলাপ করার উদ্দেশ্যে কোন দল গঠন করা চলতে পারবে না। বিদেশী রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক দলের প্রভাব প্ররোচনায় কিংবা তাদের অর্থে বা সাহায্যে কোন দল গঠন করতে দেওয়া হবে না।

এ সব ব্যাপারে কোন সন্দেহ বা বিতর্ক উত্থাপিত হলে সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে।

এবডো বা প্রোডা আইনে বা অন্যান্য কারণে অযোগ্য ঘোষিত রাজনীতিকরা কোন দল গঠন করতে বা দলের সদস্য হতে পারবে না।

এই আইন তেষট্টি সালে সংশোধন করে অযোগ্য ঘোষিত রাজনীতিকদের উপর আরও কঠিন নিশেধাজ্ঞা জারীর বিধান সন্নিবিষ্ট করা হয়। এবং এই আইনের বলে আমার উপর নোটিশ জারী করা হয়, যে আমি যেন জনসভায় বক্তৃতা, সংবাদ পত্রে বিবৃতি সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা ইত্যাদি না করি। এই নোটিশ ছয় মাসের ম্যাদে, ম্যাদ অন্তে আরও ছয় মাস। তার পর আবার ছয় মাস চালু হয়েছিল। মুখে তালা—কথা কইবার উপায় নাই।

সারা পাকিস্তানে অন্য সবাইকে বাদ দিয়ে শুধু আমার উপর কেন এই নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছিল, তা আজও বুঝতে পারি নাই।

এই আইন ভঙ্গ করার অভিযোগে চারটি মামলা আমার বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে এবং তা' চালু আছে।

নয় নেতার বিবৃতি পাকিস্তানে বিরাট আন্দোলন সৃষ্টি করেছে। এই আন্দোড়ন জাতীয় ঐক্য ও সংহতি গঠনের এক বিরাট সম্ভাবনার সূত্রপাত করেছে। গণঐক্য ও গণজোট গণবিরোধী গোষ্ঠির মারণাস্ত্র। জনগণ তাদের বিশ্বাস করেনা, তারাও জনগণকে বিশ্বাস করেনা। শুধু তাই নয়, ঘৃণাও করে। জনগণ সেটা জানে এবং সেই কারণে ভয়ও করে।

এই গণ-ঐক্যে ভাঙ্গন ধরানো শাসক গোষ্ঠির একটা মহা কর্তব্য। দল গঠন করার সুযোগ দিলে রাজনৈতিক কর্তারা দলগঠন বা পুনরুজ্জীবনের জন্য অধীর হয়ে উঠবে। অতিব্যস্ত যাত্রীর দল যেমন আসন্ন বিপদ উপেক্ষা করেও প্রায়নিমজ্জমান খেয়ানৌকায় চড়ে বসে। ডুবলে সবাই ডুববে, আমি একা নই, এই মনোভাব। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চিন্তাধারা প্রায়ই পাইকারী ও এজমালী।

দল গঠন হলেই দলীয় কোন্দল সৃষ্টি হতে বাধ্য। পার্টি হলেই পার্টিবাজি। তার অর্থ গণঐক্যে ফাটল। পার্টিজ অ্যাক্ট প্রণয়ন, করার সময় এ কথাটাও মনে রাখা হয়েছিল।

যা ভয় করা হয়েছিল, তাই হল। আইন পাশ করার সাথে সাথেই বিলুপ্ত দলগুলির নেতৃবৃন্দ ও কর্মীবৃন্দ চঞ্চল হয়ে উঠল। পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ ভাবলেন, আইন পাশ করার সাথে সাথেই তাদের দলগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়ে গেল। যেন ছিপি এঁটে বোতলে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল—ছিপি খুলে দেবার পর লাফায়ে বাইরে এসে পড়ল। তারা এই মর্মে একটি বিবৃতিও দিলেন।

অন্যান্যরা অন্য মত পোষণ করে। তারা বলে, আটান্ন সালের অক্টোবর মাসে দল বিলোপ করা হয়েছিল,—প্রাণবন্ত অথচ অকর্মণ্য করে রাখা হয় নাই। মেরে ভূত করা হয়েছিল। আইনের বলে কেমন করে পুনরায় জীবন লাভ করতে পারে। সুতরাং নতুন করে রাজনৈতিক দলের গোড়াপত্তন করতে হবে।

এর পাল্টা যুক্তি পেশ হল: মার্শাল ল' যতই ক্ষমতাশীল হোকনা কেন তার রেগুলেশন দিয়ে একটা রাজনৈতিক দলকে বিলুপ্ত করা সম্ভব নয়। বড় জোর তার ক্রিয়া কলাপ বন্ধ রাখা যায়। এখন আবার শুরু করে দিলেই হয়।

অর্থাৎ টোপ-গেলার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল কোন কোন রাজনৈতিক দলের সদস্যরা। আয়ুব খাঁও তাই চান। তাঁর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে পারে না।

সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের অপরিহার্য অঙ্গ। আদর্শ দর্শনের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল সৃষ্টি হলে গণতন্ত্র ধীরে ধীরে পূর্ণতা লাভ করে। অবশ্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে পরস্পর বিরোধী কর্মসূচী রাজনীতি গণতন্ত্র ও দেশের পক্ষে অকল্যাণকর নাও হতে পারে। তাই বলে ব্যাঙের ছাতার মত আদর্শ বিহীন দল ঘরে ঘরে জন্মলাভ করলে তা দেশের পক্ষে মোটেই কল্যাণকর বলা চলেনা।

কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিকে সুস্থ ও স্বাভাবিক কি বলা চলে?

বিরাট বিপর্যয় ঘটে গেছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটেছে। এই অবস্থায় গতানুগতিক রাজনীতি করা অসম্ভব। আগে রাজনীতিকে ফিরায়ে আনতে হবে সুস্থ অবস্থায়। তারপর রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করা যেতে পারে।

আটান্ন সালের শেষ ভাগে দলীয় রাজনীতির অবনতি যে পর্যায়ে নেমে গিয়েছিল, যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল রাজনীতি ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক দল পুনরায় গঠন করলে, সেই ভয়াবহ অবস্থার যে পুনরাবৃত্তি হবেনা, একথা জোর করে বলা চলে না।

শাসকগোষ্ঠি এটা বুঝতে পেরেছিল। দল গঠনের লোভ সংবরণ করা যে কঠিন হয়ে পড়বে অনেকেব পক্ষে, এটা বুঝতে পেরেই তারা দল গঠনের সুযোগ দানের ব্যবস্থা করেছিল। এই পথেই গণঐক্য বিনাশ করা যেতে পারে।

নতুন সরকাবী দল গঠনের তোড়জোড় শুরু হল। ডাকা হল একটা কনভেনশন বা সম্মেলন।

ডাক শুনে করাচীর আরব সাগরের তীরে ক্লিফটন উপকূলে জমা হল কয়েক শ' লোক। চেনা-অচেনা, জানা-অজানা নারী-পুরুষ চলল পূণ্যতীর্থে। অজস্র পয়সা খরচ করে আয়োজন করা হল সম্মেলনের। কে টাকা দিল, কোথা থেকে পয়সা এল সে খবব কে রাখে!

সমবেত জনতা দাবী করল, আমরা পুরাতন লীগকর্মী—আদি ও অকৃত্রিম। জানমাল কোরবানী করেছি মুসলিম লীগের নামে। আমরাই খাঁটি মুসলিম লীগার।

তারপর যে উদ্দেশ্যে এই সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল তা সফল হল। দল একটা গঠন করা হল। কপালের উপর সিলমোহর দেওয়া হল মুসলিম লীগের। নাম হল কনভেনশন লীগ। কিন্তু ওরা বলে পাকিস্তান মুসলিম লীগ। চৌধুরী খালিকুজ্জমান সভাপতি।

বেচারা বৃদ্ধ ছিন্নমূল অবস্থায় পাকিস্তানে এসে রুটি-রুজির ব্যবস্থা করতে পেরেছেন সরকারের কৃপায়। পূর্ব-পাকিস্তানে দল গঠন করার দায়িত্ব পড়ল আবুল হাশেমের উপর। তিনিও ছিন্নমূল বহিরাগত এবং দৃষ্টিহীন। তাঁরও ব্যবস্থা করেছে সরকার।

আয়ুব খাঁ হলেন একজন প্রাথমিক সদস্য। পূর্ব-পাকিস্তানের এক অতি উৎসাহী তরুণ পিণ্ডি গিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁর দস্তখত নিলেন ভর্তি হওয়ার ফর্মে।

এটাই হল সরকারী দল। আয়ুব খাঁর নিজস্ব দল। আইনের সংজ্ঞায় রাজনৈতিক দল।

কিন্তু তাই কি হল? সরকারী দল হতে পারে, রাজনৈতিক দল হবে কেমন করে? সে ত আর আসমান থেকে ঝরে পড়ে না। নীচে থেকে গজায়, প্রায় উদ্ভিদের মত। নানা রকম ঝড়-ঝঞ্ঝা, আপদ বিপদ, নির্যাতন লাঞ্ছনা সহ্য করে তিলে-তিলে গড়ে উঠে। জনগণের দাবী-দাওয়া নিয়ে সংগ্রাম করে জীবনী শক্তি আহরণ করে। শাখা পল্লব বিস্তারিত হয়। ঐতিহ্য গড়ে উঠে ত্যাগ-তিতিক্ষার ও গণ-আস্থার।

সরকারী দলের এ সবের বালাই নাই। উচ্চশৃঙ্গে বসে হুকুম করলেন, কুন, আর অমনি ফাইয়াকুন। বললেন হও, হয়ে গেল। হুকুম দিয়ে যেমন গণতন্ত্র সৃষ্টি করা হল, অর্থাৎ মৌলিক গণতন্ত্র, তেমনি হয়ে গেল রাজনৈতিক দল। গণতন্ত্র ছাড়াই যেমন মৌলিক গণতন্ত্র, রাজনীতি ছাড়াই তেমনি রাজনৈতিক দল। সরকার-সৃষ্ট গণতন্ত্রের মত সরকার-সৃষ্ট দলের সাথে রাজনীতি বা জনগণের সম্পর্ক থাকেনা। রাষ্ট্র-পরিচালনার সর্বক্ষমতা এক নায়কের হাতে। এ অবস্থায় রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনটা কোথায়? নীতি, আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা একটি প্রাণীর ইচ্ছাধীন। প্রতিষ্ঠান বা দল তাঁরই করতলগত। দুনিয়ার সর্বত্রই এক নায়কত্বের এই একই আদর্শ ব্যতিক্রম হবার কোন কারণ নাই।

সরকারী দল জনকল্যাণকামী কোন কর্মপন্থা গ্রহণ করতে পারেনা। জনগণের সর্ব অধিকার লুণ্ঠনের ভিত্তিতে যে সরকার গঠিত, যে দল সৃজিত, সে দলের কর্মধারা গণ-বিরোধী বা জনকল্যাণ-বিরোধী হতে বাধ্য। জনমতের চাপে এই দল সৃষ্টি হয় নাই, জনমতের প্রতিধ্বনি করার জন্য ইহার জন্ম হয় নাই, সুতরাং জনমতকে উপেক্ষা করেই এই দলকে বেঁচে থাকতে হবে।

সরকারী দল বলেই এই দল দেশ শাসন ও শোষণ করার দায়িত্ব নিতে পারে। শাসন অর্থ শাসান। শাঁসায়ে জনগণকে শায়েস্তা করা। সেটাও পারে মাত্র এক ব্যক্তি। অবশ্য উপ-শাসকের দলও আছে। তারাও উর্ধ্বের অনুকরণ করে এবং শাসনের ক্ষমতা নাই বলে শাসনের ক্ষমতা পুরাপুরি ইস্তেমাল করে। আর করে শোষণ! বিভিন্ন স্তরে সেটা যাতে নির্বিঘ্নে হয়, তার ব্যবস্থা নির্ভুলরূপে করা হয়।

সরকারী দলের সুযোগ সুবিধা অপরিসীম। সরকারী কর্মচারীরা প্রায় সকলেই দলের কর্মী। তা হতেও বাধ্য। এক নায়কত্বের আমলে কর্মচারীদের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। অবশ্য তারা সে ক্ষতি পূরণ করে অন্য দিক দিয়ে। এবং যিনি সর্বাধিনায়ক তিনিই তাদের জনগণের উপর কর্তৃত্ব করার পূর্ণ ক্ষমতা দান করে থাকেন। এই ভাবে ভারসাম্য রক্ষা হয়।

সরকারী কর্মচারীরা সরকারী দলের উপর একটু সুনজর দিলেই দল ভারী হয়। তারপর যারা সরকারী কর্মচারীর অনুগ্রহপুষ্ট, তাদের দয়ার উপর যে শ্রেণীর জীবনমরণ নির্ভর করে, তারাও একই কারণে সরকারী দলভুক্ত হতে বাধ্য হয়।

সরকারের সংবাদপত্র সরকার ও সরকারী দলের জীবন রক্ষার প্রধান অবলম্বন। সরকারী দলের প্রচার ও সরকারী কার্যের প্রশংসা তাদের প্রধান খাদ্য। ঐ নিয়ে তারা মগ্ন।

এই অবস্থায় নতুন দল গঠন করা খুব সহজ। এবং যতদিন সরকার জীবিত থাকে ততদিন তারাও দাপট দেখাতে পারে।

কনভেনশন লীগ যখন রাজনৈতিক দল হবার দাবী করে বসল, তখন প্রাক্ বিপ্লব আমলের মুসলিম লীগ মহাকলরব করে উঠল। নেতারা বললেন, আমরা মুসলিম লীগের ঐতিহ্যবাহী কায়দে আযমের গড়া লীগ। কোথাকার কতকগুলি অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে একত্রে জমা করে তাদের দিয়ে একটা দলগঠন করলেই তার নাম মুসলিম লীগ দেওয়া যায়? অসম্ভব। এটা ত দলচুরি। সাইনবোর্ড চুরি করে লাগায়ে দিলেই দখল হয়ে যায়? জলজ্যান্ত, তবতাজা একটা প্রতিষ্ঠানকে কবর দিয়ে তার কাফন গায় চড়ায়ে মুসলীম লীগ জাহির করার অধিকার তোমাদের কে দিল?

তারা আহ্বান করল তাদের পুরাতন কাউনসিল—সর্বোচ্চ পরিষদ। এই অধিবেশন পুরাতন ও সনাতন মুসলিম লীগকে পুনরুজ্জীবিত করাব প্রস্তাব নিল। খাজা নাজিমউদ্দিন সভাপতি —আয়ুব খাঁর ভ্রাতা সরদার বাহাদুর খাঁ জেনারেল সেক্রেটারী। মিস ফাতিমা জিন্নাহ আশীর্বাদ করলেন এই কমিটিকে।

নুরুল আমিন, শাহ আজিজুর রহমান ও আরও অনেকে এই দলে যোগদান না করে বাইরে রইলেন। দলহীন ঐক্যের আশায়।

কাউন্সিলে পুনরুজ্জীবিত হল বলে একে বলা হল কাউন্সিল মুসলিম লীগ। এর আগে জুলাই মাসে আইন পাশ হওয়ার সাথে সাথেই মওলানা মওদুদী তার জামাতে ইসলামী দলকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। এটাও পুরাপুরি রাজনৈতিক দল নয়। তবে আইনের সজ্ঞায় রাজনৈতিক দল ত বটেই। রাজনীতিকেরা যে ধরণের নির্ভেজাল গণতন্ত্র চান, এরা বোধ হয় সেটা পুরাপুরি বিশ্বাস করেন না। এরা ইসলামী গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন অর্থাৎ ধর্মীয় অনুশাসনের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চান। দেশের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তারাও চিন্তাধারা সংশোধন করতে বাধ্য হবেন বলে মনে হয়।

এর কয়েকদিন পর চৌধুরী মহম্মদ আলী ফরিদ আহমদ—

দুই অংশের দুই নেতা তাঁদের নেজামে ইসলাম দলকেও পুনরুজ্জীবিত করলেন। এরাও ইসলামী গণতন্ত্রে বিশ্বাসী।

পুনরুজ্জীবনের একটা হিড়িক পড়ে গেল। আমরা যে দলহীন ঐক্যের আহ্বান জানায়েছিলাম, কিছুদিন আগে সে আহ্বান নেতৃবৃন্দ উপেক্ষা করেই দল পুনরুজ্জীবিত করলেন। কিন্তু জনগণ আমাদের আহবান উপেক্ষা করে নাই, এবং তারা দল গঠনের হিড়িক দেখে মর্মাহত হয়েছে।

সাতাশ

বাষট্টি সালের আগষ্ট মাসে সোহরাওয়ার্দী মুক্তি পেলেন। সরকার পক্ষের দু' একজন জেলখানায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার পরই তাঁর মুক্তি।

সত্তরের বেশী বয়স। জেলজীবনে অনভ্যস্ত। তার উপর নিঃসঙ্গ বন্দী। তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। জেলেই তিনি হৃদ-রোগের আভাস পান।

স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য বিশ্রাম করেন কয়দিন। কিন্তু কায়েমী স্বার্থবাদীর দল তাঁর পেছনে লাগে। নয়-নেতার বিবৃতি প্রসংগে তাঁর সাথে আলাপ আলোচনা করে, এবং তাঁর মতামত বিকৃত করার প্রাণপণ চেষ্টা করে।

খবরের কাগজে বের হল,—নয়-নেতার বিবৃতি প্রসংগে সোহরাওয়ার্দী বলেছেন: এরা কারা? কারা নয়-নেতা? কেউ নেতা নাই। ইত্যাদি।

দালাল খবরের কাগজ যেন উঠে পড়ে লাগল। কিন্তু এই ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচার এত নির্লজ্জ ও উলঙ্গ যে সবাই এটা ধরে ফেলল। আমরা এক কানাকড়ির মূল্যও দেই নাই এই সব জঘন্য প্রচারণার।

কিছুদিন পর নেতা এলেন ঢাকা। বিমানঘাঁটিতে যে সম্বর্দ্ধনা তাঁকে দেওয়া হল, তা অপূর্ব—অভূতপূর্ব। লক্ষ লক্ষ লোক পাঁচ সাত ঘণ্টা আগে থেকেই সমস্ত বিমানঘাঁটি দখল করে বসে রইল। যখন প্লেন এল তখন নির্ধারিত স্থানে নামতে না পেরে বহুদূরে অবতরণ করে। সেখান থেকে বিমানঘাঁটিরই একটা গাড়ী করে তাঁকে নামায়ে আনা হল। সিঁড়িতে দাঁড়ায়েই তিনি ঘোষণা করলেন, নয়-নেতার বিবৃতির ফলে দেশে নয়-কোটি নেতা সৃষ্টি হয়েছে। এতে তিনি খুব আনন্দিত। এত নেতা এক কালে দুনিয়ার কোন দেশে দেখা যায় নাই। পশ্চিম পাকিস্তানেও অদ্ভুত সাড়া জেগেছে। তারা নেতৃত্বের জন্য চেয়ে আছে পূর্ব পাকিস্তানের দিকে। এটাই সূর্যোদয়ের দিক।

লক্ষ কণ্ঠের জিন্দাবাদে বিমান বন্দর ফেটে পড়ার মত হয়ে গেল।

কথায় কথায় হেসে বললেন, আমিও নয়-নেতার শামিলে। আমার নম্বর দশ।

বিরাট জনসভা হল ঢাকায়। তিনি বক্তৃতা করলেন। ঐক্যের আহ্বান জানালেন। বললেন, যদি ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করতে পারি, তা হলে কোন শক্তিই—যতই হিংস্র ও প্রবল হোক না কেন, আমাদের পরাজিত করতে পারবে না। কিন্তু সাবধান, এই ঐক্যে যেন ফাটল সৃষ্টি না হয়—তা' হলে চিরদিনের মত জাতি গোলাম হয়ে থাকবে।

ঢাকা অবস্থানকালে সোহরাওয়ার্দী সব দলের নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ আলোচনা করে একটা দলহীন সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। নাম দিলেন জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট।' পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে, বললেন।

কয়দিন পর নেতা লাহোর চলে গেলেন। আমরা অনেকেই তাঁর সাথে গেলাম।

লাহোরে জনসভার আয়োজন করা হল মোচি-গেইটে। রাত্রি কালে মিটিং। শুরু হওয়ার সাথে সাথেই কতকগুলি গুণ্ডা এসে ঝাপায়ে পড়ল মিটিং-এ। ইট পাটকেল ছুঁড়ল। লাঠিধারী পুলিশ রাস্তায় ও মণ্ডপের চারদিকে দাঁড়ায়ে তামাসা দেখতে লাগল।

এটা সরকারী ব্যবস্থা বোঝা গেল। পশ্চিম পাকিস্তানে জনসভার আয়োজন করা নিরাপদ হবে না, এটাও বুঝতে পারলাম।

লায়ালপুরেও ঐ অবস্থা। গুণ্ডাদের হামলা।

চরম হামলা হল গুজরাণওয়ালায়। গাড়ী থেকে সোহরাওয়ার্দী নামার সাথে সাথেই গুণ্ডার দল হামলা করল। একজন গুলি না পট্‌কা নিক্ষেপ করল নেতাকে লক্ষ করে। একজন কর্মীর গায় লেগে জখম করল তাকে।

দেশের লোক এই ঘৃণ্য বর্বরতার প্রতিবাদ করল। সরকার পক্ষ থেকে কৈফিয়ৎ দেওয়া হল, গুলি টুলি কিছু নয়। কে যেন পট্‌কা ছুঁড়ে মেরেছিল। সরকার এর জন্য দায়ী নয়।

পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সবগুলি দলই পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। আমাদের নীতি দলহীন ঐক্য। এখন এই দুই মতবাদেব সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হবে কিনা এটা নিয়ে আলোচনা। নেতা বললেন, ওরা রিভাইভ করে ফেলেছে, অথচ আমাদের সাথে মিলেমিশে কাজ করতে চায়, এ অবস্থায় দলের নিজস্ব কার্যক্রম যদি ওরা বন্ধ রাখেন তা হলে সামগ্রিক সংগ্রামে ওরাও যোগদান করতে পারে। একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কার্যে অগ্রসর হলে দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করতে হবে। দলীয় কর্মপন্থা স্থগিত রাখতে হবে।

সবাই রাজী হল। সেখান থেকে করাচী যাই। সেখানেও রেল ষ্টেশনে সোহরাওয়ার্দীর উপর গুণ্ডার হামলা কলে। আমাদের অনেকেই লাঠির আঘাত পাই।

গুজরাণওয়ালার বর্বরতার পর সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল যে,

সরকার পক্ষ যদি তাদের গুণ্ডাদের বিরত না করেন এবং নিরাপত্তার আশ্বাস না দেন, তা হ'লে পশ্চিম পাকিস্তানে আর জনসভা করব না। করাচীর আয়োজিত জনসভা বাতিল করে দেওয়া হল।

পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টে যোগদানের সিদ্ধান্ত করে এক যুক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন জনাব গুরমানী, মিঞা মমতাজ দৌলতানা, আইয়ুব খুড়ো, গোলাম আলি তালপুর, মৌলানা মওদুদী, সরদার বাহাদুর খাঁ, জেড্ এইচ্ লারী, য়ুসুফ খটক, হাশিম গাজদার, মউলা বখ্শ সমরু, আবদুল মজিদ সিন্ধী, হায়দার বখশ জাতোই প্রমুখ সেরা রাজনীতিক এই দলিলে স্বাক্ষরকারী।

সিন্ধু বেলুচিস্তান প্রভৃতি সংখ্যালঘু প্রদেশের নেতারা প্রথমে এই ফ্রণ্টে যোগদান করতে অস্বীকার করেন। তাঁরা বলেন, গণতন্ত্রের চেয়েও আমাদের কাছে এক য়ুনিট ভঙ্গ করা অনেক বড় ও জরুরী কাজ। এক য়ুনিট মানে মহাপাঞ্জাব। পাঞ্জাবীর রাজত্ব আমাদের সর্বনাশ। একে শেষ করার আগে অন্য প্রশ্ন বড় বলে মনে হয় না।

নেতা আশ্বাস দিলেন। কিন্তু তাঁরা জেদ করলেন, শেখ মুজিবর রহমান ও আমাকে আশ্বাস দিতে হবে। আমরাও অকাতরে আশ্বাস দিলাম। রাত্রে সোহরাওয়ার্দীর বাসভবনে তাঁরাও বিবৃতিতে স্বাক্ষর দেন।

আয়ুব খাঁ এই সময় বিদেশে ভ্রমণ করে দেশে ফিরে এলেন। বাড়ী পৌঁছেই এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করলেন। বিদেশের অভিজ্ঞতা, সফরের সাফল্য কিছুই বললেন না। শুধু বকাবকি করলেন সোহরাওর্দীকে। বললেন, ক্ষমতা দখল করাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। যেখানে হট্টগোল বিশৃঙ্খলা, সেখানেই তিনি। দেশের সংহতি নষ্ট করা, দেশকে বিপন্ন করার জন্যই ফ্রণ্ট গঠন করা হয়েছে। ব্যবহার করবেন জনস্বার্থের বিরুদ্ধে।

তারপর নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই বললেন, তা করুন তিনি। ও ভয়ে কম্পিত নহে আমার হৃদয়। আমি ভয় পাইনা। একটা কেন, পঞ্চাশটা যুক্তফ্রণ্ট করুন না কেন।

অর্থাৎ ভয় যে পেয়েছেন, সেটা গোপন করার জন্যই আন্দোলন।

শেষে বললেন, আমি একলা নই। লক্ষ লক্ষ পাকিস্তানী থাক্‌বে আমার পাশে।

তা ত থাকবেই।

নেতাও তখন সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করে উত্তর দিলেন, প্রেসিডেণ্ট কোন কিছু না জেনেই এতকথা বলে ফেললেন আমার বিরুদ্ধে। মন্ত্রীবা তাঁকে কুমন্ত্রণা দিয়েছে। জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট রাজনৈতিক দল নয়—ক্ষমতা দখল করাও এর উদ্দেশ্য নয। জনস্বার্থ রক্ষা, জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করার জন্য এই ফ্রণ্ট গঠন করা হয়েছে। গণতন্ত্র উদ্ধার করার এটা একটা আস্ফালন। প্রেসিডেণ্টের ভয় পাবার কোন কারণ নাই।

এই অবস্থার সৃষ্টি করেছে পূর্ব-পাকিস্তানের স্বনামধন্য সবুর খাঁ অর্থাৎ খানে সবুর ও তার সহযোগীবা। বিদেশে অবস্থান কালে তাঁকে নানা কথা শুনায়েছে। গোলাম ফারুক পূর্ব-পাকিস্তান সোহরাওয়ার্দীর হাতে ছেড়ে দিয়েছে—উদ্ধারের পথ নাই। শীঘ্র করে চলে আসুন ইত্যাদি।

পাকিস্তানের জনৈক লণ্ডন প্রবাসী সাংবাদিকও খবর দিল, আয়ুব খাঁ ফিরে আসার পর সোহরাওয়ার্দীর সাথে 'শো-ডাউন' হয়ে যাবে।

সৈনিক মানুষ। আর যাই হোক 'শো-ডাউনের' কথায় আগুন হয়ে গেলেন। অস্ত্রের জোরে ক্ষমতায় আসীন—তার সাথে শো-ডাউন করার আস্পর্দ্ধা কার হতে পারে। লণ্ডনে এসেই সংক্ষিপ্ত একটা ধমক দিলেন। তারপর করাচী এসে সম্মেলন ডেকে মনের ঝাল ঝাড়লেন।

পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্ণর গোলাম ফারুক তখন করাচী ছিলেন। তিনি বিমান ঘাঁটিতে যান নাই। কিন্তু তাঁর উপস্থিতির কথা আয়ুব খাঁর জানা ছিল। অথচ তাঁকে ডেকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই সোহরাওয়ার্দীকে বকাবকি করলেন। সোহরাওয়ার্দীর নামের সাথে তাঁর নামও জড়িত ছিল। বোধ হয় সেই কারণেই তাঁকে খবর দেওয়া হয় নাই।

সম্মেলন শেষে নীচে নেমেই দেখেন গোলাম ফারুক উপস্থিত। বললেন, ভেরি সরি, তোমার বন্ধুকে গালাগাল দিতে হল।

গোলাম ফারুক গভর্ণর হয়ে আসার পর থেকেই এ দেশের জনগণের মনোভাব মোটামুটি বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, একটা রাজনৈতিক বোঝাপড়া হওয়া দরকার। অন্যথায় দেশের মঙ্গল সাধিত হবে না।

আমাকে কয়দিন এ কথা বলেছেন। আয়ুব খাঁ যদি আপনাদের সাথে একটা সমঝোতা করতে চান, তা হলে আমরা যেন সহযোগিতা করি। ধীরে ধীরে পারস্পরিক আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। মিলেমিশে সবাই কাজ না করলে দেশের অগ্রগতি অসম্ভব।

বলেছিলাম, আয়ুব খাঁ আমাদের মূল দাবী মেনে নিলে আমাদের ঝগড়া কিসের ? তা'ত তিনি মানতে রাজী হচ্ছেন না।

বললেন, আয়ুব খাঁ লোকটা নেহাত খারাপ নন। কতকগুলি স্বার্থান্বেষী কর্মচারী দিনরাত তাঁর কানে গুন্‌গুন করে তাঁর স্তুতিবাদ করে, আর ফাঁকে ফাঁকে দু' একটি কাজ সেরে নেয়। তিনি অবশ্য তাদের মতামতের তোয়াক্কা করেন না। কিন্তু অষ্টপ্রহর চাপলুসী করলে মানুষের মাথা ঠিক রাখা মুশকিল। তাই অনুরোধ করি, আপনারা এসে একটু পরিবর্তন করুন। সরাসরি বিপ্লব ত আপনারা করতে পারছেন না। এই অবস্থায় ক্রম বিবর্তনের পথই আপনাদের গ্রহণ করতে হবে। দেশকে বাঁচাতে হবে ত।

বললেন, ধরুন, প্রেসিডেণ্ট যদি একটা জাতীয় সরকার গঠন করতে চান, আর আপনাদের যোগদান করার আহ্বান জানান, তা' হলে আপনাদের যোগ দেওয়া উচিৎ হবে না ?

বললাম, একদম বিনা শর্তে ?

—না, না, বললামই ত ! কিছুটা মেনে নিলে বাকি সব ধীরে ধীরে আদায় করতে পারবেন। একেবারে আপোষহীন সংগ্রামের কথা বলে অটল হয়ে বসে থাকলে চলবে না। দেশের কল্যাণে আপোষ করতেই হয়। নেতার সাথে আলাপ করুন। আমি নিজে প্রেসিডেণ্টের সাথে আলাপ করেছি। সোহরাওয়ার্দীর সাথে তাঁকে আলাপ করতে বলেছি। তিনি আমাকেই আগে দেখা করতে বললেন। বিদেশ থেকে ফিরে এসে তিনি দেখা করবেন। তবে সাবধান ! মন্ত্রীরা যেন টের না পায়। তা হলে সর্বনাশ ! আপনাদের সাথে আপোষ হলে ওদের মৃত্যুঘণ্টা বেজে উঠবে।

বিদেশ থেকে ফিরে এসেই ত এই কাণ্ড করে বসলেন। তাঁর অস্থির করে তুলেছিল মন্ত্রীর দল। সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়ে স্থির হলেন।

আমরা যখন লাহোরে তখনই গোলাম ফারুকের প্রস্তাব নেতাকে বলেছিলাম।

তিনি বলেছিলেন, আমাদের মূল দাবী—সার্বজনীন ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ ভোটে পরিষদ নির্বাচন যদি আয়ুব খাঁ মেনে নেন, তা' হলে আমরা তাঁর সাথে সহযোগিতা করতে পারি। তিনি যত দিন খুশী প্রেসিডেণ্ট থাকতে পারেন।

গোলাম ফারুকের প্রস্তাবিত সোহরাওয়ার্দী-আয়ুব সাক্ষাৎ কারের কথাও সোহরাওয়ার্দীকে বলেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, ঠিক আছে। তাঁর সাথে আলাপ আলোচনা করে যদি একটা পথ খুঁজে পাওয়া যায় তা হলে ত দেশের মঙ্গল।

এই সাক্ষাতকার আর ঘটতে পারে নাই। তবুও গোলাম ফারুক

শেষ চেষ্টা করবেন বলে ওয়াদা করেছিলেন। কিন্তু রক্ষা করতে পারেন নাই। কারণ, তিনিই চাকুরী থেকে বিদায় নিলেন কয়দিন পর।

আমরা সবাই করাচী থেকে ফিরে এলাম। তারপর শুরু হল প্রদেশব্যাপী অভিযান। এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঝটিকা সফর। সারা দেশে জেগে উঠল। মানুষ অভূতপূর্ব উত্তেজনায় উন্মত্ত হয়ে উঠল। রাস্তাঘাট ট্রেন-ষ্টীমার হাট-ঘাট বাজার-বন্দর লোকে লোকারণ্য; জনসভায় তিলধারণের স্থান থাকে না। জাগরণের হিল্লোলে দেশ কাঁপায়ে তুলল।

রেলগাড়ী চলতে পারে না। সারা রাস্তা থেমে থেমে চলে। মাঝে গতিরোধ করে ফেলে জনতা। নেতার কথা শুনতে চায় রেললাইনের ধারে এসে দাঁড়ায়ে। দু'চার পাঁচ ঘণ্টা লেট হয়ে যায় গাড়ী।

নেতা বক্তৃতা করেন, আমাদের ভেতর কোন দলাদলি নাই। হিংসা বিদ্বেষ কলহ কোন্দল সব শেষ করে দিয়েছি। জাতির জীবনে আজ গভীর সঙ্কট। আমরা যদি কোন্দল করি, তা হলে আমাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকবেনা। আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। কিন্তু খুব সতর্কদৃষ্টি রাখতে হবে যাতে এই ঐক্য ভেঙ্গে না যায়। ভিতরে বাইরে অপচেষ্টা চলবে একে বিনষ্ট করার। এ সবের বিরুদ্ধে আপনারা রুখে দাঁড়াবেন। দলাদলির ফলেই দেশে বিপর্যয় নেমে এসেছে।

বিরাম নাই বিশ্রাম নাই—রাত্রদিন একাকার।

রাজশাহী সভা করে রাত্রি দশটায় আত্রাই, একটায় শান্তাহার ভোর চারটায় পার্বতীপুর। সর্বত্রই জনসমাবেস—বক্তৃতা। তা ছাড়াও বক্তৃতা প্রত্যেকটি ষ্টেশনে।

ভোরের দিকে সোহরাওয়ার্দী শুয়েছেন। বাইরে কোলাহল। একজন বলল, এইমাত্র শুয়েছেন, একটু ঘুমাতে দাও—তোমরাও ঘুমায়ে যাও।

চট্ করে একটি যুবক বলে উঠল, না—আর ঘুমাব না। একবার ঘুমায়েই সব হারায়েছি। গণতন্ত্র ফিরায়ে না আনা পর্যন্ত ঘুমাব না।

কথাটা নেতার কানে গেল। তিনি চট্ করে জানালা খুলে মুখ বার করে বললেন, ঠিক বলছে। এই উঠে পড়লাম, আর ঘুমাব না।

নারায়ে তকবীর আর জিন্দাবাদে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠল।

আর একদিনের ঘটনা। কুমিল্লা থেকে রাত ন'টায় মোটরে রওয়ানা হয়ে রাস্তার ধারে প্রত্যেকটি বাজারে মিটিং করে এগারটায় চৌমুহনী জনসভা। সাড়ে বারটায় ফেনী গিয়ে দেখি বিরাট জনসভা। সর্বত্রই বক্তৃতা দিলেন সোহরাওয়ার্দী। ভোরে উঠেই গাড়ীতে চাটগাঁ রওয়ানা। রেল লাইনের ছ'ধারে শুধু মানুষ আর মানুষ।

কুমিল্লা থেকে চাটগাঁর পথে, এক ফাঁকে নেতাকে বললাম, স্যার, মানুষের এই যে উচ্ছ্বাস উন্মাদনা, এটাকে আপনি একটানা স্থায়ী মনে করবেন না। মানুষ তাঁর দায়িত্ব সম্বন্ধে মোটামুটি সচেতন কিন্তু এই উচ্ছ্বাস এই গণ-জাগরণ কতকটা প্লাবনের মত ক্ষণস্থায়ী। গতি শুরু হয় প্রবলবেগে। তারপর তেমনি প্রবলবেগে বন্ধ হয়ে যায় উচ্ছ্বাস। বাড়ী-ঘর গাছপালা আবার চড়ায়ে উঠে। গণ-জাগরণের বিপুল উদ্দীপনা যে দেখতে পাচ্ছেন এটাও ঠিক তেমনি। একে সুনিয়ন্ত্রিত করে সুনির্দিষ্ট পথে যদি চালিত করা যায়, তা হলে এই জাগরণের একটা অর্থ হবে। এর ভিতর শক্তি সামর্থ ও প্রাণ ঢেলে দিতে হবে। নইলে অসাড় হয়ে পড়বে।

কথাটা উত্থাপন করেছিলেন, খদ্দর। বলেছিলেন, সভাসমিতির পালা আমাদের শেষ হয়েই গেল। এখন কর্মপন্থা নির্ধারণও পরিকল্পনা গঠন করা দরকার।

নেতা বললেন, তাই করা যাবে। ঢাকা ফিরে একটা খসড়া প্রস্তুত করলেন। জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের কমিটি গঠন করার তোড়জোড় চালালেন।

আটাশ

মার্শাল ল' জারী হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য নেতাদের মত মৌলানা ভাসানীও গ্রেফতার হয়েছিলেন। অনেকদিন জেলে থাকার পর তাঁকে অন্তরীণ করা হল। ধানমণ্ডি এলাকায় একটা বাড়ী সরকার ভাড়া করে তাঁকে সস্ত্রীক বসবাস করবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের নাম তখন মানুষের মুখে মুখে। মৌলানা ভাবলেন, মাঠ বেদখল হয়ে যায়। তিনি কি করেন! মানুষ তাঁর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল।

অথচ ফিরে আসতে হবে। করলেন 'হাঙ্গার ষ্ট্রাইক'—আমরণ অনশন। দাবী করলেন, পাটের ন্যায্য মূল্য দিতে হবে। বন্যা-কবলিত এলাকার জন্য পঁচিশ কোটি টাকা সাহায্য দিতে হবে। বন্যা-নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ক্রুগ মিশনের সুপারেশ বাস্তবায়িত করতে হবে। আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বিতাড়িত মুসলমানদের পুনর্বাসনের ব্যবসা করতে হবে। এসব না হলে তিনি মৃত্যুবরণ করবেন।

মৌলানা এর আগেও দু'একবার 'হাঙ্গার ষ্ট্রাইক' করেছেন। কাজেই এটাও একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। সোহরাওয়ার্দী ও আমরা সকলে গিয়ে অনুরোধ করলাম, কিন্তু তিনি অটল। দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত কোন কথাই শুনতে রাজী নন।

অবশেষে রাজী হলেন। দিনক্ষণ ঠিক করে কটোগ্রাফার

সাথে নিয়ে আমরা সবাই গিয়ে হাজির হলাম। তিনি অনশন ভাঙ্গলেন। শরীর সুস্থ হলে সরকারী বাসভবনে ফিরে এলেন।

এর কয়দিন পর মুক্তি নিলেন। মুক্তি নিলেন বলছি এই জন্য যে, এটা তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিল। জাতীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তর কালে সরকার পক্ষ থেকে এই কথা বলা হয়েছে। পুলিশ বিভাগের উচ্চতম কর্তাও আমাকে তাই বলেছিলেন। বাইরে গেলেই বিপদ। অসুখ শরীরে ঘুরাফেরা করাও অনুচিত। গাঁয়ে চিকিৎসাও হবেনা। অনর্থক লোকজন ভিড় করবে। তার চেয়ে এই ভাল।

মৌলানার মুক্তির ব্যাপারে আবুল হাশিমের হাত ছিল বলে তিনি দাবী করেন। আয়ুব খাঁকে তিনি নাকি বলেছিলেন, আপনি সৈনিক, রাজনীতিক নন, তাই ভুল করেছেন। মৌলানাকে কেন আটক রেখেছেন। সোহরাওয়ার্দী যে ঐক্য গঠনে ব্যস্ত মৌলানা এটা ভেঙ্গে দিতে পারেন, এবং দেবেনও। তাঁকে ছেড়ে দিলে আপনার পক্ষে সংগ্রাম চালাবেন। মৌলানা সোহরাওয়ার্দীর কার্যক্রমের সর্বদাই বিরোধিতা করেন। এটাও করবেন।

আয়ুব খাঁ চট্ করে রাজী হয়ে গেলেন। মৌলানাকে ছেড়ে দেবার নির্দেশ দিলেন।

কয়দিন পর আবুল হাশিম কাগমারী গেলেন। ফিরে এসে বিবৃতি দিলে। আর যাই করুন, মৌলানা জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে যোগ দিচ্ছেন না।

বিবৃতি অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক। মাহমুদ আলি আমাদের সভায় এর প্রতিবাদ করে বললেন, মৌলানা এ কথা বলতে পারেন না।

আমরা বললাম, পারেন না হয়ত, কিন্তু বলেছেন ত! আজ তিনি সশরীরে জীবিত, মিথ্যা হলে প্রতিবাদ করতে পারেন। তা' তিনি কোনদিন করেন নাই।

এর আগেই গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের পূর্ব-পাকিস্তান কমিটি গঠিত

হয়েছে। প্রত্যেক পার্টি থেকে দু'জন করে সদস্য নেওয়া হয়েছে। মৌলানার দলের দুইজন—তাঁরই মনোনীত। হাজী দানেশ ও মাহমুদ আলি। তাই, মাহমুদ আলি জোর দিয়ে বলেছিলেন, তাদের মনোনীত করাব পর তিনি কেমন করে বলতে পারেন যে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে যোগ দেবেন না।

কাগমারী ফিরে গিয়ে মৌলানা আমাকে ও শেখ মুজিবর রহমানকে ডেকে পাঠান। আমি যাই নাই। মুজিব গিয়েছিলেন। মাণিক মিঞাও। ফিবে এসে উভয়েই বললেন, মৌলানা ঠিক আছেন।

আমরা জেলা ও মহকুমায় কমিটি গঠন কবার দিকে মনোযোগ দিলাম। কিন্তু এই ব্যাপাবে কিছু অসুবিধা দেখা দিল। স্থির করা হয়েছিল, চাবদলেব চাবজন সেক্রেটারী তাঁদেব বিভিন্ন দলের জেলা ও মহকুমা শাখাব প্রতি কমিটি গঠন কবার নির্দেশ দিবেন। প্রত্যেক দল থেকে তিন বা চাব সমসংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে কমিটি গঠন করা হবে।

শেখ মুজিবব বহমান এই প্রস্তাবের ঘোব বিবোধী। আয়তন ও কলেবরেব ভিত্তিতে তাঁব দলেব প্রতিনিধিব সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে। মহকুমা স্তরে, এমন কি কোন কোন জেলায় কোন কোন দলের কোন কর্মী ছিলনা বা নাই। এখন বাইরে থেকে একজনকে ধবে এনে সংখ্যাপূরণ করতে দেওয়া হবে না।

হামিদুল হক চৌধুরী এব প্রতিবাদ করেন। তাঁর মতে—এটাই ছিল জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মূলভিত্তি—সব দল থেকে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে কমিটি গঠন করতে হবে।

এই বিতর্কের মীমাংসা হওয়া কঠিন। এর মধ্যে আবার নূতন এক ক্যাঁকড়া উঠল ন্যাপের কীর্তিকলাপ নিয়ে। মৌলানা ভাসানী নিজে ত এলেনই না, তাঁর মনোনীত দুইজন প্রতিনিধি হাজী দানেশ ও মাহমুদ আলির সঙ্গেও কোন যোগাযোগ রক্ষা

করলেন না। আর তাঁর দল খুব জোরেশোরে জেলা মহকুমায় দলীয় কাজকর্ম চালাতে লাগল।

মৌলানা একটু বেকায়দায় পড়লেন। ন্যাপের নামে সরাসরি কার্য্যক্রম গ্রহণ করলে দৃষ্টিকটু হয়। তাই তিনি কৃষক সমিতি বা কিষাণ সমিতি গঠন করে ফেললেন। এবং কাজকর্ম সভা-সমিতি ঐ নামে চলতে লাগল। অর্থাৎ জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট যেন অনুযোগ না করতে পারে যে তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী।

অনুযোগ না হোক, এটা পরিষ্কার বোঝা গেল যে তিনি গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বিরোধী। আবুল হাশিম তা হলে মিথ্যা বলেন নাই।

এমতাবস্থায় মৌলানাকে অগ্রাহ্য করেই অগ্রসর হতে হবে। কিন্তু শেখ মুজিব এতেও রাজী নন। তিনি বললেন, যদি তাই হয় তা' হলে মৌলানার প্রতিনিধিদ্বয় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করুন যে মৌলানার সাথে তাঁদের সম্পর্ক নাই। কিন্তু এরা রাজী নন, আর তা' সম্ভবপরও ছিল না।

অতএব, অচলাবস্থা। এর মধ্যে সোহরাওয়ার্দী করাচী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁকে চিকিৎসা ও বিশ্রামের জন্য হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। হৃদরোগের প্রথম আক্রমণ বলে চিকিৎসকরা সন্দেহ করেন। কিছুদিন পর অবস্থার অবনতি হওয়ার তিনি চিকিৎসকদের পরামর্শে মার্চ মাসের মাঝামাঝি বৈরুত চলে যান।

আমাদের পক্ষে এটাও একটা আঘাত। আগের মতই সভা-সমিতি করে যাচ্ছি কিন্তু বিশেষ অগ্রগতি লাভ হয় নাই আমাদের পরিকল্পনার।

মৌলানা ঢাকা এলেন। গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সাথে কাজ করার জন্যই অনেকেই তাঁকে অনুরোধ করলেন। তিনি তাঁর স্বাভাবসিদ্ধ ভাষায় নানা কথা বললেন। অবশেষে আলাপ-আলোচনার জন্য স্থান ও সময় নির্ধারণ করা হল। নুরুল আমিন ও অন্যান্য

কয়েকজন তাঁর সাথে মিলিত হলেন। তিনি মনের কথা ফাঁস করে ফেললেন। বললেন, সোহরাওয়ার্দীর সাথে কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবেনা। তিনি অনেক দেখেছেন, শিখেছেন এবং ঠকেছেন। ভবিষ্যতে আর ঠকতে রাজী না।

আওয়ামী লীগের দু'একজন কর্মী মৌলানাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি ঐ সব বলেছেন কি না? মৌলানা উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন জিজ্ঞাস করলেন, নুরুল আমিনের সাথে কাজ করা আমার সম্ভব? তোমাদের পক্ষেও কি সম্ভব? খুনী নুরুল আমিন বলে কয় বছর তোমারও কি চীৎকার কর নাই? এই মরা লাশ কাঁধে নিয়ে আমাকে চলতে বল, তোমরা?

কর্মীরা হতবাক। পাল্টা প্রশ্ন তুলে মৌলানা তাদের আঁতে ঘা দিলেন। তাদের পালের হাওয়া মৌলানা অনেকখানি বার করে দিলেন।

আমাদের অচলাবস্থা আরও জটিল আকার ধারণ করল। শাখা কমিটি গঠন আর মৌলানা ভাসানী-এই দুই সমস্যার কিছুতেই সমাধান হয় না। প্রায় দশ বারটা মিটিং হল। সভার শুরুতেই শেখ মুজিব ঐ দুটি কথা তুলতেন। ফলে নির্ধারিত কর্মসূচীর কোন দফা আলোচনা করা সম্ভব হতনা। বলতেন ঐ দু'টি প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত সভার কাজ আরম্ভই করা চলে না।

মাণিক মিঞা মধ্যস্থ একটা ফরমূলা দিলেন। জেলাস্তরের নেতা ছাড়া জেলা কমিটি এবং মহকুমা স্তরের নেতা ছাড়া মহকুমা কমিটি গঠন করা চলবে না। নিম্নস্তরের কোন প্রতিনিধি দিয়ে সংখ্যাবৃদ্ধি করা যাবে না। এতে যদি কোন দলের নির্দিষ্ট সংখ্যা কম হয়ে যায় তা হলে তাই নিয়েই কমিটি করতে হবে।

আমরা এটা স্বীকার করে নিলাম। শেখ মুজিবুর রহমানও বিশেষ আপত্তি করেন নাই। কিন্তু কার্যতঃ এই ফর্মুলা কার্যকরী করার চেষ্টা ও করেন নাই। [illegible]

তিন দলের প্রতিনিধির নাম পাওয়া গেছে কিন্তু আওয়ামী লীগের নাম আসে নাই। ঢাকা থেকে নির্দেশ না পাওয়ায় জেলা মহকুমার নেতা কর্মীরা কিছুই করতে পারছে না।

এ সব বাধা বিঘ্ন সত্বেও কোন কোন জেলা ঢাকার নির্দেশের অপেক্ষা না করে তার দলের প্রতিনিধি নিয়ে কমিটি গঠন করে ফেলল। কোন কোন জেলায় মহকুমা, এমনকি থানা পর্যন্ত শাখা গঠন করা হল।

এদিকে মৌলানা প্রকাশ্যে জাতীয়-গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের বিরোধিতা শুরু করে দিলেন। পশ্চিম পাকিস্তান সফর কালে মুলতান পৌঁছে তিনি সাংবাদিকদের কাছে তার মনের কথা খুলে বললেন। তিনি ঘোষণা করলেন, এক মাসের মধ্যে ন্যাপ রিভাইভ করবেন। কিন্তু এন-ডি-এফ-এর অকাল মৃত্যু ঘটেছে। সোহরাওয়ার্দী নিজস্ব-মতলব হাসিলের উদ্দেশ্যে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের শক্তির অপব্যবহার করছেন। আরও বললেন, মার্কিণরাও পূব পাকিস্তানকে আলাদা করার আন্দোলনে ইন্ধন যোগাচ্ছে। বহু অর্থ ব্যয় করছে। এদের গতিবিধি ও কার্যকলাপ যদি বন্ধ না করা হয়, তা হলে তিন চার মাসের মধ্যে দেশে ভয়াবহ সঙ্কট দেখা দিবে।

বর্তমান পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে বলেছেন, সীমান্ত এলাকায় রুশীয় সৈন্য-সমাবেশ মার্কিণদের উদ্বিগ্ন করে তোলে নাই। পশ্চিম পাকিস্তানের কথাও ওরা ভাবেনা। ওরা ভাবছে, চীনের বিরুদ্ধে ভারতের যুদ্ধে কেমন করে ভারতকে জয়ী করা যায়। এই উদ্দেশ্যে পূর্ব-পাকিস্তানের সামরিক গুরুত্বের সুযোগ লাভ করা তাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা। কারণ, পূর্ব-পাকিস্তানের বিমান ঘাঁটি ব্যবহার না করে নেফার যুদ্ধ জয় করা সম্ভব নয়।

উপসংহারে বললেন, মার্কিণরা আমাদের আন্তরিকতার সুযোগ নিচ্ছে। এই কারণে, তাদের দেশ ছাড়া না করা পর্যন্ত গণতন্ত্র স্থাপনের সংগ্রাম সফল হতে পারে না।

উর্দু 'কোহিস্তান' কাগজে বাষট্টি সালের আটাশে এপ্রিল এই তথ্য প্রকাশিত হয়। কয়েক বছর আগে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিদায় গ্রহণের ঘোষণা করেছিলেন, সেটা তিনি ভুলে গেলেন। সাতান্ন সালে কাগমারী সম্মেলনে, ভারতকে পাকিস্তানের বুকে চাপাবার যে কৌশল করেছিলেন, সেটাও ভুলে গেলেন।

আজব লীলা। আমাদের মত লোকের বোঝা অসাধ্য।

মৌলানার সাঙ্গপাঙ্গরা প্রকাশ্যে মাঠে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে লাগল। তারাই প্রচার করল, এন ডি এফ মানে নাথিং ডুইং ফ্রন্ট—অকর্মণ্যের দল।

কিন্তু মুজিব জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়বেন এটা স্বাভাবিক ভাবতে পারি নাই। সোহরাওয়ার্দীর সৃষ্ট ফ্রন্টে তারই উৎসাহ সব চেয়ে বেশী ছিল।

প্রথম দিকে জোরেশোরে কাজ আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পর হঠাৎ তার মনোভাব বদলে গেল। হতে পারে, আমাদের নিষ্ক্রিয়তাই এজন্য দায়ী। তিনি বলতেন, এসব করে কিছু হবেনা। দল বলতে আওয়ামী লীগ। কর্মী বলতে আমাদের। অনেক দলের অস্তিত্বই নাই বিভিন্ন জায়গায়। নামকা ওয়াস্তে সর্বদলীয় করে কি লাভ। আমাদের কর্মীরা কাজের অভাবে অধীর হয়ে পড়েছে। আমাকে তারা অতিষ্ঠ করে তুলল।

কথা ঠিক। কর্মীরা কাজ চায়। তাদের কাজ দিতে হবে। আমরা কাজ দিতে পারছি না। তবে আমাদের গতি মন্থর ধীর ও সতর্ক হতে হবে। হৈ চৈ করে একটা গরম অবস্থা সৃষ্টি করে কোন লাভ নাই। কারণ, সেটা ক্ষণস্থায়ী। আওয়ামী লীগ বড় দল বলে দাবী করলে তার দায়িত্বও বড়। গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনে তার দানই ত হবে সবচেয়ে বেশী। ছোট দল কি তা' পারে? দানও ত্যাগের ক্ষমতা তার কোথায়?

তেষট্টি সালের এপ্রিল মাসে আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারীদের একটা সভা আহ্বান করলেন শেখ মুজিবর রহমান।

অনেকেই গরম বক্তৃতা দিল। ভাসানী তাঁর কাজ করে যাচ্ছেন। সবত্র সোহরাওয়ার্দীর কুৎসা প্রচার করছেন। এর জবাব আমরা দিতে পারছি না। আমাদের নিজস্ব দল গঠন করে কাজে নেমে পড়লে ভাসানী একতরফা বক্তৃতা দিতে পারবেন না।

বক্তৃতা আমিও দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, সোহরাওয়ার্দী ফ্রণ্ট গঠন করেছেন। জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট গণঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য সৃষ্টি হয়েছে। এই ঐক্য ভেঙ্গে দিলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ভাসানীর গালাগালির পাল্টা জবাব দেবার জন্য আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত করতে হবে এটা যুক্তিযুক্ত নয়। অন্য কোন কারণে যদি ফ্রণ্ট ভেঙ্গে দিয়ে আওয়ামী লীগ রিভাইভ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তা হলে সেই প্রশ্নই উত্থাপন করা উচিত ও তারই উপর আলোচনা চলা উচিত। সবাই যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সাব্যস্ত্য করে তা হলে সবাই সেটা মানবে। আমার একলার অমতের মূল্য কি?

সভা শেষে সাব্যস্ত্য হল সোহরাওয়ার্দী শীঘ্রই ফিবে আসবেন, তিনি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হয়। তাঁর মতের বিরুদ্ধে কোনকিছু করা উচিত হবে না।

সভার ভাবসাব দেখে মুজিব উৎসাহিত হলেন। একদিন বললেন, দেখলেন ত সবার মতামত? সবাই চায় দল পুর্ণ গঠন করে কাজ শুরু করতে।

বললাম, সবাই কোথায়? প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী—জেলার ও মহকুমার। পার্টি রিভাইভ হলে তাদের ব্যক্তিগত সুবিধা। বিনা খরচে কায়েম-মোকাম হয়ে যায়। অর্থাৎ পুনর্গঠনের সাথে সাথে তারাই পুনর্বহাল হয়। এটা কে না চায়?

বললেন, খোঁজ নিয়ে দেখুন, অন্যদেরও এই মত। আমি খোঁজ-খবর রাখি, তাই বলছি।

এরপর রাজনৈতিক মহলে প্রতিক্রিয়া শুরু হল। জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের কাজ প্রায় বন্ধই হয়ে গেল। যেখানে শাখাকমিটি গঠিত হয়েছিল, তারা অবশ্য সভা-সমিতি করে যেতে লাগল। সবাই প্রতিক্ষায় রইল নেতার প্রত্যাবর্তনের।

কেউ কেউ প্রস্তাব করেছিল আমাকে ও শেখ মুজিবকে সোহরাওয়ার্দীর সাথে দেখা করতে—লণ্ডন বা বৈরুত গিয়ে। তাঁর মতামত জরুরী হয়ে পড়েছে।

নানা কারণে আমার যাওয়া সম্ভব হয় নাই।

উনত্রিশ

আগেই বলেছি, মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর সদস্যপদ বাতিল হওয়ার বিধান আয়ুব খাঁ বাধ্য হয়ে বদলে দিলেও হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্ট সেটা মঞ্জুর করেন নাই, অর্থাৎ শাসনতন্ত্রের বিধান বহাল রইল।

সদস্যপদ খালি হওয়ায় বাই-ইলেকশন ঘোষণা করা হল। ইলেকশনের নামে রাজনীতিকরা পাগল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সবাইকেও পাগল করে তোলে। আমরা বাষট্টি সালে ইলেকশনে অংশগ্রহণ করি নাই। এখন কি করা হবে?

খাজা নাজিমউদ্দিন পশ্চিম পাকিস্তানে সফরে গিয়ে ঘোষণা করলেন, বাই-ইলেকশনে, আমরা শতকরা নব্বইটি আসন দখল করতে পারবে—ইনশাআল্লাহ!

শেখ মুজিবও চ্যালেঞ্জ দিলেন তাঁর দেশের ভাই ওহীদুজ্জামান খাঁকে। তাঁরও সদস্যপদ বাতিল হয়েছিল।

এই দুই নেতার ঘোষণা স্বভাবতই ঢাকার রাজনৈতিক মহলে

একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল। অনেকেই বলল, তাদের ঘোষণা সবার ঘোষণার শামিল। অর্থাৎ বাই-ইলেকশন ফাইট করতেই হবে।

যুক্তিও খাড়া হল: গণতন্ত্র স্থাপনের যে প্রচেষ্টা, বাই-ইলেকশনে অংশ গ্রহণ সেই প্রচেষ্টারই একটা অংশ বিশেষ। আন্দোলন শুরু হবে এখান থেকে।

উৎসাহে মেতে উঠল সবাই।

খাজা নাজিমউদ্দীনের আগ্রহই সব চেয়ে বেশী। তাঁর বাসায় এক বৈঠক ডাকলেন, একটা ইলেকশন-জোট গঠন করার জন্য। এন ডি-এফ কে জানালেন, তাদের সঙ্গে তিনি একটা জোট চান। নিমন্ত্রণ পেয়ে গিয়ে দেখি, নিজামে ইসলাম ও জমাতে ইসলামের প্রতিনিধি উপস্থিত।

এটা আমরা জানতাম না। আভাস দেওয়া হয়েছিল শুধু এন-ডি-এফ-এর সাথেই তিনি আলাপ করবেন। আমাদের চেহারা দেখে নাজিমউদ্দিন নিজেই কৈফিয়ৎ দিলেন, ওদেরও ডাকলাম। ভাবলাম, সবাইকে নিয়ে জোট করাই ভাল।

ভাল ত বটেই। কিন্তু উদ্দেশ্যটা ঠিক তা নয়। আমাদের সাথে একলা তিনি টিকতে পারবেন না এই ভয় বোধ হয় মনে উদয় হয়েছিল। কাজেই দু'জন সাথী জুটিয়ে নিলেন।

প্রস্তাব করলেন একটি কমিটি গঠন করার। প্রত্যেক পার্টির তিনজন সদস্য নিয়ে। আমরা আপত্তি করলাম। এন-ডি-এফ চার দলের সংমিশ্রণে ফ্রণ্ট—তার গুরুত্ব বেশী। তিনি শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন। কমিটিতে এন-ডি-এফ এর প্রতিনিধি সংখ্যা বেশী দেওয়া হল।

প্রথম বাই-ইলেকশন টাঙ্গাইল ও বাসাইল দুই থানা নিয়ে নির্বাচন কেন্দ্র। স্থানীয় কর্মীদের মতামত সংগ্রহ করে, প্রাক্তন এম-পি-এ খোদাবক্স মোক্তারকে প্রার্থী মনোনীত করা হল।

আবদুর রহমান নামে এক ব্যক্তি দাবী করল, মৌলানা ভাসানী

তাকে দাঁড়াতে বলেছেন। এই কথায় সে দাঁড়ায়ে গেছে। তাকে অনেক অনুনয় বিনয় করা হল, কিন্তু কিছুতেই প্রত্যাহার করতে রাজী হল না। মৌলানার হুকুম ছাড়া সে কিছুই করবে না। মৌলানা তখন পশ্চিম পাকিস্তানে।

ঢাকা ফিরে এসে মৌলানা বললেন, সবাই যাকে মনোয়ন করেছেন আমিও তাকে সমর্থন করি। সংবাদ পত্রে এটা প্রকাশিত হল।

কিন্তু লোকটি দাঁড়ায়েই রইল। মৌলানাকে পীড়াপীড়ি করতে তিনি চটে গেলেন, বললেন, সে না বসলে তাকে আমি ঘাড়ে ধরে বসাতে পারি ?

শেষ চেষ্টা করার জন্য আমরা কয়েকজন টাঙ্গাইল যাই। স্থানীয় ন্যাপের সদস্যরা একবাক্যে বলল তারা খোদাবক্সকে সমর্থন করে। কিন্তু আবদুর রহমানকে রাজী করাতে পারে নাই।

অতঃপর দলবলসহ টাঙ্গাইল যাই। খাজা নাজিমউদ্দিন, নূরুল আমিন, হামিদুল হক চৌধুরী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। পথে করটিয়া কলেজের ছাত্ররা এসে ধরল বক্তৃতা করার জন্য। সদর রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে আমাদের গাড়ী সব দাঁড় করায়ে আমরা একে একে সবাই বক্তৃতা করলাম। ছাত্র প্রতিনিধিও বক্তৃতা দিল। আমাদের সংগ্রামে তারা আমাদের সমর্থন করবে ঘোষণা করল।

টাঙ্গাইলে ঐ দিন প্রজেকশন মিটিং। শতাধিক সদস্য উপস্থিত। মিটিং শেষ করে আমাদের সাথে ডাকবাংলায় এসে সাক্ষাৎ করল। কথা বার্তার পর আমাদের প্রার্থীকে সমর্থন করার আভাসও দিয়ে গেল।

কয়দিন পর বাশাইল যাই। প্রায় ত্রিশ চল্লিশ জন ছোট বড় নেতাও গেলেন। করটিয়া কলেজের পাশেই গাড়ী রেখে বাকী পথ নৌকায় যেতে হল। কথা ছিল কলেজের ছাত্ররা ওখানে থাকবে আমাদের সম্বর্ধনা করবে এবং আমাদের সহগামী হবে। কিন্তু ওখানে পৌঁছে তাজ্জব হয়ে গেলাম। একটা ছাত্রের

চেহারাও দেখা গেলনা। ব্যাপার কি, কেউ, কিছু বলতে পারেনা। একটা কিছু ব্যাপার নিশ্চয় ঘটেছে।

নৌকায় যেতে যেতে টাঙ্গাইলের একটি ছাত্রের কাছে রহস্যের ভেদ পেলাম। মোনায়েম খাঁ এর মধ্যে একদিন করটিয়া কলেজে তশরীফ এনেছিলেন। ছাত্রদের হিতোপদেশ দান করার পর তাদের এক দল ছাত্রকে পশ্চিম পাকিস্তান সফর করার জন্য কয়েক হাজার টাকা দান করার ওয়াদা করে গেছেন। ছাত্রদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন।

সত্য মিথ্যা নিরূপণ করার উপায় ছিল না, কিন্তু কার্যক্রম দেখে মনে হল ঐ রকম একটা কিছু ঘটেছে নিশ্চয়। নইলে অমন উৎসাহ উদ্দীপণা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায় কেমন করে। কোন্ যাদুমন্ত্র বলে!

বাশাইলে প্রচুর জনসমাবেশ। চারিদিক সয়লাব। ডাকবাংলার পাকা ভিটা সমান পানি। কয়েক'শ নৌকায় আশপাশের সব লোকজন সমবেত হয়েছে। মস্ত বড় একটা নৌকার উপর চেয়ার টেবিল বসায়ে মঞ্চ করা হয়েছে। নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করলেন। জিন্দাবাদ ধ্বনিতে বর্ষা বিধৌত পল্লী মুখর হয়ে উঠল।

পরদিন 'মনিং নিউজ' নামক বাঙালী বিদ্বেষী সংবাদ পত্রে অদ্ভুত খবর দেখলাম: এ-পি-পি পরিবেশিত। মিটিং-এ বেশ হট্টগোল হযেছে। নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে মুর্দাবাদ ধ্বনি দেওয়া হয়েছে।

হতবাক্ হয়ে গেলাম। এ-পি-পির জনৈক কর্তাকে জিজ্ঞাস করলাম। বলতে চায় না। ধমক খেয়ে বলল, এর চেয়ে অনেক বেশী দেওয়ার কথা ছিল, আমি আপত্তি করায় কেটে দেওয়া হয়েছে। আমরা হুকুমের চাকর।

বললাম তাই বলে অমন ডাহা মিথ্যা খবর সৃষ্টি করবে নাকি?

বলল, সৃষ্টি হয়েছে অন্যত্র—পরিবেশন করেছি আমরা।

বললাম, দু' বছর প্রধানমন্ত্রীত্ব করেছি কোন একটি ঘটনা

মনে করতে পার, যে আমি তোমাদের এমন খবর পরিবেশন করতে বলেছি? বা সত্যঘটনাও রং চড়ায়ে ফলাও করে ছাপতে নির্দেশ দিয়েছি?

বলল, জি না, আপনার আমলে তা কখনও হয় নাই।

ইলেকশনের আগের রাত্রে গিয়ে পৌছলাম টাঙ্গাইল। মেজর আফসার উদ্দিন ইলেকশন তদারক করছেন। পরে অবশ্য তিনি সরকারী দলে যোগদান করে পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী হয়েছিলেন। বললেন, থানার দারোগার নৌকায় সরকারী প্রার্থীর পোষ্টার প্যামফলেট আটকান দেখে অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে বললাম। তিনি প্রথমে বিশ্বাস করেন নাই। পরে দারোগাকে ডেকে পাঠান।

দারোগা তৈয়ার হয়েই এসেছিল। বলল, কে লাগাল জানতেই পারি নাই। ঘুমের সময় আমার হাতের তালুতে গাঁজা ডলে গিয়েছে টেরও পাই নাই। তারপর মেজর আফসারউদ্দীনের দিকে তাকায়ে বলল, দিন না, আপনাদেরও কয়েকটা কাগজ লাগায়ে। আমার আপত্তি নাই।

মেজর ধমক দিয়ে বললেন, ফাজলামী রাখ। লজ্জা হয় না এ সব বলতে?

বাশাইল নিবাসী এক ভদ্রলোক দারোগা। ঢাকায় পোষ্টেড। জরুরী কাজের জন্য তাকে পাঁচ দিনের ছুটি দিয়ে এলাকায় পাঠায়ে দেওয়া হয়েছে। সে ঘুরে ঘুরে ভোটারদের কাছে গভর্ণরের জরুরী সংবাদ পৌছায়ে দিয়েছে।

বাই-ইলেকশনে আমাদের প্রার্থী হেরে গেল। এত কম ভোট পেল যে, তা কল্পনাতীত। সরকারী একটি প্রার্থীর বিরুদ্ধে দু'টি বিরোধী দলীয় ও একটি স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল। ফলে, এই বিপর্যয়।

কিন্তু মূল কারণ সরকারী হস্তক্ষেপ। মোনায়েম খাঁ সশরীরে মাঠে নেমে পড়েছিলেন। ভয় লোভ হুমকি—সবই দেখায়েছেন।

বলেছেন, তাঁর হাতেই ভোটারদের জীবন-মরণকাঠি। বিনা হিসাবে হাজার হাজার টাকা দিয়েছেন তাঁদের। এখন হিসাব ধরে টান দিলেই সব মিঞার গোমর ফাঁক হয়ে যাবে। দূর্নীতি বিভাগের লোকেরা ত সেই দিনেরই অপেক্ষা করছে। তিনিই শুধু তাদের নিরস্ত করে রেখেছেন।

ভোটাররা এতবড় হিতাকাঙ্খীর উপদেশ অগ্রাহ্য করতে পারে নাই। এলাকার ছোট-বড় কর্মীদের লাটভবনে ডেকে এনে পরিস্থিতি বুঝায়ে দেওয়া হয়েছে। তারা মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে এলাকায় গিয়ে সুসমাচার প্রচার করেছে। অনেকেই হাতে হাতে ফলও পেয়েছে।

পর পর কতকগুলি বাই ইলেকশন হয়ে গেল। টাঙ্গাইলের পর আমাদেব আর অংশগ্রহণ করা উচিত হয় নাই। কিন্তু আন্দোলনের অংশ হিসাবে থামাবার উপায়ও ছিলনা। তা' ছাড়া বন্ধ করে দিলে জনসাধারণও হতাশ হয়ে পড়বে। এই সব যুক্তির বলে আমরা চল্‌লাম সম্মুখ দিকে।

প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারেও আমাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। খাজা নাজিমউদ্দিন তার দলের লোককে মনোনীত করার ব্যাপারে কঠিন মূর্তি ধারণ করলেন। সিলেটের এক ব্যক্তির নামও তিনি জানেন না, তবু বললেন খুব ভাল প্রার্থী। ঢাকার তাঁরও নিজের দলের দু'জন দাঁড়ায়ে গেল। তিনি জোর দিলেন একজনের জন্য এবং তাকে নমিনেশন দিলেন। দু'তিন দিন সরজমিনে তদন্ত করার পর তাঁকে তাঁর সিদ্ধান্ত বদলাতে অনুরোধ করলাম। তিনি বললেন, পুনর্বিবেচনা করার কোন বিধান নাই।

বিধান ত নাই ই।

দু'জনেই হেরে গেল। অথচ দুই জনের ভোটের যোগফল সরকারী-প্রাথীর ভোটের চেয়ে অনেক বেশী।

যশোহরে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ তিন চার দলের একজন প্রার্থীকে

মনোনীত করার জন্য সুপারেশ করলেন। খাজা সাহেব অন্য একজনকে দেবার পক্ষপাতী। তাঁর জেদ বজায় রইল। স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মনোনীত প্রার্থীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল দেখে সরকার পক্ষ তাকে দলে টেনে নিল। সেই জিতে গেল। খাজা সাহেবের প্রার্থী হেরে গেল।

এমনি আরও হয়েছে।

আমাদের দলীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষতিজনক হলেও মারাত্মক হয় নাই। মারাত্মক হয়েছে সরকারী হস্তক্ষেপ, দুষ্কৃতি ও অবৈধ প্রভাব। নিরক্ষেপ ও অবাধ নির্বাচনের প্রশ্নই এখানে উঠতে পারে না। এটা মোনায়েম খাঁর নিজস্ব ব্যবস্থা প্রণালী।

সভ্য-জগতের গণতন্ত্রীরা হয়ত শুনলে স্তম্ভিত হয়ে যাবে। গভর্ণর যিনি পার্টি বা দলাদলির উর্ধ্বে তিনি একদম দলাদলির মাঝখানে, কেন্দ্রস্থলে গিয়ে নেমে পড়লেন। ইলেকশনটা তাঁরই যেন। তাঁর চাকুরী বহাল থাকবে এই ইলেকশনের সাফল্যের উপর।

গভর্ণর মাঠে নেমে গেলে বংশবদ কর্মচারীর দল বসে থাকতে পারে না। যে যতটুকু পারে সাধ্যমত সহায়তা করে। তাদের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ বা দুষ্কৃতির অভিযোগ করবে কার কাছে? সরিষাই ত ভূত। কর্মচারীরা ত তাঁরই দোহাই দিয়ে ভোট আদায় করে। তাঁরই জন্য। তিনি সরাসরি যে কোন পর্যায়ের সরকারী অফিসারকে টেলিফোনে ডেকে এনে কানে মন্ত্র ফুঁকে দিয়েছেন। জয়লাভ করতেই হবে। যেমন করেই হোক। মুষ্টিমেয় ভোটার—হাত করা সহজ।

বাই-ইলেকশানের পালা শেষ হবার পর চীফ সেক্রেটারী জনৈক জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে জিজ্ঞাস করলেন, এই যে ইলেকশনে সরকারী হস্তক্ষেপের কথা শুনি—এসব কি?

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, সরকারী হস্তক্ষেপের অভিযোগ কেন উঠবে? সারা ইলেকশনটাই ত সরকারী—আমরা পরিচালনা করেছি। বাইরের হস্তক্ষেপ অসম্ভব।

—ভেরি ইন্টারেষ্টিং চীফ সেক্রেটারী বললেন। ব্যাপারটা বিস্তারিত বলুন ত?

—ব্যাপার বিশেষ জটিল নয়। সরকারী কর্মচারীরাই ভোটার সংগ্রহ কবে উপস্থিত করেছে। সবই উপরওয়ালার হুকুমে। গভর্ণর আমার মাথার উপর দিয়ে, আমার অজ্ঞাতে ডেকে পাঠায়েছেন। তাদের দিয়ে কাজ আদায় অনেক সহজ মনে করেছেন। অথচ, আমাকে বললেই আমি তাদের পাঠাতে পারতাম। গভর্ণরের আদেশ পালন করতে আমি বাধ্য। কিন্তু তা' তিনি করেন নাই।

চীফ সেক্রেটারী শুনে গুম হয়ে গেলেন। বললেন, সরকারী কর্মচারীদের এসব ব্যাপারে টানাটানি করা উচিত হয় নাই। এর আগে ত এ রকম হয়েছে বলে শুনি নাই অন্ততঃ এই প্রদেশে।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বললেন, জি, না, আগে এ রকম হয় নাই। দু'একটি বিচ্ছিন্ন অভিযোগ এসেছে হস্তক্ষেপের। কিন্তু তাও অত্যন্ত গোপনে।

এ রকম ব্যাপার কোনও কালে হয় নাই। আমার আমলে অনেকগুলি বাই-ইলেকশন দিতে হয়েছিল অল্প কয়মাসের মধ্যেই। আমার মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার অল্প কয়দিন পর থেকেই ইলেকশন শুরু হয়েছিল। ইলেকশন শুরু হওয়ার আগেই নির্দেশ দিয়েছিলাম, বাই-ইলেকশন সম্পূর্ণ দলীয় ব্যাপার। সরকারী অফিসারের এতে আগ্রহ বা উৎসাহ দেখান উচিত নয়। আমাদের কর্মীদের উপর নির্দেশ ছিল, তারাও যেন ইলেকশনে জয়লাভের ব্যাপারে সরকারী কর্মচারীর সাহায্য গ্রহণের চিন্তাও না করে। সরকারী যান-বাহন, মাইক্রোফোন ইত্যাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছিলাম। এমন কি, আমার সফরের সময় ছোট একটি পুলিশ রক্ষীদল যে সর্বদা অনুগামী হত, সেটাও বারণ করে দিয়েছিলাম। জনসভা আয়োজন করার দায়িত্ব ছিল সম্পূর্ণরূপে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের।

যথেষ্ট অসুবিধা, কষ্ট এমনকি, বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে এর জন্য। বরিশাল থেকে ভোলা যাবার জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর মোটর লঞ্চ দিতে চাইলেন। তা' না নিয়ে ছোট্ট একখানা মোটর লঞ্চ ভাড়া করে রওনা হই। তাতে কেবিন নাই। পর্দা ফেলে দিয়ে বেঞ্চে বিছানা পেতে কয়েক ঘণ্টা কাটাতে হল। শীতের দিন। একটু ঝড়ো হাওয়া উঠতেই সাবেং পর্দা উঠায়ে দিল। শীতে কাঁপতে কাঁপতে ভোলা গিয়ে হাজির হলাম। সঙ্গীরা আমার দুর্দশা দেখে দুঃখ করতে লাগল: আহা ডি-এম এর লঞ্চ খানা নিয়ে এলে এত কষ্ট ভোগ করতে হ'ত না। এমন ভাবে জীবন বিপন্ন করার কি মানে হতে পারে? ইত্যাদি।

সিরাজগঞ্জ থেকে প্রায় মাইল কুড়ি দূরে এক জনসভা ছিল, বাই-ইলেকশন উপলক্ষে। স্থানীয় কর্মীবৃন্দ একটা বাস ভাড়া করে রওনা হল। আমিও আবুল মনসুর আহমদ একটা জীপে—দু'একজন বন্ধুবান্ধব সহ। রওনা হবার কালে দেখলাম একটা জীপে একজন হাওলদার ও ছয়জন কনষ্টেবল যাবার জন্য প্রস্তুত। তাদের বলে দিলাম, আমার সাথে যেতে হবে না। তারা ওখানেই রয়ে গেল।

সভা করে রাত্রিকালে ফিরে আসার সময় এক খেয়াঘাটে জানতে পারলাম, আমার কর্মী-বোঝাই বাস পার হবার সময় ওপার গিয়ে ফেরি-বোট থেকে ফসকে পড়ে যায় কিনারায়। ফেরি-বোট ডুবে যায়—বাসও অর্ধ নিমগ্ন। সারা রাত চেষ্টা করেও তোলা গেলনা। অতি কষ্টে এপার এসে উদ্ধার কার্যের চেষ্টা করলাম। রাত বারটা পর্যন্ত মরা গুড়ি-কাঠের উপর বসে কাটালাম। নিকটে অনেকগুলি বড় বড় নৌকা বাঁধা ছিল, তাদের ডাকা হল। কেউ সাড়া দিল না। আমরা আবার পার হয়ে জীপে অন্য রাস্তায় সারা রাত চালায়ে ভোর পাঁচটায় ডাক বাংলায় পৌঁছলাম।

একজন সার্কেল অফিসার হঠাৎ খবর পেয়ে ওখানে এল। সে বেচারা আমার চাইতেও নিরীহ। এক কৌতূকজনক পালা করল, নদীর তীরে দাঁড়ায় বক্তৃতার সুরে অথচ ক্ষীণকণ্ঠে বলতে লাগল, দেখুন, নৌকার মাঝি মাল্লারা, আমাদের এখানে বাংলার প্রধান ব্যক্তি উপস্থিত বিপদগ্রস্থ। তাঁহার সাহায্যার্থে আপনারা নেমে আসুন।

মৌকার মাঝি-মাল্লারা ছৈ-এর নীচে ঘুমে বিভোর। বেচারার বক্তৃতা নদীর স্রোতে ভেসে গেল। তাকে বললাম, আর কিছু হবেনা, তুমি আমার কর্মীদের যদি রাত্রিকালের ব্যবস্থা করে দিতে পার, তা হলে খুব ভাল হয়। বাজারে মুড়ি, চিড়া যা' পাবে খেয়ে নিবে।

পুলিশ বাহিনী সঙ্গে থাকলে এই বিপদে পড়তে হতনা। খাকি পোষাকের মাহাত্ম্য অপরিসীম—ঐ অবস্থায়। ওদের ডাকে দু' এক শ' লোক জমা হত। বাস ও ভেরিবোট ডাঙ্গায় উঠত। পাড়াগায়ে, নদীব তীরে, শীতের রাতে প্রধান মন্ত্রীত্ব—প্রধানত্ব নগণ্য।

এ সব অসুবিধা সত্বেও পরবর্তী ইলেকশানে আমাদের নীতি পরিবর্তন করি নাই। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ধুয়া তুলে প্রকাশ্য ও গোপনে পদে পদে হস্তক্ষেপ করে ইলেকশনের গতি পরিবর্তন করা চরম নির্লজ্জতা। রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক জীবনে নির্বাচন একটি পবিত্র অনুষ্ঠান। এর মর্য্যাদা রক্ষা করা যে কোন সরকারের প্রধান ও অবশ্য কর্তব্য। যে সরকার এই কর্তব্যে পরাঙমুখ হয়—গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনা করার তার কোন অধিকার নাই।

বাই-ইলেকশন ব্যাপারে আমাদের কত রকমের উৎপাত ও দৌরাত্ম্য সহ্য করতে হয়েছে। যেখানেই গিয়েছি, কর্মীরা ও রাজনীতিকরা অফিসারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। ওরা বলে, আমাদের কাজে এরা বাধা দেয়। এরা বলে ওরা আমাদের

কাছে অন্যায় আবদার নিয়ে আসে, আর সেগুলি পুরণ করতে না পারলেই চটাচটি করে ও ভয় দেখায় ইত্যাদি। দুই পক্ষ মোকাবেলা করে আমাদের নিরপেক্ষ নীতি অকাতরে পালন করার নির্দেশ দিয়েছি। এক জায়গায় এক প্রার্থীর সমর্থকরা অন্যায় আবদার ও দাবী করা শুরু করেছিল, এস-ডি-ও সার্কেল অফিসারদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করেছিল। উভয় পক্ষ শুনে কর্মীদের বলে দিলাম, তোমরা যদি আবার এ রকম কর, তা হলে নির্বাচন বন্ধ করার ব্যবস্থা করে দেব। সরকারী কর্মচারীদের সাথে তোমাদের কোন সংস্রব থাকবে না। ইলেকশন তোমাদের দলের। তোমরা কৃতকার্য হবার চেষ্টা কর, কিন্তু অন্যায়ভাবে নয়।

এ সব কথা জনসভায় বলেছি—ঘরোয়া আলোচনায়ও উল্লেখ করেছি।

সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। এখনকার আমলও আলাদা। রীতিনীতি আইন কানুন নৈতিক মানও অন্য ধরণের।

মানুষের মৌলিক অধিকার বিলুপ্ত। সামান্য যা নামমাত্র আছে তাও যদি সততার সাথে প্রয়োগ ব্যবহার করতে না পারে তা হলে স্বাধীন নাগরিক হবার গৌরব তার কোথায় রইল। সর্বোতভাবে গোলামের স্তরে আজ সে এসে গেছে।

তিরিশ

বাষট্টি সনের সমস্ত প্রার্থীরাই গণদাবীর ভিত্তিতে ভোট দাবী করে নির্বাচনে জয়লাভ করেছিল। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে এদের সংখ্যাও অধিক ছিল। কিন্তু এ অবস্থা বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই।

এ কথা আগেই বলা হয়েছে যে কোন কোন দল ইতিমধ্যেই পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। কোন কোন নেতা সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্ব স্বীকার করতে চায় নাই বলে দল পুনর্গঠন করে ফেলেছে।

পার্টি নসরিভাইভ্যালের ভিত্তিতে যে সার্বজনীন ঐক্যগঠনের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল তা আর উপরে উঠতে পারে নাই। ফলে কেন্দ্রে ও প্রদেশে বিরোধী মনোভাব সম্পন্ন সদস্যদের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পেতে লাগল আর সেই অনুপাতে সরকারী দলের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে হতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠল।

বাই-ইলেকশানে বিরোধীদলের বিপর্যয় মানুষকে হতাশাগ্রস্থ করেছিল। ঐক্যের অভাব, সরকারী প্রভাব—এই দুইয়ে মিলে যে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে জনসাধারণ তা বুঝতে পেরেছিল। তাই গণঐক্যে যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি হতে চলেছে এবং কালক্রমে এই ঐক্যের ভিত্তি ধ্বসে পড়তে পারে এই আশঙ্কা তাদের মন আচ্ছন্ন করে দিল।

নেতা সোহরাওয়ার্দী বিদেশে। তাঁর অনুপস্থিতিতে কোন নির্দিষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণ করাও সম্ভব হচ্ছে না।

আমরা গোড়াথেকেই ভয় পেয়েছিলাম যে, আমাদের ঐক্যে ভাঙ্গন ধরাবার চেষ্টা খুব জোরেশোরে চলবে। সবাইকে তাই হুঁসিয়ার করে দিয়েছিলাম যে, এই ঐক্যই শাসকশ্রেণীর একমাত্র মারণাস্ত্র। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র নাই, বিপ্লবের শিক্ষা গ্রহণ করি নাই, উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় আমরা দিতে পারি না। তা হলে কি করে আমরা সংগ্রাম চালাব? গণঐক্যই ছিল একমাত্র জবাব। বিশ্বের দরবারে আমরা একটা ছবি তুলে ধরতে পারতাম যে, দেশ দুই শিবিরে বিভক্ত: একদিকে আয়ুব খাঁ ও তাঁর অনুগ্রহ-পুষ্ট পরিষদদল, অন্যদিকে অগণিত জনগণ—গোটা জাতি। এ দৃশ্য যে কোন স্বৈরাচারীর পক্ষে দুঃসহ।

ভেতর থেকে যখন ঐক্য ভঙ্গের লক্ষণ দেখা গেল পার্টি পুণর্গঠন বা পুনরুজ্জীবনের দরুণ—তখন বাইরে থেকে আঘাত করা আরও সহজ। মাঝে মাঝে সরকারী কর্মচারীরা এই প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করতে লাগল। এন-ডি-এফ এর বিরুদ্ধে শ্লোগানও দিয়েছে মাঝে মাঝে।

একদিন এক সামরিক কর্মচারীর সাথে দেখা। কথা উঠতেই রাজনীতির কথা। কি করছেন আপনারা ?

বললাম, কিছুই করার নাই, তাই চুপচাপ বসে আছি।

—না, তা কেন থাকবেন ? যার যার পার্টি গঠন করে কাজ শুরু করে দেন। ফ্রন্ট ট্রন্ট করে কিছু হবে না। অনেকেই এটা বুঝে ফেলেছেন। আপনারা কেমন করে ফ্রন্ট ধরে বসে থাকবেন ?

বললাম, আপনারাও দেখছি রাজনীতির আসরে নেমে পড়লেন। সরকারী কর্মচারীরা ত অনেক আগেই নেমে পড়েছে। বাকী ছিলেন আপনারা—সামরিক কর্মচারীরা। আসুন, ষোলকলায় পূর্ণ হোক।

বিব্রত হলেন। বললেন, না না আমরা রাজনীতি করব কেন ? একজন পাকিস্তানী নাগরিক হিসাবে বলছি, আপনারা দল গঠন করুন—এতেই দেশের মঙ্গল।

বললাম, নিজের মনের কথা, না কারও প্রতিধ্বনি ? আপনার কথা শুনে একটা গল্প মনে পড়ে গেল : একদা হজরত আলির ভোরে ঘুম ভাঙ্গে নাই—ফজরের ওয়াক্ত যায় যায়। এক বৃদ্ধ তাকে ডাকছে, ওঠ, জাগো, নামাজের ওয়াক্ত চলে যায়।

হজরত আলি ধড়পড় করে উঠে পড়লেন। কৃতজ্ঞনয়নে বললেন, আপনি কে ? আমার এত বড় উপকার করলেন ? আসন্ন গোনাহর হাত থেকে বাঁচালেন, কে আপনি ?

বৃদ্ধ বলল, সে প্রশ্ন অবান্তর। আপনি নামাজ পড়ুন, আমাকে বাঁচান।

হজরত আলি পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। বৃদ্ধ বলল, আমি আর কেউ নই—স্বয়ং ইবলিস্।

—ইবলিস ? আলি চিৎকার করে উঠলেন। তুমি আমাকে জাগালে ? তোমার কি গরজ ?

বলল, গরজ নিশ্চয় আছে। সময়মত নামাজ পড়লেই আমি

অস্থির হয়ে যাই। আর নামাজ কাজা হয়ে গেলে চার রাকাতের বদলে আপনি যে চারশ' রাকাত পড়বেন, সেটা আমি কেমন করে বরদাশত করতে পারতাম? তাই অন্নের মধ্যে রেখে দেবার জন্য আপনাকে তুলতে গেলাম।

হজরত আলি রেগে বললেন, তা হলে আর পড়বই না এখন। দেখি তোর স্পর্দ্ধা কত। আমি চার শ' কেন চার লাখ রাকাত পড়ব। দেখি তোকে শেষ করা যায় কিনা!

গল্প শেষ করার আগেই অফিসারটি প্রায় লাফায়ে উঠলেন, কি জনাব, আমাকে আপনি শয়তানেব সাথে তুলনা করলেন?

বললাম, ছি, ছি, বলেন কি? আপনি শয়তান হবেন কেন? একটা মিসাল দিচ্ছিলাম।

এমনি আরও অনেকে। বার বার এসে বিবক্ত কবেছে। মোট কথা এন-ডি-এফকে ভাঙ্গতেই হবে। গণঐক্যেব প্রতীক যে সংস্থা তার অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করতেই হ'বে।

বাইরে ভিতরে প্রচার চলল: কিছু হবে না এদের দিয়ে। বৃদ্ধ অকর্মণ্য স্থবিরের দল। সংগ্রাম করার ক্ষমতা নাই। সংগ্রাম করতে হ'লে চাই সুনিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক দল। ফ্রণ্ট নয়।

গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টের বিরুদ্ধে যে সব অপপ্রচার করা হল, তা শাসকবর্গের গণতন্ত্র বিফল হওয়ার যুক্তিব অনুরূপ। গণতন্ত্র বিফল হয়েছে। রাজনীতিকরা গণতন্ত্রকে হত্যা ক'রেছে ইত্যাদি। গণতন্ত্র এল কোথায় যে হত্যা করা হয়েছে।

এন-ডি-এফ গঠন করা হ'ল কোথায় পুরাপুরি? জনগণের সমর্থন ও শুভেচ্ছাকে সম্বল করে জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল মাত্র। ভূমিষ্ঠ হবার পরই এর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান হয়েছে চারদিক থেকে। অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত শ্লোগান দিয়েছে এর বিরুদ্ধে। বলেছে, এরা কাজ করে নাই। ফ্রণ্ট ফেল মেরেছে।

কাজ করি নাই। করার ছিলই বা কি? মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্য

ছিল ঐক্য সৃষ্টি করা। সেই ঐক্যের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। তার জন্য মাঠে মাঠে ঘোরার প্রয়োজন নাই। সভার উদ্দেশ্য জনমত সৃষ্টি করা। ঐক্য গঠন জনগণের ঐকান্তিক বাসনা। তাদের কাছে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করা নিরর্থক। সরকারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা চলে। কিন্তু যে সরকার জনমতের ধার ধারে না, জনমতকে পদ দলিত করে চলে, তার বিরুদ্ধে জনমতের কোন অর্থ হয় না। তবুও মাঠ সরগরম রাখা ভাল। ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে।

সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হচ্ছে, যারা গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের বিরুদ্ধে বিষোদগার করছে, তারা প্রত্যেকেই এই ফ্রন্ট ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করেছে গোড়া থেকে। এদের অনেকের জন্যই ফ্রন্ট পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে নাই। পদে পদে বাধা দিয়েছে। তাদের নিষ্ক্রিয়তা ও বিরুদ্ধাচরণই ফ্রন্টের অনগ্রসরতার জন্য দায়ী। সুতরাং আর যে যাই বলুক ফ্রন্টকে আক্রমণ করার তাদের কোন অধিকার নাই। তাদের মুখে এর অকর্মণ্যতার অভিযোগ অত্যন্ত অশোভন।

বাই ইলেকশনের পালা শেষ করে শেখ মুজিব গেলেন লণ্ডন। পার্টি পুনরুজ্জীবিত করার ব্যাপার তরান্বিত করার জন্য হয় সোহরাওয়ার্দীকে নিয়ে আসবেন, না হয় তাঁর সম্মতি নিয়ে আসবেন।

লণ্ডনে নেতাকে অনুরোধ করা সত্বেও তিনি রাজী হন নাই। তার দু'চার দিন আগে যশোরের এম-এন-এ রশীদ লণ্ডন থেকে আমাকে চিঠি দিয়েছিল। তাতে লিখেছিল, নেতা পার্টি পুণরুজ্জীবিত করার ঘোরবিরোধী। পাকিস্তানে কবে ফিরবেন তাও বলতে পারেন না।

শেখ মুজিব খুব পীড়াপীড়ি করেছিলেন। কিন্তু নেতা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, যদি পার্টি রিভাইভ করা হয়, তা হলে আমি পাকিস্তানে ফিরে যাব না। আমি কাউকে মুখ দেখাতে পারব না। দেশে ফিরে গিয়ে এন-ডি-এফ এর কাজ কর।

রশিদকে নেতা বলেছিলেন, শেখ মুজিব কেন যে এটা করতে চায় তা আমি বুঝতে পারছিনা। হয়ত আমরা কেউ নাই বলে সে একাই নেতৃত্ব স্থাপন করতে চায়। কিন্তু আমার বিশ্বাস, কেউ সেটা মানবে না। তোমার কি মনে হয়?

রশীদ উত্তর দেয়, তা কেমন করে বলব?

—কেন বলতে পারবে না? দেশের অবস্থা তুমি জান না? দল গঠনের উপর মানুষের আস্থা নাই। তারপর এন-ডি-এফ মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিল নতুন পথে চলার। সে পথ ছেড়ে দিয়ে দলাদলি করতে গেলে মানুষ আবার হতাশ হয়ে পড়বে। আমিও যদি দলগঠনের চেষ্টা করি আমাকেও তারা অগ্রাহ্য করবে।

শেখ মুজিব ফিরে এসে বললেন, আমার মিশন ব্যর্থ হয়েছে। নেতাকে রাজী করাতে পারি নাই।

বললাম, ঢাকায় আওয়ামী লীগের নেতৃবর্গ যাঁরা আছেন তাঁদের ডেকে সব কথা বলা উচিত। সবাই উদ্বিগ্ন। প্রায় কুড়ি পঁচিশ জনকে ডাকা হল আবুল মনসুরের বাড়ীতে। শেখ মুজিব সব বললেন। রায় হল, নেতা ফিরে না আসা পর্যন্ত এসব আলোচনা স্থগিত রাখা হোক।

শেখ মুজিব কিন্তু বলে বেড়াতে লাগলেন, পার্টি রিভাইভ করে ফেলবেন শীগ্‌গীরই। কারও কারও কাছে বললেন, নেতা সম্মতি দিয়েছেন।

আবুল মনসুর একদিন তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাস করলেন, এটা তুমি কি করছ? নেতার নির্দেশ লঙ্ঘন করছ। তুমিই তাঁর নির্দেশের কথা আমাদের বলেছ।

শেখ মুজিব বললেন, নেতা যদি দেশে না-ই ফিরেন, তা হলে আমরা কি হাত পা গুটায়ে বসে থাকব? যে দেশে সোহরাওয়ার্দী নাই, সে দেশের মানুষ কি রাজনীতি করে না?

আবুল মনসুর থ বনে গেলেন। এতদূর হবে তা তিনি আশা করেন নাই।

হঠাৎ একদিন সংবাদে দেখি, আমার বাসায় আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং বসবে। সঙ্গে সঙ্গেই শেখ মুজিব এসে আমাকে বললেন। আমি মিটিং ডাকতেই আপত্তি করি। পরে অনেক কথা কাটাকাটির পর মিটিং বহাল সাব্যস্থ হয়। পার্টি রিভাইভ করা সম্বন্ধে আমার মত প্রকাশ করি। বিরুদ্ধে বক্তৃতা করব ও ভোট দিব। এ কথা তাঁকে বললাম।

বললেন, আচ্ছা দেখা যাক। সবাই যদি চায় তা হলে আপনি বাধা দেবেন কেন? আর তাতে হবেই বা কি?

বললাম, কিছু হবে না জানি। একার মতে কি হয়? তবে আমার বিশ্বাস অনেকেই আমার মত সমর্থন করবে।

মিটিং-এর দিন কয়েক আগে সংবাদ পাওয়া গেল সোহরওয়ার্দী শীগ্‌গীরই ফিরছেন। এই অবস্থায় মিটিং স্থগিত রেখে পরবর্তী তারিখ ঘোষণা করা হল। সে তারিখের মিটিংও বাতিল করা হল ঐ একই কারণে।

ঠিক এই সময়, ডিসেম্বর মাসের পাঁচ তারিখে অতি মর্মান্তিক ও আকস্মিক দুঃসংবাদ রেডিও মারফত প্রচারিত হল—নেতা বৈরুতে এন্তেকাল করেছেন।

সব যেন মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত আমাদের মাথার উপর একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগল। মাত্র দুইদিন আগে মাণিক মিঞার কাছে তাঁর লিখিত চিঠি দেখলাম। পত্রের সুর গভীর হতাশাব্যঞ্জক—কিন্তু তবু তিনি শীগ্‌গীরই ফিরে আসবেন, আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি লণ্ডন থেকে জুরিক গিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করায়েছেন। বিশেষজ্ঞরা তাঁকে সম্পূর্ণ সুস্থ ঘোষণা করেছেন। তবে একটা অপারেশন তাঁর করা দরকার। তার জন্য অপেক্ষা করছেন।

এর মধ্যে এই নিদারুণ সংবাদ। বিশ্বাস করাই যেন অসম্ভব, নেতা আর ইহজগতে নাই। মানুষ মরতেই মর্তে এসেছে। কিন্তু এই সময় নেতার মৃত্যু কল্পনাও করতে পারি নাই। একটা দেশ ও জাতির অন্যতম স্রষ্টা। গণতন্ত্র ও গণকল্যাণের অতন্দ্র প্রহরী। পাকিস্তানের দশ কোটি নির্যাতিত নিপীড়িত সহায় সম্বলহীন মানুষের আশা আকাঙ্খার একমাত্র প্রতীক। হঠাৎ শেষ হয়ে গেল? তাঁর সংগ্রাম বন্ধ হয়ে গেল? স্বৈরাচার খতম করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে মানুষের সর্ব অধিকার তাদের হাতে ফিরায়ে দেবার আগেই তাঁর প্রতিজ্ঞা বিলুপ্ত হয়ে গেল? স্বাধীন সুখী ও সমৃদ্ধিশালী পাকিস্তান গঠন করার অদম্য উৎসাহ নিয়ে যে মহাসমরে ঝাপায়ে পড়েছিলেন, সে সমর শেষ হওয়ার আগে কেমন করে এই রণক্লান্ত মহাবিদ্রোহী শেষ প্রযাণ করলেন?

স্বৈরাচারী শাসনের নিষ্পেষণ তাঁকে সইতে হয়েছে। বিনা দোষে বিনা বিচারে প্রায় আট মাস তাঁকে নিঃসঙ্গ কারাবাস ভোগ করতে হয়েছে। এই কারাবাসই তাঁর কাল হয়েছিল। হৃদরোগের উৎপত্তি হয়েছিল ওখানেই। যার ফলে, নিজের দেশে নয়—বিদেশে বিভুঁয়ে নিঃসঙ্গ অবস্থায় তাঁকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হল।

তুইদিন পর তাঁর লাশ ঢাকায আসার কথা। করাচী ও লাহোরের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব পীড়াপীড়ি করলেন, ওই অঞ্চলে তাঁকে দাফন করাযে, কিন্তু বাংলার মাটি তাঁকে অতি ঘনিষ্ঠভাবে আকর্ষণ করল, যার ফলে পশ্চিম পাকিস্তান হার মেনে যায়।

আসার দিন ভোর থেকেই বিমানঘাটি জনসমুদ্রে পরিণত হল। লক্ষ লক্ষ শোকার্ত হৃদয় অশ্রুর ধারা চোখে নিয়ে দাঁড়ায়ে রইল, তাদের প্রাণের অধিক প্রিয় নেতার শেষ সম্বর্ধনার জন্য। শববাহী বিমান দৃষ্টিগোচর হওয়ার সাথে সাথে 'সোহরাওয়ার্দী জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে দিগন্ত ফেটে পড়ল।

মিছিল করে শবাধার নেওয়া হল ঘোড়-দৌড়ের ময়দানে। আউটার ষ্টেডিয়াম, যেখানে শেরে বাংলার জানাজা হয়েছিল, সে স্থান অপ্রশস্ত বলে এই স্থান ঠিক করা হল। প্রায় পাঁচ লক্ষ লোকের সমাবেশ। লক্ষ লক্ষ হাত ঊর্ধ্বে উঠল নেতার আত্মার সদ্‌গতি কামনায়। লক্ষ প্রাণের হাহাকার ধ্বনি মিশে গেল মোনাজাতের সাথে।

কবরের জায়গা নিয়ে ছোটখাট কোন্দল সৃষ্টি হল। শেরে বাংলার কবরের পাশেই নেতার অন্তিম শয্যা রচনা করার ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু অতি উগ্রপন্থী বন্ধুরা এতে আপত্তি করেন। শেরে বাংলার পাশে তিনি কেমন করে থাকবেন? তিনি অশান্ত হয়ে উঠবেন। দূরে—অতিদূরে, নাগালের বাইরে রাখতে হবে তাঁকে। ফিতা দিয়ে দূরত্ব মেপে প্রায় একশ' হাত দূরে স্থান করা হল। সরকার আপত্তি করেছিল—ভূমির মালিক সরকার। তাদের আপত্তি অগ্রাহ্য হয়ে গেল।

দুইজন নেতা পাশাপাশি থাকবেন, জনগণ এটাই চেয়েছিল। কিন্তু আমরা অনেক বেশী বুঝি। নানা কারণে নানা অবস্থায় জীবনে তাঁদের বিরোধ হয়েছে—মরণে যদি সে সব মাথাচাড়া দিয়ে উঠে! তা হলে কেলেঙ্কারী হবে না? একজন সজল চোখে আমার হাত ধরে বলল, ভাইজান, কেমন করে নেতা এত কাছে থাকবেন? তাঁর আত্মা কিছুতেই শান্তি পাবে না। নেতার বিদেহী আত্মার শান্তির জন্য ভক্তবৃন্দের কি আকুল উৎকণ্ঠা!

মানুষের মৃত্যুর পরও রাজনৈতিক জীবনের কোন্দল কোলাহলের প্রতিধ্বনি পবিত্র আত্মার অসম্মান করতে দ্বিধাবোধ করে না। তাই সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে নেতাকে কবরে রাখা হল। বাংলার জনগণের শেষ সহায়-সম্বল দুইজন গণ-নেতাকে এমনি করে আমরা মাটি চাপা দিয়ে দিলাম।

একত্রিশ

কবরের কাছ থেকে চলে যেতে পা সরে না। অত্যন্ত বিভ্রান্ত মনে এদিক ওদিক পায়চারী করছি। একটু দূরে দেখতে পেলাম, কয়েকজন আওয়ামী লীগকর্মী জটলা করে দাঁড়ায়ে আছে। ভাবলাম, ওদের কাছে গিয়ে কথাবার্তা বলে মনের বোঝা হাল্‌কা করি। যেতেই শুনলাম, সন্ধ্যার পর তারা কোন এক বাসায় গিয়ে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করবে।

মনের বোঝা আরও ভারী হয়ে গেল। বাড়ী ফিরে এলাম।

পর দিন খবর পেলাম, পনর-কুড়িজন কর্মী বসে আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত করা হবে কিনা এই নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছে। নানা কথা উঠেছে: আমার ও শেখ মুজিবর রহমানের ভেতর ভুল বোঝাবুঝি আছে, সেটা দূর করতে হবে। আমরা দু'জনেই শহীদ সোহরাওয়ার্দীর উত্তরাধিকারী।

আওযামী লীগই একমাত্র রাজনৈতিক পার্টি, অপরগুলি কিছু নয়। পার্টি শক্তিশালী করতে হবে, যাতে বিকল্প সরকার গঠন করতে অসুবিধা না হয়। কেউ বলেছে: আমরা এখনই সরকার গঠন করতে চাই না। আরও দশ বছর কাজ করে যাব। একজনের এই মত।

এন-ডি-এফ একটা অসম্ভব, অবাস্তব প্রস্তাব—এটা চলতেই পারে না। যদি পার্টি করতে হয়, তা হলে এন-ডি-এফ এর নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ আলোচনা করে করাই ভাল। অপর একজন বলেছে।

কেউ বলেছে, ঐক্য ভঙ্গ করা চলবে না। পার্টি বড় কথা নয়—দেশ বড়।

ফ্রন্ট না করে আরও ব্যাপক ভিত্তিতে পার্টি করলে কেমন হয়? অন্যজন শুধায়। যদি পার্টি রিভাইভ করতেই হয়, তা হলে কাউন্সিল ডাকতে হয়। কাউন্সিল যা বলে তাই করা উচিত। কোন একজন প্রস্তাব করে।

কয়েকজনে বলে, শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলেছেন, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত পার্টি রিভাইভ করবে না। ফিরে ত এসেছেনই—না হয় মৃত। এখন ত আর বাধা থাকতে পারে না।

এই ধরণের আলাপ আলোচনা। খুলনা, সিলেট, কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ ছাড়া অন্যান্য জেলার যারা ছিল, তারা পার্টি পুনরুজ্জীবিত করার পক্ষে রায় দিল। যশোর নিরপেক্ষ রইল।

শুনে দুঃখ হল। এই ত নেতা মারা গেলেন! আর তর সইল না? রাতারাতি সব করে ফেলতে হবে! তাঁর আরব্ধ কায সমাপ্ত করাই তাঁর ভক্তবৃন্দের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। তা না' করে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যে কাজ করতে বারণ করে গেছেন, সাত তাড়াতাড়ি সেই কাজই করে ফেলার চেষ্টা করাই কি তার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধার লক্ষণ?

মনে হল, অনেকেই সোহরাওয়ার্দীকে তাদের উদ্দেশ্যের প্রবল অন্তরায় মনে করেছে। এখন তার অন্তর্ধানের পর তাড়াতাড়ি কাজে অগ্রসর হতে চায়। দেরী সয় না। হাতে হাতে ফললাভ তাদের কাম্য। আবার কে কোথা থেকে উড়ে এসে গদি দখল করে বসবে। সোহরাওয়ার্দী দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার কথা বলতেন। অতদিন কি বসে থাকা যায়? দেশ কি বসে থাকবে? জাতি কি চলা থামায়ে দেবে? শুভস্য শীঘ্রম। বিলম্ব করা চলে না। বাধা সরে যাওয়ায় পথ উন্মুক্ত।

কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মী—নেতা বা উপনেতা বলা চলে, সোহরাওয়ার্দী যখন সারা দেশময় ঘুরে বেড়ালেন সভা-সমিতি করে, তাদের তৎকালে সাক্ষাৎ পাই নাই। কেউ ব্যবসা উপলক্ষে কেউ চাকুরীর ওজুহাতে এতদিন আন্দোলনে শামিল হয় নাই। এখন হঠাৎ ব্যবসা চাকুরী ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে হাজির হল ময়দানে। মাঠ খালি।

শেখ মুজিবর রহমান একদিন আমাকে বললেন, [illegible]

চেহলম উপলক্ষে কর্মীরা ঢাকা এসে যাবেন। ঐ সময় ওয়ার্কিং কমিটির একটা মিটিং দিয়ে পার্টি পুনরুজ্জীবনের বিষয় আলোচনা করলে কেমন হয়?

বললাম, ঠিক হবে না। মিটিং এর মুড তখন কারও থাকবেনা। পরে স্থির করলেই হবে।

কয়দিন পর একটা লিখিত নোটিশ এনে আমাকে দেখালেন। বললেন, আপনি, আমি আর তর্কবাগীশ তিনজনে দস্তখত করে নোটিশ দিয়ে মিটিং ডাকতে চাই।

বললাম, নোটিশ দেবার আগে বিশেষভাবে আলোচনা করা দরকার। আমি, আপনি, মাণিক মিয়া, আবুল মনসুর সাহেব—এই চারজন বসে নানাদিক চিন্তা করে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ভাল হয়। যদি পার্টি রিভাইভ করাই সাব্যস্ত হয় তা হলে কেমন করে সেটা করতে হবে—ওয়ার্কিং কমিটি না কাউন্সিল ডেকে করতে হবে, সেটা স্থির করতে হবে। তার আগে এন-ডি-এফ ভেঙ্গে দেব কিনা সে বিষয়েও সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। যাদের সাথে মিলে এই সংস্থা স্থাপন করা হয়েছিল, তাদের সবাইকে জিজ্ঞাস করার নৈতিক দায়িত্ব আমাদের আছে। এক তরফা সিদ্ধান্ত আমি গ্রহণ করতে পারিনা।

আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, নেতা এই সম্বন্ধে কি বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, পার্টির অস্তিত্বহীনতাই এন-ডি-এফ এর মূল কথা। যতদিন লক্ষ্যে পেঁছিতে না পারি, ততদিন পার্টি রিভাইভ করা চলবেনা। কথাটা বিশেষ করে নুরুল আমিন উত্থাপন করেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাস করেছিলেন যে, কেউ যদি তার আগেই পার্টি রিভাইভ করে বসে তা হলে আমার দশা কি হবে? মুসলিম লীগ দু'ভাগ হয়েই গেছে। আমি ত আর তৃতীয় আর একটি মুসলিম লীগ দাঁড় করাতে পারবনা। বাধ্য হয়ে অন্য যে কোন দলে যোগদান করতে হবে না পারলে রাজনীতি থেকে, অবসর নিতে হবে।

নেতা জবাব দিয়েছিলেন, নূরুল আমিন, তুমি অনেক দূরের কথা ভাবছ। ইনশাল্লাহ্ ঐ অবস্থায় তোমাকে কখনও পড়তে হবেনা। আমি বলতে পারি, আমার পার্টি রিভাইভ হবে না। আর পার্টি যদি কেউ করতেই চায়, তা হলে সকলে একমত না হলে সেটা সম্ভবপর হবেনা।

শাহ আজিজ জিজ্ঞাস করলেন, তা হলে যে-কোন একজনকে ভিটো প্রয়োগ কবার ক্ষমতা দেওয়া হল? তিনি একলাই সব পাল্টে দিতে পারবেন?

নেতা জোর দিয়ে বলেছিলেন, ইয়েস্—তাই!

আমরা সবাই সমর্থন করি—আপনিও ছিলেন। এখন কেমন করে আমরা এটা লঙ্ঘণ করি?

শেখ মুজিব বললেন, আমি নুরুল আমিন সাহেবের মত নিয়েছি। তিনি দায় থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

বললাম, এটা তাঁর মনের কথা নয়। তা ছাড়া তিনি একাই ত সব নন। সবার মত নিতে হবে। এটা রাজনৈতিক নীতি ও আচরণের কথা। তাদেরও বলতে হবে, আমরা আর চলতে পারছিনা আপনাদের সাথে। আমাদের মুক্তি দিন।

বললেন, হ্যাঁ, তাই করুন।

বললাম, সেই জন্যই ত চারজনে বসে এই সব প্রশ্নের সমাধান ঠিক করি। তিনি স্বীকার করে চলে গেলেন। যাবার আগে বললেন, এ সব হাঙ্গামা না করে সবাইকে নিয়ে একটা পার্টিই করে ফেলুন। ব্যাপক ভিত্তিতে করা হোক্। যারা আসতে চাইবেনা, তাদের বাদ দিলেই হবে। তবে 'আওয়ামী লীগ' নামটা আগে পাছে যেখানেই হোক রেখে দেবার চেষ্টা করবেন। নেতার নামের সাথে এ নামটা জড়িত—যেন মুছে না যায়।

বললাম, তা ঠিক। তা নেতার নামের সাথে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের নাম প্রত্যক্ষভাবে জড়িত—আওয়ামী লীগের সাথে নয়। নামকরণও

তিনিই করেছেন। তিনি জাতীয় নেতার পর্যায়ে উঠেছিলেন। এখন আর আওয়ামী লীগের নেতা নন। আর তিনি আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছিলেন এর জন্মের পর। যাক্ কোনটা থেকে তাঁকে বাদ দেওয়া যায়না।

আমাদের চারজনের বৈঠক কোনদিন হয় নাই। মাণিক মিঞা গেলেন কলকাতা। শেখ মুজিব দেশে চলে গেলেন। আমিও অগত্যা এক সপ্তাহের জন্য বাইবে চলে যাই।

এদিকে এন-ডি-এফ এর নীতি ও উদ্দেশ্য বিষয়ক একটা খসড়া রচনা কয়মাস আগেই সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। এটা চূড়ান্ত করার জন্য একটা সভা আহ্বান করা হল। শাহ আজিজ কুষ্টিয়া চলে গেলেন। শেখ মুজিব দেশের বাড়ীতে। তাঁদের অনুপস্থিতিতেই সভা হল এবং খসড়া পাশ কবা হল। হাজী দানেশ ফবেন পলিসির উপব বক্তৃতা করলেন। তিনি ঠিক কি চান তা বলতে বা বোঝাতে না পেরে বাগ করে সভা ছেড়ে চলে যান। চলে যাওয়ার বাসনা পূর্বেই আভাস দিয়েছিলেন। একটা বাহানা সৃষ্টি না করে যাওয়া দৃষ্টিকটু হয়, তাই এই ক্ষুদ্র নাটকীয় প্রস্থান।

খসড়া রচনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। মাণিক মিঞা আবুল মনসুরকে বললেন, কাজটা ভাল হয় নাই। শেখ মুজিব এমনি বিগড়ে আছে, তার উপর হাতে একটা হাতিয়ার দেওয়া হল। তাঁর অনুপস্থিতিতে এটা করা উচিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ কি সব লিখেছেন আপনারা? নেতার উদ্ভাবিত একমাত্র প্রোগ্রাম বাদ দিয়ে তার জায়গায় কতগুলি প্রোগ্রাম জুড়ে দিয়েছেন। এন-ডি-এফ এর নীতি রইল কোথায়?

সংবাদ পেয়ে মাণিক মিঞাকে আমি টেলিফোনে বললাম যে, আপনি যে খসড়া দেখে দিয়েছেন এবং সমর্থনসূচক ইঙ্গিতের রেখা দিয়েছেন দস্তখত করে, সেটাই ত পাশ হয়েছে।

বললেন, না না! সেটা কেটে ঝুটে অনেক বদল করা হয়েছে।

বললাম, এক বিন্দুও পরিবর্তন করা হয় নাই। দাঁড়ি কমা পর্যন্ত একই রয়েছে। আমার কাছে আপনার স্বাক্ষরিত লেখাটা আছে। পড়ে শুনালাম তাঁকে। তবে শেখ মুজিবের সাক্ষাতে পাশ হলে খুব ভাল হত। কিন্তু আমার বিশ্বাস তিনি দেখেছেন এবং তার অভিমতও প্রকাশ করেছেন। একেবারে অজ্ঞাতে ও গোপনে করা হয়েছে, এ কথা বলা চলে না। তবু তাঁকে বোঝায়ে বলব। আপনিও বলুন। প্রোগ্রামের কথা বলেছেন। প্রোগ্রাম এক দফাই আছে। গণতন্ত্র স্থাপন। তার সাথে কতগুলি সমস্যা আর তার সমাধানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রোগ্রাম আর প্রব্লেম এক নয়। তবুও যদি মনে করেন, এটা জুড়ে দিয়ে জটিলতা বাড়ান হয়েছে, তা হলে এটা সংশোধন করা যাবে পরবর্তী এক সভায়। এটা চুড়ান্তও নয়—অলঙ্ঘনীয় বা অপরিবর্তনীয় নয়।

তিনি সান্ত্বনা পেলেন কিনা বোঝা গেল না।

পরদিনই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল, আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং-এর দিন তারিখ ধার্য করা হয়েছে। স্থান—শেখ মুজিবর রহমানের বাসভবন। জেলার প্রেসিডেণ্ট সেক্রেটারী ও দলীয় এম-এন-এ ও এম-পি-এ-রাও সভায় নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

আমার বাসা থেকে স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মধ্যে মিটিং সীমাবদ্ধ নয়। এম-এন-এ, এম-পি-এ-রাও কারা? সাবেক সদস্য না বর্তমান আমলের? কমিটির সদস্যরা ত প্রাক্ মার্শাল ল' যুগের। সেই আমলের সদস্যরাই ত যোগদান করার অধিকারী। হাল জমানার সদস্যরা আওয়ামী লীগ টিকেটে নির্বাচিত হয় নাই। বরং আমাদের নির্দেশ লঙ্ঘন করেই নির্বাচনে জয়লাভ করেছে। আমাদের নির্দেশ দেবার অধিকার ছিল কিনা সেটা অবান্তর। যাই হোক, তাদের আওয়ামী লীগের পরিষদ সদস্য বলা সুবিধাজনক হতে পারে, কিন্তু সমীচীন হবে না।

আরও প্রশ্ন উঠে। ওয়ার্কিং কমিটির যারা সদস্য বলে দাবী করে—তাদের মনোনীত করেছিলেন তৎকালীন আওয়ামী লীগ সভাপতি মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। তাঁর পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মনোনীত গোটা কমিটিই বাতিল হয়ে যায়।

অবশ্য পরবর্তী প্রেসিডেন্ট ইচ্ছা করলে সেই কমিটি বহাল করতে পারতেন কিংবা নতুন কমিটি গঠন করতে পারতেন। কিন্তু করেছেন কিনা তা' আমার জানা নাই। যদি না করে থাকেন তা হলে কমিটির বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে।

মাণিক মিঞাকে জিজ্ঞাস করলাম, কি হবে? তিনি সর্বদাই পুনরুজ্জীবনের বিরোধী। অন্ততঃ তাই জানতাম। তিনি বলেছেনও তাই। এমনকি, দিন সাতেক আগেও আমার বাড়ীতে এক ঘরোয়া বৈঠকে তিনি তিরস্কার ঘোষণা করলেন যে, প্রাণপণ চেষ্টা করে এই প্রচেষ্টা রোধ করবেন। বললেন, আপনারা কাজ করে যান। যতদিন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের তিনটি শব্দের অস্তিত্ব থাক্‌বে, ততদিন আমি আপনাদের সমর্থন করব।

তিনি মাঝে মাঝে কঠোর ভাষায় পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টার নিন্দা করেছেন। কেন এটা হচ্ছে, এ সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বায়ান্ন সালে শেরে বাংলার বিরুদ্ধে যে অনাস্থা প্রস্তাব আমরা এনেছিলাম, তার উল্লেখ প্রায়ই করতেন। বলতেন, আপনাদের কেউ কেউ আমাকে ভুল বুঝায়ে সমর্থন যোগাড় করেছিলেন। সোহরাওয়ার্দী ভাসানীর সমর্থন আছে, অধিকাংশ সদস্যদের দস্তখত সংগ্রহ করা হয়েছে, এসব কথা বলা হয়েছিল। পরে জানা গেল, নেতৃদ্বয় সমর্থন ত দেনই নাই বরং ঘোর বিরোধিতা করেছেন। অথচ আপনাদের এসব কীর্তি কলাপ আমার কাগজে সমর্থন দেওয়ার ফলে প্রচার সংখ্যা অন্ততঃ পাঁচ হাজার নেমে গিয়েছিল। বহু কষ্টে অবস্থার পুনরুদ্ধার করতে পেরেছি। এবার যদি এই ব্যাপারে জড়িত হয়ে পড়ি তা হ'লে আবার

কি দশা হবে বলা যায় না। নেড়া মাথা নিয়ে দ্বিতীয়বার বেলতলায় যাচ্ছি না।

আরও বলতেন, আপনাদের ঐক্যের সমর্থনে—দলহীন ঐক্যের সমর্থনে আপনারা বক্তৃতা করেছেন মাঠে মাঠে। সব হাওয়ায় ভেসে গেছে—আপনাদের মুখের কথা। কিন্তু আমি যে এতকাল ছাপার অক্ষরে কাগজে লিখলাম, তাত অক্ষয় হয়ে রয়েছে। কেমন করে চট করে গণেশ উল্টায়ে অন্য সুরে পালা গাইতে শুরু করি? তা হয় না।

এই জন্যই তাঁকে জিজ্ঞাস করলাম, কি হবে? আসন্ন বিপদ থেকে তিনি উদ্ধারের পথ হয়ত বার করতে পারবেন। তিনি বললেন, তাঁর মত অটল। হোক না মিটিং। মিটিং হলেই আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত হবে তার প্রমাণ কি?

বললাম, মিটিং ডাকাই হয়েছে ঐ উদ্দেশ্যে। মিটিং এর স্থান পরিবর্তন ও কালের সম্প্রসারণ সবই এক উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। এখানে সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

—তা হোক, অস্থির হবেন না।

আমার বাড়ীতে মিটিং না দেওয়ার কৈফিয়ৎ স্বরূপ প্রচার করা হল: আমি আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবনের বিরোধী, এখানে মিটিং দেওয়া নিরাপদ মনে করা হয় নাই।

এটা অযৌক্তিক কথা। আমি ত আগা-গোড়াই বিরোধী—এটা সবার জানা আছে। তা সত্বেও দুই দুই বার আমার বাড়ীতে মিটিং করার নোটিশ দেওয়া হয়েছিল কেন? অবশ্য বিশেষ সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে যদি স্থান পরিবর্তন করা হয়ে থাকে, তা হলে, এ সব কথা প্রচার করে লাভ কি? আমাকে জিজ্ঞাস করলে আমি কি আপত্তি করতে পারতাম? আর একলার আপত্তির মূল্যই বা কি ছিল?

বত্রিশ

বাষট্টি সালের জানুয়ারী মাসে পাক-ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পুনরাবৃত্তি হয়।

কাশ্মীরে হজরত বাল (রসূলুল্লাহর পবিত্র কেশ) সযত্নে রক্ষিত ছিল কয়েক শ' বছর আগে থেকে। হঠাৎ সেটা চুরি যায় কিংবা কোন চক্রান্তকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠি চুরি করায়। এই ব্যাপারে ভীষণ উত্তেজনা ও বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। ঘোর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। বহু লোক হতাহত হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে এর ঢেউ এসে লাগে এবং নির্বিকারে হত্যাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়।

পাকিস্তানে স্বভাবতই বিষম প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। সূত্রপাত হয় খুলনা থেকে। প্রাথমিক স্তরে তথাকার অতি বিখ্যাত এক দেশ প্রেমিকের প্ররোচনায় দুই দলে সম্পত্তি নিয়ে খুনাখুনি হয়। সেই ঘটনার উপর সাম্প্রদায়িক রং চড়ায়ে চারদিকে বিস্তার করা হয়।

দৈবক্রমে এক জনসভা উপলক্ষে আমরা তখন বরিশালে ছিলাম। আবহাওয়া সেখানেও গরম হয়ে উঠল। স্থানীয় নেতৃবৃন্দের আপ্রাণ চেষ্টায় দাঙ্গা বেঁধে উঠতে পারে নাই। জেলা কর্তৃপক্ষও সময়োপযোগী কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, ফলে আসন্ন দাঙ্গা বন্ধ হয়ে যায়।

ঢাকায় ফিরে এসে দেখলাম, ঝড়ের পূর্বাভাস। নিস্তব্ধ থম্‌থমে ভাব। চতুর্দিকে গুঞ্জন ধ্বনি। সবারই মনে আতঙ্ক। কখন কোথায় কি হয় বলা যায় না। সংখ্যালঘু শ্রেণীর মনে ভীষণ ত্রাসের সঞ্চার হয়।

পরদিনই নারায়ণগঞ্জের পার্শ্ববর্তী মিল এলাকায় নিদারুণ হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল। বিস্তৃত এলাকাব্যাপী নরমেধ যজ্ঞের অবশিষ্ট

দেখতে পেলাম দু'দিন পর অকুস্থলে গিয়ে। রাস্তার দু'ধারের সমস্ত গ্রামগুলি পুড়ায়ে ভস্মের স্তূপ করে ফেলেছে। মানুষ কত মরেছে তার সংখ্যা কেউ বলতে পারে না।

ঢাকা শহরের পরিস্থিতিও আতঙ্কজনক। সারাদিন আমরা বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে লোকদের শান্ত থাকার ও ধৈর্য ধরার আবেদন জানালাম। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেকের বাড়ী গিয়ে সাহস ও ধৈর্য ধরার অনুরোধ করলাম। ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে গেছে—যে কোন মূহূর্তে মৃত্যু ঘটতে পারে এই অবস্থায় তারা কাল কাটাচ্ছে।

কিন্তু যা নিয়তি তা কে রুখতে পারে। বাড়ী ফিরে রাত আটটায় খবর পেলাম আগুন জ্বলে উঠছে। নবাবপুর এলাকায় দাউ দাউ করে দালান-কোঠা দোকান-গুদাম সব পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। দমকল বাহিনী কাছে ঘেসঁতে পারছে না। গুণ্ডার দল তাদের দিকে ইট-পাটকেল ছুঁড়ে মারছে। অর্থাৎ আগুন নিভাতে দিবে না। ধ্বংস বন্ধ করতে পারবে না।

ছাদের উপর উঠে লেলিহান অগ্নিশিখা দেখতে পেলাম। বুক কাঁপতে লাগল এই প্রলয় কাণ্ড দেখে। আর কি দেখতে হবে কে জানে!

আগের দিন একটি শান্তি-কমিটি গঠন করার প্রস্তাব হয়েছিল। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি, সর্দার, প্রধান, তরুণ ছাত্র-কর্মী—সবাইকে নিয়ে একটি সর্বদলীয় কমিটি করা হবে সাব্যস্থ করা হল। সবাইকে সংবাদ দেবার দায়িত্ব নিল এন-ডি-এফ। এই জন্য ছোটখাটো একটা কমিটিও করা হল এন-ডি-এফ-এর।

পরদিন শান্তিকমিটি পুরাপুরি গঠন করার আগেই সিদ্ধান্ত হল শহরে বার হয়ে বিভিন্ন এলাকায় প্রচার কার্য শুরু করার। বিলম্বে অপুরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে। শান্তি কমিটির নামে একটি দল গঠন করে আমরা মোটর ট্রাক্ নিয়ে বার হয়ে পড়ি। সর্বত্র

ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা করা হল। কোন কোন মহল্লায় ট্রাক থেকে নেমে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে আমরা আবেদন জানালাম। ভারতের এক সম্প্রাদায়ের হত্যার প্রতিশোধে এখানে অন্য এক সম্প্রদায়ের লোককে হত্যা করলে ওখানের দাঙ্গা প্রতিরোধ করা যায় না। যাদের প্রতি দরদ ও মমতা বশত এটা করা তাদের কোনই উপকার হবে না বরং ক্ষতি হবে অপরিসীম। এখানে একটা বাড়ী পোড়ালে ওখানে গ্রামকে গ্রাম ছারখার করে দেবে। একটা হত্যার বদলে ওরা হাজার হাজার হত্যাকাণ্ড করে ফেলবে। প্রতিশোধ নিবার পথ এটা নয়।

অধিকাংশ স্থানে আমাদের এই আবেদনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। কিন্তু সব জায়গায় নয়। এক এলাকায় আমাদের গাড়ীর উপর গুণ্ডার দল ইট-পাটকেল ছুঁড়ে মারল। গাড়ী আটকাবার চেষ্টাও করল। চেঁচাতে লাগল, ইণ্ডিয়া চলে যাইয়ে—উন্‌কো সমঝাইয়ে। মালুম হ্যায় ওধার ক্যা হো রহা হ্যায়? ইহাঁ লেকচার দেনেসে ক্যা হোগা? ইত্যাদি।

পুলিশ ঠায় দাঁড়ায়ে আছে রাইফেল কাঁধে নিয়ে। ব্যবহার করে না। জিজ্ঞাস করলাম, তোমার চোখের সামনে হত্যাকাণ্ড হচ্ছে, দাঁড়ায়ে দেখ্‌ছ, গুলি চালাতে পারনা?

উত্তর দেয়, অর্ডার হ্যায় নেহী।

বল কি? অর্ডার নাই? অর্ডার লাগে নাকি?

জরুর,—বলে মুখ ঘুরায়ে পায়চারি করতে থাকে।

রাস্তার দুই ধারে কয়েকটা লাশ দেখলাম—টাটকা। দু'চার মিনিট আগেই বোধ হয় শেষ করেছে। ইতিমধ্যে কারফিউঅর্ডার জারী হয়েছে। রাস্তা জন মানবশূন্য।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের ঘরে ঢুকলাম। এস-পিকে দেখলাম সেখানে। জিজ্ঞাস করলাম, আপনার পুলিশ দাঁড়ায়ে আছে, গুলি করছে না। বলে, অর্ডার নাই।

মিথ্যা বল্‌ছে, অর্ডার নিশ্চয়ই আছে। আর এ অবস্থায় অর্ডারের প্রয়োজন আছে নাকি?

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, কয়েক রাউণ্ড গুলি হয়েও গিয়েছে।

বল্‌লাম, তা হয়ত হয়েছে, কিন্তু কারও গায়ে লাগে নাই। হয়ত, যাতে কারও গায় না লাগে তার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।

হেসে বললেন, না, তা নয়। গুলি করার সাথে সাথে গুণ্ডার দল দৌড়ে ঢুকে পড়ে গলি-কুচার ভেতরে। কাজেই গুলি লাগে না।

বল্‌লাম, ভারী অন্যায়! দাঁড়ায়ে না থেকে দৌড়ে পালায় এটা ত বেআইনি।

আমাদের তরফ থেকে কয়েকটি বাস্তব প্রস্তাব তাঁর কাছে পেশ করলাম। কেমন করে এই হত্যাকাণ্ড রোধ করা যায়।

পাশে একজন এ-ডি-এম। তরুণ সি-এস-পি। অত্যন্ত তাচ্ছিল্য ভরে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলল, নানা জনে নানা কথা বল্‌বে। এ সব শুন্‌তে গেলে আমাদের কাজ ব্যাহত হবে। আমাদের প্ল্যান মত কাজ করাই উচিত।

খুব চটে গেলাম। বল্‌লাম, তোমাদের মাথা এমনি মোটা হয়েছে বলেই ত কোন কাজ করতে পারছনা। সবই বানচাল হয়ে যাচ্ছে। দাঙ্গার কোন অভিজ্ঞতা তোমাদের আছে বলে মনে হয় না। দাঙ্গাহাঙ্গামা দেখও নাই। আমরা যে সব সত্যিকার দাঙ্গা দেখেছি সে সব দেখলে তোমরা ত পাগল হয়ে যেতে। সরকারকে দেখেছি, কেমন করে দমন করেছে। আমরাও যতদূর সম্ভব সাহায্য করেছি। আমাদের নিয়ে তারা পরামর্শ করেছে। শান্তি কমিটি গঠিত হয়েছে। আর তোমরা গায়ে পড়ে পরামর্শ দিতে এলে তা নিতে চাও না। আমরা কি হুকুম দিতে এসেছি? না, আমাদের কোন অধিকার আছে? আমাদের পরামর্শ বা উপদেশ গ্রহণ করা না করা তোমাদের ইচ্ছা। কিন্তু তা' শুনতেও চাইবে না। এমন

গরম মেজাজ হলে চল্‌বে কেন? তোমরা কি ভেবেছ নিজেরাই দাঙ্গা বন্ধ করে দিতে পারবে? জনগণের সহায়তার কোন প্রয়োজন নাই? তোমাদের কর্তারা ত গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছেন। ছেড়ে দাও আমাদের কাছে—যদি দু'দিনের মধ্যে বন্ধ করে দিতে না পারি তা হলে যা ইচ্ছা তাই সাজা দিও। আমরা এসব করেছি—অভিজ্ঞতাও আছে। আর, তা' ছাড়া, আমরা কি রাস্তার বাজে লোক নাকি? ক'বছর আগে এই দেশের শাসনভার ত ছিল আমারই উপর! শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে এতটুকু জ্ঞান-অভিজ্ঞতা নাই নাকি মনে কর? আবার বলছি, গদী ছাড়—আমরা ভার নেই এই ব্যাপারের। দাঁড়ায়ে দেখ, কি করে দাঙ্গা দমন করতে হয়।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও আরও কয়েকজন ভদ্রলোক দাঁড়ায়ে ছিলেন। বিব্রত বোধ করলেন। আমার হাত ধরে বললেন, বসুন স্যার, —ওর কথায় অত চটলে চলবে কেন? ছেলে মানুষ। সত্যিই ত এসব দেখে নাই। একটু বিভ্রান্ত হয়েছে বৈ কি।

বললাম, সেই জন্যই ত মাত্রা ঠিক রেখে কথা বলা উচিত।

উয়ারী একটা বাড়ীতে প্রায় শ' ছয়েক লোক জড় হয়েছে—চতুর্দিকের। বাড়ীটার দুইদিকে দেওয়াল, আর দুইদিক প্রায় খোলা। ওদিক দিয়ে আক্রমণ করলে প্রতিরোধ করার কোন ব্যবস্থা নাই। আমরা যখন ওদের থাকা বসা ও খাওয়ার ব্যবস্থার কথা আলোচনা করছি, তখন শাহ মোয়াজ্জম ও আরও কয়েক জন সেখানে গিয়ে পৌঁছায়। তাদের ওখানে পাহারায় রেখে আমরা চলে এলাম—গার্ড পাঠাবার ব্যবস্থা করার জন্য।

ওখান থেকে এস-পি'র অফিসে গেলাম, গার্ডের কথা বললাম, বললেন, অনেক আগেই ত পাঠায়ে দিয়েছি।

বললাম, এই মাত্র আমরা এলাম। কেউ যায় নাই। হয়ত অন্যত্র চলে গেছে।

বলল, না ওখানেই গেছে।

তর্ক করা বৃথা। ওদের বলার ধরণই ঐ রকম। অর্ডার যখন দিয়েছে তখন নিশ্চয়ই গেছে। এর ব্যতিক্রম ওরা বিশ্বাস করে না। তা হলে অর্ডারের মাহাত্ম্য খর্ব হয়ে যায়।

বিকালে খবর নিয়ে জানলাম কোন গার্ড যায় নাই। সন্ধ্যায়ও না। রাত ন'টায় টেলিফোন করে মোয়াজ্জম বলল, কেউ যায় নাই। বেচারারা দিনে বার হয়ে গিয়েছিল। গরম কাপড় সঙ্গে নেয় নাই। এখন, এই প্রচণ্ড শীতের রাতে তাদের টিকে থাকা দুঃসাধ্য। বিশেষ করে বাইরে বারান্দায় আকাশের নীচে। ঘরে ত তিল ধারণেরও স্থান নাই।

আট ঘণ্টা কেটে গেছে। বেচারারাও আটকা পড়ে গেছে। ছেড়ে আসতেও পারছে না। রাত্রিকালে যদি আক্রমণ হয়, তা হ'লে ওরা শুদ্ধ প্রাণ হারাবে। ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়লাম।

হঠাৎ এক জায়গায় দেখা হল কমিশনারের সাথে। সব বললাম। তিনি বললেন, এখখুনি গিয়ে একটা ব্যবস্থা করবেন। তিনি গেলেন উয়ারী। ছাত্রদের সাহস ও ভরসা দিয়ে এলেন। সারা রাত আমার কাটল অনিদ্রায—গভীর উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার ভেতর দিয়ে। আমরাই ওদের রেখে এলাম ওখানে এই বিপদের মধ্যে। যদি একটা দুর্ঘটনা ঘটে, তা হলে জীবনে এই গ্লানি দূর হবে না।

পরের দিন জানতে পারলাম, রাত তিনটায় রাইফেলধারী সান্ত্রী সেখানে পৌঁছে। ছাত্রদের সারারাত থাকতেই হল। কারণ, রাত তিনটায় তারা কোথায় ফিরে যাবে? শীতে একদম জমে গিয়েছিল।

এখানে যখন এইসব কাণ্ড ঘটছিল, তখন মুল্লুকের সর্ব ক্ষমতার অধিকারী গভর্ণর বাহাদুর দরবার করেছেন পিণ্ডিতে বসে নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তায়। তাঁর অবর্তমানের কেউ কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেনা। সুতরাং নিজ নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক অনুযায়ী যে যা' পারে হুকুম দিয়ে যাচ্ছে আর এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছে। দৃঢ় বলিষ্ঠ সক্ষম

নিয়ে এই হত্যাকাণ্ড রোধ করার কোন প্রচেষ্টা কেউ করে নাই।

একজন মন্ত্রীকে—তিনিই তখন সিনিয়ার—টেলিফোনে জিজ্ঞাস করলাম, বড যে চুপচাপ বসে আছেন? চারদিক যে সব নিদারুণ কাণ্ড কারখানা ঘটে যাচ্ছে, এটা দমন করার কোন বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন না?

বললেন, পারি। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট আদেশ-নির্দেশ ত এখনও পাই নাই।

তা হলে বসে থাকুন, চুপচাপ।

না, তা থাকব কেন? কাজ ত সবাই করে যাচ্ছে। সাধ্যানুযায়ী বিধি-ব্যবস্থাও করা হয়েছে। ই-পি-আর বাহিনী নেমে পড়েছে। অবশ্য বেশীর ভাগ পাঠাতে হয়েছে মিল এলাকায়।

জিজ্ঞাস করলাম, আপনাদের গভর্ণর ওখানে বসে কি করছেন? তিনি কেন ঢাকা ফিরে আসছেন না? আপনাদের ধরণ-ধারণ দেখে লোকে মনে করে আপনারা ইচ্ছা করেই এই হত্যাকাণ্ড দমন করছেন না।

উত্তর দিলেন, না মনে করলে আর কি করব?

অতি উচ্চপদস্থ একজন কর্মচারীকে বললাম, আপনারা কি একদম ছেড়ে দিলেন নাকি?

বললেন, স্যার, সত্যি কথা বলতে কি, উই হ্যাভ ফেইল্ড—দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হ্যাজ ফেইলড—ভেরি মিজারেব্লী। আমরা ফেল করেছি—অতি শোচনীয় ভাবে। এটা স্বীকার করতেই হবে। এর আগে ত দাঙ্গা দেখেছি। কিন্তু এমন নির্বিকার উদাসীন ভাবসাব কখনও দেখি নাই। বড় লজ্জা বোধ হয়।

* * *

এই হত্যাকাণ্ড লুঠ তারাজ অগ্নিকাণ্ড—এটা দাঙ্গা নয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ত বলাই চলে না। এক তরফা ব্যাপার। এক সম্প্রদায়ের লোক সবল, অন্য সম্প্রদায়ের দুর্বল লোকের উপর

অত্যাচার চালায়েছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় শৌর্য ও পৌরুষের নিদর্শণ দেখা যায়। আঘাতের প্রতিঘাত প্রস্তুত থাকে। বিবদমান দলগুলি নিজ নিজ ঘাঁটি সুরক্ষিত করে স্থাপন করে—প্রায় দুর্গের মত। সাজ সরঞ্জাম রীতিমত যুদ্ধের। রণ-কৌশলও ব্যবহার করে উভয় দল। দুই পক্ষের নারী-পুরুষ একটা উত্তেজনাময় অবস্থায় কালক্ষেপ করে। দিবারাত্র আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ চলে। এক পক্ষে একটা হত্যা কিংবা লুঠ বা অগ্নিকাণ্ড ঘটলে অপর পক্ষ তার প্রতিশোধ নেয়। ধর্মের দোহাইও চলে। জেহাদের অনুপ্রেরণা জাগে। জীবনদান অগৌরবের কাজ বলে মনে করেনা। মরলে শহীদ, মারলে গাজী। ঢাকা শহরে ছাব্বিশ সাল থেকে দেখে এসেছি।

কিন্তু এবারের ঘটনা কি? এতে না আছে শৌর্যবীর্য, না আছে পৌরুষ। আছে ঘৃণ্য কাপুরুষতা—লুট তারাজ করার প্রবৃত্তি। এক সম্প্রদায়ের মুষ্টিমেয় লোক ধরে এনে হত্যা করা। বাড়ী ঘরে আগুন জ্বালায়ে দেওয়া। কোন প্রতিবাদ নাই—প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নাই। এমনকি করুণা ভিক্ষারও অবকাশ নাই। বাজার থেকে মাছ কিনে এনে তাকে আঁশ বটিতে ফেলে টুকরা করার মত।

এক থানায় এক মৌলভী রীতিমত ওজু করে "বিসমিল্লাহ্ আল্লাহু আকবর" বলে সারি দিয়ে শোয়ান কয়েকটি মানুষকে কোরবানী দেয়।

একে কি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলা চলে?

হিংস্র পশুও এমন নির্মম ব্যবহার করতে পারে না।

ঢাকা শহরের নিকটবর্ত্তী এক এলাকায় পুরুষরা রাত্রিকালে বড় নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছে। এই ফাঁকে দুর্বৃত্ত নরপশুর দল গ্রামে ঢুকে নারীশিশু নির্বিশেষে অবাধে হত্যা করেছে। অতি বৃদ্ধাও বাদ যায় নাই—কোলের শিশুও না।

ভারতে এর চেয়ে বীভৎস নারকীয় কাণ্ড ঘটেছে। জ্যান্ত

মানুষের বুকে পেরেক মেরে দেয়ালে বা গাছে গেঁথে ফেলেছে। সীমাহীন বর্বরতার নজির স্থাপন করেছে।

অবস্থা ভয়াবহ আকার ধারণ করায় সেনাবাহিনী নামায়ে দিতে হয়েছে দমন করার জন্য।

আমাদের একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী—সহৃদয় বলে কোন দাবী করে না। একদিন আমাকে বলল, স্যার, চাকরী আর করা চলবে না। যা দেখলাম, জীবনে ভুলতে পারব না। আল্লাহর দরগায় মোনাজাত করি, এমন দৃশ্য আর যেন দেখতে না হয়।

ঢাকা জেলার গড়-অঞ্চল নীরব নিথর। প্রকৃতির লীলাভূমি। ঢাকা থেকে মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূরে হলেও আধুনিক সভ্যতার কোলাহল ও কর্মব্যস্ত অস্থির আবহাওয়া এই এলাকায় ঢুকতে পারে নাই। অধিবাসীরা প্রায়ই আদিবাসী। কোন ধর্মীয় অনুশাসন নাই। ভাষা, কৃষ্টি, রীতি, আচার পার্শ্ববর্তী লোকদের থেকে ভিন্ন। জীবন সহজ ও সরল। সাহসী ও কর্মঠ বলে খ্যাতি আছে। কতকাল আগে এদের পূর্বপুরুষ এই ঘন জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে এসে বনজঙ্গল কেটে হিংস্র জন্তুর সাথে যুদ্ধ করে ঝড়ঝঞ্ঝা শিলাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবেলা করে বসতি স্থাপন করেছিল, তা কেউ বলতে পারে না। দুর্গম জঙ্গল কেটে ক্ষেতখামার তৈয়ার করেছে। মাটি দিয়ে ঘর বানায়ে গাছপালা লতাপাতা দিয়ে ঘেরাও করে আশ্রয় নির্মাণ করেছে।

দুর্বৃত্তের দল এখানেও এসে হানা দেয়। বাড়ী-ঘর, মজুত ধান, পাকা ফসলে আগুন লাগায়ে দেয়। প্রাণের ভয়ে বাড়ী-ঘর ছেড়ে বন থেকে বনান্তরে পালায়ে এরা জীবন রক্ষা করেছে। কয়দিন কেটেছে নিরম্বু উপবাস করে। পাতার উপর সঞ্চিত শিশির চুষে পিপাসা নিবারণ করেছে। ফিরে এসে দেখে বাড়ীঘর সহায়সম্বল সব নিশ্চিহ্ন!

টঙ্গি মিল এলাকা থেকে হাজার কুলি শ্রমিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে

জেহাদ করতে বার হয়ে গেল পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে। মিল থেকেই নাকি অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে। পঙ্গপালের মত এরা চলল ধ্বংস লীলা সাধন করে। এই এলাকায় একজন ভদ্রলোক ছিলেন, জমিদার গোছের। সাধু ও মহানুভব বলে সুবাদ ছিল। বাড়ীর ফটকের উপর খোদাই করে লেখা ছিল 'মানুষের ভাল করিবে'। দূর্বৃত্তেরা ভালই করল। একেবারে নির্বংশ করল তার বিরাট পরিবার। গর্ভবতী মহিলাও রক্ষা পায় নাই। মাত্র দু'টি প্রাণী পার্শ্ববর্তী খালে ঝাপায়ে পড়ে জীবন রক্ষা করে।

এই সময় কয়েকজন লোক গিয়ে থানায় ঢুকে পড়ে এবং তাদের রক্ষা করার অনুরোধ করে। থানার এক ছোট দারোগা তাদের কাছ থেকে এগার শ' টাকা আদায় করে—রক্ষা করার মাশুল। বলে, আপনারা যান, আমি সৈন্যসামন্ত নিয়ে আসছি। কিন্তু যায় নাই। ফলে গ্রাম আক্রান্ত হয়ে যা' হবার তাই হয়েছে।

এই সব এলাকায় ঘুরেছি। দেখেছি মর্মান্তিক দৃশ্য। যারা বেঁচে আছে আহত হয়ে তারাই এই সব ঘটনা ও কীর্তিকাহিনী বলেছে। অবোধ শিশুর মতই অনেকে জিজ্ঞাসা করেছে, কেন তাদের উপর এই অত্যাচার করা হল। তারা ত কাউকে কিছু বলে নাই? কেন তাদের টাকা কড়ি লুঠ করে নিয়ে গেল? কেমন করে তারা জীবনধারণ করবে? আমরা এসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারি নাই।

একদল দূর্বৃত্তকে স্থানীয় ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বাধা দেবার চেষ্টা করে। দলের সর্দার তাকে ভয় দেখায় এবং বলে, জানেন আপনি, কার হুকুমে এ সব হচ্ছে? আপনি এর বিরোধিতা করলে তার বিষম ফল ভোগ করতে হবে।

ফলের কথা না ভেবে চেয়ারম্যান বেপরোয়া গুলি চালায়ে দূর্বৃত্তদের অগ্রগতি বন্ধ করে দেয়। অনেকেই ঝাপায়ে খালে পড়ে সাঁতার কেটে পার হয়ে সরে পড়ে।

লুঠ করা ছাড়া এই হাঙ্গামার আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

মেরে কেটে এদের তাড়াতে পারলে বাড়ীঘর জায়গা জমিন দখল করা যাবে। এটাই ছিল কাম্য। এটাই লভ্য। ছেঁড়া কাঁথা, ঝাড়ু, ভাঙ্গা হাঁড়ি-পাতিলও লুট করে মাথায় বয়ে নিয়ে যেতে দেখেছি। কি ঘৃণ্য ও নীচ প্রবৃত্তি!

আমাদের সরকার দলিল পত্রে এটাকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নাম দিতে পারে নাই। সরকারী নাম হয়েছে সিভিল ডিস্টারবেন্স—অর্থাৎ ক্রিমিনাল বা অপরাধজনক নয়। নেহায়েৎ সিভিল—ভদ্রোচিত।

দুই দেশেই ঘটেছে এই নারকীয় কাণ্ড। দেশের সরকার নিরীহ মানুষকে রক্ষা করতে পারে নাই। অন্যায়, অত্যাচার অধম বর্বর পাশবিকতা বল্গাহীন বিস্তার লাভ করেছে। এই দুই দেশেরই ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

পুরাকালে অধর্ম ও বর্বরতার জন্য আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি বার বার ধ্বংস করে দিয়েছেন। একটি জনপদ নির্মূল নিশ্চিহ্ন করে নতুন জাতি ও জনপদ সৃষ্টি করেছেন। বর্তমান কালে সেই সব অধর্ম ও বর্বরতার যে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, এ দেখে আল্লাহ কি চুপ করে থাকবেন? তাঁর সৃষ্ট নিরপরাধ মানুষকে ধ্বংস করা মানে তাঁরই বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করা। এর প্রতিশোধ তিনি নিবেন না?

* * * * *

একদিন 'ইত্তেফাক' অফিসে গিয়ে সংবাদ পেলাম রেলওয়ে কোয়ার্টারে কয়েকটি পরিবার বিপন্ন। আগের রাতে একটি রেল কর্মচারী নিহত হয়েছে। যে কোন মুহূর্তে এই কয়টি প্রাণীর উপর হামলা হতে পারে। তৎক্ষণাৎ নিকটবর্তী পুলিশ ফাঁড়ির একজন দারোগা ও দুইজন সশস্ত্র কনষ্টেবল নিয়ে সেখানে গিয়ে সবগুলি পরিবার উদ্ধার করে নিয়ে আসি এবং রামকৃষ্ণ মিশন রোডের একটি রিলিফ ক্যাম্পে তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করি। কিন্তু সে রিলিফ ক্যাম্পও অরক্ষিত অবস্থায়। চার পাঁচটি নির্জীব লাঠিধারী পুলিশ আর আনসার চার পাঁচশ লোকের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব

নিয়ে বসে রয়েছে। তারা বলল, অতি সত্বর রাইফেলধারী পুলিশ না পাঠালে এদের রক্ষা করা যাবে না।

ফিরে আসব, এমন সময় খবর এল, প্রায় মাইল খানেক দূরে শহরের শেষ প্রান্তে, একটি গ্রাম—সাত আটশ নিম্নশ্রেণীর লোকের বাস। চারদিক খোলা। তিনদিক থেকে আক্রমণের ভয় নাই—স্থানীয় গ্রামবাসীই সাহায্যের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু একটি দিক শহরের দিকে, সে দিকটাই মারাত্মক। দিনে বিশেষ ভয়ের কারণ নাই, কিন্তু রাত্রিকালে তাদের রক্ষা করার কোন উপায়ই থাকবে না।

সামাদ ও ওলি আহাদকে সঙ্গে নিয়ে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবকসহ পায়ে হেঁটে সেই গ্রামে যাই। সব জড় হয়েছে এক জায়গায়—ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত। পার্শ্ববর্তী গ্রামের অনেক লোক উপস্থিত। তারাই পাহারা দিচ্ছে। আমরাও মৌখিক সাহস ও ভরসা দিলাম। সবাই বলল, দুই চারটি রাইফেলধারী না পাঠালে ভয়ানক মুশকিল হয়ে যাবে। বললাম, চেষ্টা করে দেখব।

এই সব জায়গায় রাইফেলধারী পুলিশের অত্যন্ত দরকার। তারা থাকলে দুর্বৃত্তরা কাছে আসতে সাহস পায়না। অবশ্য সে রাইফেল যদি ব্যবহার করা হয়।

'ইত্তেফাক' অফিসে ফিরে এসে দেখি, কেউ নাই। সব নাকি চলে গেছে চীফ সেক্রেটারীর সাথে দরবার করতে। ইতিমধ্যে দাঙ্গা প্রতিরোধ করার জন্য একটি কমিটিও নাকি গঠিত হয়েছে। আমাদের শান্তি কমিটির পাল্টা। মাণিক মিঞা সভাপতিত্ব করেছেন। শেখ মুজিবর রহমান হয়েছেন কনভেনর। দুই মিনিট কাল স্থায়ী সভা দাঁড়ায় দাঁড়ায়েই সম্পন্ন করা হয়েছে। কমিটি করেই চীফ সেক্রেটারীর দরবারে হাজির হয়েছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে কেউ কেউ ফিরে এল। সামাদ মাণিক মিঞাকে জিজ্ঞাসা করল, এই কমিটির কি প্রয়োজন ছিল? আমরা

গেলাম মানুষকে উদ্ধার করতে, আর এই অবসরে একটা কমিটি করে ফেললেন। এত তাড়াহুড়ার কি দরকার ছিল?

মাণিক মিঞা নির্বিকার চিত্তে বললেন, ওরা করে ফেলল, কি করা যায়?

আসল কথা আমাদের কমিটি—এন-ডি-এফ এর কমিটি। কাজেই পাল্টা আর একটি কমিটি করতেই হয়। এর নাম হল দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি। আমাদের অনেককেই এই কমিটির সদস্য করা হয়েছে। অথচ, আমরা এর বিন্দুবিসর্গও জানি না। পরদিন সংবাদপত্র পড়ে জানতে পেরেছি।

'ইত্তেফাক' অফিস থেকে বাড়ী ফেরার পথে প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে লোকজনের ভিড় দেখে সেখানে ঢুকি। উপরে উঠে দেখি সভা বসে গেছে—উগ্র বামপন্থীদের। একটা ইস্তেহার বার করা হবে, তাই নিয়ে আলোচনা। কি শিরোনামায় বার করা হবে এই নিয়ে খুব কথা কাটাকাটি চলছে। উঠে এলাম। কেউ কেউ বলল, বিকালে মিটিং হবে, দয়া করে যাবেন।

কোথায় মিটিং তাও জানিনা। কাজেই দয়া করে যেতে পারি নাই।

পরদিন দেখলাম, 'পূর্ব-পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' শীর্ষক আবেদন সংবাদপত্রে বার হয়েছে। তার পর ইস্তেহার আকারে প্রকাশ করা হয়েছে এই আবেদন।

পরদিন মোনায়েম খাঁ সাভার সফরে গিয়ে ফিরে আসছেন সৈন্য সামন্ত সহ। এদিক থেকে শেখ মুজিবর রহমান ও আরও কয়েকজন দুইটি গাড়ী নিয়ে ওদিকে রওনা হয়েছেন রিলিফের কাজে। এর মধ্যে একটি গাড়ী থেকে কে যেন একটা ইস্তেহার দলা করে ছুঁড়ে মারে গভর্ণরের গাড়ীর দিকে। পড়বি ত পড় গাড়ীর ভেতরে। গভর্ণর চমকে উঠলেন। হৃদ্‌কম্পন শুরু হয়ে গেল। কে জানে ওটা কি? ওর ভেতর বোমা কিনা তাই বা কে জানে।

সান্ত্রিরা গাড়ী ছুটাল দুষ্কৃতীদের পেছনে। বহুদূর গিয়ে ধরে ফেলল গাড়ী। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সদর্পে হুকুম দিলেন, এদের অ্যারেষ্ট কর। মামলা দায়ের হল এদের বিরুদ্ধে। গভর্ণরের জীবন বিপন্ন করার অভিযোগ।

আমাদের কয়েকজনের অর্থাৎ দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির সদস্য বলে যাদের নাম সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধেও আলাদা একটা মামলা দায়ের হল। ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের অভিযোগ। ঐ ইস্তেহার নাকি জন-নিরাপত্তা আইন বিরোধী।

দাঙ্গার সময় সরকার শহরের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি আশ্রয় শিবির বা রিলিফ ক্যাম্প স্থাপন করেছিল। আমরা ঘুরে ঘুরে সে সব ক্যাম্পের খোঁজ খবর নিতাম। একদিন রাত্রে রায়ের বাজার এলাকায় একটা খোলা জায়গায় প্রায় দশ বার হাজার আশ্রয়প্রার্থীকে জমা দেখলাম। সরকারী ভাবে ওটা ক্যাম্প বলে স্বীকৃতি লাভ করে নাই। কাজেই সরকারী সুদৃষ্টি পুরাপুরি পড়ে নাই। খোলা মাঠের পার্শ্বে একটা দালান আর অন্যদিকে গোটা তিনেক মাটির ঘর। যে যেখানে পারে ঢুকে পড়ে মাথা গুঁজে আছে। বাইরে প্রচণ্ড শীত। মাঠেই অধিকাংশ লোক। আবরণহীন অবস্থায় আকাশের নীচে জড়পদার্থের মত আছে নারী-পুরুষ-শিশু একত্রে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণের কোন ব্যবস্থা নাই।

দাঙ্গা-প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে কিছু রুটির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মিউনিসিপ্যালিটি পানির ব্যবস্থাও করেছিল। কিন্তু ঘণ্টা তু'য়েকের মধ্যে তা শেষ হয়ে গিয়েছে। অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় দেখে ফায়ার বিগ্রেড ডাইরেক্টরের সাথে যোগাযোগ করে তাঁকে পানি সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করায় তিনি ব্যবস্থা করে দিলেন।

কিন্তু খোলা ময়দানে ত এরা থাকতে পারবে না। দুই তিনটি গর্ভবতী মহিলা এরি মধ্যে সন্তান প্রসব করল। তারাও বাইরে পড়ে রয়েছে।

পাশেই গভর্ণমেন্টের একটা প্রকাণ্ড দালান উঠছে—বোধ হয় গুদাম টুদাম হবে। ছাদও দেয়াল উঠে গেছে কিন্তু মেঝেয় এখনও কাদা—শুকায় নাই। সেখানে চট বা বাঁশের চাটাই বিছায়ে দিলে বহু লোকের বিশেষ করে বৃদ্ধ ও শিশুদের থাকার ব্যবস্থা হয়। একজন ব্যবসায়ী বন্ধু পরম উৎসাহে একহাজার চাটাই এবং কয়েক মণ চিড়া গুড় যোগাড় করে দিলেন। সামাদ ও ওলী আহাদ সেগুলি ট্রাক ভরে রায়ের বাজার ক্যাম্পে পৌছাল। রাত বেশী হওয়ায় আমি যেতে পারি নাই।

ওরা যখন মালপত্র নিয়ে ওখানে পৌছে বিলিব্যবস্থার কাজে ব্যস্ত, তখন জনৈক সি-এস পি ও আর দুইজন অফিসার ওখানে গিয়ে হাজির। হুকুম জারী করলেন, বাইরের কোন লোক এই এলাকায় থাকতে পাববে না। থাকলে অ্যারেষ্ট করা হবে।

সামাদ ও ওলী আহাদকেও বার হয়ে যেতে বলল। ওরা বলল, কাজ করার জন্যই এখানে এসেছি, তা ত দেখতেই পাচ্ছেন। তামাশা দেখতে আসি নাই।

কিন্তু সি-এস-পি তাতে খুশী নয়। কারা আপনারা? এখানে কেন এসেছেন? কি কাজ কববেন ইত্যাদি।

ওলী আহাদ রগ-চটা। বলল, আমাকে চেনেন না? আমি অমুক। এত চটেন কেন? এত দিন ত আমরাই কাজ করলাম। জনাবদের দর্শন পাই নাই। গোলমাল বাধায়ে দিয়ে দিব্যি নাকে তেল দিয়ে ঘুমায়েছেন। এখন চোট দেখাতে এসেছেন আমাদের উপর। যেখানে চোট দেখাবার প্রয়োজন ছিল সেখানে ছিলেন নীরব।

কথাগুলি কর্কশ এবং সি-এস-পির পক্ষে অসহনীয়। ওলী আহাদের ছোট ভাইও একজন সি-এস-পি। একেও সহোদরজ্ঞানে কথাগুলি বলে ফেলেছিল। কিন্তু সহোদর-প্রতিম সি, এস, পি ক্ষমাহীন। দুই দিন পরেই উভয়েই গ্রেফতার হল নিরাপত্তা আইনে। সরকারী কর্মচারীর সাথে কথা কাটাকাটি করার ঠ্যালা বোঝ।

ডি-আই-বি অফিসে নিয়ে নানাবিধ প্রশ্ন করা হল এদের—কয়েক ঘণ্টা ধরে। বেশীর ভাগ প্রশ্নই রাজনৈতিক দলের পুনরুজ্জীবনের প্রসঙ্গে। এরা পক্ষে না বিপক্ষে। দাঙ্গা সম্বন্ধেও প্রশ্ন করা হয়েছে।

অফিসারের রিপোর্টে এরা বন্দী হল। তরুণ সি-এস-পি। একজন মন্ত্রীব জামাই। সোনায় সোহাগা। ড্যাম কেয়ার ভাব। কথাবার্তায় লেহাজ-তমিজের গন্ধও নাই। এক মহকুমায় এস-ডি-ও থাকা কালে বাপের বয়সী অফিসারদের 'তুমি' বলে সম্বোধন করত। তারা একদিন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে নালিশ করল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কিছু না বলে শুধু বললেন, এই ব্যবহারের পর ওরা যদি তোমাকে ধরে পিটায় তা হলে আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারব না।

তাব স্বভাব বোধ হয় ওলী আহাদের জ্ঞানেব অগোচর ছিল। তাই বেচাবা পড়ে গেল ঘোব বিপাকে—সঙ্গে সঙ্গে সামাদও। বেচারা ছাড়া কী আব বলি।

প্রায় নয মাস জেলে বন্দী থাকার পর মুক্তি লাভ।

তেত্রিশ

আওয়ামী লীগ রিভাইভ করার প্রবল বাসনা থাকা সত্বেও শেখ মুজিব চট করে গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট ভাঙ্গার গ্লানি বহন করতে রাজী ছিলেন না। ফ্রণ্টের বিরুদ্ধে যত কিছু বলা হোক না কেন, এটা যে সোহরাওযার্দীব কীর্তি এবং তিনিই এটাকে জনগণের একমাত্র অদলীয় সংগ্রাম-সংস্থারূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, এ কথাটা ত সহসা অস্বীকার করা চলে না। মৌলানা ভাসানী প্রতি মাসেই তাঁর পার্টি রিভাইভ করবেন বলে হুমকি দিচ্ছেন। শেখ মুজিব সেই সুদিনের অপেক্ষায় বসে রইলেন।

আবুল মনসুর আহমদ এক টোপ দিলেন। শেখ মুজিবকে বললেন, তুমি যখন পার্টি রিভাইভ করার জেদ ধরেছ, তখন এটা হয়েই যাবে। কেউ তোমাকে ঠেকাতে পারবে না। কিন্তু একটু বুদ্ধির চাল খেলতে হবে। ন্যাপ রিভাইভ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। ওটা রিভাইভ হয়ে গেলে তুমি পর মুহূর্তেই রিভাইভ করে ফেলবে। ফ্রন্ট ভাঙ্গার গ্লানি ওরাই নিক।

এই প্ল্যানমত কাজ করতে শেখ মুজিব রাজী হলেন। কিন্তু ন্যাপ অনেক সেয়ানা। তবুও সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলির আয়োজন হল। পরামর্শ হল উভয়ের ওয়ার্কিং কমিটি একই দিন আহ্বান করা হবে ঢাকা শহরে। তারিখও ধার্য করা হল। কিন্তু মৌলানা চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী তারিখের দিন ঢাকা আসতে পারলেন না—অসুখ। সুতরাং ন্যাপের সভা রইল স্থগিত। কিন্তু তাই বলে আওয়ামী লীগ থামবে কেন? ন্যাপের দুই চারজন কর্মকর্তা শেখ মুজিবকে খুব তাল দিতে লাগল।

ওয়ার্কিং কমিটির বর্ধিত সভা বসল, শেখ মুজিবের বাসভবনে। দুই দিনের কর্মসূচী। প্রথম দিনে কার্য আরম্ভ করার আগে সোহরাওয়ার্দীর রুহের মাগফেরাত প্রার্থনা করা হল। তার পরই প্রস্তাব পেশ করা হল, পার্টি রিভাইভ করার এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে জিন্দাবাদ ধ্বনি সহকারে প্রস্তাব গৃহীত হয়ে গেল। ঐ সময় সদস্যরা সোহরাওয়ার্দীর বিক্ষুব্ধ আত্মার কাছে নিজেদের জন্য মাগফেরাত প্রার্থনা করেছে কিনা তা জানা যায় নাই।

আমি, আবুল মনসুর এই মিটিং-এ যোগদান করি নাই। অনেক সদস্য আমার বাড়ীর উপর দিয়া বন্ধুর বাড়ী চলে গেছে —অনেক অসদস্য, বহুকাল আগে থেকেই আওয়ামী লীগের সাথে সম্পর্ক যাদের ছিন্ন, তারাও গিয়ে হাজির। অনাহুত রবাহুতের দল ত আছেই।

মিটিং চলতি অবস্থায় এক পর্যায়ে, অর্থাৎ পুনরুজ্জীবনের

পালা শেষ হবার পর সভাপতি তর্কবাগীশ আমাকে টেলিফোনে মিটিং-এ যোগদান করার অনুরোধ করলেন। বললেন, যদি আমি ইচ্ছা করি, তা হলে তিনি মিটিংটাই তুলে আমার বাড়ী নিয়ে আসবেন। দুঃখ করে বললাম, ইট ইজ টু লেইট—এখন ত কিছু করার বাকী নাই।

প্রচলিত রীতি অনুযায়ী দুই দিনের সভায় শেষ দিনে প্রস্তাব উত্থাপন ও পাশ হয়। এরা কিন্তু প্রথম দিনেই সেরে ফেলল শেষ দিনের কাজ। এই একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়েই সভা আহ্বান করা হয়েছিল। বিলম্ব করে লাভ কি?

মাণিক মিঞা চট করে সভার আগের দিন চাটগাঁ চলে গেলেন। খুব জরুরী কাজ নাকি ছিল। হতে পারে। কেউ কেউ বলল, তিনি রাগ করেই চলে গেছেন, কারণ মুজিব তাঁর অনুরোধ রাখবেন না এটা টের পেয়েছিলেন। এও হতে পারে।

মিটিং-এর দিন সন্ধ্যার সময় ঢাকা ফিরে আসার জন্য ভীষণ চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই টিকেট সংগ্রহ করতে পারেন নাই। তাও হতে পারে।

প্রথম দিনের মিটিং শেষ করে তর্কবাগীশ দশ পনর জন চোখা সদস্যসহ আমার খোঁজে বার হলেন। বাড়ীতে না পেয়ে ধরলেন গিয়ে আবুল মনসুরের বাড়ীতে। তর্কবাগীশ দুঃখ করে বললেন, আপনারা উপস্থিত থাকলে পরিস্থিতি হয়ত অন্যরূপ ধারণ করত। তা' যা' হোক, এখন অনুরোধ, আগামী কাল যাবেন। যদি ভুল করে থাকি তা হলে আপনারা সংশোধন করুন। আমাদের বুঝায়ে সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিন।

যশোহরের মসিহুর বাধা দিয়ে বলল, না মৌলানা, তা নয়। ভুল আমরা করি নাই। সিদ্ধান্ত বদলাব কেন? আমরা এসেছি এদের অনুরোধ করতে। গুরুজন, বয়োবৃদ্ধ। আবদার রক্ষা করে কৃতকর্মের প্রতি সম্মতি জানান, তা'হলেই আমরা কৃতার্থ হই।

আমরা দু'জনেই বললাম, লক্ষ্মী ভাইটি, আবদারের কোন প্রশ্নই উঠে না। এটা অভিমান বা রাগের কথা নয়—নীতির প্রশ্ন! তোমরা বিশ্বাস করেছ এটা ঠিক পথ—সেই পথেই চলেছ। আমাদেব বিশ্বাস অন্যরূপ। যদি দেশ তোমাদের এই কার্য সমর্থন করে, তা হলে দেশই আমাদের বাধ্য করবে তোমাদের দলে যোগদান করতে। আর যদি তা না করে, তা হলে তোমরাই স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে আমরা ভুল করি নাই।

অনেক বাদানুবাদের পব চলে আসে।

ছোট্ট একটি বিবৃতি দিয়ে আমাদের বক্তব্য সংবাদপত্রে প্রকাশ করলাম। তারপর এন-ডি-এফ এর পক্ষ থেকেও একটি প্রস্তাব পাশ করা হল। এ প্রস্তাবের উপর 'পাকিস্তান অবজার্ভার' মন্তব্য লিখল যে, আওয়ামী লীগের বড় একটা অংশ বাইবে রয়ে গেল ইত্যাদি।

মাণিক মিঞা রেগে টেলিফোন করলেন আমাকে। কি সব প্রস্তাব করেছে এন-ডি-এফ? বললাম ওটা প্রস্তাব নয়, সংবাদ-পত্রের মন্তব্য। প্রথমে বিশ্বাস করেন নাই। পরে প্রস্তাব ও মন্তব্য দু'টিই পাশাপাশি রেখে পড়ে শুনালাম। তারপর বোধ হয় শান্ত হলেন। না পড়েই আমার উপর এক চোট ঝেড়েছিলেন।

আওয়ামী লীগ পুনরায় জীবন লাভ করল। নেতা সোহরাওয়ার্দীর বিদেহী আত্মা অশান্ত হয়ে উঠল কিনা কে বলতে পারে। তবে তাঁর সুস্পষ্ট নিষেধ লঙ্ঘন করে এ কাজ যে করা হল, এ ব্যাপারে তর্কের অবকাশ থাকেনা।

সরকারী মহল খুশীতে বাগবাগ। কনভেনশন লীগের প্রেসিডেন্ট জবর খাঁ জবর খুশী হলেন। তিনি ও তাঁর সেক্রেটারী হাশিম উদ্দিন অভিনন্দন জানালেন। 'মর্নিং নিউজ' শেখ মুজিবের ছবি ছাপাল।

'সংবাদ'ও বেজায় খুশী। বিরাট স্তুতি গাইল। নজরুলের

গানের অনুকরণে লিখল, ঐ তরুণের কেতন উড়ে কাল-বোশেখীর ঝড়—তোরা সব জয়ধ্বনি কর। তরুণরা কাজে লেগে গেল। দেশোদ্ধারের দায়িত্ব নিল। প্রাচীন জরাজীর্ণ নেতৃত্বের অবসান ঘোষিত হল। তরুণের জয়যাত্রা কে রোধ করতে পারে ?

ঝড় যে কাল বোশেখীর, তাতে সন্দেহ নাই।

আয়ুব খাঁরও খুশী হবার কথা। তিনি প্রাণমনে এটা চেয়েছিলেন। চারদিকে দূত পাঠায়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে সবাই মিলে যে সংগ্রামের হুমকি দিয়েছিল, সেটা বাদ দিয়ে নিজেদের মধ্যে ঘরোয়া সংগ্রামের যে সূত্রপাত করা হল, এতে নিশ্চয় তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

এই দিন থেকে সূত্রপাত হল দেশের নানাবিধ দুর্গতির। পরবর্তী কালের যত বিপর্যয় ঘটেছে তার প্রায় সবই এর কল্যাণে। গ্রামের একজন বৃদ্ধ অথচ পুরাতন কর্মী দুঃখ করে বললেন, যারা এ কাজ করল, তারা ধর্মঘট ভাঙ্গার অপরাধ করল। আপনাদের চুপ করে থাকাই যে সংগ্রামের পরিচায়ক এই উগ্রপন্থীরা এটা বুঝতে পারল না। আপনাদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করল। হৈ রৈ করে তালগোল পাকালেই সংগ্রাম হয় না, এটাও এরা বুঝতে পারল না। দেশের দুর্ভাগ্য বলতে হবে।

মাণিক মিঞা গোড়ার দিকে দোমনা থাকলেও শেষ পর্যন্ত নেমে পড়লেন পুরোদ্যমে। রিভাইভ্যালকে পুরাপুরি সমর্থন দিতে লাগলেন।

আমরা সাইত্রিশ জন পুরাতন কর্মী আমাদের অভিমত প্রকাশ করে একটা বিবৃতি দিলাম। জনগণ আমাদের সম্বন্ধে ভুল বুঝতে পারে, সেইজন্য আমাদের দিকটা পরিষ্কার করার জন্যই এই বিবৃতি দিলাম। ছাপাবার আগেই মাণিক মিঞা ভয় দেখালেন। আপনাদের সাইত্রিশ জনের বিরুদ্ধে সাড়ে তিন শ' জনের বিবৃতি এসে যাবে। সেটা ভাল হবে ? অনেকেই আপনার বিবৃতির প্রতিবাদ করবে। দস্তখত অস্বীকার করবে।

এটা নতুন কথা নয়—দস্তখত করে অস্বীকার করা। আমরা দস্তখত নিয়েছি। যারা বাইরে ছিল, টেলিফোন করে তাদের সম্মতি নিয়েছি। এরপরও যদি অস্বীকার করে—করবে।

প্রতিবাদ ঠিকই বার হল—'ইত্তেফাকে'। অদ্ভুত ধরণের। বরিশালের লকিতুল্লাহ প্রতিবাদ করেছে। তার আগের দিন বার লাইব্রেরী থেকে তাকে টেলিফোনে জিজ্ঞাস করেছি। বিবৃতিকে তার স্বাক্ষর দেব কিনা। স্পষ্ট বলেছিল, ডেফিনেট্‌লি—নিশ্চয় দেবেন। রাতারাতি টেলিফোন করে মাণিক মিঞা তার মত বদলায়েছেন। পরে সে কথা সে স্বীকার করেছে। মাণিক মিঞা অত্যন্ত পুরাতন বন্ধু। তাঁর অনুরোধ এড়াতে পারে নাই।

এ ছাড়াও আজগুবী প্রতিবাদ বার করেছিল 'ইত্তেফাক':

গফরগাঁয়ের আবদুর রহমান খাঁব দস্তখত অস্বীকার করল, ব্রাহ্মণবাড়িয়াব আবদুল রহমান খাঁ। ইনি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য সভায় উপস্থিত থেকে দল রিভাইভ করেছেন। আমাদের দলে কেমন করে আসতে পারেন? কোন্ আহম্মক তার নাম দিতে পারে আমাদের দলে?

সিলেটের জসীম উদ্দিনের দস্তখত অস্বীকাব করানো হল পাবনার ডাক্তার জসীম উদ্দিনকে দিয়ে। বরিশালের আবদুল ওহাবের দস্তখত অস্বীকার কবল নারায়ণগঞ্জের জনৈক ব্যবসায়ী আবদুল ওহাব।

এমনি অনেক। 'প্রতিবাদের' সংখ্যাবৃদ্ধি করাই ছিল উদ্দেশ্য। নতুবা মাণিক মিঞার হুমকি বৃথা হয়ে যায়। ভাগ্যিস, রাজশাহী বা দিনাজপুরের কোন আতাউর রহমান খান বা আবুল মনসুর আহমদ আমাদের দুই জনের দস্তখত অস্বীকার করে নাই। তা হলে ত' ভরাডুবি হত। গোটা বিবৃতিটাই জাল সাব্যস্থ হত।

তবু যা' হোক, সাড়ে তিন শ' জনের কোন বিবৃতি আসে নাই রিভাইভ্যাল সমর্থন করে। তা হলে তার ভারে সাইত্রিশ জনের দম বন্ধ হয়ে যেত।

এই সব অমূলক প্রতিবাদ ও অস্বীকৃতি ছাপায়ে সাধারণ মানুষের মনে একটা কুয়াশা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এতে আওয়ামী লীগের বিশেষ কোন উপকার হয়েছে বলে মনে হয় না।

এর পর যথারীতি ন্যাপও রিভাইভ হয়ে গেল। কথা ছিল এক সঙ্গে হবার। যাতে কেউ কারও উপর দোষ চাপাতে না পারে। কিন্তু ন্যাপ টেক্কা মারল। চালাকী করে পিছে রইল। দোষটা ষোলআনা চাপল আওয়ামী লীগের ঘাড়ে।

কিছু কাল পরে হল আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন।

একদা সন্ধ্যার সময় প্রায় শ' দেড়েক সদস্য আমার বাড়ী এসে হাজির। কি বৃত্তান্ত! আপনাকে আওয়ামী লীগে আসতেই হবে। আপনি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন। অধিকাংশের মতামত কি করে অগ্রাহ্য করবেন।

বললাম, পার্টির অধিক সংখ্যাই বড় কথা নয়। দেশের অধিকাংশ লোক আমাদের মত সমর্থন করেছে এবং করে। তারা পার্টি পুনর্গঠন করার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। নানা কারণে তাদের আশানুরূপ কাজ আমরা করতে পারি নাই। সেটা আলাদা কথা। কিন্তু তাই বলে তারাও মত বদলায় নাই। পার্টি পুনরুজ্জীবিত করার আগে দেশবাসীর মত নিয়ে ঐক্যজোট করেছিলাম। সে ঐক্য ভেঙ্গে দিয়ে পার্টি রিভাইভ করাই ত অগণতান্ত্রিক। পার্টির অধিকাংশের মত জনমতের অতি ক্ষুদ্র অংশ।

তিন চার ঘণ্টা বিস্তর বাদানুবাদ হল। শেষ পর্যন্ত বলল, আপনি আমাদের নেতা, আপনাকে আমরা কিছুতেই ছাড়তে পারি না।

বললাম, আমি নেতা তার প্রমাণ কি? ঢাকা এসে তোমরা কেউ আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাস করেছ? আমার বাড়ীর সম্মুখ দিয়েই ত সভাস্থলে গিয়েছ। এদিকে মুখ ফিরায়ে চেয়েছ?

তারপর সত্যিকার নেতা যিনি ছিলেন, তাঁকে সেদিন আমরা কবরস্থ করেছি। তোমরা তার উপর আর একপ্রস্থ মাটি চাপা দিয়েছ। আমরা কেউ নেতা নই। পেখম ধরে বসে থাকলেই নেতা হওয়া যায় না। তবে এ কথা ঠিক, যিনি নেতা ছিলেন, বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই আওয়ামী লীগ রিভাইভ করতেন না। এ কথা তিনি শেষ পর্যন্ত বলে গেছেন। তিনি করতে চাইলেও তাঁকে আমি অনুরোধ করে বলতাম, আপনি কিছুতেই এ কাজ করতে পারবেন না। জাতীয় নেতার পর্যায় থেকে দলীয় নেতার পর্যায়ে আপনি নেমে আসতে পারেন না।

এর পর অতি বিষণ্ণ বদনে সবাই ফিরে গেল।

এন-ডি এফ এর বিশিষ্ট সদস্য শাহ আজিজুর রহমান হঠাৎ আওয়ামী লীগে যোগদান করে ফেললেন। আমরা ঘুণাক্ষরেও আভাস পাই নাই। তিনি পরে নুরুল আমিনের কাছে গিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, মাণিক মিঞার চোখের পানি দেখে ভাবাবেগ সম্বরণ করতে পারেন নাই। তাই আওয়ামী লীগে যোগ দিলেন।

তা হলে মাণিক মিঞাও মাঠে নেমে গেলেন!

পরদিন কাউন্সিল অধিবেশন। অধিবেশনে ময়মনসিংহের একজন সদস্য আমাকে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কারের প্রস্তাব পেশ করার পায়তারা করেছিল। শেষ পর্যন্ত অনেকে বিরোধিতা করায় প্রস্তাব পেশ হয় নাই।

জাষ্টিজ ইব্রাহিম একদিন আমাকে বললেন, আওয়ামী লীগে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রণ পেয়েছি। যোগ দেব কি?

বললাম, আমাকে জিজ্ঞাস করা কি ঠিক হল? আমি নিজে যোগদান করি নাই। করার যুক্তিও খুঁজে পাই নাই। আমার বিশ্বাস সকলে মিলে সামগ্রিক ভাবে চেষ্টা না করলে বর্ত্তমান অবস্থা পরিবর্ত্তন করা অসম্ভব। আমার কাছে দেশ প্রথম,

তারপর পার্টি, তারপর ব্যক্তি। অনেকে উল্টাদিক থেকে হিসাব করেন: ব্যক্তি আগে, তারপর পার্টি, তারপর দেশ। দেশের মুখ্য প্রয়োজন আজ পার্টি নয়—ঐক্য: দেশ চায় সার্বিক প্রচেষ্টা, দলীয় শক্তিবৃদ্ধি নয়।

বললেন, তা হলে তাই করনা কেন?

বললাম, চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। কিন্তু বিফল হয়েছে সব চেষ্টা। আপনি বরং চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

বললেন, লোকে সন্দেহ করবে যে, লোকটা নেতা হতে চায়। মতলব ভাল নয়।

বললাম, আপনার বেলায় এরূপ সন্দেহ উঠবে না। আপনি রাজনীতিক নন। দলাদলি করেন নাই। তবে মার্শাল ল'র আমলে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করায় কিছুটা দুর্গন্ধ গায়ে লেগেছে। পরে ছেড়ে দেওয়ায় আবার ওটা সাফ হয়ে গেছে। সবাই দেখি আপনাকে টানাটানি করে। আপনি সবাইকে ডাকুন।

বললেন, দেখি চিন্তা করে।

এরপর হঠাৎ একদিন অতি ভোরে আমার বাড়ী এসে হাজির। বললাম, কি ব্যাপার? হঠাৎ যে এসে পড়লেন? আমাকে ডাকলেই পারতেন। আমিই হাজির হতাম।

বললেন, তা হয় না। সারারাত ঘুম নাই। নানা চিন্তা মাথায় ঢুকে ঘুমটা নষ্ট করে দিল। ভাবলাম, তোমার সাথে আলাপ করলে কিছুটা শান্তি পেতে পারি। বল, এখন তুমি কি করবে?

বললাম, কিসের কি করব?

বললেন, বাংলার পাঁচ কোটি লোককে বাঁচাতে হবে। তোমাকে কঠিন দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। আশা করি, তুমি আমার অনুরোধ উপেক্ষা করবে না।

বললাম, আপনি আমার শিক্ষক-গুরু। আপনার অনুরোধ আমার কাছে আদেশ। কিন্তু কি করতে হবে বলুন।

বেশ উত্তেজিত হয়ে বললেন, এ ব্যাপারে তুমি আমার গুরু-শিক্ষক। যা' বলবে, তাই করব।

বললাম, যা' পরিস্থিতি তাতে কি যে করতে হবে তাই ত ঠিকমত বুঝতে পারছি না।

বললেন, সবাইকে এক করার দায়িত্ব গ্রহণ কর। সবাইর কাছে হাতজোড় করে আবেদন কর, মিনতি কর, সমস্ত ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে যোগ দিন। জনগণের লুণ্ঠিত অধিকার পুনরুদ্ধার করুন। দেশ ও জাতিকে বাঁচান।

বললাম, আমি ত আগেই বলেছি, প্রাথমিক চেষ্টা আপনি করুন। একদিন ডাকুন সবাইকে আপনার বাড়ীতে। আমার যেটুকু সাধ্য তা আমি করব। দরকার হলে সবার হাতে পায়ে ধরব।

খুব খুশী হলেন বলে মনে হল। ধীরে ধীরে গাড়ীতে উঠলেন। বললেন, আচ্ছা, তোমাকে খবর দিব—যাবে কিন্তু।

বললাম, নিশ্চয়ই—যে কোন সময়।

চৌত্রিশ

কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ মুজিব তাঁর মুদ্রিত ভাষণে অনুযোগ করলেন যে, বিগত এপ্রিল মাসে বার লাইব্রেরী হলের মিটিং-এ আমাদের সহকর্মী জনাব আতাউর রহমান খান বলেছিলেন, আপনারা প্রস্তাব পাশ করলে আমি তা অম্লানবদনে মেনে নিব।

কথাটা রং চড়ায়ে বলা হয়েছে। বলেছিলাম রিভাইভ করার আমি বিরোধী। আপনারা সবুর করুন। নেতা ফিরে না আসা পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত নিবেন না। ন্যাপ বা অন্যান্য দল পুনরুজ্জীবিত করার হুমকি দিচ্ছে, তাতে আপনারা বিচলিত হবেন না। আপনাদের সিদ্ধান্তের যুক্তি ও দায়িত্ব ষোলআনা আপনাদেরই।

সবাই মিলে যদি একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তা'হলে আমার একলার অমতে কিছু আসে যায় না। প্রস্তাব কার্যকরী হবে।

নেতা সোহরাওয়ার্দী স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, যেখানে গণতন্ত্র নাই, সেখানে রাজনীতি নাই। যেখানে রাজনীতি নাই, সেখানে রাজনৈতিক দলগঠনের প্রশ্নই উঠে না।

তিনি বলতেন, ক্ষমতার জন্য যে রাজনীতি সে রাজনীতি আমি করতে চাই না। দেশের বর্তমান অবস্থায় রাজনীতির মারফত ক্ষমতা লাভের প্রশ্ন উঠে না। দেশকে সুস্থ অবস্থায় ফিরায়ে আনার পর, অর্থাৎ অবাধ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ক্ষমতার রাজনীতির প্রশ্ন উঠতে পারে। তার আগে নয়।

মনে পড়ে, একদিন মাণিক মিঞার বাড়ীতে নেতা বিছানায় শোয়া—ঘরে আর কেউ নাই। কথা প্রসঙ্গে বললেন, তোমরা যদি দশ বছরের মধ্যে ক্ষমতা লাভ করার আশা করে থাক, তা হলে জীবনেও তোমাদের হাতে ক্ষমতা আসবে না। আর যদি এখন থেকে কাজ করে যাও, ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করার প্রস্তুতি করে যাও, তা হলে বছর দশেক পর নিশ্চয়ই ক্ষমতা লাভ করতে পারবে।

হতাশাগ্রস্ত মনে বলে ফেলেছিলাম: এতকাল বসে থাকব? দেশের মানুষ এতদিন গোলাম হয়ে থাক্‌বে?

বললেন, উপায় নাই। থাক্‌তেই হবে। আমাদের ভুলের জন্য তাদের শাস্তি ভোগ করতে হবে। তারাও সম্পূর্ণ নির্দোষ নয়।

বললাম, আমাদের ভুলের জন্য আমাদের শাস্তি হোক। কিন্তু জনগণ কি করেছে?

হেসে বললেন, তারা অন্যায় সহ্য করছে, প্রতিবাদ করে না।

তার পর উঠে বসলেন, বললেন, যদি অধৈর্য হয়ে থাক, তা হলে অন্য দলে মিশে যাও—ওদিকে হালুয়া রুটি জুটে যাবে।

বললাম, তাই বলছি নাকি? বড় লম্বা মেয়াদী সংগ্রামের

আভাস দিচ্ছেন কিনা—তাই ভাবছি, আয়ু ততদিন আছে কিনা!

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, দেখ, যে শক্তি ক্ষমতা হাতে নিয়ে বসে পড়েছে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার তোমার কি অস্ত্র আছে? তার হাতে আছে গোলা-বারুদ। একটা সুসংবদ্ধ সেনাবাহিনী, সুনিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্র, শক্তিশালী শিল্প ও পুঁজিপতি সঙ্ঘ, আর আছে তাঁরই সৃষ্ট—মৌলিক গণতন্ত্রী-বাহিনী। সবগুলিই সুসংগঠিত। তোমাদের কি আছে? নেতৃবৃন্দ, রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ না হলে, বিচ্ছিন্ন জনগণ ঐক্যবদ্ধ না হলে তোমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। নিরস্ত্র জনগণের একমাত্র শক্তির উৎস গণঐক্য। চিরাচরিত ও গতানুগতিক পদ্ধতিতে তোমরা বর্তমান শাসক-গোষ্ঠিকে তাড়াতে পারবে না। একই চিন্তা ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চালায়ে যেতে পারলে জয় সুনিশ্চিত।

এই ছিল তাঁর ধারণা। জীবিত কালে নিজে নেতৃত্ব দিয়ে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা তাদের হাতে এনে দেবেন এই ছিল তাঁর স্বপ্ন। এই অবস্থায় তিনি দশ বছর-ব্যাপী সংগ্রামের প্রস্তুতির কথা ভাবতেন।

আর এখন, তাঁর অন্তর্ধানের সাথে সাথে আমাদের মত বিরাট নেতৃবৃন্দ ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দল গঠন করে, বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে একে অন্যের চেয়ে বেশী শক্তিশালী প্রমাণ করার চেষ্টায় নিমগ্ন থেকে স্বতন্ত্রভাবে সংগ্রামে অবতরণ করার সঙ্কল্প ঘোষণা করছি। জয় আমাদের অনিবার্য!

এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই জাতীয় ঐক্য ভেঙ্গে দলীয় ঐক্য গঠন করার কাজে নেমে পড়লাম। শুরু হয়ে গেল সংগ্রাম। অর্থাৎ সর্বত্র জনসভা।

চৌষট্টি সালের মার্চ মাসে ঢাকায় যে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে আবুল মনসুর আহমদ এক লিখিত ভাষণে বলেছিলেন, 'শহীদ সাহেবের প্রভাব-

শালী ব্যক্তিত্ব ও অনুপ্রেরণাদায়ক নেতৃত্বের দৈহিক মৌনতার প্রথম চোটেই তাঁর নিজের পার্টিসহ রাজনৈতিক দলসমূহ রিভাইভড হইয়া গিয়াছে······এন-ডি-এফ বলে পার্টির চেয়ে দেশ বড়, পার্টি সংস্থার আগে গণঐক্য চাই। পার্টি যাঁরা রিভাইভ করিয়াছেন তাঁরা দেখাইয়াছেন তাঁদের কাছে দেশের চেয়ে পার্টি বড়। কাজেই পার্টি আগে, দেশ পরে।

তিনি আরও বলেছিলেন, 'তাবা (জনগণ) মনে করিয়াছিল, আমাদের জ্ঞানোদয়ের জন্য এটা (মার্শাল ল') দরকার ছিল। আশা কবিয়াছিল, পাঁচ বছর মার্শার ল'র বেত্রাঘাতে আমাদের শিক্ষা হইয়াছে। এবার আমরা সত্যিকার গণতন্ত্রীব মত জনগণের অধিকার আদাযের জন্য অতীতের দলীয় তিক্ততা ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধ ভাবে সংগ্রাম করিব। যতদিন তা সফল না হয় দলাদলীর নামও মুখে আনিব না।'

—'কিন্তু জনগণ দেখিয়া তাজ্জব নিরাশ ও হতাশ হইয়াছে। আমাদের চরিত্রে কোন পরিবর্তন আসে নাই। মার্শাল ল' উঠামাত্র পার্টি করিবার প্রথম সুযোগেই আমরা নেতৃত্ব লইয়া কামড়া-কামড়ি শুরু করিয়াছি। গাছে কাঁঠাল ধরিবার অনেক আগেই আমরা শুধু গোঁফে তেল দিতে নয়, একে অন্যেব গোঁফ ধরিয়া টানাটানি শুধু করিয়াছি·········মন্ত্রীত্বের ও নেতৃত্বের লোভে যারা একদিন শেরে বাংলার নেতৃত্বে গঠিত জনগণের যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গিয়া ১৯৭৫ সালের ঐতিহাসিক বিজয়কে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল, তারাই আজ তেমনি নেতৃত্বের লোভেই সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে সংগঠিত এন-ডি-এফ-কে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিতেছে। জনগণ অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল: এ সব কি করিতেছেন সা'ব? আপনাদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের কি হইল? হঠাৎ যার তার ভিন্ন গোঠ বানাইতেছেন যে? উত্তর দিতেছি, মূর্খ জনগণ, তোমরা বুঝিতে পারিতেছ না। আমরা ঐক্যের জন্যই পৃথক হইতেছি।

জাতীয় ঐক্যকে মজবুত করিবার জন্যই আমরা আগে দলীয় ঐক্যকে মজবুত করিতেছি। গোড়া পাকা না করিয়া কি আগা পাকা করা যায়? হইতেও পারে, ভাবে জনগণ। খানিকক্ষণ হা করিয়া ব্যাপার দেখিয়া আবার জিজ্ঞাসা করে,—'নিজের দলের লোক বাদ দিয়াই যে পার্টি রিভাইভ করিতেছেন, এটা কেমন হইল? নিজেদের পার্টির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া গণঐক্য করিবেন কিরূপে? উত্তর দিতেছি, বাজে লোক বাদ দিয়া খাটি মাল পাইয়া দল করিতেছি। আগে ঘরের ভিতর সাফ না করিয়া কি উঠান পরিষ্কার করা যায়? ঘরের বিভীষণ আগে ফিনিশ না করিয়া কি দুশমনের মোকাবিলা করা যায়?"

এই মনোভাবই গণঐক্য ভেঙ্গে দলীয় ঐক্য সৃষ্টি করার জন্য দায়ী। তবুও পার্টি পুনর্গঠিত হবার পরও গণঐক্য সৃষ্টি করা যায় এ বিশ্বাস আমরা করেছি। সবাইকে নিয়ে ঐক্য গঠন করতে গেলে কাউকে বাদ দেওয়া চলেনা—পুনর্গঠিত পার্টিদের ত নয়ই।

যারা পার্টি পুনর্গঠন করেছে তাদের অনেকেই পার্টিসমূহের ঐক্যে বিশ্বাসী নয়। তারা বলে, অতীতে যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়েছিল, তা বিফল হয়েছে। কথাটা ঠিক নয়। বিরোধীদলীয় প্রতিষ্ঠান গুলি তখন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল নির্বাচনে জয়লাভ করার মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে। ক্ষমতাশীল মুসলিম লীগ দলকে পরাজয় করাই ছিল প্রথম উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য নিষ্ফল হয নাই।

নির্বাচনে অভূতপূর্ব জয়লাভ এই ঐক্যফ্রণ্টেরও কৃতিত্ব। ফ্রণ্টের একুশ দফার প্রতিও জনগণ দুর্বার বেগে আকৃষ্ট হয়েছিল। উত্তর কালে যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে দেওয়ায় একুশ দফার পূর্ণ রূপায়ণ সম্ভব হয় নাই। এটা গভীর পরিতাপের বিষয়। কিন্তু এর জন্য যুক্তফ্রন্ট দায়ী নয়। দায়ী ব্যক্তিগত নেতৃত্বের অদম্য বাসনা।

জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টেরও মুখ্য উদ্দেশ্য দেশে গণতন্ত্র পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করা। এটা জাতির সামগ্রিক কর্মসূচী হতে পারে না। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর রাজনীতির রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। সে অবস্থায় বিভিন্ন দল নিজ নিজ কর্মসূচী নিয়ে মাঠে নেমে যাবে এটা স্বাভাবিক। তাই বলে ভবিষ্যতে ঐক্য অটুট থাকবেনা, এবং যুক্তফ্রন্টের মত ভেঙ্গে যাবে, এই আশঙ্কায় আজকের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ও প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে অমূলক যুক্তিতর্কের অবতারণা করা রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচায়ক নয়।

যুক্তফ্রন্ট যখন হয়েছিল তখন সব পার্টিগুলিই চালু ছিল। তবুও ঐক্যের প্রয়োজন হয়েছিল। আর এখন পার্টি চালু ছিলনা, তবুও ঐক্য সৃষ্টি করা সম্ভব হল না। উদ্ধৃত ভাষণে বলা হয়েছিল, 'তখন চালু পার্টিসমূহের কার্যক্রম সাসপেণ্ড করিয়া ঐক্য আনা হইয়াছিল, আর এখন চালু ঐক্য সাসপেণ্ড করিয়া পার্টি আনা হইয়াছে।.......... মার্শাল ল' যদি পার্টিসমূহ ভাঙ্গিয়া নাও দিত—যদি পার্টিসমূহ তাজা থাকিত, তবুও গণতন্ত্র হাসেলের উদ্দেশ্যে আমাদিগকে ঐ সব চালু পার্টির কাজ সাসপেণ্ড করিতে হইত—অচেতন পার্টিকে চেতন করা ত দূরের কথা।'

এই সব যুক্তি ঐক্যবিরোধী দল গঠনকারীদের মনে কোন অনুকূল প্রভাব বিস্তার করতে পারে নাই। দল তাজা করে অন্যের সাথে পাল্লা দিয়ে মাঠে নেমে রাজনীতির আসর গরম করতে হবে—এই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। এক সাথে কাজ করার কথা তারা ভাবতেই পারে না।

একলা চলার পক্ষে যুক্তি খাড়া করা হল; গণতন্ত্র উদ্ধার করতে হলে সংগ্রাম করতে হবে। সংগ্রামের জন্য চাই সুসংবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। তার রীতিনীতি, নিয়মাবলী দৃঢ়ভাবে সদস্যদের মনে একত্ব-বোধ জাগায়। সবাইকে দলের রীতিনীতি মেনে চলতে

বাধ্য করা হয়। ফ্রন্ট একটি অসংবদ্ধ ঢিলা সংস্থা। নানাজাতীয় লোক এতে থাকবে। একনিষ্ঠ মনে কেউ কাজ করতে পারে না। সুতরাং সংগ্রামের নেতৃত্ব দেওয়া এই সংস্থার পক্ষে অসম্ভব ও অবাস্তব। তা ছাড়া ফ্রন্ট একটা ক্ষণস্থায়ী সাময়িক ব্যবস্থা। দীর্ঘমেয়াদী সংগ্রামে, লম্বা সফরে এর শক্তি ফুরায়ে যাবে। অকর্মণ্য হয়ে পড়বে।

অতএব চাই প্রতিষ্ঠান—দল। প্রতিষ্ঠানে শরিকানা বা মালিকানা বোধ জন্মে—ফ্রন্টে তা' হয় না। এটা জগন্নাথ ক্ষেত্র। সব এক বরাবর। যে যা' খুশী করতে পারে।

সুতরাং প্রত্যেকটি পুনরুজ্জীবিত দল ভিন্ন ভাবে গণতন্ত্র উদ্ধারের সংগ্রামে নেমে পড়ল। কে কার আগে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে, তার একটা প্রতিযোগিতাও চলল।

জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট প্রায় ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হল। যাদের নিয়ে ঐক্য গঠন করব তারা একে একে সব ভেগে পড়ল। আমরা কয়েকজন রইলাম এটা ধরে। একমাত্র আশা রইল, যদি প্রত্যেকটি দল ঘাত-প্রতিঘাতে চৈতন্যলাভ করে আবার ঐক্যের পথে ফিরে আসে। শুধু আশা!

পয়ত্রিশ

উনিশ শ' চৌষট্টি সাল ইলেকশনের প্রস্তুতির বছর। পয়ষট্টি সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হবে। নতুন পরিষদ গঠিত হবে। এপ্রিল মাসে ইলেকটোরাল কলেজ আইন পাশ হল। নির্বাচক-মণ্ডলীর নির্বাচন আইন। আগষ্ট মাসে পাশ হল জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচন আইন। তারপর প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচন আইন।

ইলেকটরাল কলেজ হবে নতুন ধরণের। একই বস্তু, অন্য ভিন্ন প্রক্রিয়ায়। আগের বার অর্থাৎ বাষট্টি সালে মৌলিক গণতন্ত্রীদের

নির্বাচন হয়েছিল—তারা পরবর্তী কালে ইলেকটোরাল কলেজে পরিণত হয়েছিল। এবার প্রথমেই তারা নির্বাচিত হবে ইলেক-টোরাল কলেজ অর্থাৎ নির্বাচকমণ্ডলী হিসাবে। তারপর বিভিন্ন পর্যায়ে ভোটদানের কার্য সমাপ্তির পর তারাই হবে মৌলিক গণতন্ত্রী, অর্থাৎ তারাই বিভিন্ন এলাকায় য়ুনিয়ন কাউন্সিল গঠন করে তার সদস্য হবে এবং পাঁচ বছর কাল বহাল থাকবে।

ইলেকটোরাল কলেজ নির্বাচন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের অগ্রদূত। এটা হাত করতে পারলে প্রেসিডেন্সিয়্যাল নির্বাচনের পথ সুগম হয়। বিরোধী দলগুলি তাই এই নির্বাচনের গুরুত্ব বুঝতে পেরে এদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

কিন্তু, এ ব্যাপারে ত একলা চলার নীতি চলেনা। বিরোধী দলগুলির পক্ষ থেকে একটি মাত্র প্রেসিডেন্সিয়াল প্রার্থী আয়ুব খাঁর বিপক্ষে মনোনীত করা দরকার। দলগুলি ঐক্যবদ্ধ না হলে সেটা সম্ভবপর হয় না।

খাজা নাজিমউদ্দিন একটা সাংবাদিক সম্মেলনে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের কথার উল্লেখ করলেন। আওয়ামী লীগও ওয়াকিং কমিটির সভায় অনুরূপ প্রস্তাব পাশ করে ঘোষণা করলেন ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের। অন্যান্য দলগুলির মনোভাবও তাই।

অর্থাৎ গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টের যে মূল নীতি তার তাৎপর্য এতদিন পর সকল দলই স্বীকার করতে বাধ্য।

প্রেসিডেণ্ট পদ প্রার্থী কাকে করা যায়? সব পার্টিরই একমত হতে হবে। মিস ফাতিমা জিন্নার নাম উঠল। তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী—কায়েদে আজমের বোন হিসাবে। তিনি কোন রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপে লিপ্ত হন নাই। প্রতি বছর দু'তিনটি বিবৃতি দিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য ও চিন্তাধারা জাতির নিকটে পেশ করেছেন। কারও ভালমন্দে কিংবা জনগণের সুখ দুঃখ আপদ-বিপদেও তিনি নির্বিকার রয়েছেন। দেশের উপর দিয়ে বারংবার

প্রাকৃতিক দুর্যোগ চলে গেছে, তিনি মামুলি সহানুভূতি প্রকাশ করেও কোন বিবৃতি দেন নাই।

এক কথায় তিনি নিঃসঙ্গ, নির্বিকার ও স্বাতন্ত্র বজায় রেখে দিন কাটাচ্ছেন। তবুও কায়েদে আজমের বোন। একটা আবেগপূর্ণ আকর্ষণ তাঁর প্রতি সবারই আছে। মোটামুটি ধরে নেওয়া হল, তাঁকেই মনোনীত করা হবে!

খাজা নাজিমউদ্দিনের সমর্থকরা খাজা সাহেবকে মনোনীত করার পক্ষপাতী। খাজা সাহেবও করাচী ভ্রমণ করে ফিরে এসে বললেন, মাদারে মিল্লাত রাজী নন। তাঁকে নাকি বলেছেন।

অনেকেই সন্দেহ করল। এই রিপোর্ট তারা বিশ্বাস করে নাই। খাজা সাহেব স্বয়ং প্রার্থী হবার আশা পোষণ করেন, এমতাবস্থায় মিস্ জিন্নাহ্ তাঁর নিকট অনিচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন, কথাটা অনেকেই গ্রহণ করতে চায় নাই।

ছাত্রদের এক প্রতিনিধি দলের সাথে তাদের অভাব অভিযোগ আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি প্রকারান্তরে আভাস দিয়ে ফেললেন। একটু সবুর কর, ইলেকশনের পর এসব ব্যাপার নিজেই দেখতে পারব। ইনশাল্লাহ্ সব হয়ে যাবে। ইত্যাদি।

মাহমুদ আলি কাসুরী ঢাকা এলেন। তাঁকে জিজ্ঞাস করলাম, মিস্ জিন্নাহ্ নাকি অস্বীকার করেছেন। তিনি বললেন, ঠিক তা নয়। তিনি দেশের নেতাদের কাছ থেকে অর্থাৎ আপনাদের সকলের কাছ থেকে সমর্থনের আশ্বাস চেয়েছেন। আপনারা যদি সবাই একযোগে তাঁকে আশ্বাস দেন তা হলে নিশ্চয়ই তিনি দাঁড়াবেন।

খাজা সাহেবের নেতৃত্বে বিভিন্ন দলেব মধ্যে আলাপ আলোচনা চলতে লাগল। আমাদেরও কয়েকজনকে আহ্বান করলেন। জমাতে ইসলামী ও নেজামে ইসলামের প্রতিনিধিও উপস্থিত। আলাপ আলোচনা হল। অন্যান্য সব পার্টি কাউন্সিল লীগের সাথে

কাজ করতে রাজী হয়েছে। আমরা অর্থাৎ এন-ডি-এফ যোগ দিলেই ছয় পার্টি মিলে সংগ্রাম শুরু করা যায়।

আমাদের ভেতর সব পার্টির লোকই আছে, সুতরাং আমরা পার্টি হিসাবে যোগদান করতে পারি না। আমরা থাকব যৌথ-সংগ্রামে, কিন্তু পার্টি হিসাবে নয়। খাজা সাহেব রাজী হলেন, কিন্তু অন্যান্য পার্টির মতামত ছাড়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না।

তিনি খুব জোরালো বক্তৃতা দিলেন ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে। বললাম, যাক, শেষ পর্যন্ত আমাদের নীতি স্বীকার করলেন।

বললেন, এ ছাড়া উপায় নাই।

নির্বাচক মণ্ডলীর নির্বাচনে বিরোধীদল থেকে প্রার্থী মনোনয়ন করা হবে কিনা এ প্রশ্নও আলোচিত হয়। নাজিমউদ্দিন বললেন, নমিনেশন দিতে পারলে খুব ভাল হত, কিন্তু সম্ভব হবে না। না দিলেও বিশেষ অসুবিধা হবে না। কারণ যে পার্টির মাধ্যমেই নির্বাচিত হয়ে আসুক না কেন, তারা আমাদের দলেই থাকবে। কনভেনশন লীগকে ত কেউ আর ভোট দিবে না। কাজেই ভয়ের কারণ নাই। বেচারা! এত সহজ বিশ্বাসের মানুষ!

খবর পাওয়া গেল কোন কোন দল এন-ডি-এফ কে গ্রহণ করতে রাজী হয় নাই। এন-ডি-এফ ভেঙ্গেই ত তারা পুনর্গঠিত হয়েছে! কাজেই তার সাথে কাজ করতে তারা বিব্রত বোধ করবেই।

ইতিমধ্যে একদিন নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগের জনসভা হয়। শেখ মুজিবর রহমান বক্তৃতায় ঘোষণা করলেন, চোগা চাপকান পরে যারা সংগ্রামে নামাতে ইতস্ততঃ করে, তাদের সঙ্গে লইতে রাজী নই। বিপদ-সংকুল সংগ্রামের সময় তারা বিশ্রাম গ্রহণ করুন। পরে হাসিমুখে তাঁদের বরণ করিব। ইত্যাদি।

কটাক্ষটা আমাদের দিকে। কেউ কেউ চোগা চাপকান পরে বই

কি ? খাজা নাজিমউদ্দিনও ত পরেন। তিনি ত দলেই আছেন। সেটা দোষের নয় কিন্তু আমাদের অপরাধ গুরুতর।

সোহরাওয়ার্দীর নীতি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি কাউকে বাদ দিতে চান নাই। খুনী ডাকাত দাগী পর্যন্ত। বলতেন, অবস্থা ভীষণ সঙ্কটময়। ঘরে আগুন। যে কেউ নিবাতে আসবে তাকেই গ্রহণ করব।

আর আজ তাঁরই অনুরক্ত ভক্তের দল তাঁর নীতির বিরুদ্ধে গ্রামশুদ্ধ লোককে একঘরে নিজেরাই একঘর ভদ্দর লোক সেজে বসতে চায়।

এই পরিবেশে একত্রে কাজ করা সম্ভব হলেও সমীচীন বোধ হয় না। তবুও আমরা হাল ছাড়ি নাই।

একবার 'গণতন্ত্র' দিবস উদযাপনের প্রস্তাব আমরা গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের তরফ থেকে গ্রহণ করি। প্রস্তাব হল পনরই তারিখে পল্টন ময়দানে জনসভা হবে। কিন্তু এটা করতে হবে সবাইকে নিয়ে। বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের সাথে বসে কর্মপন্থা প্রস্তুত করতে হবে। সকল দলকে খবর দেওয়া হল। কিন্তু কোথায় বসা হবে, এ নিয়ে বিস্তর বাক্‌বিতণ্ডা হল। কোথায় বসলে কার মর্যাদা হানি হয়। নিরপেক্ষ স্থান যোগাড় করতে হবে। ন্যাপ দলের একজন সদস্য জানাল, স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে—দল নিরপেক্ষ। কোথায় তা বলব না, সময় মত আমরা এসে নিয়ে যাব।

বেশ। এর মধ্যে দু'তিন জন ন্যাপ সদস্য, বোধ হয় ছাত্র বা প্রাক্তণ ছাত্র, এসে সরাসরি প্রস্তাব করল যে, দিবস পালন করার জন্য একটা সর্বদলীয় কমিটি গঠন করুন, আর মৌলানা ভাষানীকে তার কনভেনর নির্বাচন করুন।

বললাম, এ বিষয়ে এখনি কিছু বলা উচিৎ হবে না। সভায় গিয়ে বলব। আমারও ব্যক্তিগত মতামত আছে, সেটা তোমাদের প্রস্তাবের বিরোধী হতে পারে।

রাত্রের অন্ধকারে গাড়ী করে আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে গেল এক বাড়ীতে। গিয়েই জানতে পারলাম, সেটা একজন বিশিষ্ট ন্যাপ-নেতার সহোদর ভ্রাতার বাসভবন। নিরপেক্ষ বটেই! ভাই ত কোন পক্ষের নয়।

শুরুতেই আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হল, কাউকে জিজ্ঞাস না করেই দিন তারিখ ঠিক করে ফেলেছেন। করুন আপনারাই। আমরা কেমন করে যোগ দেই।

বললাম, এটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। সবাইকে নিয়ে করতে হবে—এটাই হচ্ছে আমাদের প্রস্তাবের সারমর্ম। কিন্তু সবাই করতে গেলেও একজনকে ত প্রস্তাব করতেই হয়। আমরা মাত্র প্রস্তাব উত্থাপন করেছি। তবুও ভবিষ্যতে আর এ-রকম করব না। এ কথার পর রাজী হল সবাই। কিন্তু জেদ করল, তারিখ বদলাতে হবে। পনরই হতে পারবে না। অন্য যে কোন তারিখ হোক। পনরই অস্পৃশ্য। কারণ, ওটা এন-ডি-এফ ঠিক করেছিল।

রাত বারটা পর্যন্ত তর্কবিতর্ক করেও নিষ্পত্তি হল না। সভা মুলতবী রইল। পরের দিন অন্যত্র বৈঠক হবে। স্থান গোপন রইল।

পরদিন আওয়ামী লীগের এক সদস্যের বাসভবনে সভার আয়োজন হল। সন্ধ্যাবেলা আমাকে নিতে এল। জিজ্ঞাসা করলাম তারিখ সম্বন্ধে তাদের মত পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা আছে কি না। ইঙ্গিতে বোঝা গেল তাদের মনোভাব অনমনীয়। বললাম, তা হলে ওখানে গিয়ে বৃথা সময় নষ্ট করে লাভ কি? গেলাম না।

প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে আমরা পনরই তারিখে জনসভা করে গণতন্ত্র দিবস উদযাপন করলাম। ন্যাপ আওয়ামী লীগ সভা-করল উনিশ তারিখে—উদ্দেশ্য ও বক্তব্য একই। কাউন্সিল মুসলিম লীগ দিবস পালন করল তেইশ তারিখে।

একই ব্যাপারে 'দিবস' পালন করা হল তিন দিনে, একদিনে করা সম্ভব হল না। দেশের কাছে প্রমাণ করে দিলাম যে, মত এক হলেও পথ বিভিন্ন। যে কোন অবস্থায়ই রাজনৈতিক দল একযোগে কাজ করতে পারে না।

ব্যাপারটা খুব গুরুতর না হলেও এটা একটা দৃষ্টান্ত—দলীয় মনোভাব কতদূর গড়াতে পারে তারই একটা নমুনা।

জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সকলের চক্ষুশূল। সবার সাথে কাজ করা চলে, ওদের সাথে নয়। ওটা নেতার দল—কর্মীর নয়। অন্যান্য দলে নেতা না থাকলেও কি আসে যায়। শেখ মুজিব ঘোষণাই করলেন এক জনসভায়, কে বলে আওয়ামী লীগে নেতা নাই? অন্য কোন নেতার প্রয়োজনীয়তাই বা কি? শহীদ সোহরাওয়ার্দী কবর থেকেই নেতৃত্ব দেবেন। এ কে ব্রোহী এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, সোহরাওয়ার্দী গোর থেকেই পথ নির্দেশ করবেন। শেখ মুজিব সেই বচনই উদ্ধৃত করলেন।

অন্যান্য দলের মনোভাবও দিন দিন এন-ডি-এফ এর প্রতিকূলে গড়ে উঠতে লাগল। ইলেকশনে জয়লাভ করে ফেললে এরা সিংহভাগ দাবী করতে পারে। তাই, পূর্বাহ্ণেই তাদের থেকে স্বতন্ত্র থাকাই নিরাপদ।

চৌধুরী মহম্মদ আলী, মাহমুদ আলী কাসুরী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন গণতান্ত্রিক ফ্রন্টকেও যুক্তসংস্থার শামিল করার। কিন্তু সফল হন নাই। চৌধুরী মহম্মদ আমি দুঃখ করে বলেছিলেন, কেউ কেউ ভয়ানক আপত্তি তুলল। কিছুতেই রাজী হল না।

তা' জানতাম। এ যেন মহাচীনকে জাতীপুঞ্জে গ্রহণ করতে ফরমোজার আপত্তি। একের স্বীকৃতি অপরের অস্তিত্ব বিলুপ্তির ইঙ্গিত।

ছত্রিশ

চৌষট্টি সালের জুলাই মাসের একুশ বাইশ তারিখে খাজা নাজিম উদ্দিনের বাড়ীতে বিরোধী দলের সম্মিলিত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এন-ডি-এফ কে ডাকা হয় নাই। আর পাঁচটি দল এতে যোগদান করে। কয়দিন পর আর এক বৈঠকে সম্মিলিত বিরোধী দল— কম্বাইণ্ড অপজিশন পার্টির পক্ষ থেকে 'নয় দফা' কর্মসূচীর ভিত্তিতে সকল স্তরের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত করা হয়। পার্টির পক্ষ থেকে একটি মাত্র প্রার্থী প্রেসিডেন্সিয়াল ক্যাণ্ডিডেট হিসাবে মনোনীত করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়।

'নয় দফা' কর্মসূচীকে জাতীর মুক্তিসনদ বলে অভিহিত করা হয় এবং কোন কোন সংবাদপত্র অভিনন্দন জানায়। 'ইত্তেফাক' বিরোধীদলের মুখপাত্র। সমস্ত ব্যাপারে অগ্রগামী। নয় দফার দফাওয়ারী তফসির মায় টীকা ইত্তেফাকে 'মুক্তি সনদ' শিরোনামায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হল বেশ কয়েকদিন ধরে।

শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে, মৌলিক অধিকারসহ নাগরিকদের মানবিক অধিকারের পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান, বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদকেপূর্ণ ক্ষমতাদান, ফেডারেল ও পার্লামেণ্টারী পদ্ধতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও সরকার গঠনের প্রতিশ্রুতি থাকলেও পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের উল্লেখ করা হয়েছে। তার উপর অর্থহীন ও অনাবশ্যক শর্ত যোগ করা হয়েছে। পাকিস্তানের অখণ্ডত্ব ও সংহতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যতটুকু প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের বিধান সন্নিবেশিত করা যায়।

এই বাক্যগুলি হুবহু আয়ুব শাসনতন্ত্রের মুখবন্ধ থেকে তুলে আনা হয়েছে। এটা পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী প্রতিরোধ করার কৌশল হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে।

পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কোনদিন চায় নাই। আওয়ামী লীগ ত নয়ই। আওয়ামী লীগ ঘোড়া থেকেই দাবী করেছে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন। পূর্ব পাকিস্তানকে প্রদেশ বলতে আমাদের ঘোর আপত্তি। পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকটি প্রদেশকে জবরদস্তি টেনে এনে একটি প্রদেশ গঠন করা হয়েছে, আমরা তাও মানি নাই। পূর্ব পাকিস্তানের সাথে মোকাবিলা করাব জন্যই যেন এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

উনিশ শ' পয়ত্রিশ সালেব গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্টেও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের উল্লেখ আছে। তার বাস্তবরূপ এই অঞ্চলেব মানুষ দেখেছে।

'ইত্তেফাকে' মুসাফির লিখলেন, এই দুইয়ের মধ্যে কি যে প্রভেদ তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। 'বুঝিতে' নিশ্চয়ই পারেন, এখন বুঝতে চান না, এই প্রভেদ। এ বিষয় কত প্রবন্ধ, বক্তৃতা, প্রস্তাব হয়েছে। তিনি নিজেও কত লিখেছেন।

শাসনতান্ত্রিক দফায় প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা খর্ব করার উল্লেখ আছে। তার মানে কি? প্রেসিডেন্সিয়াল প্রথা মেনে নেওয়া হবে নাকি? পার্লামেণ্টারী প্রথায় প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা খর্ব করার প্রশ্নই উঠে না। বাস্তবিক কোন ক্ষমতা তাঁর থাকে না।

দ্বিতীয় দফা: রাজবন্দী, বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ, জরিমানা মউকুফ, রাজনৈতিক কর্মীদের উপর আরোপিত বিধি নিষেধ প্রত্যাহার, গ্রেফতারী পরওয়ানা বাতিল ইত্যাদি।

তৃতীয় দফা: কালাকানুন উচ্ছেদ। নিরাপত্তা আইন, প্রেস পাবলিকেসন আইন, ফৌজদারী আইন সংশোধন, ফ্রণ্টিয়ার ক্রাইম্‌স রেগুলেশন ইত্যাদি বাতিল।

চতুর্থ: অর্থনীতির কাঠামোর রদবদল। জনগণের জীবনের মান উন্নয়ন। বৈষম্য দূরীকরণ। দশ বছরের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য সামরিক ও বেসামরিক চাকুরীর সংখ্যা-তারতম্য দূরীকরণ।

মাথাপিছু আয়ের সমতা স্থির করা। পাট, ইক্ষু, তুলার ন্যায্যমূল্য প্রধান। পূর্ব-পাকিস্তানে পঁচিশ বিঘার কম জমির কর মৌকুফ। দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ। ট্যাক্সভার হ্রাস করা। বণ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা চালু করা। ইত্যাদি।

আয়ুব শাসনতন্ত্রে ও বিভিন্ন সরকারী বক্তৃতা বিবৃতিতে কুড়ি বছরের মধ্যে সর্ব স্তরের বৈষম্য দূরীকরণের উল্লেখ আছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। 'নয় দফা' বলে দশ বছরের কথা। এই সময়ের মধ্যে বৈষম্য দূরীভূত না হলে কি ব্যবস্থা করা হবে, তার উল্লেখ কেউ করে নাই। কি পন্থা অবলম্বন করলে এই বৈষম্য দূর করা যাবে তার কোন ইঙ্গিত আয়ুব খাঁও করেন নাই, এরাও না। কবে থেকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে, তার উল্লেখ সরকারী ব্যবস্থায়ও নাই, নয় দফায়ও নাই।

পাট জাতীয়করণের দাবী পূর্ব-পাকিস্তানবাসীর বহু কালের দাবী। নয় দফায় এর উল্লেখ নাই। পাটকে ইক্ষু ও তুলার পর্যায়ে এনে ন্যায্যমূল্য প্রদানের উল্লেখ মাত্র আছে।

জমির খাজনা সম্পূর্ণ মৌকুফ করার দাবী ছিল আমাদের। চাষীর জীবন বিপর্যয়গ্রস্ত। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ও প্লাবনে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। খাজনার বোঝা টানা তার সাধ্যের বাইরে। খাজনা থেকে যে রাজস্ব আদায় হয়, চাষীর দুর্দশার তুলনায় তা খুব বেশী নয়। এই টাকা মৌকুফ করে অন্যান্য বিভাগের আয়বৃদ্ধি করে রাজস্বের ক্ষতিপূরণ করা চলে। বন-বিভাগ ও জলকর থেকে প্রচুর অর্থ সমাগম সম্ভব। কেন্দ্রের শোষণ বন্ধ করে দিলেও বহু টাকা এই প্রদেশের আমদানী খাতে জমা হতে পারে।

পাঁচ নম্বরে, সংখ্যালঘুদের অবস্থার উন্নয়ন। ষষ্ঠদফায় কাশ্মীর।

সপ্তম দফা: পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক। ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যের ও বিশ্বপরিস্থিতির আলোকে পররাষ্ট্রনীতির পূর্ণ বিবেচনা।

সকল দেশের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন ও মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি'র অভিমত, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সিটো, সেণ্টো প্রভৃতি সামরিক চুক্তি বাতিল পররাষ্ট্র-নীতির মূল ভিত্তি। এই সংগ্রাম গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামেরই অংশ বিশেষ। সাম্রাজ্যবাদ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিরোধী। চুয়ান্ন সালে সামরিক চুক্তিসমূহ স্বাক্ষরের পর পরই বহু বামপন্থীকে গ্রেফতার করে বিনাবিচারে জেলে আবদ্ধ করা হয়েছিল। তারা মনে করে, দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম ছাড়া অন্য কোন উপায়ে হতে পারে না।

অন্যান্য দল মনে করে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগে অন্য কোন সমস্যাসমাধান করা সম্ভব নয়। পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরই সুষ্ঠু পরারাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করা সম্ভব।

অষ্টম দফা : ইসলামিক মূলনীতি। কোরাণ ও সুন্নার নির্দেশ অনুযায়ী সত্যিকার ইসলামী সমাজব্যবস্থা ও শরিয়তের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান। এই পরিপ্রেক্ষিতে পারিবারিক আইন সংশোধন।

জামাতে ইসলামীর সাথে অন্যান্য দলের এ বিষয়ে মতানৈক্য। জামাতে ইসলামের চোখে ন্যাপ কম্যুনিষ্ট, আর ন্যাপ জামাতে ইসলামীকে ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতি বিরোধী মনে করে। একদল ইসলামিক রাষ্ট্রে বিশ্বাসী, আরেকদল ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র কায়েম করতে চায়। মৌলিক বিরোধ। কিন্তু ঐক্যের খাতিরে এই দফা স্বীকার করে নিয়েছে।

আয়ুব খাঁ পারিবারিক আইন প্রণয়ন করেছেন। বহুবিবাহ, তালাক ও উত্তরাধিকার ব্যাপারে মৌলিক পরিবর্তনের বিধান করা হয়েছে।

জামাতে ইসলামী এই আইনের বিরুদ্ধে। কারণ, এই পরিবর্তন ইসলাম-বিরোধী। এ আমলের নেতারা পাশ্চাত্যজগতের আধুনিক

সভ্যতার নির্দেশে এই সব সনাতন ও কোরাণে উল্লিখিত আইনের সংশোধন করতে লেগে গেছেন। চৌদ্দ শ' বছরে যে আইন বা অনুশাসন পরিবর্তনের কোন প্রয়োজনীয়তা কেউ উপলব্ধি করে নাই, হাল জামানার শাসকরা হঠাৎ যেন প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হয়ে এই সব বিষয়ে নূতন জ্ঞান লাভ করে সব পাল্টায়ে নিচ্ছেন। যারা বহু বিবাহের প্রতি কটাক্ষ করে তাদের মধ্যে বীভৎস ব্যাভিচারের ব্যাপকতা ও প্রসার আমাদের নেতারা কি চোখে দেখেন নাই? একাধিক স্ত্রী গ্রহণেব ব্যাপারে কোরাণে কঠিন শর্ত-সম্বলিতনির্দেশ আছে। সে শর্ত লঙ্ঘন করলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা চলে। কিন্তু সে নির্দেশ বাতিল করার অধিকাব কারও নাই।

তালাক সম্বন্ধেও কোবাণে বিস্তারিত বিধি-নিষেধের উল্লেখ আছে। আয়ুব খাঁ সে ব্যবস্থা বাতিল করেছেন। এটাও ইসলাম-বিরোধী।

নাতির ওয়ারিশ লাভ আইনের প্রশ্ন। মালিকের মৃত্যুর পরই উত্তরাধিকার বণ্টনযোগ্য হয়। তখন যারা জীবিত থাকে তারাই উত্তরাধিকার দাবী করতে পারে। এবং জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যেও সম-পর্যায়ভুক্ত ওয়ারিশ হতে হবে। উচ্চ ও নীচ পর্যায়ের ব্যক্তিরা এক সাথে ওয়ারিস দাবী করতে পাবে না। যেমন সন্তানহীন ভ্রাতার মৃত্যুর পর তার অন্য ভ্রাতা ওয়ারিশ হয় কিন্তু সে ভাই-এর সাথে অন্য ভ্রাতুষ্পুত্র ওয়ারিশ হতে পারে না। কারণ তার পিতাও জীবিত কালে ওয়ারিশ হয় নাই। ইত্যাদি।

অন্য দলের সদস্যরা, বিশেষ করে ন্যাপ ও আওয়ামী লীগ এই আইনের সমর্থক। তারা ইসলামিক ভাবধারায় প্রচুর পরিমাণে উদ্বুদ্ধ নয় এবং ইতিহাসের সাথেও তাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই। যা আপাত দৃষ্টিতে আধুনিক রুচিসম্মত বোধ হয় তাই তারা সমর্থন করে। এই পরিবর্তনকে তারা অতি আধুনিক প্রগতিশীল ও মানবিক বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।

তবুও এই প্রগতিপন্থী দলগুলি জামাতে ইসলামীর দাবী স্বীকার করে নিয়েছে। বিষ গেলার মত।

নবম ও শেষ দফা: পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের মধ্যে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বোধের উৎকর্ষ সাধন। ইসলামী ভ্রাতৃত্ব। দুই অঞ্চলের দুই ভাই সমান না হলেও ক্ষতি নাই। ছোট বড় ত প্রাকৃতিক নিয়ম! আর কুল্লু মুসলেমীনা ইখওয়াতুন। সব মুসলিম ত ভাই ভাই। এক ভাইর হক আর এক ভাই যদি সবটাও নিয়ে নেয়, তবুও সেটা ভ্রাতৃত্বের ন্যায্যদাবী। দাবী আদায় হোক না হোক ভ্রাতৃত্ব-বোধ ত হ্রাস করা চলে না।

দফাগুলি রচনা করেছেন চৌধুরী মহম্মদ আলী। ঐক্য স্থাপনের আগ্রহেই পূর্ব-পাকিস্তানেব নেতারা এসব কথা মেনে নিয়েছেন। কিন্তু কতগুলি বিশেষ গুরুতর বিষয় এই দফায় বাদ পড়ে গেছে। পূর্ব-পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী অতি পুরাতন। তিনটি বিষয় কেন্দ্রের ক্ষমতাভুক্ত আর বাকী সব আঞ্চলিক সরকারের ক্ষমতাধীন। আওয়ামী লীগের জন্ম ও জীবন নির্ভর করে এরই উপর। যুক্ত ফ্রন্টের ঐতিহাসিক একুশ দফার অন্যতম। নয়-দফায় এটার উল্লেখ নাই।

পশ্চিম পাকিস্তানের এক য়ুনিট পাঞ্জাব ছাড়া কোন প্রদেশ মেনে নেয় নাই। তারা বলে এটা মহাপাঞ্জাব—বৃহত্তর পাঞ্জাব হয়েছে। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির অন্যতম মূলদাবী ছিল এই ব্যবস্থা বাতিল করা। নয় দফা এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব।

পাকিস্তান সৃষ্টির সময় রাজধানী হল করাচী। বার চৌদ্দ বছরে গড়ে উঠেছে শহর। প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছে। তার মোটা অংশ পূর্ব-পাকিস্তান বহন করেছে। কয়েক শ' কোটি।

গোড়াতে আমাদের দাবী ছিল হয় ঢাকা নয় চাটগাঁ। কায়েদে আজমের মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধা করেই আমরা দাবী প্রত্যাহার করেছিলাম।

হঠাৎ এই রাজধানী পরিত্যাগ করে আয়ুব খাঁ নিয়ে গেলেন দেশের অন্য এক প্রান্তে। পিণ্ডি ছাড়ায়ে—পাটওয়ার নামক জংগলাকীর্ণ পাহাড়ী অঞ্চলে। কয়েক শ' কোটি টাকা সেখানে ব্যয় করে গড়ে উঠবে অতি আধুনিক শহর।

রাজধানী স্থানান্তরের ব্যাপারে কাউকে জিজ্ঞাস করা হয় নাই। পূর্ব পাকিস্তানের একটি প্রাণীরও মতামত নেওয়া হয় নাই! পশ্চিম পাকিস্তানের বিশেষ আপত্তি না-ও থাকতে পারে। একটার পর একটা শহর গড়ে উঠেছে—ঐ এলাকায়। করাচী ত রয়েই গেল। আর একটা বাড়ল। ক্ষতি কি?

স্থানান্তরের কারণ বলা হয়েছে, করাচীর আবহাওয়া অস্বাস্থ্য-কর—গরম। দুই নম্বর, ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রের বিপজ্জনক নৈকট্যে রাখা নিরাপদ নয়। কারণ ব্যবসায়ীরা অবৈধ উপায়ে সরকারী সিদ্ধান্ত প্রভাবান্বিত করতে পারে। এটা কোণ যুক্তিসঙ্গত কারণই নয়। এক নায়কত্বের আমলে এক ব্যক্তি ছাড়া সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিবর্তন ও সংশোধন করার অধিকার ত আর কারোরই নাই। তবে কেন ভয়!

করাচী পাকিস্তানের জন্মদাতার জন্মস্থান। তাই রাজধানী হয়েছিল। এখন ত্রাণকর্তার জন্মস্থানের কাছাকাছি একটা রাজধানী করতে হয়। তাই এই স্থানান্তর। তা' ছাড়া সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করে এই শাসন ব্যবস্থা চলছে। ঘাঁটি রাউলপিণ্ডি। এ দিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয়। নিকটবর্তী স্থান সেই জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

নাম রাখা হযেছে 'ইসলামাবাদ'। রাষ্ট্রের নাম তিনবার বদল হয়েছে। প্রথমে ইসলামিক রিপাবলিক। সামরিক শাসন শুরু করেই 'ইসলামিক' কথাটা উঠায়ে দেওয়া হল। আবার কয় বছর পর কি ভেবে শব্দটা যোগ করে দেওয়া হয়েছে।

উনিশ শ' ছাপান্ন সালে এই করাচী থেকে রাজধানী নিকটবর্তী

উন্মুক্ত প্রান্তরে স্থানান্তর করার প্রস্তাব এসেছিল জাতীয় পরিষদে। আমাদের তরফ থেকে ঘোর আপত্তি করা হয়েছিল। এক বক্তৃতায় বলেছিলাম, বেশ আছি—নাড়াচাড়া করে কোন লাভ নাই। তবে যদি নোঙ্গর তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়াই হয়, তা হলে আর এদিকে নয়, সটান চলে যাও পূর্ব দিকে আর নোঙ্গর ফেল গিয়ে চাটগাঁর কাছে। গড়ে উঠুক রাজধানী সেখানেই।

কিন্তু নোঙ্গার তোলা হয় নাই।

'নয়-দফা' রচনার সময় রাজধানী সম্বন্ধে কথা উঠেছিল। আবদুস সালাম খাঁ উত্থাপন করেছিলেন। চৌধুরী মহম্মদ আলি বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, কয়েক শ' কোটি খরচ করে শহর পত্তন দেওয়া হয়েছে। আবার সেটা ছেড়ে দিয়ে করাচী ফিরে আসা অন্যায় হবে।

অর্থনীতিক ব্যাপারে দুই অর্থনীতির কথা পূর্ব পাকিস্তান দাবী করে আসছে। আসলে দেশে দুইটি আলাদা অর্থনীতিক ব্যবস্থাই বিরাজ করেছে। একীভূত অর্থনীতির উপর পাকিস্তানের অর্থনীতিক কাঠামো নির্মাণ করা চলে না। দুই অংশে বিভিন্ন ধরণের অর্থনীতিক উপকরণ বিদ্যমান। সমাজব্যবস্থা, ভূমিব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। তা ছাড়া পুঁজি ও শ্রমের অচলাবস্থা একক অর্থনীতিক ভিত্তির অন্তরায়। এক অংশের সরকারী অর্থব্যয় অন্য অংশে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এমতাবস্থায় এক অর্থনীতি স্থাপন করার অর্থ পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনীতিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা।

এই সব গুরুতর প্রশ্ন সম্বন্ধে 'নয় দফা' নীরব। অথচ বলা হয়েছে জাতির 'মুক্তি সনদ'। লক্ষ্য ও আদর্শ ত্যাগ করে শুধু একটি মাত্র উদ্দেশ্য হাসেলের জন্য একটা গোঁজামিল জোট গঠন করাই ছিল এই ঐক্যের উদ্দেশ্য। তবুও ঐক্য। যদি উদ্দেশ্য সফল হয়।

দেশের মানুষ তবুও উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। জগদ্দল পাথর বুকের উপর থেকে সরাতে হবে। দফার দিকে দৃষ্টি দেবার কথা মনে হয় নাই। যে অশুভ শক্তি পাকিস্তানের সমস্ত নেতা কর্মী দেশবাসী সবাইকে দানবীয় শক্তি প্রয়োগে অপমান নির্যাতন লাঞ্ছনার একশেষ করেছে, সে শক্তির বিরুদ্ধে দুর্বার আঘাত হানার জন্য প্রত্যেকটি নর-নারী কোমর বেঁধে দাঁড়ায়ে পড়ল।

সেপ্টেম্বর মাসের মাঝখানে করাচীতে সম্মিলিত বিরোধীদলের বৈঠক হয় প্রেসিডেন্ট প্রার্থী মনোনয়নের জন্য। পাঁচ দলের নেতারাই করাচী পেঁছিলেন। বৈঠক বসার পূর্বেই ন্যাপের তরফ থেকে ঘোষণা করা হল যে, মার্শাল ল'র সাথে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তিকে প্রার্থী মনোনীত করা চলবে না।

ইঙ্গিত স্পষ্ট। আজম খাঁ। আওয়ামী লীগ আজম খাঁকে মনোনয়ন দানের পক্ষপাতী। এখানকার জনসাধারণ তাঁকে চায়। ছাত্রসমাজও তাঁর ভক্ত। আওয়ামী লীগ এই সুযোগ গ্রহণ করতে চায়।

পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর জনপ্রিয়তার মান অনেক নীচু। কাদিয়ানী হাঙ্গামার সময় আজম খাঁ মার্শাল ল'র কর্মকর্তা হিসাবে যে শৌর্যবীর্য প্রদর্শন করেছিলেন, পশ্চিম পাকিস্তানীরা এত শীঘ্র তা' ভুলে যায় নাই।

আটান্ন সালের মার্শাল ল' ও বিপ্লবের তিনি ছিলেন অন্যতম নায়ক। গণতন্ত্র হত্যার ব্যাপারে তাঁর অবদানও কম ছিল না; এখন জনদরদী সাজলে কি হবে। এই সব ভেবে ন্যাপ পূর্বাহ্নেই আলটিমেটাম দিয়ে বসল।

মৌলানা ভাসানী প্রমুখ ফাতেমা জিন্নাহর নাম প্রস্তাব করলেন। যৎকিঞ্চিৎ বাদানুবাদের পর সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকেই মনোনয়ন প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মিস্ জিন্নাহর মনোনয়নের সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে

জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টের তরফ থেকে তাঁকে অভিনন্দন জ্ঞাপন ও প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করা হয়। সম্মিলিত বিরোধী দল গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টকে তাদের সঙ্গে নিতে অস্বীকার করেছে, কিন্তু জাতির বৃহত্তর স্বার্থের দিক দৃষ্টি রেখে এই সংকীর্ণতার কথা আমরা সম্পুর্ণ ভুলে গেলাম।

ক্ষমতাসীনরা এতদিন অনেক বোলচাল ছেড়েছে। বিরোধী দল কিছুতেই একমত হতে পারে না। এইখানেই ঐক্য ভেঙ্গে যাবে। কাউকে তারা রাজী করাতে পারবে না, ইত্যাদি।

মনোনয়নের পর আর এক সুর। মিস্ জিন্নাহর মত ব্যক্তি এই সব ধিকৃত রাজনীতিকদের খপ্পরে কেন পা' দিলেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত পরিতাপজনক। তিনি এত উর্ধ্বে ছিলেন, হঠাৎ কেন নীচে নেমে এলেন।

অর্থাৎ এরা বেসামাল হয়ে পড়ল।

সাইত্রিশ

সেপ্টেম্বর মাসে ঘোষণা করা হল, নভেম্বর মাসে নির্বাচকমণ্ডলী অর্থাৎ ইলেকটোরাল কলেজের নির্বাচন সমাপ্ত করা হবে। এর আগে ঘোষণা করা হয়েছিল, পয়ষট্টি সালের মার্চ মাসের পনরই তারিখে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন করা হবে।

সরকারী লীগ সিদ্ধান্ত করল, তারা নির্বাচকমণ্ডলীর নির্বাচনে নমিনেশন দেবেনা। বিরোধী দলও ঐরূপ সিদ্ধান্ত করে। কিন্তু তলে তলে সব দলই নিজস্ব প্রার্থী দাঁড় করায় ও সমর্থন দেয়।

অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি মিস্ জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তান সফরে এলেন। চাটগাঁ, খুলনা, সিলেট, ময়মনসিংহ, রাজশাহী ও বরিশালে জনসভায় বক্তৃতা দিলেন। ঢাকা থেকে ট্রেনে চাটগাঁ যেতে সাত

ঘণ্টার জায়গায় তিরিশ ঘণ্টা লাগল পৌঁছতে। সারা রাস্তা লোকে লোকারণ্য। অভূতপূর্ব উন্মাদনায় সারা দেশ উন্মত্ত হয়ে উঠল।

পশ্চিম পাকিস্তানেও একই অবস্থা। চাটগাঁ থেকে চিত্রল পর্যন্ত মানুষ এক বাক্যে সমর্থন করল মিস্‌ জিন্নাহকে। কিন্তু মানুষ ত ভোটের মালিক নয়। যারা ভোটের মালিক তারা হচ্ছে ইলেকটোরাল কলেজের মেম্বর ও গণতন্ত্রী। এইখানেই ত হারজিত। রহস্যের গোড়া। জনমতের প্রতিফলন ত এই নির্বাচনে হতে পারে না।

আয়ুব খাঁও এলেন সফরে। জনসভা করলেন বিভিন্ন জায়গায়। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, মহকুমা হাকিম, সার্কেল অফিসার, মায় পুলিশ বাহিনী জানমাল কোরবান করে জনসভার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বিভিন্ন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও এস·ডি-ও রীতিমত ফরমান জারী করলেন সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের প্রতি, য়ুনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানদের প্রতি। তারা যেন যথেষ্ট পরিমাণে লোক সংগ্রহ করে সভায় উপস্থিত করেন। কড়া তাগিদ। কোন কোন জায়গায় রেলওয়ে কর্মচারী তার অফিসের লোকজনদের পুরা বেতনে একদিনের ছুটি দিয়ে পাঠালেন প্রেসিডেণ্ট দর্শনে। এ ছাড়া সরকারী লীগের পাণ্ডারা ত আছেই। বড় বড় কারখানাব শ্রমিকদের মাথাপিছু মজুরী ওয়াদা করে বাস বোঝাই করে সভায় টেনে এনেছে।

সফর শেষ করে খাঁ সাহেব সদর্পে ঘোষণা করলেন, তাঁর কয়েকটি জনসভায় তিরিশ লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়েছিল। তিনি হয়তো জানতেন না কি কৌশলে এই জনসংখ্যা উপস্থিত হয়েছিল।

আর মিস্‌ জিন্নাহর জনসভার স্বতঃস্ফূর্ত উত্তেজনা ও সমাবেশ দেখলে তাঁর মাথা ঘুরে যেত!

একটু বেসামাল যে হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নাই। এক জনসভায় বললেন, মিস্‌ জিন্নাহর নারীসুলভ কোন গুণই নাই।

আছে শুধু পুরুষের অসৎ দোষগুলি। আর এক সভায় বললেন, মিস্ জিন্নাহর রাষ্ট্র পরিচালনার কোন অভিজ্ঞতা নাই। বলি, আপনারও ত ছিল না। এক সভায় বললেন, কায়েদে আজমও প্রত্যক্ষ ভোটে রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচিত হন নাই। সুতরাং তিনি গণপ্রতিনিধি ছিলেন না। একমাত্র আমিই এক ব্যক্তি যে সাহস করে এই পথে নেমেছি। তবুও যদি একজন যোগ্য ব্যক্তি প্রেসিডেণ্টের পদ প্রার্থী পাই তা হলে আমি সবে দাঁড়াতে রাজী আছি।

মিস্ জিন্নাহ এক বক্তৃতায় বললেন, রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে জনমত—সমর কৌশল নয়!

বিভিন্ন বক্তৃতায় তিনি সামরিক শাসন ও আয়ুব শাহীর কুকীর্তির বিবরণ দিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, পদমর্যাদা ও সম্মানের লোভে পদপ্রার্থী হন নাই। জনগণের অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্যই তিনি রাজী হয়েছেন এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। কায়েদে আজমের স্বপ্ন, দেশের দশ কোটি নাগরিকের আশা-আকাঙ্খা রূপায়িত করার জন্যই তিনি এই সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন।

সফর শেষে যে দিন তিনি করাচী ফিরে যাচ্ছেন সেই দিন হঠাৎ সন্ধ্যার পূর্বে খাজা নাজিমউদ্দিন হার্টফেল করে ইন্তেকাল করলেন। কেউ কেউ বলল, তিনি প্রার্থী হতে না পেরে যে শোক পেয়েছিলেন সেটা সামলায়ে উঠতে পারেন নাই।

খাজা নাজিমউদ্দিনের মৃত্যুর সাথে সাথে প্রাচীন নেতৃত্বের অবসান ঘটল। গণতন্ত্রের মাধ্যমে তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন নাই। সামন্তবাদ পরিবেশে তিনি শিক্ষা দীক্ষা লাভ করে তৎকালীন রাজনৈতিক ধারার অনেক উর্ধ্বে উঠেছিলেন। কিন্তু শেষ জীবনে তিনি জনগণের পাশে এসে দাঁড়ায়েছিলেন। তাঁদের দুঃখ অভাব অভিযোগ তিনি অনুভব করেছেন অন্তর দিয়ে। তাদের দাবী দাওয়া অধিকার আদায়ের জন্য একান্ত চিত্তে

নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। ভদ্র, বিনয়ী, ন্যায়পরায়ণ ও ধর্মভীরু বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। অন্যায় ও মিথ্যাকে তিনি ঘৃণা করেছেন।

তাঁর দুইজন মহান সহকর্মীর মাঝে তাঁর শেষ শয্যা রচনা করা হল।

আটত্রিশ

আয়ুব খাঁ কনভেনশন বা সরকারী লীগেরও প্রেসিডেন্ট। তাঁর দল তাঁকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মনোনয়ন দান করল।

মনোনীত হওয়ার সাথে সাথে তিনি ইলেকশন মেনিফেষ্টো প্রচার করলেন। তাঁর নিজস্ব কর্মসূচী—দলীয় নয়। এটাও অভিনব। নির্বাচনে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা দলই নির্বাচন প্রার্থীর জন্য মেনিফেষ্টো রচনা করে। তাঁর দল রাজনৈতিক দল নয় বলেই তিনি দলীয় মেনিফেষ্টোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই। নিজস্ব মেনিফেষ্টোই যথেষ্ট। দল পরে এটা গ্রহণ করে নেবে।

আয়ুব খাঁর নির্বাচনের ব্যাপারে একটা প্রাথমিক আইনগত প্রশ্ন বা আপত্তি উঠেছিল। তিনি সামরিক নেতা। সামরিক বিভাগে চাকুরী শুরু করে ধীরে ধীরে উর্ধ্ব গতি লাভ করে ফিল্ড মার্শাল পর্যন্ত হয়েছেন। তাঁরই স্ব-রচিত শাসনতন্ত্রে বিধান আছে, সরকারী বেতনভোগী কর্মচারী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না। তিনি ফিল্ড মার্শাল—বেতনভোগী। তিনিও নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারেন না।

কিন্তু তিনি এর প্রতিকার পূর্বাহ্নেই করে রেখেছেন। আট-ঘাট বাঁধা। অক্টোবর মাসে এক গেজেটে ঘোষণা করা হল, তিনি বহুকাল আগে, সেই উনিশ শ' ষাট সালে, সরকারী চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে বসে আছেন। এখন যে স্রেফ দু' হাজার টাকা নিচ্ছেন, ওটা পেনশন।

চার বছর আগের কথা। কিন্তু কেউ জানত না। কোন গেজেটেও বোধ হয় প্রকাশিত হয় নাই। তাই চার বছর পরে অজ্ঞানকে জ্ঞানদান করা হল।

মানুষ জানত তিনি অধিক বেতন নিয়ে এই কয় বছর জীবন ধারণ করেছেন। বেতন যদি নিয়ে থাকেন তা হলে তাঁর প্রেসিডেন্ট-গিরি অবৈধ হয়েছে। অর্থাৎ এতদিন যা' কিছু করেছেন সবই অবৈধ। সরকারী ইস্তেহারে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হল। বলা হল, না, তিনি পেনশনই নিয়েছেন এবং নিচ্ছেন। ষাট সাল থেকে। বিশ্বাস না কর, চৌষট্টি সালের অক্টোবর মাসের অমুক তারিখের গেজেটে দৃষ্টিপাত করে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন কর।

বিরোধী দল এই বিতর্ক সুপ্রীম কোর্টের নিকট পেশ করার জন্য অনুরোধ জানাল। আয়ুব খাঁ অগ্রাহ্য করলেন। একটা শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট তিনি নিজ ক্ষমতা বলে মোচন করলেন। তাঁর নিজের শাসনতন্ত্রের বিধান তিনিই লঙ্ঘন করলেন। মানুষের কিছু করার ছিল না।

মিস জিন্নাহর নাম সারা দেশময়। আকাশে বাতাসে মাঠে ময়দানে সর্বত্রই তাঁর নাম। হাটে মাঠে তাঁরই জয়গান। আর কারুরও নাম উচ্চারণ করতেও কেউ সাহস পায় না।

নভেম্বর মাসে ইলেকটোরাল কলেজ নির্বাচন শুরু হল। পূর্ব-পাকিস্তানে শুরু হল দশ তারিখ থেকে। প্রথম থেকেই সরকারী মহল ও বিরোধী দলের দাবী আর পাল্টা দাবীর পাল্লা চলল। খবরের কাগজ ভোটরঙ্গে পরিণত হল। কারোর দাবী আশি পচাশি নব্বইর কম নয়—অর্থাৎ তারা শতকরা ঐ হারে ভোটার পাচ্ছে। পচানব্বই থেকে সাতানব্বই শতকরা অবধি এক

পর্যায়ে উঠে গেল। শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষ বুঝতে পারল বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে, দুই পক্ষই আশিতে নেমে রইল।

'ইত্তেফাক' এক পর্যায়ে দাবী করল, একুনে পচিশ হাজার আট শ' পচিশের মধ্যে 'কপের' তেইশ হাজার ন'শ বাইশ আর সরকারী লীগ এক হাজার ন'শ তিন।

ন্যাপের সেক্রেটারী মাহমুদুল হক ওসমানী দাবী করলেন, আশি হাজারের মধ্যে তেষট্টি হাজার ভোট মাদারে মিল্লাতের! সুতরাং জয় অবশ্যম্ভাবী।

সরকারী পক্ষ যতই চালবাজি করুক না কেন, এ কথা অনস্বীকার্য যে, কোন ব্যক্তিই আয়ুব খাঁর নাম করে ভোট সংগ্রহ করতে পারে নাই। প্রত্যেকটি প্রার্থী স্পষ্ট ভাষায় জনগণের সামনে অঙ্গীকার করেছে যে তারা পাশ করতে পারলে মাদারে মিল্লাতকে ভোট দেবে। ভোট-কেন্দ্রেও আয়ুব খাঁর নাম উল্লেখ করার সাহস কারও ছিল না। মনে মনে ইচ্ছা পোষণ করে থাকলেও প্রকাশ করার স্পর্ধা কেউ দেখাতে পারে নাই।

ইতিমধ্যে পূর্বের ঘোষণা বাতিল করে পনরই মার্চের পরিবর্তে দোসরা জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিন ধার্য করা হয়।

এন-ডি-এফ সরাসরি সম্মিলিত বিরোধীদলের সংস্থাভুক্ত না হওয়ায় পরিস্থিতি খানিকটা জটিল আকার ধারণ করল। আমরা মনে-প্রাণে অত্যন্ত আন্তরিক আগ্রহ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি কিন্তু সাধারণ মানুষ এই ব্যাপারে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল। ফলে আমরাও বিব্রত বোধ করতে লাগলাম। পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলল বিরোধী দলীয় সংবাদপত্রগুলি। আমরা একবার প্রস্তাব করেছিলাম যে, একটা ইউনাইটেড কম্যাণ্ড গঠন করা উচিত এবং সেই কমাণ্ডই নির্বাচন পরিচালনা করবে। আর যায় কোথায়! সব তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল।

রাজনৈতিক মঞ্চে মাণিক মিঞা লিখলেন, কসম খাইয়াছি,

নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত যে যাই বলুক বা করুক নীরবে সহ্য করিয়া যাইব। একদম নিশ্চিত যে মিস জিন্নাহ পাশ করে বসেই আছেন। কাজেই এই সব অনধিকার চর্চাকারীর বাজে কথায় কান দেবার ফুরসুৎ কোথায়? জবাব দিব সময় কালে অর্থাৎ জয়লাভের পর।

এই প্রসঙ্গে আরও লিখলেন, মিস জিন্নাহর নেতৃত্বে সম্মিলিত বিরোধী দলই ত ইউনাইটেড কম্যাণ্ড। ইহার চেয়ে শক্তিশালী নেতৃত্ব কি হতে পারে, জনাবরা জবাব দিবেন কি? তাঁর প্রবন্ধে ও লেখায় আমাদের অতি তাচ্ছিল্য ভরে 'জনাবরা' বলে উল্লেখ করতেন! জনাবরা কি মনে করেন, জনাবরা কি বলেন ইত্যাদি।

এই সব আচরণে কার উপকার হয়েছে? বিরোধী দলের ইস্যুটা কি? অনর্থক আমাদের বিরোধিতা করে তাদের দাবী বা উদ্দেশ্য কি উপরে তুলে ধরতে পেরেছেন? না, এই কারণে জনগণের মনে দারুণ সংশয় ও হতাশার সৃষ্টি হয়েছে! অনেক জায়গায় আমাদের কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছে। জনগণের মনের সন্দেহ দূর করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে।

আমরা ভেবেছিলাম এই পরিপ্রেক্ষিতে মিস জিন্নাহর সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই উদ্দেশ্যে, নুরুল আমিন, মোহন মিঞা, মাহমুদ আলি ও আমি করাচী যাওয়া স্থির করি। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র রাতারাতি বিরোধী দল শাহ আজিজুর রহমানকে মিস জিন্নাহর কাছে পাঠায়ে দেয়। করাচী গিয়ে নুরুল আমিন যখন মিস জিন্নাহর সাথে আলাপ করলেন, তখনই বুঝতে পারলেন, তাঁর কান ভারী হয়ে গেছে। শাহ আজিজ তাঁকে বলে এসেছেন যে, এদের দলে শামিল করে নিলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। মিস জিন্নাহ বললেন, এখন ত আর কিছুই করার উপায় নাই। আপনারা বাইরে থেকেই সমর্থন দিন।

তা ত দিচ্ছিই। কারও আদেশ উপদেশের উপর নির্ভর করে নয়। দেশের বৃহত্তর মঙ্গলের জন্যই নিঃস্বার্থভাবে আমরা কাজ করে

যাচ্ছি। বিভিন্ন স্থানে এন-ডি-এফ এর প্রায় সমস্ত নেতা ও কর্মী জনসভা করেছে। বিরাট সমাবেশ হয়েছে। অত্যন্ত সারগর্ভ বক্তৃতা দেওয়া হয়েছে। দেশের সমস্যা ও নির্বাচনের গুরুত্ব সম্বন্ধে সবাই বক্তৃতা করেছে।

নুরুল আমিন ও আবু হুসেন সরকার বয়োবৃদ্ধ। আমিও যুবক নই। নুরুল আমিন দুরারোগ্য ব্যাধির আক্রমণে প্রায় চলচ্ছক্তি রহিত। অথচ সমস্ত কষ্ট অসুবিধা উপেক্ষা করে প্রত্যেকটি সভায় গিয়েছেন ও বক্তৃতা করেছেন। ইলেকশনের আগের দিন, দুই দুইটি জনসভা করে ফেরার পথে ঢাকার অদূরে আমার জীপ গাছের সাথে টক্কর খেয়ে উলটে যায়। একজন সঙ্গী ঐ রাত্রেই মারা যায়। ড্রাইভার মারা যায় কয়েক দিন পর। দুই জন সঙ্গী আর আমি গুরুতর জখমী হই। প্রায় একমাস কাল শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছে।

এই সব পরিশ্রম, বিভিন্ন এলাকায় জনসভা, বক্তৃতা—এর এক বর্ণও ইত্তেফাকে কিংবা বিরোধী দলীয় কোন সংবাদপত্রে প্রকাশ করে নাই। এমন কি মাদারে-মিল্লাতের সমর্থনে অমুক স্থানে অমুক লোকেরা জনসভা করেছে এই খবরটি পর্যন্ত প্রকাশ করে নাই।

ঢাকা জেলার গড় অঞ্চলে এক বিরাট জনসভা করি। বক্তৃতা শেষে জনৈক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক মঞ্চে উঠে ঘোষণা করলেন, আমি একজন ভোটার। এতদিন পর্যন্ত আয়ুব খাঁকে ভোট দেবার ইচ্ছা মনে মনে পোষণা করেছি। কিন্তু নেতৃবৃন্দের বক্তৃতার পর আমার কলব সাফ হয়ে গেছে। ওয়াদা করছি, মাদারে-মিল্লাতকে ভোট দেব। জিন্দাবাদ ধ্বনিতে সভা কেঁপে উঠল।

ইত্তেফাকের একজন রিপোর্টার—তরুণ যুবক, স্থানীয় হাইস্কুলের শিক্ষক। এই ঘটনার বিবরণ তাকে টেলিগ্রাম করে জানাতে বললাম। খুব উৎসাহিত হয়ে বলল, নিশ্চয়ই। এমন খবর ক'টা পাওয়া যায়; পরে দেখা গেল ইত্তেফাক এটাও ছাপায় নাই।

ক্ষতি কার হয়েছে? এন-ডি-এফ এর? না সম্মিলিত বিরোধী-দলের—না দেশের?

আমাদের জনসভার তুলনায় সম্মিলিত বিরোধীদলের তেমন কোন জনসভাই হয় নাই, মিস্‌ জিন্নাহর জনসভা। বক্তৃতার মানও আমাদের জনসভার বহু নিম্নে।

বিভিন্ন সভায় আজম খাঁ বক্তৃতা দিতে দাঁড়ায়েছেন। উর্দুতে বলেছেন, "ভাই সব আল্লাহ হুকুম করলেন, আয় ফাতেমা খাড়া হো যাও। তিনি দাঁড়ালেন। 'আবার আল্লাহ হুকুম করলেন, আয় পাঁচ পার্টি, ইনকো তায়ীদ করো—অর্থাৎ সমর্থন দাও। পাঁচ পার্টিও নেমে গেল সমর্থন দিতে। এখন আপনাদেরও ফরজ মিস ফাতেমাকে সমর্থন করা।" সভাস্থ সকলে হাত তুলে সমর্থনের ওয়াদা করল। আজম খাঁও হাত তুলে বললেন, "সোবহান আল্লাহ, ইয়েহ ইনসান নেহী—ফেরেশতা হ্যায়। বদরের যুদ্ধে আল্লাহতায়ালা যেমন রসুলুল্লাহর মদদের জন্য ফেরেশতা নাজেল করেছিলেন, এখনও এই যুদ্ধে তিনি লাখ লাখ ফেরেশতা পাঠায়েছেন।"

লক্ষ্মীপুর থানায় যাবার পথে আজম খাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য কিছু সংখ্যক কর্মী মান্দারী বাজারে রাস্তার ধারে দাঁড়ায়ে ছিল। আজম খাঁ এলেন জীপে চড়ে। জনতা দেখে থামলেন। তারা মাদারে মিল্লাত জিন্দাবাদ, আজম খাঁ জিন্দাবাদ, এন-ডি-এফ জিন্দাবাদ ধ্বনি তুলল। আজম খাঁ মুখ বার করে বললেন, এন-ডি-এফ কুছ নেহি। পাঁচ পার্টি সব হ্যায়। হাতের পাঁচ আঙ্গুল বিস্তার করে দেখালেন। তার পর জীপ ছুটে চলল গন্তব্যস্থানে। কর্মীরা হতভম্ব হয়ে দাঁড়ায়ে রইল।

অথচ কয়েকদিন আগে আমার সাথে দেখা করতে এসে আমাকে বাড়ী না পেয়ে, একটা স্লিপে লিখে গেলেন, ভাই সাব, আপনাকে তসলিম জানাতে এসেছিলাম। নিরঙ্কুশ গণতন্ত্র

আদায়ের পবিত্র সংগ্রাম অব্যাহত রাখুন। অন্যান্য ব্যাপার পরে বিবেচ্য। ইনশাল্লাহ সব ঠিক হয়ে যাবে। আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন।

ইলেকশনের কয়েকদিন আগে এক জেলায় গিয়ে আজম খাঁ ঘরোয়া আলোচনার সময় ভবিষ্যৎ কেবিনেট গঠনের আভাস দিলেন। সবাই তাঁকেই প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছে, বললেন। অন্যান্য সদস্যদের নামও প্রকাশ করলেন। সবারই স্থান হবে। দরকার হলে একই ডিপার্টমেন্টের জন্য দু'জন মন্ত্রী করা হবে।

ইলেকশনের আগের দিন ইত্তেফাক ছায়ামন্ত্রীসভার নাম ঘোষণা করল। কোন কোন দলের নাম উল্লেখ নাই বলে তারা আবার গোস্বাও করল।

এমনি সব পাগলামি অনেক হয়েছে।

নির্বাচনের আগেই মৌলানা ভাসানী 'গুম' হয়ে গেলেন। তাঁর ন্যাপ সদস্যদের কাজে ভাটা পড়ে গেল। ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা কাজ বন্ধই করে দিল।

সম্মিলিত বিরোধীদলের মাসিক কমিটি ছিল। প্রতি মাসে চেয়ারম্যান নির্বাচন' যাতে প্রত্যেক পার্টিই সুযোগ পায়। মিউজিক্যাল চেয়ারের মত। সেখানে দ্বন্দ্ব কলহ কোলাহল পাগলামি সবই হয়েছে। বাইরেও তার ধাক্কা এসে লেগেছে।

মিস জিন্নাহ এই নির্বাচনে আয়ুব খাঁকে হারাতে পারবে এ বিশ্বাস আমরা অনেকেই করি নাই।

জনগণের উন্মাদনা যতই প্রবল হোকনা কেন, ভোট তাদের হাতে নাই। যাদের হাতে ভোট, তারা আয়ুব খাঁর সৃষ্ট। মাদারে মিল্লাতের দোহাই দিয়ে বৈতরণী পার হয়ে মূর্তি ধারণ করেছে। মাদারে মিল্লাত নির্বাচিত হলে তাদের এই ব্যবস্থা আমূল উৎখাত করে দেবে। সুখ স্বাচ্ছন্দ সমৃদ্ধি সবই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাঁকে ভোট দেওয়া আত্মহত্যার শামিল।

তারপর আয়ুব খাঁর শক্তি অসীম। অর্থ অনর্থ সবই তাঁর করায়ত্ত। বিপুল অর্থ ব্যয় করার সামর্থ্য তাঁর আছে। নির্বাচনী চাবি-কাঠি তাঁর হাতে। তাঁর গভর্ণর, তাঁর কর্মচারীই সব নির্বাচন পরিচালনা করে। তারা যে কোন পন্থা কৌশল অবলম্বন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা-সঙ্কোচ বা কুণ্ঠা বোধ করবে না। আয়ুব খাঁ সব আটঘাট বেঁধে নিয়েই ইলেকশনে অবতীর্ণ হয়েছেন। বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকলেও ইলেকশনের নাম মুখে আনতেন না।

আবুল মনসুর ভাই একদিন বলেছিলেন, নির্বাচনের ফলাফল ত তৈয়ার হয়েই আছে। ইলেকশনের পর মূহুর্তেই সেটা ঘোষণা করা হবে। চারদিকের অবস্থা দেখে একদিন হঠাৎ বললাম, আমার যেন মনে হয় মিস জিন্নাহ জিতেই যাবেন। তিনি বললেন, আপনার ঈমান হঠাৎ কমজোর হয়ে গেল কেন? আয়ুব খাঁর অসীম শক্তি সামর্থ্যের উপর আপনার সন্দেহ উদয় হওয়ার কারণ কি?

এ সব সত্ত্বেও আমরা সমর্থন দিয়েছিলাম এবং প্রাণপণ চেষ্টাও করেছিলাম। আমাদের ধারণা ছিল পূর্ব পাকিস্তানে যদি অন্ততঃ অধিকাংশ ভোট মিস জিন্নাহ লাভ করেন, তা হলে প্রমাণিত হয় যে, পূর্ব পাকিস্তান আয়ুব খাঁকে চায় না—তাঁর উপর এই অঞ্চলের আস্থা নাই। শুধু এই উদ্দেশ্যেই আমরা যোগদান করেছিলাম।

সেই উদ্দেশ্যও সফল হয় নাই। সরকারী শক্তির প্রভাবও অর্থের চাপে এবং অন্যান্য কারণে আয়ুব খাঁ জয়লাভ করলেন। পূর্ব পাকিস্তানেও অর্ধেকের বেশী ভোট তিনি পেলেন।

গভর্ণর সদলবলে মাঠ চষে ফেলেছেন। সমস্ত কর্মচারীদের ডেকে এনে উপদেশ দিয়েছেন। একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী বলল, তার সম্মুখে বাণ্ডিল ভরা টাকা দেওয়া হল পুলিশের বিভাগের ছোট-বড় কর্ম চারীদের। আমার প্রেসিডেণ্টকে পাশ করাতেই হবে। যে প্রকারেই হোক। ভোটারদের যাহ্ করতে হলেও করবেন। ভোট চাই-ই।

এক জেলার ডি-সি, রাত একটায় টেলিফোন করেন গভর্ণরকে।

খবর খুব ভাল। শতকরা চল্লিশটা ঠিকই আছে এবং আরও চল্লিশটা এসে যাবে। আপনার এই ডি·সি বেঁচে থাকলে কোন চিন্তার কারণ নাই।

গভর্ণর জিজ্ঞাস করেন, তা' এত রাত জেগে আছ কেন? উত্তরে বলে, স্যার, আনন্দের হিল্লোল বয়ে যাচ্ছে মনে-প্রাণে। ঘুম কি আসে নাকি?

গভর্ণর বলেন, কিন্তু সাবধান, আজম খাঁ যাচ্ছে ওখানে। ডি সি সদর্পে বলে, আসুক না। এবার ব্রহ্মপুত্রের স্রোতে তাকে ডুবায়ে দিব। ঘাবড়াবেন না।

সবাই এমনি করেছে। সরকারী কর্মচারীরা ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে নিয়ে পাহাড়া দিয়ে বাক্সে ভোট দেওয়ায়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানে লাইসেন্স ও পারমিটের ফরম সরকারী এম-এন এ ও এম পি-এর কাছে দেওয়া হয়েছে। তারা অবাধে সে সব বিতরণ করে ভোট সংগ্রহ করেছে।

লাহোরের আরিফ ইফতিখার বর্ণনা করলেন এক ভোট-কেন্দ্রের অবস্থা। দুই জন পুলিশ অফিসার একটি বন্ধ গাড়ীতে কতকগুলি ভোটার এনে উপস্থিত করল। দরজা খুলে এক একজন বার করল। বলে দিল, ভোট দিয়ে ফিরে এস। খানিক ক্ষণ পর তারা পুনরায় এক এক করে গাড়ীতে ঢুকল। অফিসার গুণে দেখল; তারপর গাড়ী ছেড়ে দিল। জেলখানার কয়েদীদের গাড়ীর মত। আরিফ বলল, ইচ্ছা ছিল প্রতিবাদ করি। কিন্তু সাহস হয় নাই। কি না কি করে বসে ঠিক নাই।

সরকারী প্রভাব, গণতন্ত্রীদের বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়াও সম্মিলিত বিরোধী দলের নিজস্ব দুর্বলতা এই পরাজয়ের। নির্বাচক মণ্ডলীর নির্বাচনের সময়ই দলের আভ্যন্তরীণ অনৈক্য প্রকট হয়ে উঠেছিল। প্রত্যেক দলই তার নিজস্ব প্রার্থীকে পাশ করার চেষ্টা করেছে। এমন কি পাশ করার পর একই ব্যক্তিকে বিভিন্ন

দল নিজস্ব বলে দাবী করেছে। এতে কোন্দল সৃষ্টি হয়েছে। মাসিক কমিটি ইলেকশন পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছিল। কোদ নির্দিষ্ট কর্মপন্থার নির্দেশ তারা দিতে পারে নাই। নেতৃত্বের কোন্দল সেখানে ছিল। অর্থাৎ বলিষ্ঠ ও একনিষ্ঠ নেতৃত্ব সেখানে ছিলনা বললেই চলে। উনিশ শ' চুয়ান্ন সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে সোহরাওয়ার্দী ইলেকশান পরিচালনার নেতৃত্ব গ্রহণ না করলে যুক্তফ্রন্ট বিশাল শক্তিশালী সংগঠন হওয়া সত্বেও যে আশাতীত জয়লাভ হয়েছিল, তা' হত কিনা সন্দেহের বিষয়। এই জন্যই আমরা ইউনিফাইড্ কমাণ্ডের প্রস্তাব করেছিলাম। তার পরিবর্তে তারা গঠন করল, ঘুর্ণিয়মান মিউজিক্যাল চেয়ার।

মৌলানা ভাসানী ও তাঁর শ্বাপদল নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে রইল। শেখ মুজিবের বাড়াবাড়ি ও ঔদ্ধত্য অন্যতম কারণ। আজম খার নাটকীয় প্রদর্শনীও কম ক্ষতি করে নাই।

এন-ডিএফ-কে সম্পুর্ণ ব্ল্যাক আউট করায় বিভিন্ন এলাকায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে। যত দোষই থাকুক না কেন, এর নীতি এবং নেতৃত্বের উপর জনগণের অটুট আস্থা ছিল। জনগণ জানে, এই সংস্থার নেতৃবৃন্দ প্রাচীন অভিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য। তাঁদের বাদ দিয়ে কোন জনপ্রিয় সরকার দেশে গঠন করা সম্ভব নয়। আর একটি কথা। এই সংস্থা পুরাপুরি বাঙ্গালী। অন্যান্য দলের হেড হেড-কোয়ার্টার্স পশ্চিম পাকিস্তানের। এই কারণেও এন-ডি-এফ কে বাইরে রাখায় পূর্ব পাকিস্তানের মনে খুব বেশী উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারে নাই।

অথচ এন-ডি-এফ এর কোন কিছু প্রাপ্তির বিন্দুমাত্র আশাও ছিল না। আমাদের অবস্থা ত্রিশঙ্কুর মত। দোদুল্যমান— না স্বর্গে না মর্তে। বিরোধিতা করা সম্ভব নয়। সুতরাং কিছু কালের জন্য বাণপ্রস্থ অবলম্বন করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তবুও ব্যক্তিগত পদ মর্যাদা বা লভ্যাংশের কথা আদৌ আমাদের

মনে উদয় হয় নাই। দেশের বৃহত্তর স্বার্থের তাগিদেই আমরা সংগ্রামে অবতীর্ণ হই।

'নয়দফা' কর্মসূচী জাতির মুক্তিসনদ বলে ঘোষিত হলেও অনেকেই এটাকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ-বিরোধী এবং আর এক দফা অবিচারের পরিকল্পনা বলে সন্দেহ করেছে।

এই সব অবস্থা দেখে জনসাধারণের মন স্বভাবতই বিচলিত হয়েছে। তাদের দ্বিধাগ্রস্থ মনের ছবি চোখে মুখে ফুটে উঠেছে। বিভিন্ন সভায় এসব প্রশ্ন তুলেছে। আমরা যথাসাধ্য সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দেবাব চেষ্টা করেছি। তারা গ্রহণ করেছে কি না বলা শক্ত। দু'এক জায়গায় আশ্বাস দিতে হয়েছে যে সরকার গঠনেব কালে নিশ্চয় আমরা যোগদান করব। এ বিষয়ে গোপন ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দলীয় কোন্দলই বেশী করে মানুষকে উদ্বিগ্ন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। পাঁচটি দল ঐক্যবদ্ধ বা কম্বাইণ্ড হয়ে থাকলেও কার্যতঃ ঐক্যের কোন লক্ষণ জনগণ লক্ষ্য করতে পারে নাই। দলীয় কার্যক্রম তারা গভীর ভাবে নিরীক্ষণ করেছে ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়েছে। মিস জিন্নাহর জয়লাভের পর ক্ষমতা বণ্টনের ব্যাপারে দলীয় কোন্দল এমন উৎকট রূপ ধারণ করবে যে কোন সুষ্ঠু ও স্থায়ী সরকার গঠন বা পরিচালনা একরূপ অসম্ভব হয়ে পড়বে। এ সন্দেহ তারা বরাবরই করেছে।

খাজা খয়েরউদ্দিন একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন, পরিশ্রম ত করে যাচ্ছি কিন্তু মনে হচ্ছে মিস জিন্নাহ জিতে গেলে আমাদের সমূহ বিপদ। যদি হেরে যান তা হলেই বোধ হয় মঙ্গল। যা' অবস্থা। বড় দুঃখে তিনি একথা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন।

দলীয় ঐক্যের পরিণাম-ই এই। ঐক্য বাইরের লেবাস। সাময়িক আবরণ। অন্তরে অনৈক্য। ঐক্যবদ্ধ হলে দলীয় স্বাতন্ত্র্য ও প্রাধান্য রক্ষা ও বিস্তারের আকাঙ্খা প্রবল হয়ে উঠে। সর্বদা

ভয়, পাছে আমার দল বিলুপ্ত না হয়ে যায়। কিংবা নিম্নস্তরে নেমে না যায়। ঐক্যের জোয়ারে ভেসে যাওয়ার আশঙ্কা খুব বেশী। এই সব কারণে দলীয় কার্যক্রম বৃদ্ধি পায়। দল বাঁচলে ত ঐক্য। দলই আসল—মূল। ঐক্য ত আছেই—ওটা ত আর ভেঙ্গে যাচ্ছে না। এই ছিল মনোভাব।

দলীয় কার্যক্রম সক্রিয় রাখলে ঐক্য টিকে থাকতে পারে না। এই কারণেই আমরা গোড়া থেকেই দলহীন ঐক্যের উপর এত জোর দিয়ে এসেছি। দলহীনতা-ই ঐক্যের প্রধান স্তম্ভ। দল পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পরও আমরা মন্দের ভাল হিসাবে দলীয় কার্যক্রম বন্ধ বা স্থগিত রাখার অনুরোধ করি। এটা আদর্শ ব্যবস্থা না হলেও মোটামুটি নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু আমাদের কোন প্রস্তাবই কোন দল গ্রহন করে নাই।

তাই, এক রকম হট্টগোলের মধ্যে এই বিয়োগান্ত নাটকের সমাপ্তি ঘটে।

উনচল্লিশ

আশা করেছিলাম, এর পর বিরোধী দলীয় রাজনীতিকরা আর ইলেকশনের নামও মুখে আনবে না। সকলের মনেই গভীর নৈরাশ্য ও অবসাদ। অনেকেই বলেছে, আর না। জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনে কেউ যোগদান করবে না। মিস জিন্নাহ জয়লাভ করলে অধিকাংশ আসন বিরোধীদল দখল করতে পারবে। এখন ত অবস্থা সম্পূর্ণ উল্টা। জয়লাভের কোন আশাই নাই।

জাতীয় পরিষদের নির্বাচন মার্চ মাসে, প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন মে মাসে ধার্য হয়। এই সময় এক মোকদ্দামায় সাক্ষ্য দেবার

জন্য আমাকে লাহোর যেতে হয়। সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন দলের নেতা, উপনেতা ও কর্মীদের সাথে সাক্ষাৎ হয়। সকলেই এক বাক্যে নির্বাচন পরিহার করার অভিমত প্রকাশ করে। কোন অবস্থায়ই আর ইলেকশান করা উচিত নয়। দু' চারটি আসন দখল করে কি লাভ। বরং মিস জিন্নাহর নেতৃত্বে একটি সর্বদলীয় সংস্থা সৃষ্টি করলে ভবিষ্যতে রাজনীতির একটা পরিষ্কার রূপ দেশের কাছে তুলে ধরা যাবে।

ঢাকা ফিরে এসে শুনি, আওয়ামী লীগ প্রভৃতি ইলেকশনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। সম্মিলিত বিরোধী দল এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য লাহোর চলে যায়। যাবার আগে কোন কোন দলের দু'একজন সদস্য আমার মতামত জিজ্ঞাসা করে। আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ইলেকশন বয়কট করার অভিমত প্রকাশ করি। কেউ কেউ প্রশ্ন করে, আপনারা যে সর্বস্তরে ইলেকশন করবেন বলে প্রস্তাব পাশ করে রেখেছেন তার কি হবে? বললাম, সেটা আটকাবে না। প্রস্তাব অপরিবর্তনীয় নয়। পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবও প্রত্যাহার করা চলে।

লাহোরে কায অসমাপ্ত রেখে ঢাকা এসে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মিটিং মুলতুবী করা হয়। ঢাকা মিটিং-এ আওয়ামী লীগের পক্ষে শেখ মুজিব ইলেকশনের পক্ষে আর আবদুস সালাম খাঁ প্রভৃতি বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে। শেষ পর্যন্ত সম্মিলিত বিরোধী দল ইলেকশনে যোগদান করার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করে। এন ডি-এফ এর প্রস্তাবের ভয়েই নাকি তারা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এরা বাদ দিলে, এন-ডি এফ যদি একলা মাঠ দখল করে নেয়।

সম্মিলিত বিরোধী দল এবার এন-ডি এফ কে তাদের সাথে যোগদান করার জন্য পীড়াপীড়ি করে। এন-ডি-এফ এর কেউ টোপ গিলল। প্রস্তাব করল যে সম্মিলিত বিরোধী দল যদি তাদের দলের মনোনীত প্রার্থীর একটি লিষ্ট তৈয়ার করে, এন-ডি-এফ এর

সাথে বৈঠকে মিলিত হয় তা হলে এন-ডি-এফ তাদের সাথে যোগদান করতে রাজী।

কিন্তু ওরা অনেক বেশী চালাক। তারা ভিন্ন ভিন্ন পার্টির পাঁচটি নাম-তালিকা এনে এন-ডি-এফ এর কাছে পেশ করে। উদ্দেশ্য এন-ডি-এফ ষষ্ঠ দল হিসাবে তাদের সাথে সম্মিলিত হয়। আমি ঘোর আপত্তি করি, কিন্তু অন্যরা স্বীকার করে তাদের সাথে বৈঠক করে সম্মিলিত বিরোধী দল হয়। এর পর আর কোন সভায় যোগদান করি নাই।

নীতিগত ভাবে আমি এই প্রথার ইলেকশন বিরোধী। ইলেকশনের আগে ও পরে এ বিষয়ে কঠোর সমালোচনা করে বিবৃতি দিয়েছি।

প্রেসিডেণ্ট ইলেকশনে যোগদান করার একটা উদ্দেশ্য ছিল গোটা আয়ুব শাসনতন্ত্রটাকেই বাতিল ও বিলোপ করে জনগণের লুণ্ঠিত অধিকার পুনরোদ্ধার করা। পার্লামেণ্টারী শাসনতন্ত্র—বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন প্রবর্তন। অর্থাৎ অবৈধ-ভাবে অনধিকার প্রবেশ করে সম্পত্তি দখল করে নিলে যুদ্ধে বা মামলায় অন্যায় দখলকারীকে হটায়ে দিয়ে সম্পত্তির দখল উদ্ধার করার নীতি অবলম্বনেই এই নির্বাচন সংগ্রামে আমরা যোগদান করতে স্বীকৃত হয়েছিলাম। কিন্তু যুদ্ধ বা মামলায় হেরে গিয়ে—অন্যায় দখলকারীর নির্মিত গৃহে কিঞ্চিৎ স্থান লাভের চেষ্টা করার যে নীতি তাই হচ্ছে এই অক্ষম পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হওয়ার চেষ্টা করা। দখল স্বীকার, গৃহ-নির্মাণ স্বীকার। ঐ সামান্য একটু স্থানলাভ একমাত্র কাম্য। আয়ুব শাসনতন্ত্র পুরাপুরি স্বীকার করে নেওয়া হল। কাজেই, প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে যোগদান করার যুক্তি ও উদ্দেশ্য ও পরিষদ নির্বাচনে যোগদানের যুক্তি ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী এবং বিরোধী-দলীয় নীতিরওসম্পূর্ণ বিরোধী। যৎকিঞ্চিৎ গণতান্ত্রিক অধিকার

আদায়ের নামে যারা নির্বাচনে যোগ দেয়, তারা পূর্ণ গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে।

ইলেকশনের মোহ দুর্দমনীয়, আকর্ষণ দুর্বার। রাজনীতিকের পক্ষে রোধ করা অসম্ভব। অথচ স্বৈরতন্ত্রের আমলে নির্বাচন শুধু অনর্থকই নয়, স্বৈরাচারের সমর্থন ও সহায়ক ও বটে। মৌলিক গণতন্ত্র সরকারেরই সৃষ্ট এবং সম্পূর্ণভাবে সরকারের করতলগত। প্রশাসনিক ব্যবস্থাও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই প্রথার ইলেকশনে রাজনীতিকরা উৎসাহী হবে এটা অচিন্ত্যনীয়। তাদের উৎসাহ স্বৈরাচারের দালালীর নামান্তর মাত্র।

কেউ কেউ বলে থাকেন, এই নির্বাচন আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনেরই অংশ বিশেষ। এই উক্তিও আত্মপ্রবঞ্চনামূলক। বাইরে কোথায়ও আন্দোলন নাই। ভিতরে পরিষদগৃহের অভ্যন্তরে কি করে তার প্রতিফলন হতে পারে। অক্ষম পরিষদে সদস্যদের করণীয় কিছু থাকে না। তবুও তারা বাইরের আন্দোলনের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করতে পারে। কিন্তু আন্দোলন না থাকলে তাদের নিরর্থক বক্তৃতা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না। তাতে একমাত্র সংবাদপত্রই লাভবান হয়। সদস্যদেব ক্রিয়াকলাপ বিভিন্ন রূপ ও ভঙ্গীতে মুদ্রিত করে কাগজের পাতা ভর্তি করতে পারে।

তবুও ছয় দলের সম্মিলিত বিরোধীদল নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত করে নেমে গেল। কুড়ি পঁচিশটি আসন দখল করে পরিষদগৃহে একটি নির্দিষ্ট স্থান লাভ ও সরকারের বিশ্বস্ত ও অনুগত বিরোধীদল আখ্যায় ভূষিত হবার আনন্দ ও গৌরব লাভ করল।

পরিষদ নির্বাচনে সরকার উগ্রতর মনোভাব গ্রহণ করল এবং অবৈধ প্রভাব প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের চেয়ে জোরদার হল। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সরকারী কর্মচারী মায় গভর্নরের মনে কিছু সন্দেহ ও ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল। কিন্তু পরিষদ নির্বাচনের

২২—

সময় মাঠ প্রায় খালি। জনতার উন্মাদনা ম্লান হয়ে গিয়েছিল। তাই নির্বিকার চিত্তে সরকারী কর্মচারীরা সরকারী প্রার্থীর জয়লাভের জন্য আদাপানি খেয়ে মাঠে নেমে পড়ল। রাজনীতির স্থান দখল করল অর্থনীতি। টাকার খেলা চলল অবিরাম ও অঢেল। টাকা ছাড়া কেউ ভোট দেয় নাই। টাকা ছাড়া কেউ ভোট পায়ও নাই। আয়ুব খাঁ রাজনীতিকের বিরুদ্ধে বহু সত্য-মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করেছেন কিন্তু রাজনীতিকরা নির্বাচনে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, এ কথা আজ পর্যন্ত বলতে পারেন নাই। কিন্তু এবার জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে সবাই যেখানে টাকার খেলায় মত্ত, সেখানে তিনি যদি এই অভিযোগ রাজনীতিকের বিরুদ্ধে আনেন তা' হলে তা অস্বীকার করা যাবে না। তবে তিনি যে অভিযোগ করেন নাই তার কারণ তাঁর দলই এ ব্যাপারে অগ্রদূত ও পথপ্রদর্শক। নিজে কাঁচের ঘরে বাস করে অন্যের ঘরে প্রস্তর নিক্ষেপ করার সাহস তাঁর হয় নাই।

নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোটার বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। কেনা বেচা সহজ। সরকারী প্রভাব বিস্তার করাও সহজ। নিলামের বাজারে প্রকাশ্য ডাকে মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারা দেশ দুর্নীতির আড্ডায় পরিণত হয়েছে। শুধু তাই নয়, অধর্মও চরমে উঠেছে। কোরাণ শরীফের উপর থেকে টাকা নিয়ে ভোটাররা অম্লান বদনে অন্যত্র ভোট দিয়েছে। এর ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া গেছে।

ধামরাই কেন্দ্রে ইলেকশনের দিন উপস্থিত ছিলাম। দেখলাম, বেলা ন'টার আগেই সার্কেল অফিসারের অফিস ঘরে প্রায় সমস্ত ভোটার একত্র হয়ে গরম গরম ভাত আর খাসির গোস্তের কালিয়া ধ্বংস করছে। সার্কেল অফিসার ও থানা কৃষি অফিসার এসব এন্তেজাম করেছে। তারা এবং স্থানীয় সরকারী এম-পি-এ পরিবেশন করছে।

এই ঘটনার উল্লেখ করে সংবাদপত্রে বিবৃতি দেই। কিন্তু কেউ ভ্রুক্ষেপও করে নাই। যে কোন সভ্য ও গণতান্ত্রিক সরকার আমার এই অভিযোগের প্রতিকার করত এবং অপরাধীকে শাস্তির ব্যবস্থা করত। বর্তমান সরকার অতি সভ্য ও অতি গণতান্ত্রিক বলে হয়ত এই অপকর্মের জন্য কর্মচারীদের পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করবেন।

পাক-ভারত যুদ্ধের পর তাসখন্দে যাবার পূর্বে আয়ুব খাঁ ঢাকা তশরিফ আনেন। আমাদের কয়েকজনের সাথে তাঁর মোলাকাত হয়। নানা প্রসঙ্গ আলোচনার পর ইলেকশনে ব্যাপক দুর্নীতির কথা আমরা উত্থাপন করি। মোনায়েম খাঁ উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রতিবাদ করতে গেলে আয়ুব খাঁ তাঁকে থামায়ে দিলেন। মুচকি হেসে বললেন, কিছু সংখ্যক লোকের হাতে কিছু টাকা এসে পড়েছে। তারা রাজনীতি করতে চায়। এলাকায় তাদের কোন পরিচয় নাই। কি করে ভোট সংগ্রহ করবে। অথচ ভোট তার চাই-ই। অতএব, মধ্যমা অঙ্গুলির আগায় বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে টোকা দিয়ে দেখালেন,—টাকা খরচ করতে হয়।

বললাম, তা বেশ। কিন্তু এতে দেশের কি লাভ হল? যারা এমনি করে ভোট সংগ্রহ করে, তাদের প্রতি নির্বাচক মণ্ডলীর কোন ম্যাণ্ডেট থাকে না। একবার নির্বাচিত হয়ে আর এলাকায় ফিরে যাবার কোন প্রয়োজনও হয় না। ভোটাররা তার কাছে কিছু আশাও করে না।

বললেন, তা হবে কেন? কাজ করতেই হবে। এলাকায় মাঝে মাঝে যেতে হবে তা' না' হলে আবার নির্বাচনে যাবে কেমন করে?

এবার আমার পালা। দুই আঙ্গুলে তাঁরই মত টোকা দিয়ে বললাম, এরই জোরে। অঙ্কটা না হয় বাড়বে। বেশ সংখ্যক ব্যবসায়ী ও কনট্রাকটর পরিষদে ঢুকেছে। আগামী বারে ওরাই ভরে ফেলবে। অন্য কারোর বিশেষ করে রাজনীতিকদের কোন

আশাই থাকবে না। তাদের সঙ্গতি কোথায়? কিন্তু এতে দেশ যে দূর্নীতিতে ছেয়ে ফেলবে। জাতি বাঁচাবেন কেমন করে?

তারপর ধামরাই থানার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বললাম, সরকারের কি কোন কিছু করার ছিল? মোনায়েম খাঁর দিকে চেয়ে আয়ুব খাঁ হাসতে লাগলেন। মোনায়েম খাঁ বলল, আমি ত খবর পাই নাই—বিবৃতিও দেখি নাই।

আয়ুব খাঁ হাত দিয়ে ইশারা করলেন। মোনায়েম খাঁ হাসলেন।

চল্লিশ

বর্তমান শতকের প্রায় শুরু থেকেই পাক-ভারত উপমহাদেশের হিন্দু ও মুসলিম, এই দুই জাতির মধ্যে হিংসা দ্বেষ রেষারেষির সূত্রপাত হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে অবস্থা এমন তীব্র আকার ধারণ করে যে, দুইটি জাতির একত্রে অবস্থান করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে অবস্থার চাপে দেশ বিভক্ত হয়ে দুইটি পৃথক রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়।

দেশ বিভাগের পর অনেকেই আশা করেছিল যে, এখন আর রেষারেষি, হিংসা দ্বেষ থাকবে না। বরং উভয় জাতির মধ্যে এখন সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি লাভ করবে। আগের কলহ ভুলে যাবে। নিজস্ব আদর্শ ও ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে উভয় দেশ বা জাতি নিজ নিজ দেশকে শক্তিশালী ও উন্নতিশীল করে তুলবে।

সে আশা পূরণ হয় নাই। দেশ বিভাগের সময় কতকগুলি সমস্যা অমীমাংসিত রয়ে যায়। ফলে হিংসা দ্বেষ ও মন কষাকষি দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। সমস্যার সমাধান না হওয়ার ফলে এক অপরকে শত্রু সাব্যস্ত করে নিজেকে জাহির করছে; নাগরিক

দিয়ে 'অভিযান 'চালাতে থাকে। এই অভিযান কালক্রমে সশস্ত্র অভিযানে পরিণত হতে পারে, কোন কোন মহল এই আশঙ্কা করে উভয় দেশেই যুদ্ধের সাজসজ্জা ও আনুসঙ্গিক প্রস্তুতি দিন দিন বৃদ্ধি করেই চলে আসে। রাজস্ব আমদানীর মোটা অঙ্ক এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অপচয় করা হয়। পাকিস্তানের দেশরক্ষা বিভাগ বাজেটের প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ ভাগ ব্যয় করে শক্তিশালী দেশরক্ষাবাহিনী গঠন করে ফেলল। ভারতের সাথে যুদ্ধের আশঙ্কা না থাকলে এত অর্থব্যয়ের কোন প্রয়োজনই ছিল না। অতিরিক্ত ব্যয়বাহুল্য দেশের উন্নয়নমূলক কার্যে প্রয়োগ করলে দেশ আজ সত্যিকার উন্নতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারত।

সমস্যার মধ্যে কাশ্মীরই মূল ও প্রধান। কাশ্মীর নিয়েই বড় রকমের সংঘর্ষ হওয়ার আশঙ্কা। রাজনৈতিক সরকারের আমলে আশঙ্কা অত্যন্ত ক্ষীণ ছিল। কারণ তারা যুদ্ধে বিশ্বাস করে না। কিন্তু রাজনীতিকদের তিরোধানের পর আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হবার উপক্রম হয়।

পয়ষট্টি সালে সত্যিই সংঘর্ষ বেধে গেল। সেপ্টেম্বর মাসের ছয় তারিখে যুদ্ধঘোষণা না করেই ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করল। আয়ুব খাঁ কলেমা তৈয়ব পাঠ করে এই দুঃসংবাদ ঘোষণা করলেন রেডিও মারফত।

কাশ্মীর সমস্যার পটভূমি অত্যন্ত মর্মান্তিক। দেশ বিভাগের সময় চুক্তি হয়েছিল যে, করদরাজ্যসমূহ জনমতের উপর নির্ভর করে হিন্দুস্থান বা পাকিস্তানে যোগদান করবে। কাশ্মীরের বেলায় এর ব্যতিক্রম হয়। সেখানে হিন্দু ডোগরা মহারাজা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের মতামত অগ্রাহ্য করে ভারতের সাথে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

কাশ্মীরের জনগণ গোড়াথেকেই এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি উত্থাপন করে। ফলে বিভিন্ন স্থানে [illegible] দাঙ্গাহাঙ্গামা

হয় এবং বিভাগের পর পরই প্রায় বার শ' কাশ্মিরী নিহত হয়। শেষ পর্যন্ত কতজন মৃত্যু বরণ করেছিল তার সংবাদ কোনদিন পাওয়া যায় নাই।

পুঞ্চ এলাকায় ডোগরারাজের বিরুদ্ধে এক গণ-অভ্যুত্থানের ফলে এই এলাকা মুক্ত হয় এবং পরবর্তীকালে এই এলাকাই আজাদ কাশ্মীর অঞ্চলে পরিণত হয়। ভারত তখন এই সমস্যা মীমাংসার জন্য জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা কমিটিতে আবেদন পেশ করে। নিরাপত্তা কমিটি উভয় পক্ষের তর্কবিতর্ক ও বক্তৃতা শোনার পর আটচল্লিশ সালের আগষ্ট ও উনপঞ্চাশ সালের জানুয়ারী মাসে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ কাশ্মীরী জনগণই গণভোট মারফত নির্ধারণ করবে। ভারত ও পাকিস্তান এই সিদ্ধান্ত মেনে নেয়।

কাশ্মীর প্রশ্নে পাকিস্তানের দাবী অতি পরিষ্কার। পাকিস্তান কাশ্মীরি জনগণের গণ-ভোটে বিশ্বাসী। তারা গণ-ভোট দিয়েই তাদের ভবিষ্যৎ স্থির করবে। ভারত নানা বাহানায় এই প্রস্তাব অস্বীকার করে আসছে এবং নিরাপত্তা কমিটির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে শাসনতন্ত্র সংশোধন করে কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ করে নিয়েছে।

কাশ্মীরিদের দাবীও গণ-ভোট। এর জন্য তারা গোড়া থেকেই আন্দোলন করে আসছে। ভারতের অনমনীয় মনোভাব তাদের অতিষ্ঠ করে তুলেছে। তাই তারা পয়ষট্টি সালের আগষ্ট মাসের শুরুতেই মুজাহিদ বাহিনী গঠন করে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের হুমকি দেয়।

ভারত অভিযোগ করে যে এই মুজাহিদ বাহিনী ভুয়া। ওটা পাকিস্তানের কল্পনা প্রসূত। তারা আরও বলে যে, আসলে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী মুজাহিদ বাহিনীর নামে কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ করে যুদ্ধের প্রস্তুতি চালায় এবং সুযোগ বুঝে যুদ্ধ আরম্ভ করে

দিয়ে বিভিন্ন এলাকা দখল করে নেয়। যেহেতু কাশ্মীর ভারতেবই অংশ বলে তারা দাবী কবে, সেই হেতু কাশ্মীর আক্রমণকে তারা ভারত আক্রমণ বলেই ধরে নেয়। সেই জন্য তারাও সেপ্টেম্বর মাসের ছয় তারিখে পাকিস্তান আক্রমণ করে।

পাকিস্তান এই অভিযোগ অস্বীকাব করে। কিন্তু জাতিসঙ্ঘের যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাবে উভয় দেশকে পাঁচই আগষ্টের পূর্বাবস্থায় ফিবে যাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাঁচই আগষ্ট ছয়ই সেপ্টেম্বব নয়। প্রকাবান্তরে বলা হয়েছে যে, ঐ তারিখে পাকিস্তান কাশ্মীরে যুদ্ধ শুরু করেছে বা অনুপ্রবেশ করেছে এবং সীমা লঙ্ঘন করেছে। জাতিসঙ্ঘের এই অনুমান বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পাকিস্তানেব তরফ থেকে আপত্তি বা প্রতিবাদ করা হয় নাই।

ছয়ই সেপ্টেম্বর ভাবত লাহোব আক্রমণ কবে। প্রায় দখল কবেই ফেলেছিল। এমন অতর্কিত অবস্থায় লাহোরের আক্রমণে সারা পাকিস্তান স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। লাহোর প্রতিরক্ষা বাহিনীব কোন সুব্যবস্থা ছিল না। থাকলেও কর্মক্ষম ছিল না। এব কারণ বোধ হয় এই যে, লাহোর আক্রান্ত হবার কোন আশঙ্কা কেউ করে নাই। সবই কাশ্মীব নিয়ে ব্যস্ত। যুদ্ধ হচ্ছে কাশ্মীরে—লাহোরে এসে শত্রুপক্ষ আক্রমণ চালাবে, এমন কথা ত ছিল না। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে ভারত ময়দান খোলা পেয়ে এদিকে ঢুকে পড়ে।

এক পাঠানের গল্প মনে পড়ে। চোর ধরে তার পা বেঁধে চলে যায় থানায়। দারোগা জিজ্ঞাস করে, চোরকে কি করেছ? উত্তব দেয়, পা' বেঁধে রেখে দিয়েছি যাতে পালায়ে যেতে না পারে। জিজ্ঞাস করে, হাত? বলে হাত খোলা রয়েছে। দারোগা হেসে বলে, তবেই হয়েছে। ওর হাতে বাঁধিস্ নাই, হাত দিয়ে পায়ের বাঁধ খুলে পালায়ে যেতে পারে, এটা ঢুকে নাই মগজে? পাঠান হঠাৎ বুদ্ধিহারা হয়ে যায়। পরক্ষণেই

হেসে বলে, নাহি সাব, ওয়ো ভি পাঠান হ্যায়। অর্থাৎ আমার মাথায় যখন এটা ঢুকে নাই, তখন ওর মাথায়ও ঢুকতে পারে না।

যুদ্ধ হচ্ছে কাশ্মীরে—হোক। এদিকে ত আসবেনা—থাক খোলা। ভারত পাঠান হলে সম্ভব ছিল। কিন্তু নেহাত অ-পাঠান, তাই চট করে মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল।

ভাগ্যিস্ পূর্ব-পাকিস্তানী জওয়ানরা ওখানে ছিল। এই ব্যাটালিয়ন অসাধারণ শৌর্য বীর্যের পরিচয় দিয়েছে। জীবন বিপন্ন করে লাহোর রক্ষা করেছে এবং শত্রুকে তাড়ায়ে পগাড় পার করে দিয়েছে।

পূর্ব-পাকিস্তানী সৈনিকরা ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। এতকাল এই অপবাদ প্রচার করা হয়েছে যে, পূর্ব-পাকিস্তানীরা ভীরু কাপুরুষ, যুদ্ধ দেখে ভয় পায়। এ সব মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেল। খুব দম্ভ ভরে বলা হত, পূর্ব পাকিস্তান 'অরক্ষণীয়া'—তার রক্ষার ভার পশ্চিম-পাকিস্তানের উপর। এই ধুয়া তুলে প্রতিরক্ষা বাহিনীতে পূর্ব-পাকিস্তানীদের নিয়োগের ব্যাপারে এবং সামরিক শিক্ষাদানে নানা রকমের বাধাবিঘ্ন বিধি-নিষেধ সৃষ্টি করা হয়েছে। পূর্ব-পাকিস্তানে প্রতিরক্ষা বাহিনীর অতি ক্ষুদ্র একটি শাখা মাত্র রাখা হয়েছে। যুদ্ধের সময় দেখা গেল, পূর্ব-পাকিস্তান ত অরক্ষণীয়া নয়ই, বরং পূর্ব-পাকিস্তানীরা উপযুক্ত শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হলে, শুধু নিজেদেরই নয়, বার শ' মাইল দূরে পাকিস্তানের প্রাণকেন্দ্র লাহোর নগরীকেও রক্ষা করতে পারে এবং করেছেও।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সামরিক কর্তৃপক্ষ পূর্ব পাকিস্তানের এই গৌরব ম্লান করায় যথেষ্ট চেষ্টা করেছে। তাদের সম্বর্ধনার জন্য চাটগাঁ শহরে যে বিরাট আয়োজন করা হয়েছিল সেটা বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তানী সামরিক অফিসার যাঁরা পূর্ব-পাকিস্তান বাহিনী পরিচালনা করেছেন, তাদেরও সক্রিয় কর্তব্য থেকে সরায়ে অনেক বাহিরে পাঠায়ে দেওয়া হয়েছে।

কেউ কেউ অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। বিমানবাহিনীর সবচেয়ে যে বেশী কীর্তিমান সেই আলমের নাম কোথায়ও উল্লেখ করা হচ্ছে না। মেজর ভাট্টির নাম স্মরণীয় করতে যা-কিছু সম্ভব সবই করা হয়েছে কিন্তু বিক্রমপুরের অধিবাসী শহীদ মেজর মোবারক আলীর নাম আমরা ক'জনেই বা জানি?

যুদ্ধ বেধে যাওয়ার সাথে সাথেই পূর্ব-পাকিস্তানের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, পূর্ব-পাকিস্তান সারা বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে বিছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

পূর্ব পাকিস্তানে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ বা আক্রমণের কোন আশঙ্কা ছিল না। কোন আক্রমণ হয়ও নাই। কিন্তু তাই বলে পূব পাকিস্তান জনগণ একমূহূর্তও নীবর থাকতে পারে নাই। এই অংশের জনগণ—আবাল বৃদ্ধ-বনিতা দলমত নির্বিশেষে শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। দেশের প্রতিটি ধূলিকণাকে দেহের শেষ রক্তবিন্দু দানে রক্ষা করার বজ্রকঠোর শপথ তারা গ্রহণ করেছিল।

নৈতিক সমর্থনের মত চেষ্টাও করা হয়েছিল নানা প্রকারের। মেয়েরাও রাইফেল সহ কুচকাওয়াজ ও ফার্ষ্ট এইডেব মহড়া দিতে লাগল।

মৌলভীরা ঘোষণা করল জেহাদ। জেহাদের নামে মুসলমান পাগল। মরলে শহীদ, মারলে গাজী হওয়ার উদগ্র বাসনা সবার মনে হাসির খোরাকও অনেকে জোগায়েছে। অনেকেই টিনের ছোট ছোট তলোয়ার কোমরে ঝুলায়ে মসজিদে যায় নামাজ পড়তে। জেহাদের সময় ওটা সুন্নত।

পূর্ব-পাকিস্তানের যুদ্ধ চলল রেডিওর মারফত কবিতা গল্প গান নাটক কথিকা জারী প্রচার হতে লাগল তুফানের বেগে। দিন রাত্র। সবাই [illegible]। কম্যুনিষ্টদের মত শতশত [illegible] ভাষা ও শব্দ আমদানী করে নিল নতুন নতুন বাণী ও [illegible]। [illegible]।

বহু আজগুবী গল্পও প্রচার হতে লাগল—রেডিও মারফত। অন্য সব ব্যবস্থা ত অচল। কে একজন কোথায় স্বপ্ন দেখেছে, রসুলুল্লাহ যুদ্ধের পোষাকে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হয়েছেন জিজ্ঞাসা করা হল, হুজুর সরওয়ারে কায়েনাত, কোথায় তশরীফ নিয়ে যাচ্ছেন ? হুজুব জবাব দিলেন : পাকিস্তানের জেহাদ ঘোষণা করা হয়েছে—দেশ বিপন্ন। ওদের সাহায্য ও রক্ষার জন্যই আমার যেতে হচ্ছে সেখানে।

দুই নম্বর : যুদ্ধক্ষেত্রে পাকিস্তানকে সাহায্য করার জন্য অসংখ্য ফেরেশতা নেমে এসেছে। লম্বা দাড়ি ও সবুজ পোষাকধারী। হিন্দুস্থানী যুদ্ধবন্দীরাও সাক্ষ্য দিয়েছে। ক্যাম্পে নিয়ে আসার পর তারা জিজ্ঞাস করেছে, আমাদের যে সবুজ পোষাকধারী সৈনিকরা গ্রেফতার করল, তারা কোথায় ?

এমনি কত ? এ সব নাকি যুদ্ধের সময় মানুষের নৈতিক বল বৃদ্ধি করে।

যুদ্ধ ঘোষণার দু' তিন পর ছাত্র মহলে জোর সমালোচনা চলতে লাগল, আয়ুব খাকে এইবার যাবজ্জীবন প্রেসিডেণ্ট করার প্রস্তাব করা যায় কিনা। উপযুক্ত মূহুর্তে যুদ্ধ লাগায়ে দিয়েছেন ! লালমিঞা চলে গেল এক ডিগ্রী উপর। তিনি প্রস্তাব করলেন, যদি শহীদ না হতে পারেন তা হলে প্রেসিডেণ্টকে গাজী উপাধিতে ভূষিত করতে হবে।

সরকারী দলের চাঁইরা চীৎকার করে উঠল আহ কি ফাঁড়াই না কাটল। এই সময় যদি মিস জিন্নাহ প্রেসিডেণ্ট হতেন তা হলে কি আর রক্ষা ছিল ? সমূলে ধ্বংস হয়ে যেতাম। পাকিস্তান টিকে থাকতে পারত না।

তাদের স্থূল বুদ্ধিতে এই কথাটা মাথায় ঢুকে নাই যে মিস জিন্নাহ প্রেসিডেণ্ট থাকলে যুদ্ধই হত না। তিনি প্রেসিডেণ্ট হলে শাসনভার ন্যস্ত হত রাজনীতিকদের উপর। তারা যুদ্ধ ছাড়া

অন্য যে কোন পন্থা অবলম্বন করত। তা তারা করেও এসেছে বরাবর। যুদ্ধ বিগ্রহের লিপ্সা তাদের নাই। এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় তারা কোন দিন উন্মত্ত হতে পারে নাই। শান্তিপূর্ণ পন্থা ও পদ্ধতিতে তারা ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত সমস্যার সমাধান করার নীতিই এতকাল গ্রহণ করে এসেছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলি ঘোষণা করলেন, পাকিস্তান কম-সে-কম এক হাজার বছব যুদ্ধ লড়ে যাবে। আবার বললেন, আমার ঘাস খেয়ে পয়সা বাঁচাব, তাই দিয়ে অ্যাটম বোমা তৈয়ার করব। তরুণ সমাজ এই সব বাগাম্বর শুনে হাত তালি দিয়ে উঠল। বলল, ব্যাডডা—এই ত চাই। কথার মত কথা বলছে। এনা হলে শত্রুকে জব্দ করা যায়?

যুদ্ধ লাগার পরদিনই মোনায়েম খাঁ রাজনীতিকদের ডেকে পাঠালেন—লাটভবনে। বললেন, সরকারের কার্যকলাপ সমর্থন করে একটা বিবৃতি দিতে হবে যুক্তস্বাক্ষরে। অতি উৎসাহীর দল তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেল। আমরা অধিকাংশ আপত্তি করি। আমাদের বক্তব্য, যুদ্ধ কেন হল, কি প্রস্তুতি, কি ফলাফল কিছুই আমাদের জানা নাই। দেশবাসী একটি প্রাণীও জানে না। কার সাথে পরামর্শ করা হয়েছে তাও জানা নাই। সবুর খাঁ মন্ত্রী এখানে আছেন, তিনি জানেন কিছু? আপনি গভর্ণর, জানেন কিছু?

তাঁরা বললেন, তাঁরা কিছুই জানেন না। তা হলে? এ যুদ্ধের দায়িত্ব-ভার আমরা কেন নেব? আমাদের এই অংশে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জার কি আছে? না আছে কামান বন্দুক, বারুদ বোমারু, না আছে সেনা সমাবেশ! আমাদের সমর্থনে মানুষের নৈতিক বল বৃদ্ধি পাবে বলছেন। তারা কি জানে না, এই সমর্থন সম্পূর্ণ মৌখিক?

আমরা সাব্যস্ত করলাম, বিবৃতি আমরা দেব, কিন্তু শুধু বলব, সরকার যা ভাল বিবেচনা করেন করুন। ফলাফলের দায়িত্ব

তাদের ঘাড়েই থাক। আমরা প্রকাশ করলাম যে, প্রয়োজন হলে সরকারের কার্যক্রমের সমালোচনা করার অধিকার আমাদের রইল।

সতের দিন যুদ্ধ চলল। অদম্য উৎসাহে পাকিস্তানী সেনা ও বিমান বাহিনী যুদ্ধ করে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করল। বিমান বাহিনীর কৃতিত্বই সর্বোজ্জল। শৌর্য-বীর্য ও রণকৌশলে তারা নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

তারপর জাতিসঙ্ঘ যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব দিলেন। দুই পক্ষই মেনে নিল। না নিয়ে উপায়ও ছিল না। ঢাকার রাস্তায় তখনও মিছিল চলছে—যুদ্ধ বিরতি চলবে না। কাশ্মীর আমাদের চাই-ই।

আবার আমাদের ডাক পড়ল লাটভবনে। মোনায়েম খাঁ বললেন. ঠিক এই মুহূর্তে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ প্রেসিডেন্টের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। আমার উপর নির্দেশ হয়েছে আপনাদের মতামত গ্রহণ করে তাঁকে জানায়ে দিতে। যুদ্ধ চলবে, না বিরতি হবে? অতি উৎসাহীরা আগের বারের মত এবারও খুব গরম ভাব দেখালেন। যুদ্ধ বন্ধ করা চলবে না। শত্রুর শেষ রাখতে নাই। ভাবটা এই যে, যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করেই ফেলেছি, হঠাৎ বন্ধ করে দিয়ে আমাদের বিজয়ের গৌরবটা মাটি করে দেবার ফন্দী এঁটেছে জাতিসঙ্ঘ।

আমরা বললাম, আমাদের নর্তন কুর্দন শুধু অহেতুকই নয়, ক্ষতিজনক। যুদ্ধ হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তারা জানে। এখানে নির্বিঘ্নে নিরাপদে বসে অনেক আস্ফালন করতে পারি। প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। আমাদের মতামত অবান্তর। পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ খোদ কর্তা ব্যক্তির সাথে বসে আলাপ করেছেন এবং সমস্ত ব্যাপারের গুরুত্ব পুরাপুরি জানবার সুযোগ পাচ্ছেন। সুতরাং আমাদের কোন কিছু বলা অর্থহীন। এটাও আয়ুব খাঁর উপর ছেড়ে দিন।

তিনি যা ভাল মনে করেন করুন। আমরা মোটামুটি জাতিসংঘের নির্দেশ অমান্য করার পক্ষপাতী নই।

আসল কথা দুই পক্ষই জেরবার হয়ে পড়েছিল। বেশীদিন যুদ্ধ চালাবার শক্তি কারুরই ছিল না। বিমান বাহিনীর একজন অফিসার বললেন, আমরা নিশ্চিত ধ্বংসের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলাম—ভেরি নিয়ার টু সার্টেন ডিজাষ্টার।

কয়দিন পর সোবিয়েৎ য়ুনিয়নের প্রধানমন্ত্রী কসিগিন আপোষ-নিষ্পত্তির প্রস্তাব করলেন। তিনি তাসখন্দে প্রেসিডেন্ট আয়ুব ও ভারতীয় প্রধান মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করলেন। বললেন, এ ব্যাপারে তাঁর সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালাবেন, একটা রক্ষা করার জন্য। উভয়েই রাজী হলেন।

তাসখন্দে যাবার আগে আয়ুব খাঁ ঢাকা এলেন। রাজনীতিকদের সাথে দুই দফা আলাপ করলেন। যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনা করলেন, তিনিই স্বীকার করলেন, যুদ্ধ দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, ভারতের শক্তি আমাদের শক্তির প্রায় চার পাঁচগুণ বেশী। তাদের সাথে যুদ্ধে জয়লাভ অসম্ভব।

প্রশ্ন করা হল, এটা কবে জানলেন? আপনি সৈনিক, যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী। আমরা এ বিষয়ে অজ্ঞ—কিন্তু আপনার ত আগেই জেনে পা ফেলা উচিত ছিল।

বললাম, জানি ত নিশ্চয়। কিন্তু ভারত যে অবস্থায় আক্রমণ করল, তাতে চুপ করে থাকা কি সম্ভব ছিল? প্রতি আক্রমণ করতেই হল।

কেউ কেউ বলে উঠল: কিন্তু রাজনীতিকরা এগার বারো বছর বসেই ছিল। যুদ্ধ লাগার অবস্থা সৃষ্টি হতে দেয় নাই। তার জন্য তাদের ধিক্কার দিয়েছেন। তারা আর যা-ই করুক, কাশ্মীরের জন্য গোটা পাকিস্তানকে বিপন্ন করার দুঃসাহস করে নাই।

আমাকে একটু বিরক্তির সুরে বললেন, এ সব আপনারা বুঝবেন না।

তা ত বুঝবই না। কিন্তু এ দিকে যে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলাম। আলোচনা থেমে গেল। চ'লে গেলেন তাসখন্দ। লোকলস্কর নিয়ে। সবাই বক্তৃতা ঝাড়ল। কাশ্মীর না নিয়ে দেশে ফিরবেন না।

কয়দিন আলোচনার পর প্রেসিডেণ্ট আয়ুব ও শাস্ত্রী একটি যুক্ত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করলেন। সিদ্ধান্ত হল, শান্তিপূর্ণ ভাবে উভয় পক্ষ নিজেদের ছোট বড় সমস্যার সমাধান করবে। আশ্চার্যের কথা, যা' নিয়ে যুদ্ধ, অর্থাৎ কাশ্মীর, তার নামগন্ধও এই ঘোষণাপত্রে উল্লেখ রইল না। এত কাণ্ড করে, এত ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে, সারা পাকিস্তানকে প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি ঠেলে দেওয়ার পর সিদ্ধান্ত হল, ওম্ শান্তি!

রাজনীতিকরাও তাই করেছিলেন। শান্তিপূর্ণ ভাবে যাবতীয় সমস্যা সমাধানের সিদ্ধান্তই তাঁরা নিয়েছিলেন। দুঃসাহসিক মনোবৃত্তির প্রশ্রয় তাঁরা কোনদিন দেন নাই। তাঁরা বৃথা ও ক্ষতিজনক আস্ফালনে বিশ্বাস করেন নাই।

এই ঘোষণার তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেল পাকিস্তানে। বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব-পাকিস্তানে আমরা কেউ কেউ সম্বর্ধনা জানায়ে ছিলাম। তার উদ্দেশ্য আয়ুব খাঁকে বা তাঁর কীর্তিকে সমর্থন করা নয়। অবস্থা শান্তভাব ধারণ করেছে এই জন্য। রেডিও পাকিস্তানের জনৈক প্রতিনিধি আমাকে জিজ্ঞাস করল, আমার মন্তব্য কি? বললাম, ভাল: যুদ্ধ থেমে গেল— ভবিষ্যতে হবে না, এটা আনন্দের কথা। দ্বিতীয়ত কাশ্মীর নিয়েই ত সব গোলমাল। তার উল্লেখ যখন এই ঘোষণায় নাই, তখন মনে হয় এ নিয়ে কোন বাকবিতণ্ডা হবে না। বলেও শান্তিপূর্ণ ভাবে। মাথা না থাকলে তার ব্যথাও থাকে না।

পশ্চিম পাকিস্তানে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অসংখ্য শহর বাজার গ্রাম ধ্বংস হয়েছে। বিদেশ থেকে আমদানী করা অতি মূল্যবান অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংস হয়ে গেছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর

সেরা সৈনিক নিহত হয়েছেন। পৃথিবীর কোন যুদ্ধে নানি এত অল্প সময়ে এত অফিসার নিহত হয় নাই। তাঁদের স্থান পূরণ করা সম্ভব হবে না।

তাই, পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত বিরূপ! এত ক্ষয়ক্ষতির পর আয়ুব খাঁ সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে অপমানজনক একটি ঘোষণায় স্বাক্ষর করলেন। দেশবাসীর আশা-আকাঙ্খার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। এই চুক্তি অপরাধ স্বীকৃতির শামিল বলে তারা মনে করে।

যে সব সৈনিক কর্মচারী শহীদ হয়েছেন তাঁদের বিধবা-স্ত্রীও পরিবারবর্গ এক মিছিল বার করল লাহোর শহরে! ধ্বনি তুলল, আমাদের স্বামী পুত্র ফেরৎ দাও। তাঁরা শাহাদত বরণ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন। অনর্থক আপনি তাঁদের মৃত্যুর পথে ঠেলে দিয়েছেন। আকারণে তাঁদের অমূল্য জীবন নষ্ট হয়ে গেছে। যদি দেশের স্বার্থরক্ষার জন্য হতো, তা হলে আপনি এমন চুক্তি কেন স্বাক্ষর করলেন? ইত্যাদি—

পশ্চিম পাকিস্তানের বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দ পরিস্থিতি আলোচনা করা জন্য ফেব্রুয়ারী মাসের পাঁচ-ছয় তারিখে নিখিল পাকিস্তান জাতীয় কনফারেন্স আহ্বান করলেন। এই উপলক্ষে চৌধুরী মহম্মদ আলি ও নবাবজাদা নসরুল্লাহ খা ঢাকা এসে সব দলের নেতাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে কনফারেন্সে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করলেন। বললেন, পরিস্থিতি অত্যন্ত সঙ্কটজনক। এই মুহূর্তে আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করা উচিত।

জামাত, নিজম ও কাউন্সিল লীগ যোগদানের সম্মতি ছিল। আওয়ামী লীগেরও দোমনাভাব। শেখ মুজিবের মতামতই দলের মত। প্রতিষ্ঠানের ভিন্ন অভিমত নাই। শেখ মুজিব কনফারেন্সে যোগদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন। এন-ডি-এফ সভা করে মত প্রকাশ করল যে কনফারেন্সের পক্ষে আমাদের নৈতিক

সমর্থন রয়েছে, তবে বর্তমান অবস্থায় কোন সদস্য এতে যোগদান করতে পারছেনা। শেখ মুজিব আমাকে টেলিফোনে বললেন, আপনারা ঠিকই করেছেন। আমরাও যাবনা।

পরদিন সংবাদপত্রে দেখি, শেখ মুজিব সদলবলে লাহোর যাচ্ছেন। প্রায় চৌদ্দ পনেরো জন এক দলে। ব্যাপার কি হঠাৎ মত পরিবর্তন! মতলবটা কি?

লাহোর কনফারেন্স শুরু হল গভীর উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে।

অধিবেশন চলাকালে শেখ মুজিব হঠাৎ একটি বোমা নিক্ষেপ করলেন—ছয় দফা। প্রস্তাব বা দাবীর আকারে একটা রচনা নকল করে সদস্যদের মধ্যে বিলি করা হল। কোন বক্তৃতা বা প্রস্তাব নাই, কোন উপলক্ষ নাই, শুধু কাগজ বিতরণ। পরে সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেল। জাতীয় কনফারেন্সে এই দাবী নিক্ষেপ করার কি অর্থ হতে পারে? কনফারেন্স ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে সম্মিলিত হয়েছে। এই দাবী যত গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন, এই সম্মেলন ও এই সময় তার উপযোগী নয়—সম্পূর্ণ অবান্তর।

তারপর দলবলসহ শেখ মুজিব ঢাকায় ফিরে এসে মহা-সমারোহে 'ছয় দফা' প্রচার করলেন সংবাদপত্রে। শেখ মুজিবের দাবী ও নিজস্ব প্রণীত বলে ছয়-দফার অভিযান শুরু হয়ে গেল।

ছয় দফার জন্মবৃত্তান্ত অনুরূপ: কিছুসংখ্যক চিন্তাশীল লোক দেশের অর্থনীতিক ও রাজনৈতিক দূরবস্থার কথা আলাপ আলোচনা করেন। আমাদের ইঙ্গিত ও উৎসাহ পেয়ে তারা একটা খসড়া দাবী প্রস্তুত করলেন। তারা রাজনীতিক নয় এবং কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্টও নয়। তারা 'সাতদফার' একটা খসড়া আমাদের দিলেন। উদ্দেশ্য, এটা স্মারকলিপি হিসাবে আয়ুব খাঁর হাতে দেওয়া, কিংবা জাতীয় পরিষদে প্রস্তাবাকারে পেশ করার ব্যবস্থা করা।

এই খসড়ার নকল বিরোধীদলীয় প্রত্যেক নেতাকেই দেওয়া হয়। শেখ মুজিবকেও দেওয়া হয়। খসড়া রচনার শেষ বা সপ্তম দফা আমরাও সমর্থন করি নাই। শেখ মুজিব সেই দফা কেটে দিয়ে ছয়দফা তারই প্রণীত বলে চালায়ে দিল। তারপর বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা ছয় দফার দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও অর্থনীতিক মর্ম ও তাৎপর্য লেখায়ে প্রকাশ করা হয়। ইংরাজী ও বাংলায় মুদ্রিত হয়ে পুস্তকাকারে প্রচারিত হয় সারা দেশব্যাপী।

লাহোর কনফারেন্স বানচাল হয়ে গেল। নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবকেই এর জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী করেন। তাঁরা অভিযোগ করেন, শেখ মুজিব সরকার পক্ষ থেকে প্ররোচিত হয়ে এই কর্ম করেছেন। লাহোরে পৌছার সাথে সাথে আয়ুব খাঁর একান্ত বশংবদ এক কর্মচারী শেখ মুজিবের সাথে সাক্ষাৎ করে কি মন্ত্র তার কানে ঢেলে দেয়, যার ফলেই শেখ মুজিব সব উলটপালট করে দেয়। তারা এও বলে যে আওয়ামী লীগের বিরাট বাহিনীর লাহোর যাতায়াতের ব্যয় সরকারের নির্দেশে কোন একটি সংশ্লিষ্ট সংস্থা বহন করে। আল্লাহু আলীমুল গায়েব।

পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ অভিযোগের সমর্থনে বলেন যে, জাতীয় কনফারেন্সের ব্যাপারে সরকার অত্যন্ত শঙ্কিত ও নার্ভাস হয়ে পড়ে। পশ্চিম পাকিস্তানের আবহাওয়া ও পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর। পরিস্থিতি যে কোন সময়ে চরম আকার ধারণ করতে পারে। সরকার স্বভাবতই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে। কনফারেন্স বানচাল করার জন্য তারা যে কোন পন্থা অবলম্বনে কুণ্ঠা বোধ করবে না।

লাহোর কনফারেন্সের নিষ্ফলতা পাকিস্তানের রাজনীতির ইতিহাসে একটা কলঙ্কময় অধ্যায়। সে দিনের পরিস্থিতি এমনি উত্তেজনাপূর্ণ ছিল যে কনফারেন্স সাফল্যের সাথে সম্পাদিত হলে দেশময় যে বিরাট বৈপ্লবিক আন্দোলন শুরু হয়ে যেত, তার মুখে

সরকারের টিকে থাকা দায় হত। নেতৃত্বের কোন্দলে সরকারই একমাত্র লাভবান। সরকার আরও স্থিতিশীলতা লাভ করল। বিরোধী দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও দুর্বলতার সন্ধান তারা আগেই পেয়েছিল, এবার চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়ে গেল। বিরোধী দলগুলিকে আরও খণ্ড-বিখণ্ড করা সম্ভব, এটা তারা বুঝতে পারল এবং সেই কাজে লেগে গেল।

যুদ্ধের পর আয়ুব খাঁ লাহোরে কোন জনসভা করতে সাহস করেন নাই। যুদ্ধের গ্লানি, অপরিসীম ধ্বংস ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিশ্চয়ই তাঁকে অভিভূত করার কথা। এই গ্লানি ও কলঙ্ক মুছে ফেলার জন্য তিনি নানা কলাকৌশল আবিষ্কার করতে লাগলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সুবিধা করতে না পেরে রাজনীতি ক্ষেত্রে নামলেন। শত্রুর সাথে আপোষ নিষ্পত্তি সম্পন্ন করে দেশবাসীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করলেন।

প্রথম: ছয় দফা। এর বিরুদ্ধে বক্তৃতা করলেন। ছয় দফা পাকিস্তান ধ্বংসকামী। এর উদ্দেশ্য পূর্ব-পাকিস্তানকে পৃথক ও স্বাধীন করা। একটা উপকার হল—ছয়-দফা পাকিস্তানে, বিশেষ করে পূর্ব-পাকিস্তানে, জনপ্রিয় হয়ে উঠল। ঘরে ঘরে ছয় দফার কথা পৌঁছে গেল।

দুই নম্বর: পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ বা সিভিল ওয়ারের আশঙ্কা। কার সাথে, কোথায়, কবে, তা কিছু বললেন না। তিনিই বা কোথা থেকে এ গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্য আবিষ্কার করেছেন তাও জানা গেল না। আসলে এটা আবিষ্কার নয়,—সৃষ্টি, উদ্ভাবন। উদ্দেশ্য, ভয় দেখান। হুমকি। উত্তরে আমরাও বললাম, যদি গৃহযুদ্ধ বেধেই যায় তা হলে তার দায়িত্বও ষোল আনা আপনাকে নিতে হবে। অন্য কেউ এর বিন্দু বিসর্গও জানে না।

সম্বিৎ ফিরে পাবার পর এ বিষয়ে আর বেশী বাড়াবাড়ি করেন নাই। ভাবলেন, কথাটা বড় বেমৌকা হয়ে গেছে। গুলি ফস্‌কে গেছে।

তিন নম্বর : জাতীয় সংহতি—ন্যাশন্যাল ইনটেগ্রেশন। কোথায় অসংহতি? তবুও সংহতি সংহতি বলে চীৎকার উঠেছে কায়েমী স্বার্থবাদী মহলে। কোন স্থানে যৎকিঞ্চিত ফাটলের আশঙ্কা দেখা দিলেও যুদ্ধের সময় পরিপূর্ণ সংহতি বিরাজ করেছে। যুদ্ধের কারণ ও উদ্দেশ্য বুঝুক বা নাই বুঝুক, দেশ আক্রান্ত হয়েছে, এতেই একতাবদ্ধ হয়েছে—অখণ্ড সংহতি স্থাপন করেছে।

অথচ এই ধূয়া, যত লেখক, কবি, গায়ককে হঠাৎ উদ্বুদ্ধ প্রেরিত করে তুলল। তাঁরা ভাবলেন, সত্যিই বুঝি? অমনি গান, রচনা, প্রবন্ধ লিখে সংহতির পক্ষে ওকালতি শুরু করে দিলেন। এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, যাতে মনে হয়, সাংঘাতিক অসংহতি বিরাজ করছে এবং যার ফলে আসন্ন বিপদ—সুতরাং একে প্রতিরোধ করতেই হবে। সরকারী মহল ছাড়া বেসরকারী মহলও প্রবন্ধ রচনা করল। উপস্থিত লাভ—লেখার জন্য পয়সা। বিনা পয়সায় কেউ লিখবে না।

এমনি সব বিভ্রান্তকারী ধূয়া ও জুজুর ভয় মাঝে মাঝে প্রচার করা হচ্ছে। আসল সমস্যা সমাধান না করার এ সব বাহানা। এমন একটা গুরুতর পরিস্থিতির ছবি দেখাতে হবে দেশবাসীকে, যাতে তারা অন্যান্য জরুরী ও গুরুতর সমস্যার কথা সাময়িক ভাবে ভুলে যায়। এবং আসন্ন কাল্পনিক বিপদের আতঙ্কে মোহাচ্ছন্ন হয়ে যায়। এই সব বোমা নিক্ষেপ করার এই একমাত্র উদ্দেশ্য।

এ সব চাতুরী ও ছলনা অতি সহজেই ও অতি শীঘ্রই ধরা পড়ে যায়। আসলেও এ সব ক্ষণস্থায়ী। বিদ্যুতের স্পর্শে যে ধাক্কা লাগে তেমনি ধাক্কা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এ সব করা হয়। শকট্রিটমেণ্ট।

এই সব বিভ্রান্ত-প্রচারণা কিছুদিনের জন্য দেশের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। মানুষের ভেতর অনাস্থা, অবিশ্বাস সৃষ্টি করা হয়। ভবিষ্যৎ মঙ্গল সম্বন্ধে সকলেই সন্দিহান হয়ে পড়ে।

বিশ্বাসের গোড়া একবার নড়ে উঠলে, আর তাকে শক্ত করা যায় না।

ছয়ই সেপ্টেম্বর—যেদিন ভারত পাকিস্তানকে আক্রমণ করে, তাকে অবিস্মরণীয় করে রাখার জন্য এ দিনকে সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

আরও একটি ব্যাপার প্রায়ই স্থায়ী ও প্রাতঃস্মরণীয় করা হয়েছে। সেটা হচ্ছে দেশরক্ষা আইন। যুদ্ধের সময় জরুরী অবস্থা আগত হয়। তখন জরুরী আইনও প্রবর্তন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু যুদ্ধের পর সে আইন জারী রাখার কোন যুক্তি থাকে না। দু'বছরের বেশী সময় কেটে গেল, যুদ্ধ শেষ হয়ে জরুরী অবস্থার অবসান হয়েছে, কিন্তু জরুরী আইনের অবসান ঘটে নাই।

কারণ, দেশের ভেতরে শত্রু বিরাজ করছে—দেশবাসী। তাদের উস্কায় বিরোধীদল। বিরোধীদলকে জব্দ করার জন্য জননিরাপত্তা আইন মার্শাল ল' আমলের গোড়া থেকেই আছে। কিন্তু সেটা পাকে প্রকারে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আদালতের হাতে পড়ে ওটা প্রায় ঢোঁড়া সাপে পরিণত হয়েছে। কাজেই যুদ্ধকালীন জরুরী আইন এস্তেমাল করে এদের জব্দ করতে হবে। তার জন্যই এখনও আইন বলবৎ রাখা হয়েছে। কোন লোককেই আর অন্য আইনে গ্রেফতার করার প্রয়োজন হয় না। গোলমাল লাগলেই,—ডি, পি, আর—ডিফেন্স অব পাকিস্তান রুলস।

আর একটা সুযোগের সৃষ্টি করা হয়েছে সরকারী দলের লোকদের জন্য। জরুরী আইনের বলে ভারতীয়দের সম্পত্তি দালান-কোঠা, কলকারখানা জাহাজ প্রভৃতি শত্রু-সম্পত্তি বলে ঘোষিত হয়েছে। এই সম্পত্তির কিছু কিছু স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের হাতে পরিচালনার জন্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অনেক সম্পত্তি সরকারী দলের সদস্যদের কাছে ইজারা দেওয়া হয়েছে। জরুরী আইন উঠে গেলে

এ সব সম্পত্তির ভোগদখল ও লভ্যাংশ ছেড়ে দিতে হবে। সুতরাং আইন বলবৎ রাখতেই হবে।

একচল্লিশ

বর্তমান সরকার ও তার সমর্থকবৃন্দ ঐক্যভাবে ঢাক ঢোল পিটায়ে প্রচার করছে যে, এই আমলে দেশে উন্নয়নের প্লাবন বয়ে গেছে। দেশ উন্নতির প্রায় উচ্চ শিখরে গিয়ে পৌঁচেছে। মার্শাল ল' প্রবর্তনের সাথে সাথেই এবং উন্নয়নমূলক কাজে হাত দেয়ার আগে থেকেই এই ঢোলের আওয়াজ উঠেছে, আর দিন দিন তার স্বর তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। এই প্রচারের অন্য দিক হচ্ছে, রাজনীতিকদের বিফলতা ও অকর্মণ্যতার কাহিনী প্রচাব। তারা দলীয় কোন্দল, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আর দূর্নীতিতে এত ঘনিষ্টভাবে লিপ্ত ছিল যে দেশের মঙ্গলের কথা চিন্তা করার অবসর তাদের ছিল না।

রেডিও, টেলিভিশন আর সংবাদপত্র—এই হচ্ছে প্রচারের বাহন। সবই বশংবদ। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নাই বললেই চলে। প্রায় সবগুলি সরকাবের করায়ত্ত—প্রেস ট্রাষ্ট নামক সংস্থার মারফত। সংবাদপত্র স্বভাবতই রাজনীতিকদের নিন্দাবাদ করে বিজাতীয় রসাস্বাদ লাভ করে। বর্তমান আমলে এটা প্রায় সংস্কারের পরিণত হয়েছে। বার্টিন মার্শালের মতে দেশের পত্র-পত্রিকার প্রধান খোরাক হচ্ছে, 'ডাণ্ডাবাজ' 'লৌহমানব' 'স্বৈরাচারী' কিংবা সমর-নেতাদের দুঃসাহসিক কীর্তিকলাপের কাহিনী। রাজনীতিক বা গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে কোন তথ্য সরবরাহ করলে তারা সে সব লুফে নেয় এবং রং চড়ায়ে প্রচার করে।

অতিরঞ্জিত ও অপরিমিত প্রচারে মানুষ অভিভূত হয়। বিশ্বাস-প্রবণ মানুষের ত কথাই নাই। যে কোন গল্প কাহিনী যতই

আজগুবী হোক না কেন প্রথম চোটেই তারা বিশ্বাস করে ফেলে। খবরের কাগজে উঠলে ত অকাট্য ও প্রমাণের উর্দ্ধে।

মার্শাল ল' প্রবর্তনের দু' মাস পরেই এক উকিল খুব জোর দিয়ে বলছিল, এই সরকার অনেক কিছু করেছে। মনে হয় যেন এ সব তারই নিজস্ব কৃতিত্ব। একটা আত্ম-গরিমার ভাব। জিজ্ঞাস করা হল, কি করেছে? মাথা নেড়ে বলল, অনেক কিছু। আবার জিজ্ঞাস করা হল, একটা দৃষ্টান্ত অন্ততঃ দাও। একই উত্তর, অনেক—অনেক। অর্থাৎ কি করেছে তা' জানে না।

প্রচারের এ-ই মহিমা।

আয়ুব খাঁ নিজেও তাই মনে করেন। তার সাথে এক সাক্ষাৎকারের সময় খুব বাগাড়ম্বর করে বলেছিলেন, এ' করেছি, তা' করেছি। বললাম, নতুন ত কিছুই করেন নাই। সবই রাজনীতিকদের আমলের। কোনোটার পরিকল্পনা তৈয়ার করা হয়েছিল, কোনোটা আরম্ভ করা হয়েছিল। অনেকগুলি প্রায় শেষই হয়ে গিয়েছিল। আপনারা মাত্র একটা কাজ নতুন করেছেন; কোটি কোটি টাকা দিয়েছেন মৌলিক গণতন্ত্রীদের, ওয়ার্কস প্রোগ্রামের নামে। এটা আমরা করি নাই। করতামও না। আর কিছু দালান-কোঠা তৈয়ার করেছেন, বাইরের ঠাঁট বজায় রাখার জন্য। বিদেশীদের প্রশংসা লাভ, আর দেশী লোকদের চোখে ধাঁধা সৃষ্টি করার জন্য। এই উদ্দেশ্য সফল হয়েছেও। কিন্তু ভেতরটা ফাঁপা।

খুব চটেছিলেন এই কথা শুনে। অনেকের কাছে বলেছেন, লোকটা বড় একগুঁয়ে। আমরা কিছু করেছি এটা বিশ্বাস করতেই চায় না।

পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের অনুকরণে বড় বড় অট্টালিকা, প্রাসাদ নির্মানই অগ্রগতির লক্ষণ বলে প্রচার করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষ মনেও করে তাই। গ্রামাঞ্চলে কম্যুনিটি সেণ্টার। সী.ড:ষ্টার,

কাউন্সিল অফিস তৈয়ার করা হচ্ছে—পাকা দালান। সেণ্টারে লোক নাই, বীজাগারে বীজ নাই, তবুও ত দালান আছে। গ্রামের লোক গর্ব করে বলে আমাদের গ্রামে কয়টা পাকা দালান আছে।

ওয়ার্কস প্রোগ্রামের টাকাই মৌলিক গণতন্ত্রীদের তাজা রেখেছে। কাজ হচ্ছে মাটি কাটা। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে মাঠের উপর দিয়ে মাটি ফেলে রাস্তা তৈয়ার করা। পচাত্তর কোটি ব্যয় হয়েছে এ পর্যন্ত। টাকাটা স্রেফ ঘুষ। গণতন্ত্রীদের হাতে রাখার কৌশল। যা' খরচ করে তার হিসাব দিতে হয় না। শুধু ইলেক-শনের সময় হুমকি দেওয়া হয়, ঠিক মত ভোট না দিলে হিসাব দিতে হবে। হিসাব দেওয়ার চেয়ে ভোট দেওয়া অনেক সহজ। এই কাজে কোন পরিকল্পনা নাই, বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নাই—একধারসে মাটি ফেলে দিয়ে টাকাগুলি হজম করা। মাটিও কিছু দিন পর হজম হয়ে যায়। এক বর্ষার প্লাবনে সব ধুয়ে একাকার। লাভের মধ্যে গণতন্ত্রীদের অবস্থার দ্রুত ও কল্পনাতীত পরিবর্তন। বিপ্লবের মত। সরকার তার ওয়াদা পুরণ করেছে। বলেছিল, তোমাদের মজবুত বানাব। বানায়েছেও।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় দেশের উন্নয়ন মাত্রা ছিল অত নিম্নপর্যায়ের। দেশে কোন উন্নয়ন সংস্থা বা পরিকল্পনা ছিল না। রাজনৈতিক সরকারই সবকিছুর ভিত্তি-পত্তন করে। দালান-কোঠা অফিস-আদালত কর্মচারীদের বাসস্থান নির্মান থেকে শুরু করে শিল্পপ্রতিষ্ঠান, কলকারখানা ও অন্যান্য অর্থ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে। দেশের সার্বিক কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব রাজনৈতিক সরকারই গ্রহণ করে।

অর্থ উৎপাদনকারী সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথেই ফলপ্রসূ হয় না। বৃহৎ পরিকল্পনা পরিপূর্ণ ও কার্যকরী হতে অনেক সময় লাগে—এ সব প্রায়ই দীর্ঘ মেয়াদী। নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে ও প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করে দেশের বিভিন্ন

উন্নয়ন সংস্থা ও পরিকল্পনার ভিত্তি রাজনীতিকরাই স্থাপন করেছে। দশ পনর বছর আগে যে কাজ শুরু করা হয়েছে, তা এই আমলে ফলপ্রসূ হয়েছে।

আজকের দিনের মত অর্থ সমাগমের পথ এত সহজ ছিলনা। বিদেশী সাহায্যের পরিমাণ অত্যন্ত নগণ্য ছিল। সামান্য টাকা ঋণ গ্রহণ করে, তাও দেশী ঋণ—বাজেটের ঘাটতি পূরণ করা হয়েছে। এই পরিবেশেই দেশের কাজ অগ্রগতি লাভ করেছে। আজ সরকারের বিদেশী ঋণ বর্তমানে সাড়ে পনের শ' কোটিতে ঠেকেছে। যার বাৎসরিক সুদ দিতে হয় প্রায় ষাট কোটি।

রাজনৈতিক আমলের প্রতিষ্ঠিত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থার ফল বর্তমান সরকার ভোগ করেছে এবং কৃতিত্ব দাবী করে বাহাবা নিচ্ছে। বর্তমান শাসনামলে অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠানও গঠিত হয় নাই—বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে।

চাটগাঁ বন্দর সম্প্রসারণ, চালনা উপ-বন্দর, কাপ্তাই বাঁধ ও বিদ্যুৎ পরিকল্পনা, গঙ্গা-কপোতাক্ষ বাঁধ, কর্ণফুলি কাগজের মিল, খুলনা জাহাজ-নির্মানের কারখানা, খুলনা নিউজ প্রিন্ট কারখানা, ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা, পি, আই, ডি, সি, ওয়াপদা, আই-ডব্লিও-টি এ, জুট বোর্ড, জুট মার্কেটিং করপোরেশন, আদমজী জুট মিল, খুলনা জুট মিল, ইনডাষ্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স করপোরেশন, হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশন, ষ্টেট ব্যাঙ্ক, ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, কৃষি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, কৃষি ফাইনান্স করপোরেশন, পিকিক, অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন, করাচী পেশাওয়ার ও রাজশাহী বিশ্ব-বিদ্যালয়, বিভিন্ন স্থানে মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরী শিক্ষাকেন্দ্র, করাচী বন্দর, ওয়ারসাক হাইড্রোইলেকৃট্রিক, মুলতান থারমাল ষ্টেশন, কোট্রী, তাউনসা ও গুদ্দু ব্যারাজ, দাউদখেল ও মুলতানে সার কারখানা, সুই গ্যাস উৎপাদন, থল উন্নয়ন পরিকল্পনা, ওয়াহ্ অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরী, ঢাকা-আরিচা রোড, নগরবাড়ী-রাজশাহী

রোড, যশোর-খুলনা রোড, ঢাকা-চটগ্রাম রোড, দিনাজপুর-তেতুলিয়া রোড, এই সব রাজনৈতিক সরকারের আমলেই স্থাপিত হয়েছে।

এই সব প্রতিষ্ঠানই পাকিস্তানের উন্নতি অগ্রগতি মূল ভিত্তি এবং অর্থনীতিক কাঠামোর বুনিয়াদ। এই হচ্ছে পাকিস্তানের সার্বিক কল্যাণের মূল কথা। পূর্ববর্তী সরকারের সৃষ্ট পরিকল্পনার শেষাংশের কৃতিত্ব দাবী করা সত্যের অপলাপ।

এই প্রসঙ্গে অর্থনীতিক বৈষম্যের ইতিকথাও বলতে হয়। পাকিস্তানের সার্বিক উন্নতি ও অগ্রগতির যে ভিত্তি পত্তনের কথা উপরে বলা হল, পূর্ব-পাকিস্তান এই উন্নতি অগ্রগতির ফল সম্পূর্ণ ভোগ করতে পারে নাই। একেবারে গোড়া থেকেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্যের যে ভিত্তি পত্তন করা হয়েছে, দিন দিন সে বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়ে পেয়ে পর্বত প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায়েছে। দুই অংশের সমানাধিকার মৌখিক ক্ষীণ স্বীকৃতি লাভ করে থাকলেও এই অধিকার কোন কালেও স্থাপিত হয় নাই। এক অংশ আর এক অংশের উপর প্রভূত্ব ও প্রাধান্য বিস্তার করে এসেছে সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে।

তাই, পূর্ব-পাকিস্তানের অর্থনীতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত শোচনীয় পর্যায়ে নেমে এসেছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পনের বছরে পূর্ব-পাকিস্তানে রাজস্ব ঘাটতি হয়েছে প্রায় ষাট কোটি টাকা। পশ্চিম পাকিস্তানে উদ্বৃত্ত হয়েছে আটত্রিশ কোটি। কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতাসুলভ মনোভাব ও অর্থনীতিক পরিকল্পনাই এই বৈষম্য সৃষ্টি করেছে।

বর্তমান সরকার এই বৈষম্য দূর করতে ওয়াদাবদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিকদের বকাবকিও করা হয়। আমরা কি এর জন্য দায়ী? দেখা যায় আটান্ন-উনষাট সালে বৈষম্য ছিল শতকরা সাতাশ কি আটাশ ভাগ, বর্তমান সরকারের বৈষম্য দূরীকরণের চেষ্টার ফলে দিন দিন সেটা বৃদ্ধি পেয়ে উঠেছে শতকরা প্রায়

আশির কোঠায়! চেষ্টা অব্যাহত থাকলে বৈষম্য বৃদ্ধি ও তার পরিমাণ এমনি অব্যাহত থাকবে।

পূর্ব-পাকিস্তানের বিক্রয়-কর' উনপঞ্চাশ-পঞ্চাশ সালে কেন্দ্রীয় সরকার কেড়ে নেয়। এর জন্য চৌদ্দ-পনের বছরে প্রায় এক শ' চল্লিশ কোটি লোকসান হয়েছে এই অংশের। এর পর পূর্ব-পাকিস্তান কাঁচা পাটের উপর যে কর লাভ করত, কেন্দ্রীয় সরকার সেটা বন্ধ করে দেয়। বিক্রয় করের ক্ষতিপূরণ বাবদ পূর্ব-পাকিস্তানকে প্রায় চল্লিশ কোটি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কাঁচা পাটের কর বাবদ যে ত্রিশ কোটি ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করা হয় নাই।

দুই অংশের উন্নয়ন পরিকল্পনা সহায়তা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ঋণদান করে। এখানেও বৈষম্য। পূর্ব-পাকিস্তানে যা দেওয়া হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে দেওয়া হয়েছে তার দ্বিগুণ। পূর্বাংশে পনের বছরে উন্নয়ন খাতে খরচ করা হয়েছে প্রায় দুই শ' আটাত্তর কোটি—তার মধ্যে কেন্দ্রীয় ঋণ এক শ' একষট্টি কোটি। পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ চার শ' পঁয়তাল্লিশ, কেন্দ্রীয় ঋণ দুই শ' তিরানব্বই কোটি।

পূর্ব-পাকিস্তানে রাস্তাঘাট দালান-কোঠা অফিস-আদালত শিক্ষাকেন্দ্র হাসপাতাল সব গড়ে তুলতে হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানে সবই ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের এ অবস্থায় উচিত ছিল, অর্থনীতিক ব্যাপারে পূর্ব-পাকিস্তানের অগ্রাধিকার স্বীকার ও স্থাপন করা। তা দূরে থাক, পূর্ব-পাকিস্তানের নিজস্ব ও স্বাভাবিক আয়ের উৎসও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ঋণের টাকা দিয়ে পূর্ব-পাকিস্তানে রাজধানী ও আনুসঙ্গিক সবকিছু গড়ে তুলতে হয়েছে। প্রায় পঁয়ত্রিশ কোটি ব্যয় করে খাদ্যশস্য আমাদানী করতে হয়েছে। মোট কথা, ঋণের টাকা সৃজনশীল উন্নয়ন খাতে ব্যয় করা সম্ভব হয় নাই। পশ্চিম

পাকিস্তান গোটা ঋণের টাকাটাই উৎপাদনশীল উন্নয়ন খাতে ব্যয় করে রাজস্বের অংক বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় করের অংশ বাষট্টি সাল পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তানে এক শ' তেতাল্লিশ কোটি আর পশ্চিম পাকিস্তানে দিয়েছে এক শ' আটষট্টি কোটি। পাট রফতানী করের শতকরা সাড়ে বাষট্টি ভাগ পূর্ব-পাকিস্তানকে দেওয়ার আইন বৃটিশ আমল থেকেই প্রচলিত ছিল। এ ছাড়া ইনকাম ট্যাক্স, কেন্দ্রীয় আবকারী ট্যাক্স বিক্রয় কর ইত্যাদির অংশও দুই খণ্ডে দেওয়ার রীতি ছিল। হিসাব করে দেখা গেছে, পাটের বাবদ টাকা বাদ দিলে পূর্ব-পাকিস্তানকে শতকরা চৌত্রিশ ভাগ আর পশ্চিম পাকিস্তানকে ছয়ষট্টি ভাগ কেন্দ্রীয় ট্যাক্সের টাকা দেওয়া হয়েছে।

পূর্ব-পাকিস্তান গোড়া থেকেই কেন্দ্রীয় রাজস্ব খাতে অধিকাংশ দান করেছে। বড় বড় ব্যবসায়, মিল, কারখানার মুনাফা আদায় হয়েছে এখানে, কিন্তু তাদের হেড অফিস করাচী লাহোর থাকার দরুণ ইনকাম ট্যাক্স ধরা হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের হিসাবে।

কিছুদিন আগে অর্থবণ্টনের ব্যাপারে সরকার একটি নতুন নির্দেশ দিয়েছে। তাতে বিক্রয় করের ত্রিশ ভাগ এবং পাট ও তুলার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ প্রদেশকে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রদেশের ঋণের অর্ধেক মওকুফ করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশের ফলে পূর্ব-পাকিস্তান এক শ' পঞ্চাশ কোটির অর্ধেক পচাত্তর কোটি মাফ পেতে পারে। আর পশ্চিম পাকিস্তান দুই শ' আশি কোটির অর্ধেক এক শ' চল্লিশ কোটি মাফ পাবে। আগেই বলা হয়েছে ঋণের টাকা দিয়ে পূর্ব-পাকিস্তান বিশেষ কোন উৎপাদনশীল পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে নাই। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান সব টাকাই সৃজনশীল সংস্থায় প্রয়োগ করতে পেরেছে। তাদের অর্ধেক ঋণ মওকুফ করার প্রশ্নই উঠে না।

ন্যায় বিচারে পূর্ব-পাকিস্তানের গোটা ঋণটাই মওকুফ করে দেওয়া উচিত ছিল।

পাটের অর্ধেক টাকা পূর্ব-পাকিস্তানকে দেওয়া বড়ই চমকপ্রদ। তূলার সাথে এর তুলনা চলেনা। পাটের ব্যাপারে প্রাক্-পাকিস্তান যুগ থেকেই বিশেষ আইন প্রচলিত ছিল। তূলার ব্যাপারে এমন বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না।

অর্থনীতির মূল কথা হচ্ছে, দেশের রাজস্ব তুল্যাংশে সমস্ত এলাকায় বণ্টন করা: পাকিস্তানে এই মূলনীতির ব্যতিক্রম করা হয়েছে। বাষট্টি সাল নাগাদ কেন্দ্রীয় রাজস্বখাতে আমদানী হয়েছে দুই হাজার ছাব্বিশ কোটি। এই টাকার মধ্যে এক হাজার কোটি দিয়েছে পূর্ব-পাকিস্তান। খরচের বেলায় পেয়েছে মাত্র পচাত্তর কোটি।

সরকারের ব্যয়ই জনগণের আয়। দু' হাজার কোটির মাত্র পচাত্তর কোটি পূর্বাংশে খরচ করা হলে অর্থনীতিক বিপর্যয় এখানে কি পরিমাণে হতে পারে তা' অনুমান করা কঠিন হবে না। অন্যান্য খাতেও—যেমন, দেশরক্ষা বিভাগে, পূর্ব-পাকিস্তানের ভাগ্যে পড়েছে মাত্র দুই ভাগ! সংখ্যালঘু অংশের স্বার্থে সংখ্যাগুরু এলাকাকে বঞ্চিত করে, পঙ্গু করে, বিকল করে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংহতি দৃঢ় করা হচ্ছে।

পূর্ব-পাকিস্তান আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যব্যাপারে রফতানী করেছে সাইত্রিশ কোটি, আমদানী করেছে পচাশি কোটি: ঠিক তার বিপরীত পশ্চিম পাকিস্তানে।

আধা-সরকারী সংস্থা সমূহের টাকার অংশ পূর্ব-পাকিস্তান পেয়েছে শতকরা বার থেকে পয়তাল্লিশ ভাগ আর পশ্চিম পাকিস্তান পেয়েছে পঞ্চান্ন থেকে আটাশি।

বাষট্টি সাল অবধি পূর্ব পাকিস্তান বিদেশী মুদ্রা অর্জন করেছে, তের-শ' কোটি খরচ করেছে সাত শ' নব্বই কোটি। পশ্চিম

পাকিস্তান অর্জন করেছে নয় শ' তেরানব্বই, আর ব্যয় করেছে আঠার শ' চুরাশি। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করেছে পশ্চিম পাকিস্তান। এর জন্য কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় নাই।

এই সব কারণে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিক উন্নয়নে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। রাজস্ব খাতে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। জনগণের অর্থনীতিক জীবন প্রবাহ রুদ্ধ হয়ে গেছে। বেকার সমস্যা মারাত্মক হয়ে পড়েছে। সর্বহারা নিঃস্ব কৃষককুল প্রায় এক শ' কোটি টাকা ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে জীবনমৃত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে।

পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য প্রাপ্য ধনসম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে রফতানী করে দেওয়াব ফলে পূর্ব-পাকিস্তান আজ শ্মশান। কবরস্থানে এমারত অট্টালিকা উত্তোলন করে শ্রীবৃদ্ধি করার নামই হচ্ছে উন্নয়ন।

বৃটিশ আমলেও পাক-ভারতের অর্থ সম্পদের এক বিরাট অংশ বিলাতে টেনে নিয়ে যাওয়া হত। যার ফলে এই দেশে বিরাট দৈন্য ও গভীর অসন্তোষের কালো ছায়া নেমে আসে এবং কালক্রমে ইতিহাসেব অমোঘ নিয়মে বৃটিশ এ দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়।

পাকিস্তানের দুই অংশের ভেতর এক অংশের টাকা নানা কৌশলে অন্য অংশে নেওয়ার ফলে, এবং এক অংশের প্রাপ্য থেকে তাকে বঞ্চিত করে যে অর্থনীতিক সঙ্কট সৃষ্টি করা হয়েছে, তার ফলে, দেশে বিষম বিক্ষোভ ও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। সংহতির ফাঁকা চীৎকারে সে বিক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া বন্ধ হবে কিনা কে জানে।

এই প্রসঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানের উপর আর এক দফা অবিচার ও জুলুমের বর্ণনা করাও উচিত। সেটা হচ্ছে পাটের ব্যাপার নিয়ে। পূর্ব পাকিস্তানের সোনালী-আঁশ, সব চেয়ে বেশী বিদেশী মুদ্রা

উপার্জন করে। কিন্তু নানা কৌশল ও ষড়যন্ত্রের ফলে এই উপার্জনে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হচ্ছে।

বাষট্টি-তেষট্টি সালে দুনিয়ার চাহিদা ছিল এক শ' আটাত্তর লক্ষ বেল। পাকিস্তানের রফতানী চৌষট্টি লক্ষ, ভারতের ছয়ষট্টি লক্ষ। সাতচল্লিস-আটচল্লিশ সালে, অর্থাৎ পাকিস্তান হওয়াব পর পরই, পাকিস্তানের রফতানী ছিল উনসত্তর, ভারতের মাত্র সতের। দুনিয়ার চাহিদা ছিল তখন আটাশি লক্ষ। বর্তমানে সেটা দ্বিগুণ হয়েছে, ভারতের রফতানী চারগুণ হয়েছে, আর আমাদের রফতানী স্থির হয়ে আছে। এক সময়ে অর্ধেকে নেমে এসেছিল। উৎপাদন দিন দিনই কমে যাচ্ছে—অর্থাৎ কমান হচ্ছে।

শতকরা সাত ভাগ ভূমিতে পাট আর আটাশি ভাগ ভূমিতে ধান উৎপাদন করা হয়। পাট নগদ টাকা অর্জন করে। কৃষকের অর্থনৈতিক জীবন স্বচ্ছল ও সুদৃঢ় করে। অথচ পাটের চাষ ক্রমে ক্রমে কমানের ফলে কৃষকের অবস্থারও দ্রুত অবনতি ঘটছে। বিদেশী ক্রেতারা মনে করে পাকিস্তান কম উৎপাদন ও রফতানী করে মূল্য বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে। একচেটিয়া ব্যবসায়ে সেটা সম্ভব, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পাকিস্তান বর্তমানে একচেটিয়া রফতানীকারক নয়। ভারত আমাদের এই ভুল নীতির সুযোগ নিচ্ছে। ওদিকে থাইল্যাণ্ড, চীন ও বর্ম্মাদেশেও পাটের উৎপাদন শুরু করা হয়েছে।

পাটের ব্যবসা ও বাণিজ্য নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলা হয়, দুনিয়ার আর কোন পণ্যদ্রব্য নিয়ে এমন হয় না। পাটের বদৌলতে হাজার হাজার ব্যবসায়ী লাল হয়ে গেছে, আর যারা পাট উৎপাদন করে তারা সাদা হয়ে গেছে। বিলাতের আজকের দিনের লাট-বেলাট পাটের টাকা দিয়েই বড় হয়েছে। পাটই পূর্ব-বাংলার অর্থনীতির মূলভিত্তি। অথচ এই পাটই পূর্ব-পাকিস্তানীর দারিদ্রের অন্যতম কারণ। অর্থনীতিক অস্থিরতা এরই জন্য।

এই পাটের টাকা দিয়েই পশ্চিম পাকিস্তানে অনেক বড়

বড় ব্যবসা গড়ে উঠেছে। এই ব্যবসার যারা কর্তৃত্ব করছে তারা সব পশ্চিম পাকিস্তানী। আগে ছিল বিলাতী সাহেব ও ভারতীয় মারোয়াড়ী। অর্থাৎ বাঙালী কখনও নয়।

পাট-ব্যবসায়ের সবচেয়ে অদ্ভুত ও দুর্জ্ঞেয় রহস্যপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে এই যে, কৃষক পাট উৎপাদন করে, সে ন্যায্য মূল্য পায়না। যতদিন তার হাতে পাট থাকে ততদিন মূল্য নির্দ্ধারিত হয়না এবং নিম্নস্তরে উঠা-নামা করে। কিন্তু যেই তার হাত ছাড়া হয়ে গেল, অমনি হুড় হুড় করে দাম আকাশের দিকে চড়তে লাগল। কৃষক অপেক্ষা করতে পারেনা। যে দাম পায় সে দামেই ছেড়ে দেয়। ব্যবসায়ীরা কৃষকদের এই দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। বিভিন্ন কমিশন পর্যালোচনা করে দেখেছে যে পাঁচসাত বছর আগে প্রতি মণ পাট উৎপাদনের খরচ ছিল উনিশ কুড়ি—বিক্রি করত আঠার বা আরও কম। বর্তমান সময়ে উৎপাদন খরচ প্রায় পচিশ ছাব্বিশ। দাম পায় কুড়ি বাইশ কিংবা তারও কম। এইভাবে কৃষক ধ্বংসের পথে যাচ্ছে।

পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীরা প্রায়ই একচেটিয়া। স্থানীয় যারা তারাও এদেরই হাতধরা। অথচ কয়েক বছর আগে এদেরই একজন ট্রেনে ভ্রমণের সময় এক গৃহস্থের বাড়ীর উঠানে খুব বড় খড়ের পালা দেখে চীৎকার করে উঠেছিল, হাউ ফাইন দি গোলডেন ফাইবার—কি সুন্দর সোনালী আঁশ। রং যখন সোনালী তখন পাট না হয়ে যায়না। তিনি এখন উচ্চস্তরের একজন পাটের মিল মালিক!

পাট চাষীর অনশনক্লিষ্ট কঙ্কালের স্তূপে দাঁড়ায়ে ব্যবসায়ীরা কোটি কোটি টাকা অর্জন করছে। আড়তদার, দালাল, ফড়িয়া, রফতানীকারক, মিল মালিক, সবাই মিলে পাটের রস তথা কৃষকের রক্ত, তথা পূর্ব-পাকিস্তানের মেরুদণ্ড চুষে খাচ্ছে।

পাট চাষীর জীবনের সমৃদ্ধির উপরই পূর্ব-পাকিস্তানের সমৃদ্ধি

নির্ভর করে। সরকার চেষ্টা করলে পাট চাষীদের রক্ষা করতে পারে। পাট ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প জাতীয়করণ ছাড়া এটা সম্ভব নয়। ঋণ করে বহু বাজে পরিকল্পনায় অজস্র অর্থব্যয় করা হয়। এই পরিকল্পনায় ব্যয় করলে সেটা সার্থক হবে।

কাজটি কঠিন সন্দেহ নাই। আমরা জাতীয়করণের অগ্রদূত হিসাবে সাতান্ন সালে জুট মার্কেটিং করপোরেশন স্থাপন করেছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল ত্রিবিধ: পাট চাষীদের উপযুক্ত মূল্য প্রদান ও পাটের মূল্যে স্থিতিশীলতা আনয়নের উদ্দেশ্যে এই সংস্থার ব্যবসায়ে যোগদান: প্রাদেশিক সরকারের সহায়তায় বাজারে নিশ্চয়তা বিধান ও অর্থ সাহায্য দ্বারা পাটচাষীদের সমবায় সমিতি গঠনে উৎসাহ প্রদান। কিন্তু স্বার্থান্বেষী চক্র এর বিরুদ্ধেও আন্দোলন শুরু করে। তাদের একচেটিয়া মুনাফা লুণ্ঠনে হস্তক্ষেপ করায় তারা স্বভাবতই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। মার্শাল ল'র আমলে তারা খানিকটা কৃতকার্য হয়েছিল। তাদেরই প্ররোচনায় সরকার করপোরেশনের কার্যক্রম অনেকাংশে খর্ব করে দিয়েছিল। অথচ, এই সংস্থা পাটচাষীদের দুর্দশা মোচন করতে সক্ষম এবং প্রয়োজন বোধে এই সংস্থা পাটকল স্থাপন করার অনুমতি পেলে চাষীদের সুযোগ সুবিধা ও অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

কিন্তু স্বার্থান্বেষীরা কৃষকের উন্নতি কামনা করে না। তাদের প্রতি এদের কোন দরদ বা সহানুভূতি থাকার কথাও নয়। এই সেদিনও এক রিপোর্টে তারা বলেছে যে, পাকিস্তানের মূলতঃ কাঁচা পাটই বিক্রি করা উচিত। যেটা উদ্বৃত্ত থাকবে সেটা দিয়ে হাজার পনের লুম চলতে পারে এমন ব্যবস্থাই চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত! এই হচ্ছে পুঁজিবাদী মিল মালিকদের মনোবৃত্তি।

পাটের ব্যাপারে গবেষণা করা দরকার। উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎকৃষ্টতর পাট উৎপাদনের জন্য বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত।

পাট ও পাটখড়ি অন্যান্য উপায়ে ব্যবহার করা চলে কিনা, সেটাও গবেষণা করা উচিত।

এসব পন্থা পরিত্যাগ করে এখন পশ্চিম-পাকিস্তানের পাটকল স্থাপনের উদ্যোগ করা হচ্ছে। সেখানে পাট উৎপাদন করারও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পাট সেখানে জন্মাবে কিনা সন্দেহের বিষয়; জন্মালেও ধরণ ও প্রকৃতি কি হবে তা' বলা শক্ত। তবুও চেষ্টা করা হচ্ছে। যতদিন উৎকৃষ্ট ও মিলে ব্যবহার উপযোগী পাট উৎপাদন করা সম্ভব না হয় ততদিন পূর্ব-পাকিস্তানের পাট চালান দিয়ে ওখানে মিল চালু রাখতে হবে। কাঁচা মালের জন্য পূর্ব-পাকিস্তান ত আছেই। এই পাট রফতানী করার জন্য পূর্ব-পাকিস্তান এক পয়সাও মুনাফা অর্জন করতে পারবে না। অথচ কম মূল্যে পাট ক্রয় করে, চট প্রস্তুত করে পশ্চিম-পাকিস্তান বিস্তর মুনাফা অর্জন করতে পারবে।

উচ্চপদস্থ একজন কর্মচারী একদা বলেছিল, পূর্ব-পাকিস্তান শিক্ষা ও পাটের বড়াই করে থাকে। দেখা যাক কতদিন টিকে। শিক্ষার বাহাদুরী শেষ করে দেওয়া হয়েছে, এখন পাটের বাহাদুরী শেষ করতে পারলেই ভদ্রলোকের ওয়াদা পূরণ হয়।

বিয়াল্লিশ

সরকারী অর্থনীতির অব্যবস্থা মানুষের জীবনে বিপর্যয় টেনে এনেছে। মানুষ ভেবেছিল, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দেশী সরকার তাদের দুঃখ দৈন্য মোচনের চেষ্টা করবে; রাজনৈতিক মুক্তির সাথে সাথে অর্থনীতিক মুক্তিও তারা লাভ করবে।

কিন্তু তা' হয় নাই। বৃটিশ আমলের মাথাভারী চাপ ত কমেই নাই, আরও বেড়ে চলেছে। এটা জনগণের দৈন্যের অন্যতম কারণ। পাকিস্তান হওয়ার পর আশা করা গিয়েছিল প্রশাসনিক

ব্যয়ের মাত্রা হ্রাস পাবে, এবং উদ্বৃত্ত অর্থ জনকল্যাণের জন্য ব্যয়িত হবে। কিন্তু বর্তমানে প্রশাসনিক ব্যয়ের মান ও পরিমাণ বেড়ে গিয়ে বৃটিশ আমলের মানের চেয়ে অনেক বেশী হয়ে গেছে।

বৃটিশ আমলে বিলাত থেকে আমদানী করা আই-সি-এস ও আই-পি এস দের প্রশাসনিক কার্যে নিয়োগ করা হত। তাদের চালচলন, আচার-ব্যবহার, বেশ-ভূষা—সবই ছিল রাজকীয়। রাজার জাত ত বটেই। কম টাকা ও কম সুখ সুবিধায় তারা এতদূর আসতে রাজী হবে কেন। তাই মোটা টাকা দিয়ে প্রলুব্ধ করতে হত। এই মোটা বেতনের মোটা অংশ চলে যেত বিলাতে।

এই চাকুরেদের উত্তরাধিকারী বলে দাবী করে বর্তমান আমলের তরুণ কর্মচারীরা যে সুখ সুবিধা উপভোগ করে থাকে বিলাতী কর্মচারীদেরও তা ঈর্ষার উদ্রেক করত। এতটা বিলাসিতা তারা কল্পনা করতে পারে নাই। বিনা ভাড়ায় সুসজ্জিত প্রাসাদ, বিনা খরচে মোটর গাড়ী ছাড়াও নানা রকমের সুযোগ স্বাচ্ছন্দ্য তারা উপভোগ করে। প্রায় কর্মচারীর নিজস্ব বাড়ী আছে। তার ভাড়া যা' পায় তা তার বেতনের দ্বিগুণ বা তিনগুণ। নিজে থাকে বেতনের শতকরা দশটাকা হারের বাড়ীতে, সরকারী হুকুম দখল করা বাড়ী বা ঐ রকমের প্রাসাদ। আধা সরকারী ও স্বায়ত্ত শাসিত সংস্থার কর্মচারীদের অবস্থা আরও চমকপ্রদ। তাদের ব্যয় বিলাসিতা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে।

অথচ দশ বছর আগে এ ব্যবস্থা ছিলনা। হঠাৎ এই আমলে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে তাদেরও অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে। স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার সংখ্যাও বৈপ্লবিক বেগে বেড়ে চলছে। কর্মচারীদের যা বেতন তার চেয়ে বেশী ভাড়ার বাড়ী তাদের জন্য নির্দিষ্ট। তাদের বিলাসিতা ও বেতন ভাতার কাহিনী বিদেশী পর্য্যটকদের ও বিশেষজ্ঞদের চোখে ধাঁধা লাগায়ে দেয়। বাড়ী গাড়ী নাই এমন সরকারী বা আধা সরকারী একটি কর্মচারীও নাই।

এক একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এক একটি ক্ষুদ্র সাম্রাজ্য বিশেষ। কর্মচারীর অন্ত নাই। পদেরও ঠাঁই-ঠিকানা নাই। কাজের চেয়ে অকাজ বেশী। কিন্তু টেবিল ডেস্ক ভরা অফিসার। বেতনের হারও অস্বাভাবিক চড়া। বিভাগীয় কমিশনার একদিন দুঃখ করে বলছিলেন, আমার এখানে একজন পার্সনাল অ্যাসিষ্টান্টের দরকার। অভিজ্ঞ এস-ডি-ও হলে ভাল। দু'একজনের কথা মনে হয়েছিল, কিন্তু হাজার বাবশ' টাকা বেতনে বিভিন্ন করপোরেশনে চলে গেলে। আমার এখানে ছয় সাত বা আট শ'।

নতুন পদও যে কত সৃষ্টি করা হয়েছে তার অন্ত নাই। বাজনৈতিক আমলে কমিশনাব পদ উঠায়ে দেওয়াব সিদ্ধান্ত প্রায়ই হয়ে গিযেছিল। এই আমলে অতিবিক্ত কমিশনার প্রত্যেক বিভাগে নিযুক্ত করা হয়েছে। ডি-আই-জির পদও উঠায়ে দেবার কথা হয়েছিল। এখন এই পদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়াছে। বিলোপ কবা দূবেব কথা!

তরুণ কর্মচারীদের বাব চৌদ্দ বছর চাকরীর পরই কমিশনার পদে নিযুক্ত কবা হচ্ছে। অর্থাৎ উন্নতির প্রায় শিখরে পৌছে যাচ্ছে। এর পব কাজ করার, কাজে উন্নতি করার আর কোন প্রেরণা তাদের থাকতে পারে না। অথচ চাকুবী করতে হবে আরও পনেরো কুড়ি বছর।

প্রশাসনিক ব্যয় বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে। পাকিস্তান হওয়ার সময় মন্ত্রী ও সাঙ্গপাঙ্গদের খরচ ছিল সাত লাখ। এখন হয়েছে সাড়ে এগার লাখ। দুইটি পরিষদ ভবনে বিভাগের পূর্বে, তিন শ' পচিশজন সদস্যের জন্য ব্যয় করা হত পনের লাখের উপর। বিভাগের পর তেপান্ন-চুয়ান্ন সাল পর্যন্ত এক শ' সত্তর জনের জন্য ব্যয় করা হয়েছে সাত লাখ। এখন এক শ' পঞ্চান্ন জনের জন্য ব্যয় করা হয় সোয়া পনের লাখ। সাতষট্টি সালে সদস্যদের বেতন সরাসরি দ্বিগুণ করা হয়েছে। যা পূর্বের চারগুণ। তার অর্থ আরও সাত আট লাখ বৃদ্ধি।

সরকারী ব্যয়ের পরিমাণের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি অর্থনীতিক দুর্গতির অন্যতম কারণ।

মাথাপিছু আমদানী এক শ' আটানব্বই থেকে বেড়ে দু'শ পচিশ হয়েছে—অর্থাৎ শতকরা তের ভাগ মাত্র বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষের জীবন ধারণের ন্যূনতম ব্যয় পাঁচ ছয়গুণ বেড়ে গেছে। সুতরাং তের ভাগ বৃদ্ধির কোন মূল্যই নাই।

খাদ্যশস্য উৎপাদন কমে গেছে। মার্শাল ল'র আগে প্রতি বছর গড়ে দুই লক্ষ দু'হাজার টন খাদ্যশস্য বিদেশ থেকে আমদানী করা হত। মার্শাল ল'র পর থেকে প্রতি বছর গড়ে সাত লাখ চার হাজার টন আমদানী করা হচ্ছে। সরকারী মহল থেকে ঘোষণা করা হয়, চাউল উৎপাদন চার দশমিক আট ভাগ বেড়েছে। জনসংখ্যা শতকরা দুই ভাগ বেড়ে থাকলেও তিন চারগুণ খাদ্যশস্য বিদেশ থেকে আমদানী করার অর্থ নিশ্চয়ই খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষণ নয়।

পয়ষট্টি সাল থেকে শুরু করে চাউলের দাম দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ছয়ষট্টি সালে পঞ্চাশ ষাট টাকায় পৌঁছে যায়। সাতষট্টি সালেও পঞ্চাশ ও তার উর্ধ্বে হয়। পাকিস্তান হওয়ার পর বা তার পূর্বেও কোন কালে চাউলের মূল্য এত বৃদ্ধি পায় নাই। এমন কি, তেতাল্লিশ সালে যে মন্বন্তর হয়েছিল তখনও চাউলের মূল্য এত বৃদ্ধি পায় নাই। দু' এক জায়গায় পঞ্চাশ ষাট টাকা হয়ে থাকলেও তা' অতি অল্প সময়ের জন্য হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে মূল্যবৃদ্ধি স্থায়ী এবং সরকারী মতে স্বাভাবিক।

চাউলের মূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যও অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণ মানুষ এবং নিম্ন-মধ্যবিত্তদের জীবন ধারণ দুরূহ হয়ে পড়েছে।

মোনায়েম খাঁ একদা বললেন, বাংলা দেশের প্রধান শস্য দুইটি—একটি পাট, অপরটি ধান। পাটের মূল্য বৃদ্ধি করার চেষ্টা

করা হয়েছে কিন্তু পারা যায় নাই। অগত্যা ধানের দামই বাড়ায়ে দেওয়া হয়েছে। এতে কৃষকদের খুব লাভ হবে।

ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে পূর্ব-পাকিস্তান অনগ্রসর। পুঁজির অভাব, পুঁজি ভীত ও লুক্কায়িত বলে পুঁজি গড়ে উঠার সুযোগ এ অঞ্চলবাসী পায় নাই। ব্যবসা বাণিজ্য চালু হলেই পুঁজি গঠন সম্ভব হয়। পূর্ব-পাকিস্তানে অবাঙ্গালীরা যারা, এখানে ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে, তারা অনেকেই ভারত, বর্মা ও পূর্ব-আফ্রিকা থেকে মূলধন সংগ্রহ করে এখানে এনে নিয়োগ করেছে। ইনকাম ট্যাক্স বিভাগ তাদের সম্বন্ধে কোন উচ্চ্যবাচ্য করে নাই। কিন্তু বাঙালী কিছু টাকা ব্যবসায়ে নিয়োগ করতে গেলেই তার বিরুদ্ধে ইনকাম ট্যাক্সের নোটিশ দেওয়া হয়। টাকার উৎস কি ও কোথায় তা প্রকাশ করতে হবে।

ব্যাঙ্কের সাহায্য ছাড়া পুঁজি গঠন ও নিয়োগ সম্ভব নয়। ব্যাঙ্কের হেড কোয়ার্টারস পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব-পাকিস্তানের পক্ষে ব্যাঙ্কের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সৌহার্দ্য স্থাপন করা সম্ভব হয় নাই। এ না হলে ব্যাঙ্ক থেকে অর্থ সাহায্য পাওয়া যায় না। তাই পূর্ব-পাকিস্তানে পুঁজি গঠন হয় নাই, ফলে ব্যবসা বাণিজ্যে তারা অগ্রসর হতে পারে নাই।

মূলধনের সুযোগ ছাড়াও ব্যবসা বাণিজ্যে পূর্ব-পাকিস্তানীরা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকেও বঞ্চিত রয়েছে। পারমিট, লাইসেন্স, বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহ করাও পূর্ব-পাকিস্তানীদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। বাঙালী কর্মচারীরাও এ বিষয়ে উপযুক্ত সাহায্য করার মত সাহস অর্জন করতে পারে নাই। হীনমন্যতা এর অন্যতম কারণ। পূর্ব-পাকিস্তানীকে এ সব দিলে যদি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনা হয়। বিলম্বে হলেও এই মনোভাবের কথঞ্চিৎ পরিবর্তন ইদানীং লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

ব্যাঙ্ক, ইনস্যুরেন্সের সমস্ত আমদানী পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যায়। এখানে যা' জমা দেওয়া হয়, তাও খরচ করার অধিকার কারুরই নাই। সমস্ত টাকাটাই ঐ অঞ্চলে ব্যবসায় নিয়োজিত হয়। এইভাবে তেলা মাথায় তেল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই সব কারণে শিল্প ও বাণিজ্য প্রায় সবই অবাঙালীদের হাতে। বাঙালী ছোট ছোট শিল্প স্থাপন করে প্রতিযোগিতায় বড় শিল্পপতিদের সাথে টিকে উঠতে পারে না। বড় মাছ যেমন সুযোগ পেলেই ছোট মাছকে উদরস্থ করে, বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানও তেমনি ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে কুক্ষিগত করার চেষ্টা করে।

ঢাকা ও চাটগাঁ শিল্প এলাকায় ঘুরে এলে দেখা যায় হাজার হাজার শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। প্রায় সবই অবাঙালীদের মালিকানা। বাঙালী যে কয়টা আছে তা' হাতের আঙ্গুলে গোণা যায়। সময় সময় তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে।

ঢাকা শহরে দোকান পাটের দিকে লক্ষ্য করলে বিদেশী আগন্তুক কিছুতেই বুঝতে পারবে না যে এটা বাংলা দেশেরই একটা শহর।

এক ভদ্রলোক সাতচল্লিশ সালে হাজার পঞ্চাশ টাকা নিয়ে চামড়ার ব্যবসা করার জন্য নারায়ণগঞ্জ এসে স্থান নিলেন। কিছু দিন পর চামড়া ছেড়ে দিয়ে পাটের ব্যবসা ধরলেন, এবং মাত্র সতের আঠার বছরে প্রায় পঁচিশ কোটি টাকার মালিক হয়ে পড়েছেন। কি পরিমাণ মুনাফা লুটেছেন তা অনুমান করা যায়।

একজন মেমন ভদ্রলোক চাটগার শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে একদিন বললেন যে, বছর পনের আগে হাজার দশেক কি হাজার পনের টাকা নিয়ে এরা শুরু করেছে এবং এই কয় বছরে প্রত্যেকেই প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ লাখ টাকার মালিক হয়ে পড়েছে।

মুনাফার কোন হার নিদ্ধারিত নাই। কাজেই সীমাহীন মুনাফা লুণ্ঠন করে অতি অল্প পুঁজিতে ও অল্প দিনের মধ্যে বিরাট শিল্পপতি হয়ে পড়েছে।

টি, বি, ডানিং তাঁর 'ট্রেড য়ুনিয়ন ও ধর্মঘট—দর্শন ও লক্ষ্য' পুস্তিকায় বলেছেন, প্রকৃতি যেমন শূন্যতা করে, পুঁজি ও তেমনি মুনাফাহীনতা বা অতি কম মুনাফা থেকে দূরে পালায়। যথেষ্ট মুনাফার ক্ষেত্রে পুঁজি ভারী সাহসী। পুঁজিপতিরা শতকরা দশে যে কোন স্থানে পুঁজি নিয়োগ সম্ভব করে ; শতকরা কুড়িতে তার অতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ পায় : শতকরা পঞ্চাশে রীতিমত উদ্ধত্য প্রকাশ পায় : শতকরা একশতে সমস্ত মানবিক নিয়ম পদদলিত করতে প্রস্তুত। আর শতকরা দু'শ বা তিন শ'য় এমন কোন অপরাধ নাই যা করতে সে কুণ্ঠিত, এমন ঝুঁকি নাই যা' নিতে সে প্রস্তুত হবে না—মালিকের ফাঁসি যাওয়ার আশঙ্কা সত্বেও।"

বর্তমান কালের পাকিস্তানী এবং ব্যবসায়ী শেষোক্ত দলের। শতকরা দু' তিন চার শ' ভাগ মুনাফা করবে না এমন শিল্প প্রতিষ্ঠান নাই। মুনাফা অর্জন করা নয়, মুনাফা লুণ্ঠনই তাদের লক্ষ্য।

এমনি করে পাকিস্তানে আজ একশটি পরিবারের হাতে দেশের সম্পদ সঞ্চিত হয়েছে। সরকারী কর্মচারীদের সহায়তা, বিদেশী মুদ্রা ও সাহায্যের বেশুমার বিতরণ কার্টেল ও মনোপলীর সুযোগ, এই সব মিলে অসংখ্য নর-নারীর রক্ত মুষ্টিমেয় লোক শোষণ করে তাদের হাড্ডিসার করে ফেলেছে। তারাই দেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে—সরকার নয়। বরং সরকারও নিয়ন্ত্রণ করে তারাই। এদের বিরুদ্ধে কে কথা বলবে। বলেও লাভ নাই।

শিল্পপতিরা মাঝে মাঝে উৎপন্ন পণ্যদ্রব্য সরবরাহ বন্ধ করে। উদ্দেশ্য মূল্য বৃদ্ধি করা। অল্প সরবরাহে মূল্যবৃদ্ধি এটা অর্থনীতির মূল নিয়ম। একবার পণ্যদ্রব্যের মূল্য বাজারে বৃদ্ধিলাভ করলে সেটা স্থায়ী হয়ে যায়—কমার প্রশ্ন আর উঠে না। সরবরাহ স্বাভাবিক অবস্থায় এলেও না।

তেতাল্লিশ

জঙ্গী আইন প্রবর্তনের পর থেকেই দেশে সব কিছু পরিবর্তন শুরু হয়েছে। জগতই পরিবর্তনশীল। পাকিস্তানের পরিবর্তন আমূল। একেবারে মূল থেকে—মৌলিক গণতন্ত্রের মত; কিংবা উদ্ভিদের মত মাটি ভেদ করে।

পরিবর্তন অভিনব—দ্বিমুখী। উর্ধ ও নিম্নগামী। উন্নতি অবনতি উভয়ই পবিবর্তন।

পাকিস্তানের পরিবর্তন বৈপ্লবিক। পবিবর্তন যা' কিছু হচ্ছে, বিপ্লবের কারণেই এবং তার পর থেকেই। এর আগে নয়। বিভাগের সময়ের 'ইনকেলাব জিন্দাবাদ' শ্লোগানও দু' ভাগ হয়েছে। ইনকেলাব রয়ে গেছে ওপারে, আর জিন্দাবাদ নিয়ে আছি আমরা এপারে। এখানে কিছু হলেই 'জিন্দাবাদ'—না হলেও জিন্দাবাদ।

আয়ুব খাঁ তাই 'জিন্দাবাদ' ছেড়ে ধরেছেন 'পাইন্দাবাদ'। দু'টি শব্দ ভিন্ন অর্থ-বোধক। কিন্তু বশংবদের কাছে এটা অলঙ্ঘনীয়। 'জিন্দাবাদের' ধাক্কা এড়ায়ে এখন 'পাইন্দাবাদের' পালা চলছে। অর্থাৎ নতুন করতে হবে।

অর্থাৎ পরিবর্তন।

দাবী করা হয় সরকারী মহল থেকে যে, রাজনৈতিক আমলে দেশে কোন পরিবর্তন হয় নাই। আগে যা ছিল পরেও তাই। অর্থাৎ অচলাবস্থা। পরিবর্তন যা' কিছু হয়েছে বা হচ্ছে, তা' এই আমলেই। কথা ঠিক।

কিন্তু এক জায়গায় এসে বিরোধ শুরু হয়েছে। সেটা হচ্ছে সরকার ও শাসন বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা। এখানে কিন্তু পরিবর্তন নাই। এখানে স্থিতিশীলতা—অপরিবর্তনীয় অবস্থা। অর্থাৎ

অবলাবস্থা। রাজনীতিকদের আমলে ঘনঘন পরিবর্তন হয়েছে বলে উন্নয়ন কার্য্য অগ্রগতি লাভ করতে পারে নাই, বলা হয়। এই অনুমান ও অভিযোগ অমূলক। দেশের উন্নতির ভিত্তিপত্তন করা হয়েছে রাজনৈতিক আমলে। বর্তমান আমল তারই ফল ভোগ করে বাহবা নিচ্ছে। এ কথার প্রমাণ আগেই দিয়েছি।

গণতান্ত্রিক দেশে চার বা পাঁচ বছরে সরকার পরিবর্তন করার বিধান রয়েছে। কোন বিশেষ সময়ে এর ব্যতিক্রমও হয়,—ও হয়েছে। সরকার পরিবর্তনের জন্য উন্নয়নকার্য ব্যাহত হয়েছে এমন ধুয়া কোন দিন কোন দেশে কেউ তোলে নাই। এক সরকারের আমলের উন্নয়ন-পরিকল্পনা পরবর্তী সরকারের অনুসরণ করার দায়িত্ব ও বিধান সমস্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বীকৃত। সরকার-পরম্পরাক্রমে এই অবিচ্ছিন্ন ধারা চলে আসার রীতিই প্রচলিত। দেশের উন্নতি অগ্রগতি ব্যাহত হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। স্থিতিশীলতা কল্যাণকর রাষ্ট্র-পরিবচালনার বিশেষ সর্ত বা অপরিহার্য অঙ্গ ও নয়।

কিন্তু স্বৈরাচারী বা এক-নায়ক সরকারের ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই সরকার পূর্ববর্তী সরকারের বিধি-ব্যবস্থা, কার্যক্রম সব ভেঙ্গে চূড়ে নতুন প্রথা প্রচলিত করে থাকে। করতে বাধ্য। রাজনৈতিক সরকার উৎখাত করার যুক্তি হিসাবেই তাদের কার্য্যক্রম ত্রুটিপূর্ণ, পরিকল্পনা অর্থহীন ইত্যাদি বলতে হয়। এই বলেই আগের সব বাতিল করতে হয়। তাদের মতে সরকার পরিবর্তন মানে জীবনাদর্শের পরিবর্তন। কাজেই উন্নয়ন-পরিকল্পনা ব্যাহত ও বাধাপ্রাপ্ত, এমন কি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতে বাধ্য। তাই তারা উন্নয়ন ও অগ্রগতির দোহাই দিয়ে সরকার চিরস্থায়ী করার চেষ্টা করে।

এক নায়কত্ব দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থা। এইটাই স্থিতিশীলতার লক্ষণ। স্থিতিশীল মানেই গতিহীন। বট পাঁকুড় তাল তমালের

মত যতদূর সম্ভব নীচের দিকে শিকড় নেমে গিয়ে স্থিতিশীলতা দৃঢ় করে। স্বৈরাচারীদের শিকড় নীচের দিকে যাওয়ার প্রয়োজন হয়না। মাটির উপরেই দৃঢ় স্তম্ভের সহায়তায় অনড় অটল হয়ে দাঁড়ায়ে থাকে। আবুল মনসুর এক নায়কত্বের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন, আয়ুব খাঁ চারটি শক্তিশালী খুঁটির উপব স্থিতিশীল হয়ে বসে আছেন। কিন্তু সেখান থেকে নামবার ব্যবস্থা নাই। সরতে হলে ধপ. করে পড়ে যাওয়া ছাড়া আব কোন উপায় নাই।

প্রশাসনিক ব্যবস্থার উর্ধ্বস্তরে গভর্ণব। জঙ্গী আইনের আমলে তিন বছরে তিনজন পাব হয়েছেন। স্থিতিশীল হতে পারেন নাই। তাবপর যিনি এসেছেন, তিনি টিকে আছেন পাঁচ বছব পবও। শিকড নীচে চলে গেছে। কাজেই স্থিতিশীল।

তিনিও তাঁর এলাকায অর্থাৎ প্রদেশে আয়ুব খাঁব অনুকবণে স্বৈরাচারী ব্যবস্থা কায়েম কবেছেন। তাঁর নীচেব কর্মচাবীবাও ধাপে ধাপে তাঁবই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এক একটি ক্ষুদে ডিক্টেটর হযে বসে আছেন। যা' খুশী বলেন, যা' ইচ্ছা করেন। শুধু একজনকে খুশী রাখতে পাবলেই সব কিছু কবা সম্ভব।

মোনায়েম খাঁ গভর্ণব হয়ে আসাব খবর পেয়ে একজন পুলিশ কর্মচারী জিজ্ঞাস কবলেন, ইনি কে? পরিচয় দিলাম, যতদূর জানি। বললাম, তোমাদের খুব সুবিধা হবে। কোথাও কোন দাঙ্গা হাঙ্গামা বেঁধে গেলে ইনি একাই লাঠি হাতে মাঠে নেমে যাবেন। পুলিশ বাহিনীর খরচা কমে যাবে। কিছুদিন পর নিজেই' নিজের পরিচয় ঘোষণা কবলেন। বললে, আমি নুরুল আমিনেব লাঠিয়াল ছিলাম। এই উক্তির বরাত দিয়ে এক বিবৃতিতে তাকে লাঠিয়াল গভর্ণর আখ্যায় ভূষিত করলাম। তিনি বেজার হলেন।

মোনায়েম খাঁ কীর্তিমান পুরুষ। কেমন করে সাতটাকা

মায়নার স্কুল মাষ্টারী শুরু করেন। তার পর কয়েকবার চেষ্টা করে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পেরে ঢাকা ছেড়ে কলকাতা চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল, ইত্যাদি খুব গর্বের সাথে তিনি বর্ণনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলেন যে, রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি জেলার বাইরে পরিচিত ছিলেন না। একবার নুরুল আমিন তাকে গণ-পরিষদের সদস্য করে দিয়েছিলেন। জেলা স্কুল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও নুরুল আমিন তাকে করেছিলেন।

সেই জন্যই নুরুল আমিনের উপর আক্রোশ বেশী। যথা তথা তাঁকে গালাগাল দেন। তাঁর আমলের সমস্ত দোষত্রুটির বিস্তারিত বর্ণনা করেন। তিনি স্বয়ং তার দলভুক্ত ছিলেন, এ কথাটা ভুলেই যান।

কয়েকটি বাঁধা ধুয়া তিনি মুখস্থ করে নিয়েছিলেন। সর্বদাই সেগুলি আওড়ান :

প্রথম হল : সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে কুৎসা—তাঁর মৃত্যুর পরই বেশী। সোহরাওয়ার্দী বৃহত্তর বাংলার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। যেন মস্ত বড় একটা অপরাধ। বলা হয় সেই উদ্দেশ্যেই। একবার বলেছিলাম, আপনি তৎকালে একজন সাধারণ ভলান্টিয়ার মাত্র ছিলেন। ঐ সময়ের ক্রীয়াকলাপ ও তার তাৎপর্য আপনার জানার কথা নয়। তৎকালের নেতৃবৃন্দ যারা জীবিত আছেন, তারা মর্ম জানেন। তাঁদের জিজ্ঞাস করে, তার পর এ বিষয়ে উচ্চবাচ্য করুন। কিন্তু তিনি কি কারও কথা শোনেন? কে যেন তার মাথায় ঢুকায়ে দিয়েছে যে ব্যাপারটা মস্ত বড় দোষনীয় ছিল—পাকিস্তনে বিরোধী। তাই তিনি আরামসে বলে বেড়ান। এর পর শেরে বাংলার বিরুদ্ধেও কোনদিন হয়ত বলে ফেলবেন, দেখুন, এই লোকটি লাহোর প্রস্তাব উথাপন করেছিলেন। দেশের কত বড় শত্রু !!

বৃহত্তর বাংলার পটভূমি ছিল এইরূপ : পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠা

যখন সম্ভাবনার স্তর ছাড়ায়ে বাস্তবের আকার ধারণ করতে শুরু করল, তখনই কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্ত করার আন্দোলন শুরু করল। কায়েদে আজম ও মুসলিম লীগ এর তীব্র বিরোধিতা করেন। বাংলা কংগ্রেসের শরৎ বোস, কিরণ শঙ্কর, ডক্টর পি, সি, ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের বিরোধিতা করেন।

কায়েদে আজমের নির্দেশে বাংলার প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী বাংলা বিভাগ প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে ও যুক্ত বাংলা রক্ষার জন্য উক্ত নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ আলোচনা শুরু করেন।

কেন্দ্রীয় পরিষদের মুসলিম লীগ পার্টির ডেপুটি লীডার খাজা নাজিমদ্দিন একটি বিবৃতিতে বলেন: আমার দৃঢ় অভিমত এই যে, মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে স্বাধীন সার্বভৌমিক বাংলা জনগণের জন্য অতি উত্তম ও কল্যাণকর ব্যবস্থা এবং অতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে বাংলা বিভাগ বাঙ্গালীর জন্য মারাত্মক।

সাতচল্লিশ সালের আটই এপ্রিল সংবাদপত্রে এক বিবৃতিদান প্রসঙ্গে সোহরাওয়ার্দী বলেন: আমি সর্বদাই এই মত পোষণ করি যে বাংলা কিছুতেই বিভক্ত হতে পারে না। আমি যুক্ত বৃহত্তর বাংলার পক্ষপাতী।

তিরিশে এপ্রিল কায়েদে আজম কংগ্রেসী আন্দোলনের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ ও দীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করেন। শরৎ বোস ও কিরণশঙ্কর রায় দিল্লীতে কায়েদে আজমের সাথে সাক্ষাৎ করেন, তখন কায়েদে আজম তাঁদের প্রচেষ্টা সমর্থন করেন ও তাঁদের আশীর্বাদ করেন।

আটাশে মে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়াকিং কমিটি তিনঘণ্টা ব্যাপী দীর্ঘ আলোচনার পর যুক্ত বাংলা পরিকল্পনার খসড়া অনুমোদন করেন এবং কায়েদে আজমের কাছে তাঁর বিবেচনার জন্য পাঠায়ে দেন।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী প্রমুখ হিন্দু মহাসভার নেতৃর্বৃন্দের তীব্র বিরোধিতার ফলে এবং বৃটিশ সরকারের চক্রান্তের ফলে এই পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়। প্যাটেল ও নেহরুও এর বিরোধিতা করেন।

এই হচ্ছে বৃহত্তর বাংলার ইতিকথা। ওয়াকিং কমিটি, কায়েদে আজম নাজিমুদ্দিন কেউ দোষী হলেন না। দোষী হলেন সোহরাওয়ার্দী—মোনায়েম খাঁর চোখে।

মোনায়েম খাঁর দুই নম্বর অভিযোগ: নূরুল আমিন ও আমি আমাদের আমলে কোটি কোটি টাকা কেন্দ্র থেকে সাহায্য এসেছে তা খরচ করতে না পেরে ফেরৎ পাঠায়ে দিয়েছি। কেন ফেরৎ দিতে বাধ্য হয়েছি, তার যথাযথ উত্তর আমরা দিয়েছি। বেহিসাব খরচ করলে কিংবা ওয়ার্কস প্রোগ্রামের নামে অপচয় করলে আমরাও সব টাকা খরচ করে দেখাতে পারতাম।

তিন নম্বর: বিরোধীদল গণতন্ত্র স্বায়ত্তশাসন ও বয়স্কদের ভোটাধিকার দাবী করে। তাদের আমলে প্রেসিডেন্ট তিন শ' দশ ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। বর্তমানে আশি হাজার ভোটারের ভোটে নির্বাচিত। উভয় প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা এক। শাসনতন্ত্রে একই রূপ বিধান।

চার নম্বর: বিরোধীদল ক্ষমতা দখলের দাবী করছে। কোথায় ক্ষমতা? ক্ষমতা ত একব্যক্তির হাতে। কেমন করে তাকে দখল করব। সেখানে যা ভিড়—ঢোকাই যায় না। আর এমন ক্ষমতা আমরা চাইও না। জনগণ আমাদের ক্ষমতা হাতে তুলে দিলেই আমরা নিতে পারি। অন্যথায় নয়।

মোট কথা, চাকুরী বজায় রাখার জন্য তিনি যে কোন কাজ করতে রাজী আছেন। সমস্ত ন্যায়নীতি জলাঞ্জলি দিয়ে তিনি যে সমস্ত কাজ করে থাকেন, কোন সভ্যদেশের উচ্চপদে সমাসীন ব্যক্তি তা দেখলে লজ্জায় মাথা হেঁট করবেন।

সময় সময় রাজনীতির গণ্ডী অতিক্রম করে গভর্ণর ব্যক্তিগত গালাগালি বা অপবাদের পর্যায়ে নেমে আসেন। অতি ক্ষুদ্র বিষয় নিয়েও বার বার আলোচনা করেন। প্রায়ই আমার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন। বলেন, তাঁর ছেলের দার্জিলিং কার্শিয়াং-এ লেখাপড়া করে। দশ বছর আগে মাত্র এক বছরের জন্য শিলং পাঠায়ে ছিলাম। তিনি বলেন দার্জিলিং কার্শিয়াং। হয়ত মনে করেন, শিলং ওদেরই কাছাকাছি।

নূরুল আমিনের পরই আমাব উপর আক্রোশ। আমার প্রধান মন্ত্রীত্বেব সময় তাঁর বিশেষ উপকার করেছিলাম বলেই বোধ হয় তিনি রাগান্বিত।

অর্থাৎ তিনি না পারেন এমন কর্ম নাই।

পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্ণর ছিলেন ও আছেন। তাঁরা এসব করেন না। তাঁরা মান-মর্যাদা সম্ভ্রম রেখে কাজ করেন। চাকুরীর পরওয়া তাঁরা কম করেন। কিন্তু, ইনি ত সর্বদাই শশব্যস্ত। কখন চাকুরী যায়।

সভা-সমিতিতে যে কোন বিষয়ে তাঁর একটা বক্তব্য থাকবেই। ঈদের খোতবা তিনি দিতে চান। তার প্রভু যখন খলিফা তখন তিনি শাগরেদ বা নায়েব-খলিফা। খোতবা দেওয়ার হকদার। ধর্ম, অধর্ম, অর্থনীতি, দর্শন সব বিষয়ে তিনি কিছু না কিছু বলতে চান—সে বিষয়ে কোন জ্ঞান থাক বা না থাক। সরকারের উচ্চতম পদে সমাসীন—মনে করেন এসব তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের শামিল।

ভাষাও অদ্ভুত ব্যবহার করেন। কথ্য ভাষার দোষ-ত্রুটি থাকবেই। কিন্তু তার মুখে এটা কুৎসিত শোনায়। এক সামরিক কর্মচারীকে সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলাম, গালাগালি দেন, তা কিন্তু বড় কুৎসিত (আগলি) ভাষায় ব্যবহার করেন। তিনি উত্তর দিলেন, মাত্র ঐ ভাষা ছাড়া আর কোন ভাষা ত তিনি জানেনই না।

আয়ুব খাঁ বলে থাকেন, প্রশাসনিক ব্যবস্থা উন্নতির দিকে যাচ্ছে।

কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। ক্ষমতা অনেক বেড়ে গেছে তারা ইচ্ছা মত কাজ করে। উন্নতির লক্ষণ ত বটেই।

প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার না থাকায় কর্মচাবীরা নিজ নিজ বিভাগের কর্তা। তারাই দেশ শাসন করে। মাঝে মাঝে গভর্ণর গালাগালি দেন কিংবা সামান্য অপমান করেন। সেটা ধর্তব্য নয়। এ সব ছোটখাট অপমানের শোধ নেয় কর্মচারীরা তাদের অধীনস্থদের উপর দিয়ে।

কর্মচারীদের ক্ষমতা অসীম—দুরাকাঙ্খাও অসীন। না হবার কারণ নাই। চোখেব উপর দেখতে পাচ্ছে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ নয় একেবারে বটগাছ হয়ে যাচ্ছে। সবাই প্রতীক্ষা করে. কোন দিন সিঁড়ি না ডিঙ্গায়ে এক লাফে উপরে উঠে যাবে। যে কোন কর্মচারীকে ধরে নিয়ে মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত, বিভিন্ন সংস্থার চেয়ারম্যান করা হচ্ছে।

জঙ্গী আইন প্রবর্তনের কয়েক মাস পর একজন বর্মচারী বলল, স্যার, দুই প্রদেশে দুইজন লেফ্টেনাণ্ট গভর্ণব নেওযা হবে। আমার নাম লিষ্টে আছে—দোয়া করবেন। বললাম, নিশ্চয় করব, ফি আমানিল্লাহ। এর পর নিশ্চয়ই গভর্ণর? আকাশের দিকে একবার চেয়ে মুখ নীচা করে বলল, আল্লাহ মালিক।

মালিক ত বটেনই!

কর্মচারীদের ডিক্টেটরী মেজাজ সম্বন্ধে এক গল্প বলেছিলেন চীফ জাষ্টিস কর্ণেলিয়াস। বললেন, সি-এস-পিরা ছোটখাট মোগল সম্রাট। এক জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রকাশ্য জনসভায় সামান্য কথার উপর এস-ডি-ও কে যা' তা' বকলেন। তিনি ইচ্ছা করলে আলাদা ডেকে নিয়ে দু'কথা বলতে পারতেন। সেইটাই রীতি। কিন্তু তা' তিনি করেন নাই। কেন, বলতে পাবেন? তিনি জনগণকে দেখাতে চান তার প্রতাপ। বোঝাতে চাইলেন যে যাকে তোমরা এত বড় মনে কর, আমি তাঁর চেয়েও বড়। দেখলেই ত স্বচক্ষে!

মন্ত্রীরা সাক্ষীগোপাল। তারা কর্মচারীদের ভয় করে চলে। একজন এম-পি-এ প্রাদেশিক পরিষদের বৈঠকে বলল, আগে জানতাম বিড়ালে ইঁদুর ধরে। ইঁদুর সর্বদাই ভয়ে অস্থির। কিন্তু সে দিন এক চাউলের গুদামে দেখলাম বিপরীত কাণ্ড। দুইটি মোটা ইঁদুর একটি কাহিল বিড়ালকে তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে গুদামের বাইরে।

মন্ত্রীরাও দুঃখ করে বলে, ভাই, আমরা ত কাগজের ঘোড়া কোন ক্ষমতা নাই। বললাম, তবুও ঘোড়া ত। গরু না হলেই রক্ষা।

মন্ত্রীদের অক্ষমতার সুযোগেই কর্মচারী ক্ষমতাশীল হয়ে উঠেছে। শাসনতন্ত্রের বিধানই তাই। সরকারী নিয়ম-কানুন ও সেইভাবে রচনা করা হয়েছে।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট—যাকে ডেপুটি কমিশনার বলা হয় ও মহকুমা হাকিম নিজ নিজ স্থানে এক একজন মহা পরাক্রমশালী। সরকার তাদেরই দায়ী করে সব কাজের।

উপর থেকে ক্ষমতা ন্যাস্ত হওয়ায়, আর অপরদিকে জনমতের চাপ বা ভয় বিন্দুমাত্রও না থাকায়, কর্মচারীরা ক্ষমতার যথেচ্ছা প্রয়োগ করে থাকে। তাদের কার্য্যকলাপ পরীক্ষা-নিরিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। সুতরাং তারা সম্পূর্ণ মুক্ত। অবাধে ক্ষমতা বিস্তার করতে পারে।

কর্মচারীদের ছবি সংবাদ-পত্রে প্রচারিত হওয়ার ব্যবস্থাও আছে। এস-ডি-ও, সার্কেল অফিসার যে কোন ক্রীয়া-কলাপে যোগদান করে, তার সচিত্র বিবরণ সংবাদ পত্রে মুদ্রিত হয়। এস-ডি-ও অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, তাঁর স্ত্রী পুরস্কার বিতরণ করেন। উভয়ের ছবি উঠে সংবাদ পত্রে। তাদের চাপ দেওয়া হয়। তারাও মনে করে, সরকারী কর্মচারীদের লীলাখেলার [illegible] তাদের প্রধান [illegible]। [illegible] নিয়েই [illegible] [illegible]।

প্রশাসনিক বিভাগে চরম অব্যবস্থা বিরাজ করছে। কর্ম-চারীরা ভাবে, বিরাট সুযোগ, এই ফাঁকে যা-কিছু করে নেওয়া যায়। অর্থ, বৈভব, মান-মর্যাদা বৃদ্ধির এই ত ব্রাহ্মমুহূর্ত। খুশীমত অফিসে যান ও আসেন। ফাইলে অর্ডারও দেন তেমনি ইচ্ছামত। ফলে, এক আদেশ দ্বিতীয় আদেশ দিয়ে খণ্ডিত হয়ে তৃতীয় আদেশে স্থিতিলাভ করে। হুকুমের পর পাল্টা হুকুম ত আছেই। নেপোলিয়ানের ভাষায়: অর্ডার—কাউন্টার অর্ডার—ডিস-অর্ডার; হুকুম, পাল্টা হুকুম, তারপরই বিশৃঙ্খলা। উপরস্থ কর্মচারীর হুকুম নীচের তলায় পড়ে থাকে—তামিল হয় না। কেউ দেখেও না। নতুন সি-এস-পিরা মহকুমার এস-ডি-ও হচ্ছে। কোন কাজই করতে হয় না: কাজ জানাও নাই। অন্যান্য ম্যাজিস্ট্রেট ত কাজ করার জন্য আছেন। কয়দিন পর এরা অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার অর্থাৎ এ-ডি-সি হয়। অতিরিক্ত মানে অপ্রয়োজনীয়। তাদেব অফিস এক একটা চা-খানা। তরুণ যুবক, শহরে ছাত্র-বন্ধু অনেক। তারা বসে আড্ডা জমায়—আর ট্রে-র পর ট্রে চা আসতে থাকে। উকিল মোক্তার ও অন্যান্য উমেদাররা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাইরে বসে আছে তীর্থের কাকের মত। বাইরে দারোয়ান, অন্দরে প্রবেশ নিষেধ।

সরকারী কর্মচারীদের মেজাজ ভয়ানক রুক্ষ। আমলটাই হচ্ছে গোয়ার্তুমি গুণ্ডামি, দুর্বৃত্তপনার যুগ। শালীনতা, সৌজন্য কোমলতা—এক কথায় কালচার দিন দিন উঠে যাচ্ছে। সবার মেজাজই মিলিটারী। শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের গল্পের নায়কের মত, রংটা নেটিভ কিন্তু মেজাজটা বৃটিশ।

চুয়াল্লিশ

বর্তমান আমলে দুই শ্রেণীর চাকুরে অধিকতর অনুগ্রহভাজন। প্রথম নম্বরে: সামরিক কর্মচারী, দ্বিতীয়: পুলিশ কর্মচারী। অন্যান্য শ্রেণীর কর্মচারীরা এটা বোঝে ও দুঃখ করে। চেষ্টা করেও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবার উপায় নাই। নিদানপক্ষে ওই দুই শ্রেণীর কর্মচারীদের আচার ব্যবহার অনুকরণ করার চেষ্টা করে। তাই জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য কর্মচারীদের চলাচলন অনেকটা পুলিশী ধরণের হয়ে যাচ্ছে। এই পরিবর্তন নগ্ন ও প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের অফিসারদের সম্বন্ধে বলা হত, তারা না ইণ্ডিয়ান, না সিভিল, না সারভেণ্ট। অর্থাৎ ভারতীয় সৌজন্য ব্যবহার শিষ্টতা তারা রক্ষা করে চলতে পারে নাই।

আমাদের অফিসারদের আলাদা একটা সমাজ বা শ্রেণী সৃষ্টি হতে চলেছে। দেশের আর সব মানুষ থেকে তারা আলাদা। এমন কি নিজ নিজ পরিবার ও আত্মীয়স্বজন থেকেও তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ হয়ে পড়ছে। এই প্রবণতা প্রতিরোধ করার উপায় নাই।

ঢাকার এক তরুণ এ-ডি-সির সাথে কয়েকজন ভদ্রলোক দেখা করতে গেলেন—তারই অনুমতি নিয়ে। তারাও সরকারী কর্মচারী—নিম্নস্তরের। তাদের বাড়ীঘর হুকুক দখলে নেওয়া হয়েছে। তারই ক্ষতিপুরণের হার নির্ধারণ করার জন্য তাদের দরখাস্ত পেশ করার জন্য এ-ডি-সির দফতরে উপস্থিত। একজন আগন্তুকের হাতে জ্বলন্ত সিগারেট ছিল—ফেলে দেবার অবকাশ পায় নাই। এ-ডি-সিও সিগারেট ফুকছে। কিন্তু আগন্তুকের হাতে সিগারেট দেখেই বলে, গেট আউট। ভদ্রলোক হতবাক ব্যাপারটা বুঝতে পারে নাই। আবার হুকুম হল, গেট আউট। অগত্যা

গেট-আউট হয়ে, সন্ধ্যার সময় আমার বাসায় এসে নালিশ করল। বলল, একটা মানহানি মোকদ্দমা করা যায় কিনা। বললাম পাগল নাকি! বেচারা তোমার মানই জানে না, হানি করবে কেমন করে? রাগ করোনা। মাফ করে দাও।

ঢাকার এক ডি-সি একদিন দুঃখ করে আমাকে বলছিলেন— নতুন এক সি-এস-পিকে আজিমপুর কলোনীতে ভাল বাসা দেওয়া হয়েছে। তবুও অনুযোগ করল, বাথরুম বড় ছোট—হাওয়ার ব্যবস্থা নাই। কার্পেটগুলি পুরাতন, সোফাও তাই। বিছানার গদি বড় শক্ত। রাগ হয়েছিল, মুখ দিয়ে এসে গিয়েছিল: ভায়া, বাথরুম কবে থেকে দেখছ? দেশে ত মাঠে-ময়দানে ডোবা-নালা-জঙ্গলেই ও-কর্ম করেছ? কার্পেট কোন কালে ব্যবহার করেছ? বাংলাদেশে কার্পেটের প্রয়োজনই কি? কিন্তু চেপে গেলাম। হাজার হোক, সহযোগী ত?

ঢাকার আর একজন এ ডি-সি। এক উকিলের সাথে যুক্তি-তর্কে পরাস্ত হয়ে তাঁকে গ্রেফতার করে হাজতে পাঠায়ে দেয়—বিনা বিচারে। ব্যাপারটা হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। হাইকোর্ট আদালত অবমাননার কারণ দর্শাবার নোটিশ জারী করেন। সেখানে বিনাশর্তে মাফ চেয়ে অব্যাহতি পান।

একজন এস-ডি-ও জীপে চড়ে সফরে যাচ্ছেন। নির্বাচন পরিদর্শন করার ওজুহাতে। ফেরি ঘাট পার হতে হয়। টোল-কর্মচারী দাবী করে, হয় পয়সা দিন, না হয় পাশ দেখান। না হয় বই-এ নামধাম লিখে দিন। এস-ডি-ও গরম। আমাকে বাধা? ড্রাইভারকে হুকুম দেয় চালাও। বাঁশের অবরোধ ভেঙ্গে ড্রাইভার জীপ নিয়ে ফেরিবোটে উঠায়। ফিরবার পথে কিন্তু ফেরিবোটের বই-এ নাম-নম্বর দিয়ে আসে। ফিরে এসে মহকুমা হাকিম টোলকর্মচারীকে ওয়ারেন্টের বলে গ্রেফতার করে তিনদিন হাজতে রাখেন। মামলা দায়ের হয়। সরকারী কাজে বাধা দানের

অপরাধ। বহুদিন ঘুরে ঘুরে আসামী বেকসুর খালাস পায়। ছোট কর্মচারীর প্রায় তিন হাজার টাকা খরচ হয়ে যায়।

একজন ম্যাজিষ্ট্রেট জবরদস্তী একটি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের এলাকার ভেতর দিয়ে জীপ গাড়ী নিয়ে বার হয়ে তার কর্মস্থলে যেতে চায়। সরকারী আদেশক্রমে এই এলাকা নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত। দারোয়ান বাধা দেয়। বলে, এটা সরকারী রাস্তা নয়। ম্যাজিষ্ট্রেট ফিরে এসে এস-ডি-ওর কাছে নালিশ দায়ের করে, আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল, সরকারী কয়েক হাজার টাকা ছিল আমার সাথে, লুট করার চেষ্টা করেছিল। এস-ডি-ও বাহাদুর বিনা জামিনে ওয়ারেণ্ট ইস্যু করলেন মালিক ও দারোয়ানের বিরুদ্ধে।

মোকদ্দমা শুনানীর দিন ম্যাজিষ্ট্রেট এসে বসল বিচারকের পাশে। কিছুদিন আগে এই অফিসার কারখানার মালিকের কাছে তাদের ব্যক্তিগত রাস্তা দিয়ে যাবার অনুমতি চেয়েছিল। সেই পত্রখানা বিচারককে দেখান হল। আসামী ও উকিলকে বাইরে যাবার নির্দেশ দিয়ে বিচারক সে চিঠিখানা অফিসারকে দেখান এবং বলেন, আপনার দাবী প্রমাণিত হবে না। আপনি জোর করে অনধিকার প্রবেশের চেষ্টা করেছিলেন, এইটা প্রমাণিত হয়ে যাবে। অফিসার তখন পিছন-দুয়ার দিয়ে পালায়ে যান। কিছুক্ষণ পর আসামীর ডাক পড়ে। হাকিম রায় দেন, বাদী অনুপস্থিত মোকাদ্দমা ডিসমিস, আসামী খালাস।

এক তরুণ সি-এস-পি এক মহকুমার কর্তা। একজন মন্ত্রীর জামাই। তার অধিনস্থ প্রাচীন ও প্রৌঢ় অফিসারদের তিনি নাম ধরে ডাকেন এবং তুমি বলে সম্বোধন করেন। একজন প্রবীণ ডেপুটি। তাঁর পরিবারে দু'একজন এস-ডি-ও, জজও হয়েছেন। তাঁকেও নাম ধরে ডাকেন। তিনি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে এ কথা জানান। ম্যাজিষ্ট্রেট এস-ডি-ও কে ডেকে বললেন, তুমি যে ব্যবহার কর, তাতে এরা

যদি তোমাকে ধরে পিটানি দেয় তা হলে আমি কিন্তু তোমাকে রক্ষা করতে পারব না। বুঝে সুঝে চল।

কর্মচারীদের খুঁটি হচ্ছে গভর্ণর। তাদের নিজস্ব ক্ষমতাই প্রচুর। তাও উপর গভর্ণরের দোহাই দিয়ে তারা জুলুম অত্যাচার অনেক করতে পারে।

ঢাকা শহরে একটি জায়গা দখল দেওয়ার জন্য মুন্সেফ কোর্টের একজন পেয়াদা কোর্টের পরওয়ানা জারী করার জন্য অকুস্থলে যায়। পেয়াদা কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ডিক্রিদারকে দখল দেয়। হেন কালে থানার দারোগা গিয়ে উপস্থিত। সবাইকে গ্রেফতার করে চালান দেয়। পরে পেয়াদাকে বাদ দিয়ে অন্য সবার নামে চার্জশীট দেয়।

বিচারের সময় দারোগাকে প্রশ্ন করা হয়, আপনি কেন ওখানে গেলেন? উত্তর দেয় আমার এক এ-এস-আই গভর্ণমেণ্ট হাউস থেকে টেলিফোন পেয়ে দুইজন কনষ্টেবলসহ ঘটনাস্থলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়। আমি তাদের নিষেধ করে নিজেই ঘটনাস্থলে যাই। টেলিফোনের বার্তা যথারীতি ষ্টেশন ডাইরীতে লিপিবদ্ধ আছে।

হাকিম রায়ে লিখলেন, বর্তমান কালে একজন দারোগার পক্ষে গভর্ণমেণ্ট হাউসের টেলিফোন উপেক্ষা করা অসম্ভব।

সেক্রেটারিয়েটে বড় বড় কর্মচারীদের কাজ করার কিছুই নাই। সারাদিন কনফারেন্স, কমিটি আর কমিশন। কোন সমস্যার সমাধান করতে হলেই, এই তিনটির যে কোন একটির শরণাপন্ন হতে হয়। বড় কর্মচারী এই নিয়াই ব্যস্ত। দৈনন্দিন কার্য-কলাপের ভার পড়ে নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের উপর। তাদের না আছে উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা, না আছে যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা বা সমস্যা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান। অথচ তাদের সিদ্ধান্তের উপরই ঢ্যারা সই করে বড় কর্মচারীরা তাদের কর্তব্য সমাধা করে।

এই হচ্ছে মোটামুটি প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ও উন্নতি।

এর পরই চোখে পড়ে সর্বগ্রাসী দুর্নীতির বিস্তার। এখানে বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। সারা দেশ দুর্নীতিময় হয়ে পড়েছে। দুর্নীতি আগেও ছিল না তা' নয়। কিন্তু ছিল সীমাবদ্ধ। দু' একটি বিভাগের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং সবারই তা' জানাও ছিল। এখন সর্বত্র! এমন কোন সরকারী বা আধাসরকারী বিভাগ বা সংস্থা নাই যেখানে দুর্নীতি প্রভাব বিস্তার করতে পারে নাই। যক্ষ্মার বীজের মত সংক্রামক এবং সমাজদেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করে দিন দিন বিস্তৃতি লাভ করছে।

জীবনযাত্রার মান বেড়ে গিয়েছে কিংবা বাড়ানোর সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এখানেও বিরাট পরিবর্তন। পাশ্চাত্য জগতের প্রভাব এখানেও খুব বেশী। এখানেও অনুকরণের মোহ। মান রক্ষা করতে গেলে চাই অর্থ। আইনতঃ যে অর্থ উপার্জন করা সম্ভব, তা' নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহেই নিঃশেষ হয়ে যায়। বিলাসিতা ও উচ্চমানের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য চাই অতিরিক্ত অর্থ। তার জন্যই দুর্নীতির আশ্রয় নিতে হয়।

বহুকাল থেকেই সরকার দুর্নীতি দমন বিভাগ স্থাপন করেছিল। এখন নিজেদের বিভাগীয় কর্মচারীদেব দমন করতেই শক্তি সামর্থ নিঃশেষ হয়ে যায়। 'দুর্নীতি'কে দমন করার অবকাশ থাকে না।

তারপর ধরে কাকে? কেরানী পাঁচ টাকা, চাপরাশী এক টাকা, কনষ্টেবল পাঁচ টাকা, হদ্দমদ্দ দারোগা পঞ্চাশ, এক শ' বা দু'শ টাকা নিয়েছে। এরাই হচ্ছে লক্ষ্য। যত টানাটানি খোঁজা-খুঁজি এদের নিয়ে। মামলা মোকর্দ্দমা সাক্ষ্য প্রমাণ সৃষ্টি বা সংগ্রহ এদেরই বিরুদ্ধে। যেখানে হাজার হাজার বা তারও বেশী কারবার চলে, সেখানে দুর্নীতি-দমন বিভাগের প্রবেশ নিষেধ। তারা এমন সব দুর্ভেদ্য দুর্গ রচনা করে রেখেছে, কার সাধ্য সেখানে ঢোকে। এক একটা চক্রে শত শত লোক। কে কার বিরুদ্ধে যাবে।

পিণ্ডি পুলিশের এক উর্দ্ধতন কর্মচারী সেদিন বলছিলেন যে, রাজধানী উন্নয়ন সংস্থার অধীনে কোটি কোটি টাকার কাজ হয়েছে, শত শত কণ্ট্রাকটর ও সাব-কণ্ট্রাকটর মারফত। প্রত্যেকটি সংশ্লিষ্ট অফিস বা বিভাগের প্রত্যেকটি কর্মচারী কোন-না-কোন কণ্ট্রাকটরের সাথে জড়িত। তাদেরই সাহায্যে কেউ কেউ বিনা পুজি নিয়োগে কণ্ট্রাকটাররা অজস্র অর্থ উপার্জন করছে, সাথে সাথে তারাও। ধরার উপায় নাই।

দিন দিন দুর্নীতি বেড়েই চলেছে। বর্তমান আমলে আর একটা পরিবর্তন হয়েছে—রেট বেড়ে গেছে। বলে, রিস্ক (বিপদের ঝুঁকি) বেশী, কাজেই রেটও বেশী হবে। 'রিস্ক বেশী' কথাটা অতিরঞ্জন এবং অধিক আদায়ের ফন্দি। ধরা পড়ার আশঙ্কা আগের চেয়ে অনেক কম। কে ধরাবে, সবাই ত লিপ্ত।

সরকারী ও আধা সরকারী সংস্থার গণ্ডী ছড়ায়ে দুর্নীতি গ্রাম্য সমাজে বিস্তার লাভ করেছে। এটা বর্তমান আমলের অবদান। মৌলিক গণতন্ত্রী প্রথা প্রবর্তনের পর থেকেই জনসাধারণও দুর্নীতির আস্বাদ পেয়েছে। পয়সা ছাড়া ভোট দেবেনা, চেয়ারম্যান কোন রকমের সার্টিফিকেট দিবেনা, মেম্বর রিপোর্ট দিবেন। সার্কেল অফিসারও তার অংশ ছাড়া ওয়ার্কস প্রোগ্রামের বিল সই করে না। গোটা জাতিটাই দুর্নীতি-পরায়ণ হয়েছে। মস্ত বড় পরিবর্তন বৈ কি!

মন্ত্রী হাফিজুর রহমান একদিন নাকের ডগা উঁচা করে বললেন, দুর্নীতি দেশ ছেড়ে পালায়েছে। তা ত' বটেই। সবই যেটা উপভোগ করে সেটা দোষণীয় হতে পারে না। তা' ছাড়া পাকিস্তান—পাক জমিন। না-পাক বলতে এখানে কিছুই থাকতে পারে না। অন্যত্র যা' নাপাক পাকিস্তানে তা পাক হতে বাধ্য। লবণ খনিতে যা' পড়ে তাই লবণাক্ত হয়ে যায়। সুতরাং দুর্নীতি পাকিস্তানে নাই ঠিক। সীমান্তের ওপার চলে গেছে।

এক থানার দারোগা এক হিন্দু বিধবার কাছে থেকে ভয় দেখায়ে প্রায় হাজার তিনেক টাকা আত্মসাৎ করে। আমি দৈবক্রমে সেখানে যাই। ডাকবাংলায় প্রায় দুই তিন শ' হিন্দু মুসলমান এসে আমার কাছে অভিযোগ করে এবং প্রতিকার করার অনুরোধ করে। ঢাকা এসে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে বলি। তিনি পুলিশ সুপারকে ডেকে পাঠান। প্রস্তাব করি বিচার বিভাগীয় তদন্ত হোক। পুলিশ সুপার বলে, ওতে লাভ নাই। প্রমাণ আইনের ফাঁক দিয়ে দোষীও খালাস হয়ে যায়। তার চাইতে বিভাগীয় তদন্ত ভাল—লক্ষ্য অব্যর্থ। বললাম, তাই হোক। তবে উপরস্থ কর্মচারীকে দায়িত্ব দিতে হবে আর তদন্তের পূর্বে দরখাস্তকারীকে যেন খবর দেওয়া হয়।

সুপার বলল, অতিরিক্ত সুপারকে পাঠাব। বাদীকে সময়মত খবর দেয়া হবে।

অতিরিক্ত সুপার থানায় গিয়ে সেই দারোগাকে তাঁর জীপে উঠায়ে বিধবার বাড়ী যায়। দারোগার অনুরোধক্রমে তার দলীয় দুই একজন স্থানীয় মাতব্বরকে সঙ্গে নেয়। বিধবাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে। সে বলে, টাকা দিয়েছে। জিজ্ঞেস করে, প্রমাণ আছে? উত্তর দেয়, এখন ত কেউ নাই। ছেলেরা সব বিদেশে। খবর পেলে যোগাড় করে রাখতে পারতাম।

অতিরিক্ত সুপার ফিরে এসে রিপোর্ট দিল; কিছু একটা ঘটেছে, তবে অতিরঞ্জিত করে বলা হয়েছে দরখাস্তে। আর প্রমাণও পাওয়া গেল না। তবুও দারোগাকে বদলী করার নির্দেশ দেওয়া হয়। দারোগা বদলী হয়ে নিকটস্থ আরও বড় এক থানায় চলে যায়।

একদিন পুলিশ সুপারকে বললাম, এটা একটা তদন্ত হল? কাউকে খবর না দিয়ে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তদন্ত করে এসে রিপোর্ট দিলেই হল? আমি নিজে প্রায় দুই শ'

লোকের জবানবন্দী জেরা করেছি সারারাত জেগে। তোমার অফিসার পাঁচ মিনিটে তা ফুংকারে উড়ায়ে দিল? সুযোগ না দিলে প্রমাণ আসবে কোত্থেকে?

হাসতে লাগল। বলল, স্যার, কি আর করা যায়?

করা যে কিছুই যায় না—এই আমলে, তা ঠিক। নববিধানে সব কিছুর পরিবর্তন হচ্ছে। এটা গ্রহণ করে নিতে হবে।

এই পরিবর্তনের ধারাও বর্তমান কালে বৈপ্লবিক রূপ ধারণ করেছে। গতিবেগ অতি দ্রুত। বিজ্ঞানের আবিষ্কার যেমন দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পাচ্ছে, মানুষের জীবন আদর্শেরও তেমনি দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। বিজ্ঞানের অতি বিস্ময়কর আবিষ্কার এই পরিবর্তন ত্বরান্বিত করা সম্ভবপর করছে। আমরা গরুর গাড়ীর যুগ থেকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে জেট যুগে এসে পড়েছি।

ধৈর্য বা বিলম্ব গতি মৃত্যুরই নামান্তর। শিল্প-ব্যবসায়ে দ্রুত উন্নতি, রোগে দ্রুত আরোগ্য লাভ শিক্ষায় দ্রুত অগ্রসর, নির্মাণ কার্যে দ্রুত সম্পাদন। বিলম্বে শিক্ষা শিল্প ও উন্নয়ন অর্থহীন হয়ে পড়ে। আগে আট ঘণ্টায় বিমানে করাচী পৌঁছতাম। তার পর ছয় ঘণ্টায়। সুপার-কনষ্টেলেশনে পৌঁছায়ে দিত সাড়ে চার ঘণ্টায়।, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতাম। ছোট-বোয়িং এখন আড়াই ঘণ্টায় নিয়ে যায়। অস্বস্তি বোধ হয়। এক ঘণ্টায় নিলে বড় আরাম হত।

ট্রেনে চললে মনে হয় হেঁটে চলছি। ষ্টীমার ত বসে থাকার মত। যেন অনড়।

পরিবর্তনের যুগে সব কিছুরই পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক—দ্রুত ও বৈপ্লবিক। অনেক সময় উদ্ভট ও অদ্ভুত। কিন্তু তবুও

পরিবর্তন। সমাজ-ব্যবস্থার আকৃতি ও প্রকৃতির আমূল পরিবর্তন হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতি-সভ্যতারও। আধুনিক থেকে অতি আধুনিক, প্রগতি থেকে অতি-প্রগতি। তাতেও তৃপ্তি নাই। মনে হয় পিছনে পড়ে আছি। এর পরেও অভিনব অদৃষ্ট ও অনাস্বাদিত রূপ রস ছন্দ বৈচিত্র্য নিশ্চয়ই আছে। তাকে আবিষ্কার করতে হবে। যারা এর সাথে পাল্লা দিতে পারে না, তারা পিছনে পড়ে থাকে, আর প্রগতিকে ধিক্কার দেয়।

আমাদের আয়ুব খাঁ সেদিন তাই বলে ফেললেন, আমরা উন্নয়ন মার্গে এত দ্রুত চলছি যে, অনেকেই তাল সামলাতে না পেরে আমাদের নিন্দা করছে। আসলে তারা যে পিছনে পড়ে ধূলায় মিশে যাচ্ছে, তাও তারা টের পাচ্ছেনা।

অতি প্রগতিবাদীরাও আমাদের উপর কটাক্ষ করে বলে, এরা প্রগতির প্রচণ্ড বেগ সহ্য করতে পারেনা বলেই এর বিরুদ্ধে অপপ্রচার করেন। তারা কোথায় পড়ে রইলেন, আর আমরা কোথায় উঠে এলাম। এটা হচ্ছে অতি-প্রগতির যুগ।

দেশের সার্বিক উন্নয়নের গতি এমনি দ্রুত। উত্থান বা অভ্যুত্থান ও বলা চলে, কিংবা উড্ডয়ন।

নতুন সমাজ-ব্যবস্থা, অভিনব আদর্শ ও গড়ে উঠেছে। অনেক সময় তার বিকট রূপও প্রকাশ পায়। সমাজ-সভ্যতার গতি ও উর্ধ্বমুখী বা বহুমুখী। এই নতুন দর্শনের উৎস কোথায় কোথায় এর উৎপত্তি, কি এর পরিণতি তা নির্ণয় করা কঠিন। তবে অতীত ও বর্তমান আদর্শকে দ্রুত পিছনে ফেলে নতুন আদর্শ ও দর্শন যে গড়ে উঠছে তা অস্বীকার করা চলে না। অতীতের আদর্শ বহুদিন আগে পরিত্যক্ত—বর্তমানের অবস্থাও সঙ্কটময়।

ইসলাম ও মুসলমানের নামে পাকিস্তান অর্জন করা হয়েছে বলে দাবী করা হয়। বিতর্কমূলক দাবী, কিন্তু সনাতনপন্থীরা

এ দাবী পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্তু তাঁদের অনেকেরই মোহ কেটে যাচ্ছে। নববিধানে নতুন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বস্তুতান্ত্রিক ও ঐহিক মতবাদ আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক মতবাদকে সঙ্কুচিত করে ফেলছে। এক কথায় মানব জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য অর্থনীতি। অর্থনীতিক মানদণ্ডেই তার মানমর্যাদা নির্ধারিত হয়। ন্যায্য অন্যায্য নির্বিশেষে যে কোন পন্থা অবলম্বনে দ্রুত বিত্তশালী হলেই সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ। কায়িক আনন্দ ও সম্ভোগের উপকরণকে আয়ত্তাধীন করাই জীবন আদর্শ।

পূর্ব-বাংলা আদি যুগ থেকে যে গ্রামীন সভ্যতা ও সমাজ-ব্যবস্থার গৌরবমণ্ডিত ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক ছিল, সে ঐতিহ্যের মূলে আজ প্রচণ্ড আঘাত হানা হয়েছে। সে ঐতিহ্য আজ ক্ষীয়মান —মূমূর্ষ। গ্রাম্য সমাজ-ব্যবস্থা দ্রুত ভেঙ্গে পড়ছে। গ্রাম ছেড়ে মানুষ ছুটে আসছে—শহরে, শান্তি, প্রাচুর্য ও সুখের সন্ধানে। ধনী হবার মানী হবার লালসায়। পঙ্গপালের মত দ্রুত ও চঞ্চল। গড্ডলিকা প্রবাহের মত পরিব্যাপ্ত। বাংলার পল্লী সমাজ আজ পরিত্যক্ত—পাণ্ডব-বর্জ্জিত, শ্মশান-সদৃশ।

ভাষা ও সংস্কৃতির দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকি-স্তানের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পূর্ণ পৃথক বলেই সংস্কৃতির প্রধান বাহন ভাষা সম্বন্ধে তুমুল বিতণ্ডা শুরু হয়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ফলেই বাংলাকেও উর্দ্দুর সাথে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দান করা হয়। আগামী বাহাত্তর সালে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রয়োজন বোধে ইংরাজী বাদ দিয়ে দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ অতঃপর শুধু দুইটি জাতীয় ভাষাই প্রচলিত থাকবে। উর্দ্দু অনুন্নত বলে তার তরক্কীর জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। দেখাদেখি, পূর্ব-পাকিস্তানেও বাংলা উন্নয়ন বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।

কিন্তু বাংলা রাষ্ট্রভাষার স্থান দখল করতে পারে নাই। স্বীকৃতি

পর্যন্তই ইতি। সরকারী দফতরে, রাষ্ট্র পরিচালনার কার্যে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারে নাই। সুযোগই দেওয়া হয় নাই। আজ পনর বছর পরে দু'একটি সরকারী ফরমে কিংবা কারেন্সি নোটের কোণায় ও মুদ্রার পৃষ্ঠে দু'একটি বাংলা অক্ষর বা অঙ্ক দেখা যায়। দুধের স্বাদ বা সাধ ঘোলে। অথচ এই বাংলা ভাষার জন্য কত আন্দোলন সংগ্রাম এমন কি রক্তপাত হয়ে গেছে। ইদানীং মোটর গাড়ীর ফলকে বাংলায় অক্ষর ও অঙ্ক অর্থাৎ নম্বর উৎকীর্ণ করার জন্য সরকারী নির্দেশ জারী করা হয়েছে। ব্যস্! জয় রাষ্ট্রভাষার!

কোর্ট কাছারী অফিস আদালতে বাংলার প্রবেশ প্রায় নিষিদ্ধ। কোর্ট হাকিম উকিল মোক্তার পক্ষ সাক্ষী পেশকার সবই বাঙ্গালী। কার্যকলাপ কতক বাংলায় কতক ইংরাজীতে। রেকর্ড করা হয় ইংরাজীতে। হাকিম রায় লেখেন ইংরাজীতে। কর্মচারীরা হুকুম লেখেন ইংরাজীতে। অদ্ভুত ব্যাপার! অফিসে দু'একজন কর্মচারী বা শিক্ষিত লোক সমবেত হলেই ইংরাজীর মহড়া চলে। তবুও যদি ভাষা বা উচ্চারণ শুদ্ধ হত! তাও হয় না। অথচ পরিবেশ দেখলে মনেই হবে না এটা বাংলা দেশ—পূর্ব-পাকিস্তান।

পশ্চিম পাকিস্তানের পরিবেশ আরও অধিক পাশ্চাত্য। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব ও মোহ সেখানে অত্যুগ্র। এই মোহাবেশ থেকে মুক্তিলাভ অসম্ভব বলেই মনে হয়—অন্ততঃ অদূর ভবিষ্যতে। লাহোর করাচী ও অন্যান্য শহর পাশ্চাত্যদেশীয় শহর অপেক্ষা অধিক পাশ্চাত্যভাবাপন্ন। বেশভূষা, আচার-ব্যবহার খানা-পিনা চালচলন পাশ্চাত্য-সভ্যতার বিকৃত অনুকরণ। অতি আধুনিক, অতএব অতিশয় উগ্র।

মার্কিণ মুল্লুকের সাথে আমাদের যোগাযোগ ও সম্পর্ক ইদানীং ঘনিষ্ঠতর হওয়ার ফলে তাদের জীবনাদর্শের প্রভাব অতি দ্রুত

আমাদের সমাজে বিস্তারলাভ করছে। ইংরাজীর স্থান ক্রমে ক্রমে দখল করে নিচ্ছে মার্কিণী ভাষা। বৃটিশের ভাষা মার্জিত, সুসভ্য, সংস্কৃতি-সভ্যতা অভিজাত ও সনাতন। পক্ষান্তরে মার্কিণী ভাষা উগ্র কঠোর সংস্কৃতি-সভ্যতা হঠাৎ-লব্ধ ভূঁইফোঁড় গোছের পোষাক পরিচ্ছদে শালীনতার অভাব। পশ্চিম-পাকিস্তানীরা এই সব অকাতরে গ্রহণ করে সভ্যসমাজে স্থান লাভ করেছে। আমাদের এই অঞ্চলের তরুণ তরুণীরা এবং কিছু সংখ্যক উচ্চশিক্ষিতের দলও—জাতীয় সংহতি-স্থাপনের নামে মার্কিণী পোষাক পরিচ্ছদ, ভাষা ও আচার ব্যবহারের অনুকরণ করে পশ্চিম-পাকিস্তানীদের সম-পর্য্যায়ে উন্নীত হবার চেষ্টা করছে।

একজন তরুণ বাঙ্গালী এম, এ পাশ। চাকুরী করে পিণ্ডিতে—রেডিও কিংবা তথ্যসরবরাহ বিভাগে। কয়েক বছর আগে ঢাকা কোর্টে সাক্ষ্য দিতে এল। জেরা করার সময় প্রশ্ন করলাম, আপনি ওখানে কতক্ষণ ছিলেন? উত্তর দিল, অ্যান এঁয়া আঁ্যান, এঁ হঁ্যাফ। চমকে উঠলাম উভয়েই—ম্যাজিষ্ট্রেট ও আমি। আবার প্রশ্ন করি—ঐ উত্তর দেয়। বোকা বনে গেলাম। পিছন থেকে একজন তরুণ যুবক আমার কানে কানে বলল, দেড় ঘণ্টা! বাব্বা! ম্যাজিষ্ট্রেটকে বললাম। হেসে বললেন, গ্রামের আণ্ডা এখানে এসে অম্‌লেট হয়ে গেছে। চিনব কেমন করে?

তথাকথিত অভিজাত ও বিত্তশালীরা ইংরাজী বাদ দিয়ে মার্কিণী ধরেছে। পোশাক-পরিচ্ছদে ত বটেই। নিম্ন মধ্যবিত্তরাও পায়জামা ছেড়ে দিয়ে প্যান্ট, বুশ ও হাওয়াই শার্ট ধরেছে। বলে, খরচও কম এবং টেকসই। গ্রামের ছেলেমেয়েরা শহরে এসেই বদলে যায়। চট্ করে লুঙ্গি বা পায়জামা ফেলে দিয়ে প্যান্টের ভেতর ঢুকে পড়ে। শহরের ছেলেরা ত অনেক আগেই টেডি হয়ে বসে আছে। নিম্নাঙ্গে খুব আঁটা চামড়ার সাথে সাঁটা পাইপের মত সরু প্যান্ট ও কোমরের উপর অবধি ঝুলায়মান

ব্লাউজের মত এক ধরণের জামা—উর্ধাঙ্গে। শরীরের আবৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নকশা ফুটে উঠে প্যান্ট ও জামার উপর দিয়ে। উদ্দেশ্য হয়ত তাই-ই। এই পোষাক পরার ফলে তাদের চলন-ভঙ্গীও বদলে মার্কিণী হয়েছে। তাদের অনুকরণে হাঁটতে হয় কিংবা পোষাকই হাঁটতে বাধ্য করে।

তরুণীদের পোষাক আরও চমৎকার—অতি আধুনিক। জামার হাত নাই—নিম্ন অংশও নাই। কটিদেশের উপরে অনেক দূর পর্যন্ত সম্পূর্ণ অনাবৃত। ধীরে ধীরে এই ব্যবধান উপর দিকে করছে। এটাও নতুন দর্শণ ও আদর্শের ফলাফল। অনাবশ্যক বস্ত্রের জঞ্জাল দূর করা। ধীরে ধীরে আত্মাবস্থার—বাবা আদম ও হাওয়ার আবির্ভাবের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার প্রচেষ্টা। আদিম অবস্থা—সুতরাং দোষ-গুণ বিবর্জিত।

শুধু ভাষা ও পোষাকেই টেডি নয়,—সর্বতোভাবে। চালচলন, আচার ব্যবহার, খানা-পিনারও এই নতুন ধরণের অনুকরণ। নতুন দর্শণের বিকাশ। চিন্তাধারাও অভিনব—সংকীর্ণ, সহজ ও নির্লিপ্ত।

উভয় অংশের অবস্থা প্রায় একই ধরণের। তবে ভাষা ও সংস্কৃতি-সভ্যতার ব্যাপারে পূর্বাঞ্চলের অবস্থা কিঞ্চিৎ গুরুতর। এখানে ইংরাজী, মার্কিণী, পশ্চিম-পাকিস্তানী অর্থাৎ উর্দু, পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতির সংঘর্ষ এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি করেছে। ইংরাজী ও মার্কিণীর প্রতিযোগিতা ত আছেই। তার উপর ভাষা ও সংস্কৃতির ব্যাপারে একদিকে উর্দু, আরেক দিকে পশ্চিম-বঙ্গের ভাষা ও পূর্ব-বঙ্গের ভাষা ও ঐতিহ্যের এমন একটা বিরাট সংঘর্ষ চলছে যাতে পূর্ব-বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্যের গৌরবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। পশ্চিম বঙ্গের ভাষা মানে কলকাতার ভাষা। শিক্ষিত তরুণ তরুণীরা এটার অনুকরণের মহড়া দিচ্ছে। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থাৎ উর্দু ভাষা ও আনুসঙ্গিক তাহজীব তমদ্দুন প্রবর্তনের

প্রচেষ্টায় পূর্ব-বাংলার সংস্কৃতি-সভ্যতা ছেড়ে পালাবার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

পূর্ব-পাকিস্তানী তরুণ সম্প্রদায় হয় পশ্চিম বঙ্গের ভাষার অনুকরণ করার চেষ্টা করে, না হয় উর্দু জবানের সবক নেয় ও নকল করে। নিজস্ব ভাষা বলতে লজ্জা বোধ করে। প্রমাণ করতে চায়, মুসলমান হলেও তারা ভদ্রলোক। যেমন করে বহুদিন আগে হিন্দু সংস্কৃতি সভ্যতার প্রভাবে অনুন্নত মুসলমান সম্প্রদায়ের তরুণ-তরুণীরা হিন্দুদের ভাষা ও পোষাকের অনুকরণ করে শুনতে আনন্দ বোধ করত, তোমার ত 'একেবারে ভদ্রলোকের চেহারা।'

পূর্ব-পাকিস্তানীরা নিজস্ব ভাষা বলতে লজ্জা বোধ করে। হীনমন্যতাই তাদের মনে এই বোধ জাগায়। নিজেদের সংস্কৃতি সভ্যতার ঐতিহ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলেই, তারা,—চোখে যা' ভাল লাগে তারই অনুকরণ করতে চায়। অন্দরে আণ্ডা গোস্ত বলে, কিন্তু বাইরে গেলেই ডিম-মাংস। কালক্রমে অন্দরেও প্রবেশ করে ফেলবে। তখন 'বাহির' ভিতর' একাকার হয়ে যাবে।

এই হীনমন্যতার সুযোগ পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত বন্ধুরা নিচ্ছে। ফলে, পূর্ব পাকিস্তানে মাঠে ময়দানে, সিনেমা, টেলিভিশনে মোটামুটি দুই শ্রেণীর ভাষার প্রচলন দেখা যায়। একটা ইতর আর একটা ভদ্র। পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা-সস্কৃতি ইতর জনের এটা প্রমাণ করাব জন্য রেডিও টেলিভিশনে ড্রামা নাটকে দুই ভাষা ও ভঙ্গিতে বার্তালাপ ও অভিনয় করা হয়েছে। যারা ভদ্র ভূমিকায় অংশগ্রহণ করে তারা ভদ্র অর্থাৎ কলকাতার ভাষায় অভিনয় করে, আর চাকর বাকর বা অন্যান্য বাজে লোকের ভূমিকায় যারা অংশ গ্রহণ করে তারা পূর্ববাংলার বিভিন্ন জেলার কথ্য ভাষায় অভিনয় করে। পরিষ্কার দুইটি ভাষাভাষী শ্রেণী প্রমাণ করার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্য কোন সৎ-উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এ রকম করার কোন কারণ আপাততঃ দেখা যাচ্ছে না।

এ বিষয়ে বহিরাগতদের বিশেষ দোষও বোধ হয় দেওয়া যায় না। পূর্ব-বাংলার লোকেরাই এ ব্যাপারে অতি উৎসাহী। তারাই জান-প্রাণ দিয়ে কলকাতার ভাষার অনুকরণ করার চেষ্টা করছে। অথচ তারা কেউ কোন কালে কলকাতা যায় নাই, এ কথা প্রায় হলফ করেই বলা চলে।

আর গেলেই বা কি? কলকাতার ভাষা সাহিত্যিক বা সাংস্কৃতিক ভাষা নয়। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সুনীতি চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত সবাই একবাক্যে বলেছেন যে কলকাতার কথ্যভাষা সুষ্ঠু নয় ও সাহিত্যে ব্যবহারের অযোগ্য। সুতরাং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ও তার ব্যবহার অশোভন। ওটা নিজস্ব কলকাতা শহরের গণ্ডীর ভিতরই সীমাবদ্ধ।

অথচ সেই ভাষার চর্চায় অনেকেই উদগ্রীব। রেডিও টেলি-ভিশনের খবরের ভাষাও তাই। বরিশাল, নোয়াখালী বা ঢাকা নিবাসী বার্তা পাঠকের অত্যন্ত কষ্ট করে কলকাতার ভাষা উচ্চা-রণের অনুকরণের চেষ্টা দেখলে দুঃখ হয়। বেচারা!

এমন কি, পল্লীগীতি ভাটিয়ালী যা' পূর্ব-বাংলার নিজস্ব সৃষ্টি, তারও গ্রাম্য সহজ সরল সুন্দর শব্দ পরিবর্তন করে কল-কাতার শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে ও হচ্ছে। আর কিছু না হলেও ক্রিয়াপদই ত নিশ্চয় বদলে দেওয়া হয়েছে।

বাঙালীর অন্যান্য বিশিষ্ট গুণাবলীর মধ্যে অনুকরণ বা অনু-করণের স্পৃহা অন্যতম। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে অনুকরণ করার মোহ সে কাটাতে পারেনা।

অনুকরণ সাধারণতঃ বিকৃত হতে বাধ্য। আবার ব্যাধি বা ভুলেরও অনুকরণ করা হয়। আমাদের একজন রেডিও টেলি-ভিশনে সৈন্যকে সৈন বলেন—য'-ফলা বাদ দিয়ে। কলকাতার একজন বিশিষ্ট রেডিও বার্তা-ঘোষক জিহ্বা কিঞ্চিৎ আড়ষ্ট হওয়ার কারণ সৈন্যকে সৈন বলত। য-ফলা তার মুখে স্পষ্ট ফুটে উঠত

না। সেই আড়ষ্টতার অনুকরণে আমাদের ইনিও মৈন বলে থাকেন।

বহুদিন আগেব একটা ঘটনা মনে পড়ে, ছাব্বিশ-সাতাশ সালের। ডক্টর হাসান য়ুনিভার্সিটির ইংরাজীব রীডার। সুপুরুষ ও সৌখিন। ভাবপ্রবণ তরুণদের অনুকরণের পাত্র। মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় তাঁর পা ভেঙ্গে যায়। সুস্থ হবার পর তিনি একটু ঝুকে হাঁটতেন, খোঁড়ানো গোপন করার জন্য। একদিন দেখলাম মুসলিম হলে নবাগত দু'একজন ছাত্র ঝুঁকেঝুঁকে হাঁটছে। বললাম, ব্যাপার কি? কি হয়েছে? এমন করে হাঁটছ কেন? উত্তর দিল, কেন, হাসান সা'বও ত এমনি হাঁটেন। বললাম, ধোৎ—ওটা তাঁর ব্যাধি। পা তাঁর ভাঙ্গা তাই অমন কবে হাঁটেন, তোমাব ত পা' ভাঙ্গে নাই! একেই বলে অন্ধ অনুকরণ।

উচ্চারণের বিকৃত অনুকরণও আমরা করছি। কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গ যা ছেড়ে দিয়েছে, ঢাকা বা পুর্ব-বাংলা তাই আমদানী করছে। রেডিও টেলিভিশনে তাই দু'একজন ঘোষণাকারী বা সংবাদ পাঠক ওভ্যর্থনা ও ওভ্যুত্থান পড়ে থাকে! আদিতে অ-কার বাদ দিয়ে ও-কার। তা হলেই কলকাতার মত হয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আর একটা গল্প মনে পড়ে: কয়েকজন সাহিত্য-নবিশ তাঁকে জিজ্ঞাস করল: আমরা গরুকে গরু বলি—সুতরাং ও-কার দিয়ে বানান করলে কেমন হয়? কবিগুরু বলিলেন, তাতে কি গাই-এর দুধটা বেশী মিষ্টি লাগবে? আর ও-কার দিয়ে বলই বা কেন?

কলকাতার অনুকরণে তুলো মুলো গুলো ছাড়াও নেওয়া দেওয়া উঠে গিয়ে নেয়া দেয়া হয়ে গেছে। এমন কি দেওয়ান আবদুল বাসেদের উপাধি উল্লেখ করতে গিয়ে অভ্যাসের চাপে 'দেয়ান' বলে ফেলে। পরে থুড়ি দিয়ে শুদ্ধ করে রেডিওর এক বার্তা-ঘোষক।

এরপর জবরদস্তী কলকাতা থেকে নূতন নূতন শব্দ আমদানী করা হচ্ছে। তাতে নাকি ভাষা সমৃদ্ধিশালী হয়। তা হয়ত হয়। কিন্তু চেষ্টা করে কি আমদানী করা যায়? না তা, হয়েছে কোন দেশে, কোন কালে? বিদেশী শব্দের আগমন নির্গমন স্বাভাবিক ও অনুপলব্ধ। ভাইস চ্যান্সেলারকে উপাচার্য বললে কি ভাষা সমৃদ্ধ হয়ে গেল? এখানে কে আচার্য? কে সে গুণের অধিকারী? আর ইনি কার সহকারী? পোষ্ট-গ্রাজুয়েটকে স্নাতকোত্তর বললে, পোষ্ট গ্র্যাজুয়েটরাই বুঝতে পারবে না—অন্য পরে কা কথা। দুর্বোধ্য করাই যদি সমৃদ্ধ করার লক্ষণ হয় তা হলে অনেক দুর্বোধ্য ও অর্থহীন শব্দ আমাদের অভিধানে প্রবেশ করায়ে ভাষাকে সমৃদ্ধশালী করা যায়। স্নাতকোত্তর শব্দটা অর্থহীন এবং অনর্থক প্রয়োগ। পশ্চিম-বঙ্গে কেউ কেউ ব্যবহার করে। নূতন অভিধানে হয়ত স্থানও পেয়েছে। এর মূল বা ধাতুগত অর্থ হচ্ছে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী ব্রহ্মাচর্যব্রত শেষ করার প্রাক্কালে উপবীত ধারণের সময় যে স্নান করত, তাকে বলা হত স্নাতক। তার পরের অবস্থাই স্নাতকোত্তর। তা হলে যে কোন কার্যের জন্য স্নান করার পরের অবস্থাকেই স্নাতকোত্তর বা গোসলোত্তর বলা যেতে পারে। শুধু বি-এ পাশ করার পরের অবস্থার মধ্য সীমাবদ্ধ করা হবে কেন? কিন্তু তাতে কি পুর্ব-বাংলার ভাষা সমৃদ্ধিশালী হবে? অন্যান্য বহু বিদেশী শব্দ—বিশেষ করে ইংরাজী, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ শব্দগুলি যদি আমাদের ভাষার পবিত্রতা কলুষিত করতে না পেরে থাকে তা হলে ভাইস-চ্যান্সেলার আর পোষ্ট-গ্রাজুয়েট কথা দু'টি কি দোষ করল?

পশ্চিম-বঙ্গে পরিভাষা আবিষ্কার বা সৃষ্টি করার জন্য একটা মস্ত বড় কমিটি গঠন করা হয়েছিল। অনেক পণ্ডিত ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক তাতে সদস্য ছিলেন। দীর্ঘদিন পরিশ্রম বা পণ্ডশ্রম

করার পর তারা যে রিপোর্ট দিলেন, সরকার তা গ্রহণ করে নাই। করতে পারে না। অবাস্তব ও অব্যবহার্য শব্দের কষ্টসাধ্য আমদানী কোনদিন কোন ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে পারে না। তাই এই রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করা হয়।

ব্যাধির অনুকরণের মত ভুলের অনুকরণ করার দৃষ্টান্তও আছে। কলকাতার কাগজে মাঝে মাঝে হালফিল'বলে একটা অর্থহীন শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। শব্দটা নিশ্চয়ই 'ফিলহাল'—যার মানে 'সাম্প্রতিক' বা বর্তমানের—উপস্থিত কালজ্ঞাপক। গোড়াতে আরবী শব্দ ফার্সী ও উর্দুতে ব্যবহার হত প্রচুর পরিমাণে। ভুলে বা ইচ্ছাকৃত ফিলহাল লিখল কলকাতা। অমনি আমাদের এখানে ও' একটি সংবাদপত্রে এই শব্দটা লেখা হল হালফিল। মনে করেছে, এক অর্থ বোধক—ভিন্ন সমাস। কিংবা 'ফিলহাল' শব্দ এরা দেখেও নাই।

বিদেশী ভাষা আমাদের ভাষায় সহজ ও সাবলীল গতিতে প্রবেশ লাভ করেছে, এবং কালক্রমে প্রস্থানও করে গেছে। এ কথা সবাই জানে। তার জন্য চেষ্টা তদবির এমনকি আন্দোলন করার প্রয়োজন হয় নাই। আন্দোলন করে আমদানী করলে তা ক্ষীণপ্রাণ হয় এবং আয়ুষ্কালও অতি অল্প। আমার দাদা পানির পাত্রকে আব-খোরা বলতেন—দাদীও। ফার্সী শব্দ। তাঁরা পেয়ালা, রেকাবী, তশ্‌তরী বলতেন। এখন সে সব উঠে গেছে। তার জন্য চেষ্টা করতে হয় নাই। আমরা বলি, গ্লাস, কাপ, প্লেট। এর জন্যও চেষ্টা তদবির করতে হয় নাই। একে কেউ অনধিকার প্রবেশও বলতে পারে না। যুগ-পরিবর্তনের স্রোতে ভাঙ্গা-গড়া হয়ে চলেছে। ভবিষ্যতেও চলবে। আপত্তি হচ্ছে, বিশেষ উদ্দেশ্য বা মতলব সাধনের জন্য কিংবা মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে শব্দ, উচ্চারণ ইত্যাদি আমদানী করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে।

ভাষা ও সংস্কৃতির অনুকরণের সাথে সাথে খানাপিনা, পোষাক-

পরিচ্ছদের আংশিক অনুকরণের চেষ্টাও হচ্ছে। ওটা সংস্কৃতিরই অংশ বিশেষ। আচার-অনুষ্ঠানেও আমদানী হচ্ছে পশ্চিম-বঙ্গের প্রচলিত রীতি-নীতি। আমাদের ঢাকা বা পূর্ব-বঙ্গের প্রখ্যাত আহার্য পরিত্যক্ত হয়ে পশ্চিম বঙ্গের খাদ্যসম্ভার তার স্থান দখল করেছে। অনেক সুধী ও বিজ্ঞজন সে সব খাদ্য উন্নত মানের বলে অভিমতও প্রকাশ করেছেন। মুখে ভাল না লাগলেও স্বীকার করতে হবে। তা' না করলে বাঙ্গাল অর্থাৎ ইতর শ্রেণীভুক্ত হতে হবে। বাঙ্গাল বড় লোকের ক্রিকেট খেলা দেখার মত।

পূর্ব-বাংলাব দুর্গতি ও বিপদ এখানেই শেষ হয় না। অন্য দিকের চাপ রয়েছে। সেটা হচ্ছে পশ্চিম-পাকিস্তানের—যার অর্থ উর্দু ভাষা ও সংস্কৃতি সভ্যতা। চাপও একক নয়। দু' ধারা—সরকারী ও বেসরকারী।

উর্দুকে অভিজাত ভাষা বলা হয়। বাংলা-ভাষা এমন কি পশ্চিমবঙ্গীয় বাংলার উপরও তাব অভিজাত্য। দাবী করা হয় ইসলামী তাহজীব তমুদ্দনের প্রচার ও প্রকাশ উর্দুর মারফতেই হয়েছে। দাবীটা ভিত্তিহীন। উর্দুর জন্মই হয়েছে দু'শ বছর আগে। অথচ এই দাবী নির্বিকারে মেনে নিয়ে প্রথমে আলেম সমাজ মৌলুদ, খোতবাতে উর্দু চালান। পরবর্তীকালে শরাফতের নিদর্শন বলে অন্যেরা গ্রহণ করে। সভ্য ও শরীফ বলে পরিচিত হতে হলে এই ভাষায় কথা বলতে হয়। এখন ত এটা রাজভাষা। বিত্তবান ব্যক্তিরা ভাল কাপড়-চোপড়ে পরিহিত হলেই তাদের মুখে ফুটে উঠে উর্দু। অপরিচিত লোকের সাথে সম্ভাষণ হয় উর্দুতে—যদি ভদ্রলোক কিংবা পশ্চিম পাকিস্তানী হয়। রিকশা অটো-রিকশাওয়ালাও ভাল পোষাক দেখলে উর্দুতে [illegible] করে। আমোলী উর্দু বলতে তার [illegible] বেশী দেখছে।

[illegible] ছেলেবেলায় দেখতাম, [illegible] হিন্দুস্থানী চাকর-দারোয়ান [illegible] উর্দু-[illegible] কথা

বলছেন। ভয়, পাছে ওরা মনে না করে যে আমাদের মনিব নেহাত দেহাতী।

বাংলা গান ও ছায়া-ছবির চেয়ে উর্দু গান ও ছায়াছবির আদর বেশী।

উর্দুর সাথে ইসলামী দলের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। ইসলামী দল মানে যারা 'ইসলামকে' সবদাই ব্যবহার করে। সংস্কৃত বা বাংলার পরিবর্তে উর্দু ব্যবহার করলেই ইসলামী হয় বলে অনেকেই ধারণা করে। বাংলার ভেতর প্রচুর পরিমাণে আরবী ফারসী শব্দ এস্তেমাল করলে সেটা ইসলামী বাংলা হয় এবং তার ব্যবহার জায়েজ। বিশেষতঃ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে জোর করে অনেকে উর্দু ভাষায় তকরীর করতে চেষ্টা করে। সাহিত্যেও ইসলামী শব্দ ব্যবহারের প্রচেষ্টা চলছে। প্রতিবাদ করলেই নজরুল ইসলামের নজির দেওয়া হয়। তিনি কত আরবী ফার্সি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সে প্রয়োগ কত সহজ ও সাবলীল। উত্তর দেয়, ব্যবহার করে ফেললেই সহজ হয়ে যাবে। অভ্যাস গড়ে উঠলেই কষ্টবোধ হবে না।

দুই পক্ষে ধাওাযুদ্ধ চলছে। একদল জোর করে উর্দু-ফার্সি এস্তেমাল করবে। অনুষ্ঠানে, পর্বে তারা ইসলামী আচার পদ্ধতি ফুটায়ে তোলার কোশেশ করে যাচ্ছে। অন্য দল জোর করে সমস্ত প্রচলিত ইসলামী শব্দ ভাষা থেকে কেটে কুটে ভাষাকে সংস্কৃত শুদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। যা' চলতি তাও চলতে দেবে না।

পয়ষট্টি সালে একুশে ফেব্রুয়ারী শহীদ মিনারে ছাত্র সমাজের আয়োজিত এক সভায় আমাকে সভাপতিত্ব করতে হয়। রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনের সময় কর্মপরিষদের আহ্বায়ক ছিলাম বলে বোধ হয় এই সম্মান। একজন ছাত্র বক্তৃতা কালে বলল, এখানে উপস্থিত আছেন, শহীদ বরকতের আম্মা—তিনি আমাদের সকলের আম্মা অতএব শ্রদ্ধেয়া। অমনি প্রতিবাদ উঠল, আম্মা নয়, মা,

বলুন। অবাক হাল। আম্মা বলতে আপত্তি! বাঙ্গালীরা মা'কে 'মা' বলেও ডাকে, আম্মা বলেও ডাকে। এতে আপত্তির কি আছে?

কিছুদিন আগে ঈদের আগের রাতে মাইক্রোফোণে ঘোষণা করা হচ্ছে: আগামী কল্য অমুক ময়দানে ঈদের সমাবেশ হবে —পৌরহিত্য করবেন মৌলানা অমুক। ভাগ্যিস অমুক ভট্টাচার্য্য বলেন নাই। তা হলে অভিযান সম্পূর্ণ হত। জমায়েত না বলে সমাবেশ, এমামতির বদলে পৌরহিত্য। অথচ এই শব্দগুলি ঘরে ঘরে প্রচলিত। সকলেই বোঝে। উপাসনা উপবাস এগুলিও বাংলা শব্দ। কিন্তু নামাজ রোজার পরিবর্তে ব্যবহার করলে ঘোর আপত্তি উঠবে। কারণ জবরদস্তী আনা হচ্ছে।

এরাই 'স্মৃতিতর্পণ' ও 'শ্রদ্ধাঞ্জলির' ব্যবস্থা করে। ফলে ইসলামী এবং পূর্ব-বঙ্গীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের 'জলাঞ্জলি' দেওয়া হচ্ছে।

জোর করে উর্দু চাপায়ে দেবার যে চেষ্টা করা হচ্ছে, এ সব তারই প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়া কালক্রমে ঘৃণায় পরিণত হতে পারে।

নামেরও পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। একদিকে আরবী বাদ দিয়ে ফারসী নামকরণ শুরু হয়েছে, অন্যদিকে খাঁটি বাংলা নামের প্রচলনও করা হচ্ছে। তন্দ্রা ইসলাম, সুশীল খন্দকার, করবী খাঁ ইত্যাদি। হয়ত ধর্মান্তর গ্রহণ করে নাম ঠিক রেখে পদবী বদলায়েছে, কিংবা সত্যি সত্যিই ঐ সব নাম রাখা হচ্ছে। বোঝা কঠিন। অন্যদিকে অবছুস সবুর খান, খানে সবুর হয়েছেন। তাবিক জামাল, তওহিদ কায়সার, হাসান জামান,—এ সব নামের আদি আরবী বাদ দিয়ে ফার্সিতে পরিবর্তন করা হয়েছে। আধুনিক শোনায় বলে। আরবী নামগুলি সেকালের। কিন্তু নামগুলি শুনে ধরাই মুশকিল, তারা বাঙালী না লাহোরী, না পেশোয়ারী।

সংহতির পক্ষে এটা ভাল। অর্থাৎ বাঙ্গালী বলে আলাদা একটা জাত থাকবে কেমন করে? সবই পাকিস্তানী। কাজে কাজেই বাঙ্গালীত্ব শেষ করে দিতে হবে।

মুসলিম শাসনের তিরোধানের পর সংস্কৃত পণ্ডিতরা আরবী ফার্সি শব্দ বাংলা ভাষা থেকে বিতাড়ণের প্রচেষ্টা চালান। ফলে সহজ ও সুন্দর বাংলা দুর্বোধ্য ও কদাকার হয়ে যায়। জনসাধারণ এ ভাষা বুঝতে পারে নাই। তারা ঘোর বিরোধিতা করে। এই অপচেষ্টাকে বাংলা ভাষার উপর অন্যায় অত্যাচার বলে তারা মনে করে। তাদের আন্দোলনের ফলেই এই সংস্কৃতকরণ বেশীদিন টিকে থাকতে পারে নাই। অল্প দিনের মধ্যেই সংস্কৃত-বিবর্জিত সহজ ও সরল ভাষায় সাহিত্য-রচনার কাজ শুরু হয়ে যায়। অনেক হিন্দু লেখকও স্বীকার করেছেন যে জোর করে প্রচলিত শব্দ উৎখাত করে নতুন সংস্কৃত বা অন্য কোন শব্দ প্রয়োগ ভাষার সমৃদ্ধির অন্তরায়। এই প্রসংগে এ কথাও বলেছেন যে আরবী ফার্সি শব্দ আমাদের বাংলা-ভাষায় স্থায়ীভাবে আসন দখল করেছে।

এতকাল পরে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে। একদল জোর করে সংস্কৃত শব্দ আমদানী করার পাঁয়তারা করছে; অন্যদল জবরদস্তী ফার্সি আরবী শব্দ নতুন করে আমদানী করার কসরৎ চালাচ্ছে। বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে তুলছে উভয় দলই।

ভাষা ও সংস্কৃতির ব্যাপারে সরকারও আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে বলে মনে হয়। অবাঙ্গালীরা বাংলা ভাষাকে সুনজরে দেখে না। এটা হিন্দুর ভাষা বলেই তারা রায় দিয়ে ফেলেছে। পূর্ব পাকিস্তানীদের সত্যিকার ইসলামী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতে হলে তাদের এই হিন্দুর ভাষা পরিত্যাগ করাতেই হয়। জাতীয় সংহতির ব্যাপারেও এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পূর্ব-পাকিস্তানীদের ঈমান ও দেশপ্রেম কমজোর এ কথা গোড়া থেকেই শুনে আসছি। এর উপর যদি হিন্দুর সাথে তার ভাষা ও সংস্কৃতিগত সম্পর্ক ও যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন থাকে, তা হলে তার

ভিতরে দেশ-প্রেম ও ধর্মের প্রতি আকর্ষণ কোন দিনও ফুটে উঠবে না। পূর্ব-পাকিস্তানী চিরদিন হিন্দুর কাছে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেছে, তাদের অনুগত রয়েছে—সুতরাং তাদের প্রভাব আজও তারা ভুলতে পারে নাই। এ সব অভিযোগ পশ্চিম-পাকিস্তানীরা সব সময়েই করে থাকে। তাই দৃঢ় হস্তে তাদের শোধরাবার চেষ্টা করতে হবে।

মন্ত্রী শাহাবুদ্দিন ঘোষণা করলেন, রবীন্দ্রনাথের গান পাকিস্তানে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। এই উক্তির পক্ষে ও বিপক্ষে বেশ বাদ-প্রতিবাদ হল। খাজা শাহাবুদ্দিন ধূর্ত রাজনীতিক। চট্ করে সুর বদলায়ে পাকিস্তানের আদর্শ ও সংস্কৃতির উল্লেখ করে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করেন।

খাজা শাহাবুদ্দিন বাঙ্গালী বলে দাবী ত করেনই না, ঢাকার নবাবরা পাঁচ ছয় পুরুষ এখানে বাস করার পরও বাঙালী বলে পরিচয় দিতে ঘৃণাবোধ করেন। এখন যা' অবস্থা তাতে বাঙ্গালী থেকে যত দূরে বলে প্রমাণ করতে পারবে, সে ত সত্যিকার পাকিস্তানী বলে গৃহীত হবে।

রাজনীতিক সরকারের আমলে খাজা শাহাবুদ্দিন একবার তথ্য ও বেতার মন্ত্রী হয়েছিলেন। বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে উর্দু-বাংলার সংমিশ্রণে অদ্ভুত একটা নতুন ভাষা সৃষ্টি করে তিনি রেডিওতে চালু করার চেষ্টা করেন। সব কথা মনে নাই। সংবাদ ঘোষণার সময়, একজন পড়ল: পিছলে এত্তোয়ার খান গাফ্ফার খাঁর লড়কা গ্রেফতার হয়েছেন.........হুকুমতে হায়দরাবাদ হুকুমত হিন্দুস্থানের খেলাফে জং ও জেহাদের ইরাদা জাহির করেছেন। এই রকমেরই জগা-খিচুড়ি। দু'দিন পরই য়ুনিভার্সিটির ছাত্ররা একদা রেডিও অফিস ঘেরাও করে এবং ইট-পাটকেল ছুঁড়ে ভাষার উপর জং জেহাদের খায়েশ মিটায়ে দেয়। খাজা শাহাবুদ্দিনের অতঃপর শুভবুদ্ধির উদয় হয়।

দেখাদেখি, সবুর খাঁও (খুক্তি—খানে সবুর) জবরদস্ত পশ্চিমা মুসলমান হয়ে গেলেন। তিনি একদিন ঘোষণা করলেন, পয়লা বৈশাখ হিন্দুর পর্বদিন। এটা বাঙালী মুসলমানের কিছু নয়। হিন্দু মুসলমান ব্যবসায়ীবা বাংলা বছরের পয়লা দিন হাল-খাতার উৎসব করে। হিন্দু পূজা-অর্চনা করে, মুসলমানরা মিলাদ-মহফিল করে নতুন খাতা লিখে। এই সামান্য ব্যাপারে তিনি বিবৃতি দিয়ে ফেললেন। প্রমাণ করতে চান তিনি বাঙ্গালী নন। কারণ বাঙ্গালী আর পাকিস্তানী শব্দ দু'টি পরস্পর-বিরোধী। অর্থাৎ বাঙালী হলে পুরাপুরি পাকিস্তানী নয়, আর যে খাঁটি পাকিস্তানী সে বাঙালী হতেই পারে না। সবুর খাঁ বাঙ্গালীত্ব বাদ দিয়ে উচ্চমার্গে উঠে গিয়েছেন।

গভর্ণর মোনায়েম খাঁও বাদ যাবেন কেন? তিনিও শরীক হয়েছেন এই বিতর্কে। তিনি গভর্ণর, সবই নিয়ন্ত্রণ করেন। সব ব্যাপারেই তাঁর একটা বক্তব্য থাকতেই হবে। তিনি 'আদাব' বলতে নিষেধ করেন—ওটা ইসলামী নয়। গলায় ফুলের মালা ইসলাম-বিরোধী। ছোট-ছোট মেয়েরা কপালে টিপ দেয়, তিনি বলেন কপালে সিন্দুর দেওয়া হিন্দুরীতি। হিন্দুরা কপালে দেয়না, সিঁথিতে সিন্দুর দেয়, এটা তিনি এত শীঘ্র কেমন করে ভুলে গেলেন। রীতিমত ফতোয়া দিচ্ছেন। তাঁর প্রভু খলিফা হলে তিনি ত নায়েব-খলিফা। ফতোয়া দিবার অধিকার আছেই ত। এ দেশে সবই যদি সম্ভব হতে পারে, তা হলে মোনায়েম খাঁ সংস্কৃতি সভ্যতার সবক দিবেন, এতে আশ্চর্য হবার কি আছে? এখানে সব হাঁসই রাজহাঁস।

এই সব হট্টগোলে পূর্ব-পাকিস্তানের নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতি সভ্যতা গান-গীতি সবই বিপর্যস্ত হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। স্বাধীনতা অর্জনের অর্থই ছিল নিজ নিজ ভাষা, সংস্কৃতি আচার অনুষ্ঠানের উন্নতি সাধন। বাইরের প্রভাব থেকে মুক্তি-লাভ।

পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় সংস্কৃতি-সভ্যতা, আচার-অনুষ্ঠানে ভাষার ক্রম-বিকাশের ধারা বিভিন্ন ধরণের। পূর্ব-বাংলায়ও একাধিক কথ্যভাষা প্রচলিত রয়েছে। আচার-অনুষ্ঠানের পার্থক্য রয়েছে। সংহতির নামে জোর করে একই ভাষা, সংস্কৃতি-সভ্যতা, আচার অনুষ্ঠান গান-গীতি সৃষ্টি করা হঠকারিতারই নামান্তর। এ সব দ্বারা সংহতি না হয়ে তুমুল সংকট সৃষ্টি হয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। নিজের ভাষাও সংস্কৃতি সভ্যতা পরিত্যাগ করে কোন দেশ বা জাতি বড় হতে পারে নাই।

এই সব পরিবর্তনের আবর্তে মানুষের চিন্তাধারা অপরিচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। জ্ঞানবুদ্ধি দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছে। স্বৈরাচারী আমলে চিন্তাধারা বিকাশ প্রকাশের পথ অবরুদ্ধ থাকার ফলে সাধারণতঃ জ্ঞানবুদ্ধি আড়ষ্ট হতে বাধ্য। জ্ঞানবুদ্ধির কোন মর্যাদা বা স্বীকৃতি দেওয়া হয়না বলে প্রতিভার স্ফুরণ সম্ভবপর হয় না। এক ব্যক্তি দেশের ভালমন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ, মঙ্গলামঙ্গলের দায়িত্বভার নেওয়ার ফলে আর কারও কিছু করার আছে বলে কেউ মনে করে না। শাসক তাঁর অতি উর্বব মস্তিষ্ক প্রসূত নিজস্ব পন্থাপদ্ধতি প্রবর্তন করেন এবং সেই প্রথা অনুসারে দেশের সার্বিক কল্যাণ-সাধনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বলে দাবী করেন। যাঁরা এই পন্থা পদ্ধতির সাথে নিজেদের বিচার বুদ্ধি খাপ খাওয়াযে নিতে পারেন তাঁরা কৃতিত্ব লাভ করেন। কিন্তু যাঁরা স্বাধীন চিন্তাবিদ, তাঁরা স্বভাবতই মনে করেন তাঁদের চিন্তাধারার কোন মূল্য কেউ দেবে না—অযথা চিন্তা করে লাভ কি? রাষ্ট্রের অধিনায়কের পছন্দসই না হলে তিনি যত জ্ঞানগর্ভ চিন্তাধারাই প্রকাশ করেন না কেন, তা গ্রহণীয় বা গ্রহণযোগ্য হবে না। একাই তিনি চিন্তামগ্ন। অন্যের চিন্তা করা অনধিকার চর্চা।

তা' ছাড়া, জ্ঞানবুদ্ধি খর্ব করার প্রয়োজনে বিশেষ ব্যবস্থার

ত্রুটিও তিনি রাখেন নাই। বিভিন্ন সংস্থা সৃষ্টি করে তারই মাধ্যমে, তাঁর নিজস্ব মতাবলম্বী সুধীজনের মারফত জ্ঞানবৃদ্ধি বিকাশ ও প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। লেখক সঙ্ঘ, ইসলামিক অ্যাকাডেমি, জাতীয় পূর্ণগঠন সংস্থা, পাকিস্তান কাউন্সিল ইত্যাদি শিক্ষা সংস্কৃতি ও ধর্ম বিষয়ক উন্নয়ন সাধনের এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকলের চিন্তাধারার অবসান ঘটানেব দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। বাংলা অ্যাকাডেমি রাজনীতিক আমলে স্থাপিত হয়ে থাকলেও সে আমলত আব এখন নাই। সুতরাং তাবাও ক্রমে ক্রমে মহাজনেব পন্থা অবলম্বন করে বর্তমান আমলের নীতির অনুসরণ করে চলেছে।

শিক্ষিত সমাজেব চিন্তাধাবা ও জ্ঞানবুদ্ধি এত দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছে যে ভাবলে মনে আতঙ্কেব সৃষ্টি হয়। বিশ্ব বিদ্যালয়ের বড় বড় ডিগ্রিধারীরা অতি অল্প মূল্যে নিজেদের মাথা বিক্রি করে ফেলেছেন। কেউ কেউ শুধুমাত্র পশ্চিম-পাকিস্তান যাতায়াতের রাহা-খরচেব প্রতিদানে সবকাব পক্ষে যে কোন প্রবন্ধ লিখে সরকারের গুণগান, তাদেব সৃজিত নব বিধানেব ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপকরা মৌলিক গণতন্ত্রেব গুণাবলী ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করে বড় বড় প্রবন্ধ লিখে ফেলেছেন। এ সব মৌলিক গবেষণাব ফল সন্দেহ নাই। অনেক আদর্শবাদী ব্যক্তি রাতারাতি আদর্শে জলাঞ্জলি দিয়ে ব্যক্তিগত উন্নয়নে জীবন উৎসর্গ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন। শিক্ষা-দীক্ষার মহিমা মসীলিপ্ত করে ফেলছেন।

একজন অধ্যাপক কথা প্রসঙ্গে স্বীকার করলেন, জনাব, কি আর করা যায়? রুটি রুজির প্রশ্ন। আর একজন প্রাক্তন অতি প্রগতিবাদী খ্যাতনামা অধ্যাপক বললেন, শেখ মুজিব আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একদিন ঠাট্টা করে বললেন, তোমার হাত কেটে ফেলা উচিত—যা' সব লিখ। বললাম, ভাই, আর যাই কাট, হাত

কেটোনা। তোমাদের আমলে ঐ হাত দিয়েই তোমাদের কথা লিখতে হবে! নইলে আর কে লিখবে?

দেশের বিপ্লব ও পরিবর্তনের সবচেয়ে ভয়াবহ ও মারাত্মক পরিণতি হয়েছে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির অধঃপতন—ইন্‌টেলেকচুয়্যাল ডিজেনারাশান। এত দ্রুত গতিতে নেমে যাচ্ছে যে রোধ করা দুরূহ। এই অধঃপতনের গোড়া হচ্ছে ভীতি—ত্রাস। ভয় থেকে মুক্তি-লাভ না হলে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ অসম্ভব। বর্তমান আমলের সরকারী দর্শন হচ্ছে মানুষকে জ্ঞানহারা বুদ্ধিহারা করে রাখা।

পাকিস্তানের—বিশেষ করে পুর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ—অতি সাধারণ ও অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন এটা প্রতিপন্ন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হচ্ছে। তারা চিরকাল পরাধীন ও পরপদানত থাকার দরুণ স্বকীয় স্বত্বা বিকাশের সুযোগ পায় নাই, একথা স্বয়ং আয়ুব খাঁ অনেকদিন আগেই বলেছেন। বর্তমানে এই অভিমত কার্যতঃ প্রমাণ করা দরকার। তাই নানা পন্থা ও প্রক্রিয়া আবিষ্কার করা হচ্ছে। সরকারী সংস্থার কর্মকর্তারা খোদ কর্তা ও তাঁর সামন্তদের মতবাদের অনুসারী। তারা এই ব্যাপারে আগ্রহের সাথে প্রবৃত্ত হয়েছে।

রেডিও টেলিভিশনে নানা ধরণের অনুষ্ঠান, নকশা, আলেখ্য, ও নানা ধরণের বিষয়বস্তু দেখান হয়। বিদেশী গল্প ছবি, বা আলেখ্য ছাড়া দেশী যে সব দেখান হয়, তা অতি সাধারণ, তুচ্ছ ও নগণ্য। নাটক অভিনয় ও গল্প খুব নিম্ন ধরণের। কৌতুকাভিনয় অনেকের তরে উপভোগ্য—কিন্তু তারও মান উচ্চধরণের নয়। কোমলমতি বালক-বালিকাদের খেলাধুলার মাধ্যমে যে সব ব্যাপারে শিক্ষা দেওয়া হয় তাও হাস্যাস্পদ। গ্রামের অশিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা বিনা চেষ্টায় যে সব ব্যাপারে জ্ঞান লাভ করে, শহরে অর্থব্যয় করে সেই সব ব্যাপর টেলিভিশনে শিক্ষা দেওয়া হয়।

ধরেই নেওয়া হয়েছে যে, এই সব বালক-বালিকা এ সবের কিছুই জানেনা। তাদের সহজাত জ্ঞানবুদ্ধিও কিঞ্চিত বিকাশ লাভ করে নাই। তরুণ-তরুণীদের এমন কি কলেজ-য়ুনির্ভাসিটির ছাত্রদের জন্য যে সব বিশেষ অনুষ্ঠান করা হয়, তা হয়ত হাস্যরসের খোরাক জোগাতে পাবে এবং সময়ও কিছু নষ্ট করতে পারে, কিন্তু তাতে তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি বৃদ্ধি পায় কিনা তা বলা কঠিন।

এই সব দেখে শুনে মানুষের প্রকৃত বিদ্যা ও জ্ঞানার্জনের স্পৃহা দিন দিন কমে যাচ্ছে। সেই সব ব্যবস্থার মৌলিক ভিত্তি ও স্থাপন করাব চেষ্টা আজ পর্যন্ত করা হয নাই। তাই, সত্যিকার জ্ঞানলাভের আগ্রহ কমে যাচ্ছে। নকল করে; তদবীব করে বা কোন প্রকারে পাশ করে ডিগ্রী বা চাকুরী হাসিল করার আগ্রহ অতি প্রবল হয়ে দেখা দিচ্ছে। অপদার্থ ও নগণ্য ব্যক্তিরা বিশেষ বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান-অভিজ্ঞতা ত্যাগ-তিতিক্ষা ছাড়াই নানাদিক দিয়ে বড় বড় চাকুরী সম্মান মান মর্যাদা লাভ করছে। একটু কায়দা করে সরকারের সাথে লেগে থাকতে পারলেই চরম ও পরম লাভ। বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন কোথায়? অনেকেই এই সোজা রাস্তা বেছে নিয়েছে। অনর্থক অর্থব্যয় করে বিদ্যালাভ জ্ঞানলাভ করে কি লাভ? তাই অন্যপথ বাদ দিয়ে অনেকেই এই রাজপথের দিকে ছুটে চলেছে। এই পথেই সিদ্ধিলাভ।

স্বৈরাচারের শেষ দশা

আয়ুব শাহীর ন' বছর প্রায় শেষ হবার সাথে সাথে আমার এই বই লেখাও শেষ হয়ে যায়। বই প্রেসে যাবে, এমন সময় পর পর কয়েকটি ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটে গেল যার উল্লেখ না করলে স্বৈরাচারের প্রকৃত রূপ জনগণ উপলব্ধি করতে পারবে না। বই ছাপা স্থগিত রইলো। দুর্ঘটনা প্রবাহে আমরা সবাই ভেসে গেলাম।

আটষট্টি সালের ৬ই জানুয়ারী হঠাৎ সংবাদপত্রে একটি অতি চাঞ্চল্যকর লোমহর্ষক খবর প্রচারিত হয়। পরিবেশন করেছে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতর। পাকিস্তানকে ধ্বংস করার এক বিরাট ষড়যন্ত্রের কাহিনী। বাংলাকে পাকিস্তান থেকে আলাদা করার প্রচেষ্টার অপরাধে আটাশ জন গ্রেফতার করা হয়েছে। কেউ ভারতীয় দূতাবাসের জনৈক মিঃ ওঝার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে; কেউ কেউ আগরতলা গিয়ে লেঃ কর্ণেল মিশ্র, মেজর মেনন ও অন্যান্যদের সাথে পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করেছে।

খুব ঢোল-ঢাক পিটায়ে এই সংবাদ প্রচার করা হল। জানা গেল, সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর বিভিন্ন স্তরের কতিপয় বাঙ্গালী কর্মচারী, দুইজন সি. এস. পি ও কিছু বেসামরিক কর্মচারী ও ব্যক্তি বিশেষ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

আমাদের দেশের খবরের কাগজের প্রতিক্রিয়া তীব্র ও কঠিন। পশ্চিম পাকিস্তানের সংবাদপত্রের অনুকরণে তারা খুব গালি গালাজ করল। আহম্মকের দল গেল বাঙ্গালাকে আলাদা করতে —পাকিস্তান ধ্বংস করতে। ইত্যাকার মন্তব্য চলল কয়েক দিন। কেউ কেউ মনে করল, পিণ্ডি ষড়যন্ত্রের মতই এটাও সত্যি সত্যি একটা ষড়যন্ত্র।

আর সবাই মনে করল আয়ুবী চাল। পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হতে চায় এই ধূয়া তারা বহুকাল আগে থেকেই তুলেছে, পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে। তাদের দাবী দাওয়া যতই জোরদার হয়েছে, অর্থনৈতিক ও সর্ব প্রকারের বৈষম্যের কথা তারা যতই উচ্চরবে প্রকাশ করেছে, আয়ুব খাঁ ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা ততই জোরদার করেছে তাদের এই অভিযোগ। শেষ কালে যখন দেখা গেল, মিথ্যা অভিযোগে পূর্ব পাকিস্তানীদের দমন করা সম্ভব নয়, তখনই এই চরম অস্ত্র নিক্ষেপ করা হল।

এরই নাম দেওয়া হ'ল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। হওয়া উচিৎ ছিল পিণ্ডি ষড়যন্ত্র মামলা। কারণ ওখান থেকেই ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত। গল্পের সারাংশ হ'ল পাকিস্তানের একটি অংশ (পূর্ব-পাকিস্তানকে) পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করা; ভারতীয় অস্ত্র-শস্ত্রের সাহায্যে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা; এই উদ্দেশ্যে প্রতিরক্ষা বিভাগের কেন্দ্রগুলিকে পঙ্গু করে দেওয়া ও সেনা বাহিনীর প্রাক্তন কর্মচারী ও বেসামরিক কর্মচারীদের দলভুক্ত করা, ভারত থেকে অস্ত্র আমদানী করার ও সাধারণ ভাবেও রাজনৈতিক অসন্তোষ সৃষ্টি করা ও বল প্রয়োগে নির্দ্ধারিত দিবসে ক্ষমতা দখল করা।

এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সাতষট্টি সালের বারই জুলাই তারিখে আগরতলা শহরে একটি বৈঠকও হয়।

ষড়যন্ত্র শুরু হয় চৌষট্টি সাল থেকে করাচী শহর ও বন্দরে। তারপর পয়ষট্টি সালেও চলতি থাকে। করাচী থেকে সদর দফতর স্থানান্তরিত হয় পূর্ব-পাকিস্তানে। তারপর বহু সংখ্যক বৈঠক বিভিন্ন স্থানে,—ঢাকা, চাটগাঁয় অনুষ্ঠিত হয়। বহু প্রাক্তন সৈনিককে দলভুক্ত করা হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। বিলাত থেকে নানা ধরণের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করার ব্যবস্থাও করা হয়। হাত বোমা যোগাড় করা হয়। যার একটা কোর্টে দাখিল করা হয় কিন্তু সেটা নয়।

উনিশে জানুয়ারী তারিখে শেখ মুজিবকেও এই মামলার আসামী ভুক্ত করে প্রচার করা হয়।

তারপর ঘোষণা করা হয় খোলা খুলিভাবে বিচার অনুষ্ঠান করা হবে। এই মোকদ্দমা ব্যাপারে কুৎসা প্রচারকারীদের সতর্ক করে দেওয়া হয়।

মাঝে মাঝে কেউ কেউ বলতে থাকে যে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শামসুর রহমান, সি, এস, পি কেও এই মামলায় জড়াবার চেষ্টা চলছে। শামসুর রহমান তখন ইন্দোনেশিয়ার জার্কাতা শহরে পাকিস্তান-ইন্দোনেশিয়া অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থার ডেপুটি সেক্রেটারী জেনারেল। প্রায় বছর খানেক আগে থেকেই সেখানে আছে। হঠাৎ খবর পেলাম যে পিণ্ডি থেকে প্লানিং কমিশনের এক সভায় উপস্থিত থাকার জন্য শামসুর রহমানকে টেলিগ্রাম করায় সে পিণ্ডি রওয়ানা হয়ে গেছে। তার পরই শোনা গেল, শামসুর রহমানকে আসামী শ্রেণীভুক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই শুনে আমি পিণ্ডি চলে যাই এবং প্রায় আট দিন সেখানে থাকি। জানতে পারি, তাকে এই মোকদ্দমার সরকারী পক্ষে সাক্ষ্য দেবার জন্য খুব জোর পীড়াপীড়ি ও তদ্‌বীর চলছে। সরকারী উচ্চ পদস্থ দু'এক জন কর্মচারীর সাথে আমার দেখা হয় এই প্রসঙ্গে। তারা এই ব্যাপারে শামসুর রহমানকে উপযুক্ত পরামর্শ দেবার জন্য আমাকে অনুরোধ করে। আমি বলি, শামসুর রহমান নাবালক নয়, সে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তবে সরকার পক্ষের সাক্ষী সে হতেই পারে না। শামসুর রহমানের সাথে দেখা হওয়ার সাথে সাথেই সে বলে উঠল, এ প্রশ্নই উঠতে পারে না, আমি কিছুই জানি না কি সাক্ষ্য দেই? আমাকে একদম মিছামিছি জড়ান হচ্ছে। আমি চলে আসার পরদিনই তাকে গ্রেফতার করে ঢাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

কোথায় বিচার হবে, কবে বিচার হবে, কোন আইনের আওতায়

বিচার হবে, আর্মি অ্যাক্ট অনুযায়ী হবে, না সাধারণ আদালতে হবে,…এই নিয়ে খুব আলোচনা কয়েকদিন চলল। আসামীদের রাখা হল ক্যান্টনমেন্ট অফিসার মেসে। সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ। জি-ও-সির কাছে অনুমতি চাইলাম। তিনি বললেন, তদন্তকালে সাক্ষাৎ করা সম্ভব হবেনা। প্রায় মাস দুই পর চিঠিপত্র আদান-প্রদানের অনুমতি পাওয়া গেল।

মে মাসে ঘোষণা করা হল, জুনমাসে ক্যান্টনমেন্টের ভেতর বিচার অনুষ্ঠিত হবে। স্পেশাল ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়েছে। বিচারপতি এস-এ-রহমান, চেয়ারম্যান, এম-আর খান ও মকসুমুল হাকিম বিচারপতিদ্বয় সদস্য নিযুক্ত হয়েছেন।

জুন মাসের উনিশ তারিখে প্রথম বৈঠক হয়। তার পরই সময়ের প্রার্থনা জানান হয়। পরবর্তী তারিখে বিচারকার্য শুরু হয়। মোট পঁয়ত্রিশ জন আসামী কাঠগড়ায়। এর মধ্যে শেখ মুজিবর রহমান, তিনজন সদস্য সি-এস পি অফিসার, সেনা বিভাগের পাঁচজন ক্যাপ্টেন, একজন মেজর, নৌবিভাগের একজন লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার, দুইজন লেফটেন্যান্ট, বিমান বাহিনীর পাঁচজন সার্জেণ্ট, নৌ-বাহিনীর কয়েকজন ষ্টুয়ার্ড ও অন্যান্য প্রাক্তন সুবেদার, হাবিলদার ও কিছু সংখ্যক বেসামরিক ব্যক্তি।

বিচার শুরু হওয়ার প্রথম দিনই আসামীদের বক্তব্য শোনা হল। সকলেই নির্দোষ বলে গেল। শেখ মুজিবকে পরামর্শ দিয়েছিলাম, তিনি যেন বলেন, সমস্ত ঘটনা মিথ্যা-বানোয়াটি, পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। তিনি তা না-বলে, বললেন, এটা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র।

প্রমাণ পাওয়া গেল বহু লোককে অমানুষিক ও বর্বরোচিত অত্যাচার করে স্বীকারুক্তি আদায় করা হয়েছে। তাদের অনেককেই রাজসাক্ষী করা হয়েছে। এর মধ্যে ছিল ক্যাপ্টেন, সার্জেন্ট, নৌ ও বিমান বাহিনীর মাঝারি ও ছোটখাট কর্মচারী। তারা সরকারী

ষড়যন্ত্রকারীদের পরামর্শ অনুযায়ী যা খুশী তাই গল্প বানায়ে সাক্ষ্য দেয়। মোটমাট প্রায় আড়াই শ' লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

সাক্ষ্য প্রমাণে দেখা গেল একটা বিরাট প্রহসনকে বিরাট ষড়যন্ত্রের নামে চালায়ে দেওয়া হয়েছে। টাকা পয়সা আদান প্রদানের গল্প অবিশ্বাস্য। আগরতলা যাওয়ার গল্পও হাস্যকর। এখান থেকে যে দুইজন আসামী গেল ষড়যন্ত্রকারীদেরপক্ষ থেকে তাদের একজন আলী রেজা, ব্যবসায়ী, অন্যজন ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান। তারা ফিরে আসে ব্যর্থ হয়ে, কারণ অপর পক্ষ নাকি বলে যে এই ধরণের লোকদের সঙ্গে তারা আলাপ করতে রাজী নয়। অথচ এদের যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে তাদের দূতাবাসের কর্মচারী। তারা কি এদের চেনে না? তারপর আগরতলা যাওয়ার ব্যাপারে যে সাক্ষ্য দিল কয়েকজন, যারা আগরতলার রাস্তা ধরায়ে দিল, তাদের রাস্তা সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই ছিল না। এসব জেরায় প্রমাণিত হল। তারপর বিভিন্ন বৈঠকে আলোচনা প্রসঙ্গে—যে সব রাজসাক্ষী সাক্ষ্য দিল তারা যা খুশী বলে দিল। সময়, দিন, তারিখ সম্বন্ধে অদ্ভুত উদ্ভট ও অবিশ্বাস্য বর্ণনা দিয়ে গেল।

সাক্ষ্য প্রমাণ আলোচনা করলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই মোকদ্দমা জন্ম লাভ করেছিল বিরাট ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে, তারা একটা বিরাট প্রহসনের আয়োজন করেছিল না হয় নেহাত ছেলেমানুষী করেছিল।

দেশ বিভক্ত করার চেষ্টা বা ভারতের সাহায্য গ্রহণ করার পরিকল্পনা, অস্ত্রশস্ত্র আমদানী—সব ব্যাপারটা একটা নিছক পাগলামীর শামিল। হয়তো এরা ঘরে বসে গল্প করেছে কিংবা পাকিস্তানের বিপুল বৈষম্যের বিরুদ্ধে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি একটানা অবিচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করেছে। আর গোয়েন্দা বিভাগ সেটাকেই একটা বিরাট ষড়যন্ত্র মনে করে মামলা

চালাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অথচ এই প্রহসনে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়ে গেল।

আগরতলা মামলার সাক্ষ্য প্রমাণ সংবাদপত্রে প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে মানুষের মন বিষাক্ত হয়ে উঠল। বাংলার মানুষ বুঝতে পারল কত বড় ষড়যন্ত্র উদ্ভাবন করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। আয়ুবশাহীর আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে আসছে, একটা মরণ কামড়ের চেষ্টা ছিল এই ষড়যন্ত্রে।

আর একটি দুর্ঘটনা হল, আয়ুব খাঁ কর্তৃক উন্নয়ন দশক বা ডিকেড অব ডেভেলপমেণ্ট পালনের উদ্যোগ। আয়ুব শাসনের দশম বছর আটষট্টি সালে পুরা হবে, তাই দশ বছর দেশের উন্নতির স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য এই আয়োজন। সবাই যার নাম দিয়েছে ডিকেডী আমল। দশ বছরে মানুষের বুকে জগদ্দল পাথর চাপায়ে চরম অপমান, অত্যাচার, নির্যাতনে প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তুলেছে। মানুষের মন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে এটা বুঝতে পেরেই এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান। মিথ্যা অতিরঞ্জিত তথ্য প্রকাশই এই অনুষ্ঠানের ভিত্তি। বশংবদ ভৃত্যের দল সমস্ত কাজ বাদ দিয়ে এই পর্বের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বক্তৃতা, বিবৃতি ত আছেই, সরকারী কাগজ-পত্র, লেফাফা ষ্ট্যাম্প, টেলিগ্রাম, মনিঅর্ডার ফর্ম সবার মাথায় উন্নয়ন দশকের ছাপ বসায়ে দেওয়া হল। অফিস-আদালত, দালান-কোঠা, ট্রেন, বাস এমন কি মানুষের বুকে পিঠে এই ছাপ লাগায়ে দেওয়া হল। রেডিও টেলিভিশন খোলা যায় না—বিসমিল্লাতেই আয়ুবের নাম উচ্চারণ করে শুরু করা হয় নির্লজ্জ, প্রচারের তুবড়ি।

শোনা যায়, আয়ুব খাঁ-ও নাকি মাঝে মাঝে লজ্জা বোধ করেন। হাজার হোক, মিথ্যা বরদাশ্‌ত করার ক্ষমতারও ত একটা সীমা আছে। জনগণ মনে করত এটা একটা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা।

কত কোটি টাকা এই নির্লজ্জ প্রহসনে অপব্যয় হল, তার

হিসাব কেউ জানেনা; কোন কালে জানবে কিনা তাও বলা যায় না।

মিথ্যা ও নির্লজ্জ প্রচারের চোটে মানুষ অশান্ত, অস্থির ও অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। তারপর যখন আগরতলা ষড়যন্ত্রের মামলার কাহিনী সংবাদপত্রে প্রচারিত হতে লাগল তখন ক্ষোভে দুঃখে মানুষ ফেটে পড়ল। তারা পরিষ্কার বুঝতে পারল, এই মোকদ্দমা সারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। তাদের জব্দ করার ফন্দি। তারাও তাই এর উপযুক্ত জবাব দেবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। অক্টোবর মাস থেকে দেশে সর্বত্র সর্ব মহলের মানুষ বিক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল। ছাত্র-সমাজ, উকিল ডাক্তার সবাই ক্ষেপে উঠল। তারা শোভাযাত্রা করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা শুরু করে দিল। নির্যাতিত মানুষ যে কোন পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়ল।

ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি বিনা কারণে সরকার একশ' চুয়াল্লিশ ধারা জারি করল; সভা শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ। আমরা সাব্যস্থ করলাম, এই নির্দেশ ভঙ্গ করতে হবে। একদা আমরা বায়তুল মোকাররমের সামনে থেকে সরকারী নির্দেশ লঙ্ঘন করে শোভাযাত্রা নিয়ে বার হয়ে পড়লাম। পুলিশ আমাদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য রঙ্গীন কালী ছিটাতে লাগল। অনেকের গায়ে সে রং লেগে রইলো। এই প্রথম চুয়াল্লিশ ধারা সরাসরি ভঙ্গ করা হল। তারপর থেকেই দেশে আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। সর্বত্র মিছিল, শোভা যাত্রা, আইন ভঙ্গের হিড়িক পড়ে গেল। ধর-পাকড়ও শুরু হয়ে গেল। সারা দেশ গণ-আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। ছাত্র-সমাজ এগার দফার ভিত্তিতে ষ্টুডেন্টস্ অ্যাক্শন কমিটি গঠন করল। তারই মাধ্যমে সর্বত্র আন্দোলন চলতে লাগল।

পশ্চিম-পাকিস্তান, যেখানে কোন আন্দোলন কোলাহল হয় না, সেখানেও ছাত্র-জনতা সারি বদ্ধ হয়ে আন্দোলন শুরু করে। হয়-

রোজ মিছিল, শোভাযাত্রার মাধ্যমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল। বেপরোয়া হয়ে ধর-পাকড়, লাঠি, গুলি—সব অস্ত্র এক সঙ্গে চালু করে দিল। ঢাকা শহরে একটি ছাত্র-মিছিলে পুলিশের গুলিতে বিশিষ্ট ছাত্র নেতা আসাদ শহীদ হল।

এর পূর্বে অক্টোবর মাসে আয়ুব খাঁ কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। বাঁচেন কি মরেন এই অবস্থা। বেশ কিছু দিন সাধ্যমত চিকিৎসার ফলে তিনি বেঁচে উঠলেন। সবাই ভাবল, এরপর তিনি দেশের পরিস্থিতি ভেবে দেখবেন এবং যথাবিহিত ব্যবস্থা করবেন। তা তিনি আদৌ করেন নাই।

উনসত্তর সালের পয়লা ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট আয়ুব ঘোষণা করলেন, রাজনৈতিক নেতাদের সাথে তিনি আলাপ আলোচনা করতে চান। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আট দফা আদায়ের দাবীতে একটা সংস্থা স্থাপন করলেন। নাম দিলেন ডেমোক্রেটিক্ অ্যাকশন কমিটি, সংক্ষেপে ড্যাক বা ডাক। আয়ুব খাঁকে তাদের মুখপাত্র জানায়ে দিলেন, আলোচনায় তাঁরাও রাজী।

আয়ুব খাঁ পাঁচ তারিখে ডাকের চেয়ারম্যান নবাবজাদা নসরুল্লাকে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের যোগ্য নেতৃবৃন্দের নাম তাঁর কাছে পাঠায়ে দেবার জন্য আমন্ত্রণ দিলেন।

নসরুল্লাও নিজের ইচ্ছামত লোকের নাম পাঠায়ে দিলেন। আমি রোগশয্যায় চলৎশক্তি রহিত, সেই কারণেই হোক কিংবা বৈঠকে যোগদানের অযোগ্য বলেই হোক, আমার নাম তিনি পাঠান নাই। সেটা বড় কথা নয়। নিমন্ত্রণ পেলেও আমার যাওয়ার শক্তি ছিল না। কিন্তু সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের কোন নেতা বা মহিলাদের কাউকে নিমন্ত্রণ না করায় এই বৈঠক অসম্পূর্ণ ও অযোগ্য হয়েছিল। বুঝা গেল, উভয় পক্ষে যুক্তি করেই এই বৈঠকের ব্যবস্থা। এর মধ্যে একদা আয়ুব খাঁ ঘোষণা করলেন, তিনি আর প্রেসিডেন্ট পদের প্রার্থী হবেন না। বিস্ময় কি? হঠাৎ

এই বৈরাগ্য। ভেবেছিলেন, এতে হয়তো মানুষের কিছুটা সহানুভূতি পেতে পারেন কিংবা তাঁর প্রতি ক্ষোভের উপশম হতে পারে। কোনটাই হল না। মানুষ আরও গরম হয়ে উঠল।

গোল টেবিল বৈঠকের দিন ধার্য করা হল। ন্যাপের মৌলানা ভাসানী ও পিপলস পার্টির ভুট্টো যোগদান করলেন না। সরকারী পক্ষ থেকে খুব তদ্‌বীর চলতে লাগল শেখ মুজিবর রহমানকে যোগ দেওয়ার জন্য। তাকে ছাড়া গোল টেবিল বৈঠক অসম্পূর্ণ থাকে। কিন্তু শেখ মুজিব তখন আগরতলা মামলায় আটক। কেমন করে যেতে পারে। তাকে প্যারলে অর্থাৎ জামিনে মুক্তি দিয়ে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত হতে লাগল। আমরা শেখ মুজিবকে বললাম, তা হতে পারে না। গোল টেবিল বৈঠক থেকে ফিরে এসে আবার কাঠগড়ায় দাঁড়ান যাবে না। মোকদ্দমা প্রত্যাহার করতে হবে।

ইতিমধ্যে আয়ুব খাঁ ঢাকায় এক ঘোষণা জারি করলেন, মামলা প্রত্যাহারের প্রশ্নই উঠে না।

খুব টানা-হ্যাঁচড়া চলল। মাণিক মিয়া শেখ মুজিবকে প্যারলে যাওয়ার জন্য রাজী করালেন। আমি মাণিক মিয়ার বাড়ীতে গিয়ে প্রতিবাদ করি। তিনি বলেন, আয়ুবের নাক-কান কেটে হাত-পা ভেঙ্গে তাঁর সাথে কিসের দরবার করবেন আপনারা? বরং শেখ মুজিব সেখানে গিয়ে দাবী করতে পারেন যে মোকদ্দমা না উঠায়ে নিলে তিনি যোগদান করবেন না। তা হলে তার কদর আরও বেড়ে যাবে, ইত্যাদি।

অন্যদিকে আগরতলা ষড়যন্ত্রের অন্যান্য আসামীরা তীব্র প্রতিবাদ জানাল। এই ভাবে প্যারলে যাওয়া কিছুতেই উচিত হবে না। শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিব প্যারলে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন।

এরই মধ্যে দু'টি কাণ্ড ঘটে গেল। আগরতলা মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে বন্দী অবস্থায় ক্যান্টন-

মেণ্টের ভিতর বিনা কারণে গুলি করে হত্যা করা হয়। অন্য একজন সার্জেণ্ট ফজলুল হক্‌কেও গুলি করেছিল, কিন্তু বহু চেষ্টার ফলে সে বেঁচে যায়। হত্যার কারণ বলা হয়, এরা উভয়ে দুইজন রাইফেলধারী সান্ত্রীর রাইফেল কেড়ে নিবার চেষ্টা করেছিল।

কি নির্লজ্জ কৈফিযৎ! খালি হাতে দু'টি নিরীহ আসামী রাইফেলধারী সিপাহির হাতের রাইফেল কেড়ে নেবার চেষ্টা করবে! পাগল ছাড়া কেউ একথা বিশ্বাস করতে পারে না। অথচ সামরিক বাহিনীর উপরস্থ কর্মচারীরা এই কৈফিযৎ বিশ্বাস করে নিল।

পরদিন সার্জেণ্ট জহুরের লাশ মিছিল করে পণ্টন ময়দানে নিয়ে সেখানে জানাজা হয়। জানাজা শেষ করে লাশ কবরস্থানে নেবার সময় দেখতে পেলাম স্থানে স্থানে আগুন জ্বলছে। দেখতে পেলাম মন্ত্রীর বাড়ীতে আগুন। আর আগরতলা মামলার প্রধান বিচারক বিচারপতি এস. এ. রহমান যে সরকারী বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন সে বাড়ী দাউ দাউ করে জ্বলছে। বিচারপতি অতি কষ্টে এক কাপড়ে পিছন দুয়ার দিয়ে বার হয়ে ক্যাণ্টনমেণ্টে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরদিন তিনি চলে যান। যাবার প্রাক্কালে এক সাক্ষাৎকারীর নিকট বলেন, তিনি বিচারপ্রার্থী একজন আসামীকে রক্ষা করতে পারেন নাই, এ অবস্থায় তিনি আর এই মোকদ্দমায় ফিরে আসবেন না।

পরদিন রাত্রে খবর পাওয়া যায়, রাজশাহীর একজন প্রফেসর ডাঃ শামসুদ্দোহাকেও সিপাহীরা নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেছে। তিনি সংগ্রামরত ছাত্রদের বুঝায়ে তাদের আবাসে চলে যাবার জন্য অনুরোধ করছিলেন, সেই সময় তাঁকে হত্যা করা হয়। এই সংবাদে সারা দেশে আগুন জ্বলে উঠে। ঢাকার নাগরিক চারদিক থেকে চিৎকার করে উঠে আর রাত্রিকালে কারফিউ আইন ভঙ্গ করে গুলি গোলার সম্মুখীন হয়ে মিছিল বার করে।

বাধ্য হয়ে আয়ুব খাঁ আগরতলার মামলা প্রত্যাহার করেন।

শেখ মুজিব মুক্তি পেয়ে ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারী বৈঠকে যোগদান করেন।

গোল টেবিল বৈঠক প্রাথমিক অধিবেশনের পর মুলতবী করা হয়। দশই মার্চ পরবর্তী সম্মেলন বসে। আয়ুব ড্যাকের আট দফা মেনে নেন কিন্তু শেখ মুজিব সেখানে স্বায়ত্ত শাসনের কথা তোলেন। এই দফা ড্যাকের দফার মধ্যে ছিল না এবং শেখ সাহেবের নির্দেশেই এই দফা সন্নিবেশিত করা হয় নাই। অথচ এখন আবার এই দফার উল্লেখে অনেকেই চমকে উঠে। আয়ুব খাঁ বলেন, আমি যা করেছি তা আমি সংশোধন করে দিলাম। বাকী আপনারা করে নিবেন। সার্বজনীন ভোটাধিকার, পার্লামেণ্টারী পদ্ধতির সরকার ত দিয়েই দেওয়া হল।

ড্যাকের দফার মধ্যে স্বায়ত্ত-শাসনের বিষয় উল্লেখ না থাকার কথা শুনে আমি শেখ মুজিবকে বিচার কক্ষে এই কথা জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, আয়ুবের সাথে যে বৈঠক হচ্ছে এটার কি মূল্য! একটা বাজে শো মাত্র। স্বায়ত্ত শাসন ইত্যাদি আমার ছয় দফার মারফত আদায় হবে। সেই কংগ্রেসী এক ভদ্রলোকের উক্তি, 'স্বরাজ যদি আমার হাতে না আসে তাহলে সে স্বরাজের প্রতি আমার কোন আগ্রহ নাই।' অথচ স্বায়ত্ত শাসনের প্রশ্ন তিনি উত্থাপন করায় গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয় এবং তারপর তিনি ড্যাকও ভেঙ্গে দেন। তারপর শুরু করেন অন্যান্য নেতৃবৃন্দের নিন্দাবাদ। নূরুল আমিন সম্বন্ধে বলেন, তিনি সাহায্য করেছেন। নাম ধরে বললেন, হামিদুল হক চৌধুরী, ফরিদ আহমদ, আবদুস সালাম খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। এই উক্তির ফলে পরদিন কয়েক হাজার লোক এদের খবর নেবার জন্য এয়ার পোর্টে আসে এবং প্লেনের ভেতরে খানা তল্লাশী করে। ভাগ্যিস্ তারা ঐ দিন ঐ প্লেনে আসেন নাই। এলে তাঁদের কি অবস্থা হতো তা কল্পনাও করা যায় না। এরপর একদিন মাহমুদ আলিকে কয়েকজন লোক জোর করে নিয়ে তাঁকে দিয়ে

বলায় যে তিনি শেখ মুজিব সম্বন্ধে কিছু বলে থাকলে সে সব মিথ্যা।

পূর্ব-পাকিস্তানের কোন নেতাই স্বায়ত্ত শাসনের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেন না। সবাই একে সমর্থন করে আসছেন পূর্বাপর। কেউ কোনদিন স্বায়ত্ত শাসনের দাবীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতেই পারে না। প্রশ্ন হল, ঐ বৈঠকে স্বায়ত্ত শাসনের দাবীর দফা উল্লেখ করা অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক কি না! শেখ মুজিব নিজেই বাধা দিয়ে ওটা ডাকের আট দফাভুক্ত করে নাই। নীতি ও নিয়ম হিসাবে ঐ সময় এই প্রশ্ন উত্থাপন করা যুক্তিযুক্ত হয় না। ছয়ষট্টি সালে লাহোর জাতীয় কনফারেন্সে ছয় দফার বোমা নিক্ষেপ করার মত। সময়ে অসময়ে স্বায়ত্ত শাসনের দাবী উত্থাপন করলেই, স্বায়ত্ত শাসনের একক দাবীদার, ধারক ও বাহক হওয়া যায় না। যৎকিঞ্চিৎ বাহবা পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তা সাময়িক। অথচ এই নিয়ে কয়েকজন ভদ্রলোকের জীবন বিপন্ন হয়ে যাওয়ার নিশ্চিত আশঙ্কা এক সময়ে বিরাজ করছিল।

আগরতলা মোকদ্দমা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর শেখ মুজিব রেসকোর্স ময়দানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করেন। তিনি সেখানে বক্তৃতা করেন যে, ইন্দোনেশিয়ায় কতকগুলি দ্বীপ একত্রে থাকতে পারলে, পাকিস্তানের দুই অংশ একত্রে কেন থাকতে পারবে না? আগরতলা মামলার বিরুদ্ধে অভিযোগের এটা পাল্টা জবাব। সে মোকদ্দমার সাক্ষী প্রমাণের পর তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দেন যে, এই ষড়যন্ত্রের সাথে তাঁর কোন সম্পর্কই ছিল না। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, বাংলাকে আলাদা করার ষড়যন্ত্রে তিনি লিপ্ত ছিলেন। তিনি এখন সম্পূর্ণ বিপরীত উক্তি করায় জনগণ তাজ্জব হয়ে গেল।

উনিশ শ' উনষাট সালের প্রথম ভাগে যে গণ-অভ্যুত্থান হয়েছিল, তার নেতৃত্ব কয়েকদিন পর রাজনীতিক ও ছাত্র সমাজের হাত

থেকে ছুটে যায়। গণ-বিক্ষোভ শেষ পর্যন্ত নৃশংস বর্বরতায় নিষ্ঠুর অত্যাচারে পরিণত হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে হত্যাকাণ্ড শুরু হয়ে যায়। আইন কানুন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। মার্চের শেষভাগে আয়ুব খাঁ ঘোষণা করেন যে, তিনি সর্ব ক্ষমতা প্রধান সেনাপতি জেনারেল ইয়াহিয়ার হাতে ছেড়ে দিচ্ছেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান পচিশে মার্চ রাত্রে আবার দ্বিতীয় বার পাকিস্তানে মার্শাল ল' জারি করেন।

ক্ষমতা ছেড়ে দিতে আয়ুব খাঁ বাধ্য হয়েছিলেন। দেশের নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটা সমঝোতায় পৌঁছে শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট দূর করাব যে মহড়া আয়ুব খাঁ চালায়েছিলেন, পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তারা সেটা সুনজরে দেখে নাই। আয়ুব খাঁর সে চেষ্টা অবশ্য ব্যর্থ হয়েছিল, কিন্তু সামরিক কর্তাদের সন্দেহ তাতে দূর হয় নাই। দেশেব নেতৃবৃন্দের মূল দাবী দাওয়া—সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, জরুরী আইন বাতিল, সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা, ইত্যাদি সামরিক কর্তৃপক্ষ কোন ক্রমেই মানতে রাজী হয় নাই; বিশেষ করে পূর্ব-পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে ত তারা দেশদ্রোহিতার শামিল বলেই গণ্য করেছিল।

ইয়াহিয়া খাঁ দ্বিতীয় বার মার্শাল ল' জারী করতেই দেশবাসী স্তম্ভিত হয়ে গেল। অবশ্য আইন শৃঙ্খলার যে অবনতি ঘটেছিল, তা মোটামুটি উন্নতি লাভ করল। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের মনে আঘাতটা প্রচণ্ডভাবে লাগল। তারা পরিষ্কার বুঝতে পারল যে, পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন শক্তিসমূহ পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণকে ক্ষমতার অংশীদার কখনও হতে দেবেনা।

ইয়াহিয়া খাঁ দৃশ্যতঃ সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হলেও

অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট ও চীফ মার্শাল ল' অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হলেও আসল সামরিক বাহিনীর হেড-কোয়ার্টার্স ছিল ক্ষমতার উৎস। তাদের পরামর্শ মত দেশ শাসন করবেন এইটাই ছিল চুক্তি।

উদ্দেশ্য যাই থাকুক, সামরিক কর্তাদের গোপন মতলব যাই থাকুক, ক্ষমতা-লাভের পরদিনই ইয়াহিযা খাঁ ঘোষণা করলেন, দেশের রাজনৈতিক ও আইনশৃঙ্খলাব পরিস্থিতি বর্তমানে অনিশ্চিত থাকলেও যত শীঘ্র সম্ভব দেশে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে যাতে করে অবিলম্বে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনা করে নিয়মতান্ত্রিক ও গণ-সমর্থিত একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হয়।

তারপর এই ঘোষণা বার বার উল্লেখ করেছেন বিভিন্ন সময়ে।

তাঁর এই আশ্বাস ও আশার বাণী মানুষের—বিশেষ করে পূর্ব-পাকিস্তানী জনগণের মনে আশার সঞ্চার করে। বাঙালী রাজনীতিতে বিশ্বাসী—গণতান্ত্রিক রাজনীতিব মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের আশা তারা সর্বদাই করে। ষড়যন্ত্র, ছলচাতুরী কলা-কৌশলের রাজনীতি তারা বিশ্বাস করেনা। তাই ইয়াহিয়া খাঁর আশার বাণী তাদের বিক্ষুব্ধ মনে কিছুটা শান্তি আনতে সক্ষম হয়।

মার্শাল ল' জারী করার সপ্তাহ তিনেক পরে ইয়াহিয়া খাঁ ঢাকা এলেন। আমাকে ডেকে পাঠালেন। এর আগে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয় নাই। কুশলবার্তার পর জিজ্ঞাসা করলাম: ঢাকায় কতদিন থাকার নিয়ৎ করেছেন?

বললেন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক মিনিটও না।

বললাম, আয়ুব খাঁও তাই বলেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রয়োজন দশ বছরেও ফুরায় নাই।

বললেন, না না, তা' হবেনা। আমি দ্বিতীয় আয়ুব খাঁ হতে চাইনা। সে সুযোগ আমাকে দিবেন না। দায়ীত্বটা আপনাদেরও

কম নয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে বিদায় দিবার ব্যবস্থা করবেন। আপনাদের হাতে ছেড়ে দিতে পারলেই আমার কর্তব্য শেষ।

এই বলেই আঙ্গুলে গুণে গুণে আয়ুব খাঁর ভূলক্রুটির এক দীর্ঘ ফিরিস্তি দিলেন। রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ—সামরিক বাহিনীকে বেসামরিক কাজে ব্যবহার, নানাবিধ অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন, মোনায়েম খাঁকে প্রায় অর্দ্ধযুগ গভর্ণর করে রাখা ইত্যাদি। অথচ দেশের সমস্যার একটিও সমাধান করেন নাই। কাশ্মীব সমস্যা তেমনি রয়ে গেছে, বরং তাসখন্দ্ ঘোষণাব পর আরও তার অবনতি ঘটেছে ইত্যাদি।

চুপ করে শুনছি, আবার হেসে বললেন, আমাকে তাড়াতাড়ি সবায়ে দেখার চেষ্টা আপনাদেরই করা উচিৎ। দ্বিতীয় আয়ুব খাঁ না হয়ে যাই।

কথা বলাব ভঙ্গি দেখে মনে উৎসাহ হল। লোকটা হয়ত সত্যিই গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। যদি তাই হয়, তা হলে সামরিক শাসনের দীর্ঘ কালরাত্রির অবসান ঘট্‌বে। আবার সুদিন ফিরে আস্‌তে পারে।

তিন চার মাস পর ইয়াহিয়া খাঁ সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভোটার তালিকা প্রণয়নের নির্দেশ দিলেন।

জুলাই মাসে ঘোষণা করলেন, তিনটি গুরুতর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ও সময়সূচী ঘোষণা করা হবে। এই তিনটি বিষয় হচ্ছে, প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার, পশ্চিম পাকিস্তানে এক য়ুনিট বাতিল এবং পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন।

নভেম্বর মাসে ঘোষণা করলেন, আগামী বছর অক্টোবর মাসে দেশজোড়া সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তিনটি ব্যাপারের দু'টি সম্বন্ধে সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে: নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে

প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে—একজন এক ভোট।

পশ্চিম পাকিস্তানের য়ুনিট ভেঙ্গে সাবেক প্রদেশগুলির অস্তিত্ব পুণর্বহাল করা হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তান সম্বন্ধে বললেন, পূর্ব-পাকিস্তান এ যাবৎ দেশের জরুরী জাতীয় সমস্যার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে পুরাপুরি অংশগ্রহণ করতে পারে নাই। সুতরাং তাদের ম্যাক্সিমাম অটোনমি, অর্থাৎ সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে হবে।

ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে তিনি ঘোষণা করলেন যে, আগামী সত্তর সালের পয়লা জানুয়ারী থেকে রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ—যা এতকাল বন্ধ করা হয়েছিল—আবার চালু করা যেতে পারবে।

জানুয়ারী মাস থেকে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ শুরু করার ধূম পড়ে গেল। রুদ্ধ দুয়ার খুলে গেছে। রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরা হাফ ছেড়ে বাঁচল। পুরাদমে দলীয় কাজকাম শুরু করে দিল।

আমার নিজের কোন দল নাই। দল গঠন করব ভাবছি অনেকদিন থেকেই। এখন সুযোগ এসে গেছে। বিশিষ্ট কর্মীরা দলগঠনে খুব উৎসাহ প্রকাশ করতে লাগল। একটা সম্মেলন ডেকে দল গঠন করা হল।

নাম দেওয়া হল ন্যাশনাল প্রোগ্রেসিভ লীগ। তারপর জেলায় জেলায় শাখা গঠন করার কাজ শুরু হয়ে গেল। নির্বাচন আসছে, কাজেই উৎসাহের অভাব কোথায়ও দেখা গেল না।

মার্চের শেষভাগে ইয়াহিয়া খাঁ নির্বাচন অনুষ্ঠান ও নতুন শাসনতন্ত্র রচনার পদ্ধতি ঘোষণা করলেন 'লিগেল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার' (এল-এফ-ও) নামক একটি আদেশের মাধ্যমে। নির্বাচন পদ্ধতি ও শাসনতন্ত্রের মূলনীতি তাতে নির্দিষ্ট করে দিলেন।

শাসনতন্ত্রের মূলনীতি মোটামুটি এইরূপ ছিল :

এক— শাসনতন্ত্রে ইসলামী ভাবধারা রক্ষা করতে হবে ;

দুই— পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও জাতীয় ঐক্য রক্ষা করতে হবে ;

তিন— শাসনতন্ত্র হবে গণতান্ত্রিক, নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী, প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন হবে, স্বাধীন বিচার বিভাগ ও নাগরিকের মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত হবে ;

চার— প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় (ফেডারেল) শাসনতন্ত্র গঠিত হবে— সমস্ত আইন বিষয়ক, প্রশাসনিক এবং অর্থনীতিক ক্ষমতা, অর্থাৎ সর্বোচ্চ ক্ষমতাসমূহ প্রদেশগুলির হাতে ন্যাস্ত থাকবে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিষয়ের দায়ীত্ব পালনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যাপ্ত ক্ষমতা থাকবে ;

পাঁচ— সমস্ত জাতীয় সমস্যার ব্যাপারে প্রত্যেকটি অঞ্চলকে পূর্ণ সুযোগদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

এ ছাড়াও স্পষ্ট বিধান করা হবে যে, নির্বাচিত গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনের দিন থেকে এক শ' কুড়িদিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র রচনার কার্য শেষ করতে হবে, না হলে পরিষদ ভেঙ্গে দেওয়া হবে। শাসনতন্ত্র রচনার পর ইয়াহিয়া খাঁর অনুমোদন বা মঞ্জুরী নিতে হবে। তিনি মঞ্জুর না দিলে শাসনতন্ত্র শুদ্ধ হবেনা এবং গণপরিষদ ভেঙ্গে দেওয়া হবে। উভয় অবস্থায়ই মার্শাল ল জারী থাকবে।

পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনৈতিক দলগুলি এল-এফ-ওর বিরুদ্ধে বিশেষ প্রতিবাদ উত্থাপন করে নাই। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলি এল-এফ-ওর অগণতান্ত্রিক ও জাতীয় সংহতি বিরোধী বিধানগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। গণ নির্বাচিত

পরিষদ এক শ' কুড়িদিনে ভেবে চিন্তে যে শাসনতন্ত্র রচনা করবেন, তা ইয়াহিয়া একাই তার মনঃপুত না হলে ভেঙ্গে দিতে পারবেন। তা হলে গণপরিষদ সার্বভৌম হল না। এক শ' কুড়িদিনের সময় নির্দিষ্ট করাও অনেকের মতে আপত্তিকর। নানাকারণে দু'চার দিন, এমন কি দু'এক মাস বিলম্ব ঘটাও অস্বাভাবিক নয়। ঘাড়ে ধরে কান মোচড়ায়ে এক শ' বিশ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র রচনা করার বাধ্যবাধকতাও ঘোরতর আপত্তিকর। এক শ কুড়িদিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র রচিত না হলে গণপরিষদ ভেঙ্গে দেওয়ার মানে আবার কোটি কোটি টাকা খরচ করে নতুন ভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান করাও আপত্তিজনক। প্রশ্ন উঠতে পারে, এর আগের গণপরিষদ সাতচল্লিশ সাল থেকে পঞ্চান্ন সাল পর্যন্ত আট বছরে শাসনতন্ত্র রচনা করতে পারে নাই। সুতরাং যদি লাগাম ছেড়ে দেওয়া হয় তা হলে এই পরিষদও তার আয়ু বৃদ্ধি করে বছরের পর বছর পরিষদে বসে বসে মাহনা খাবেন আর শাহী মর্যাদা ভোগ করবেন, দেশের কাজ কিছুই হবেনা। সে যুগ ছিল আলাদা—অবস্থা ও পরিস্থিতি ভিন্ন ধরণের। এক যুগ পরে বর্তমান কালের গণপরিষদ সদস্যরা আগের মত গদাই লস্করী চালে চলতে পারবেন না। দেশও তাদের সেভাবে চলতে দেবেনা।

মুসলমান ছাড়া কেউ প্রেসিডেণ্ট হতে পারবে না, এই বিধান জাতির পক্ষে অপমানকর। জনগণের প্রজ্ঞা, জ্ঞানবুদ্ধি ও মর্যাদা সম্বন্ধে গভীর অনাস্থার পরিচায়ক।

অন্যান্য দলের নেতারা, এমন কি শেখ মুজিবুর রহমানও এক সভায় এল-এফ-ওর কতিপয় বিধান সম্বন্ধে আপত্তি করেন।

কয়েকদিন পর ইয়াহিয়া খাঁ ঢাকা এলে তাঁর সাথে দেখা হয়। প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি আমার বিরোধিতা করেন।

বললাম, আপনার বিরোধিতা করব কেন? আপনার প্রণীত এল-এফ-ওর বিরোধিতা করি এবং তার যথেষ্ট কারণও আছে। আর আমি একাই নই, অন্যরাও আপত্তি করেছেন।

বললেন, নাঃ, আর কেউ ত আপত্তি করেনা। এই ত মুজাফফর এসেছিল, বলল, তার কোন আপত্তি নাই।

বললাম, শেখ মুজিবও ত ভৈরব না কোথায় যেন আপত্তি করে বক্তৃতা দিয়েছেন।

হেসে বললেন, ওটা লোক দেখানো। তিনি নিজেই বলেছেন, দলের মুখ রক্ষার জন্য তাঁকে ও রকম বলতে হয়েছে। তাই বলেছেন।

বললাম, কি জানি। আমাদের আপত্তি ঐ ধরণের নয়। ধরুন, এই আপনার মঞ্জুরী ছাড়া গণ-পরিষদের রচিত শাসনতন্ত্র শুদ্ধ হবেনা। এতে গণপরিষদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না? গণ-পরিষদের সার্বভৌমত্ব কোথায় রইল? দেখা যায়, আপনিও শাসুর খাঁর মত ব্যক্তির প্রাধান্য দিচ্ছেন শাসনতন্ত্র রচনার ক্ষেত্রে। জনমতের মূল্যই যদি না থাকে তা হলে এই প্রহসন করে লাভ কি?

বুকে তর্জনীর টোকা দিয়ে বললেন, আমি ছাড়া এখন আর কেউ সার্বভৌম নয়।

—সেই জন্যই ত আপত্তি করি। আপনি উপদেষ্টাদের মতামত নিয়ে একটা শাসনতন্ত্র দিয়ে দিতে পারতেন।

—দেখতে চাই আপনাদের দৌড় কতদূর। আপনারা কি পরিমাণ জনমতের প্রতীক।

তার পর উঠে দাঁড়ায়ে বললেন, এ সব আপত্তি করে কোন ফল হবেনা।

—তাত জানিই, তবুও বললাম।

—তা বলুন।

চলে এলাম। এর পর ত কথা চলেনা।

এল-এফ-ওর মূলনীতির সাথে আওয়ামী লীগের ছয় দফার একটা স্পষ্ট বিরোধ দেখা দেয়। বিদেশী বাণিজ্য ও সাহায্য কেন্দ্রীয় ক্ষমতার বাইরে রাখার যে প্রস্তাব ছয় দফার সন্নিবেশিত আছে, তাতে কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশী নীতি নির্ধারণ করতেও সক্ষম হয়না এবং সরাসরি ভাবে ট্যাক্স ধার্য করার ক্ষমতার অভাবে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা বিভাগের কার্যক্রম পরোক্ষভাবে সঙ্কুচিত হবার আশঙ্কাও দেখা দিতে পারে।

এতদসত্ত্বেও ইয়াহিয়া সরকার ছয দফাব ভিত্তিতে নির্বাচন প্রচারণা ও অভিযান চালাতে কোন বাধা সৃষ্টি করে নাই। তার নিশ্চয় ধারণা ছিল যে আওয়ামী লীগ গোটা পূর্বপাকিস্তানের সবগুলি আসন নিশ্চয়ই দখল করতে পারবে না। পশ্চিম-পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ ও পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দও তাকে এই আশ্বাস নিশ্চয়ই দিয়েছিল যে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা কিছুতেই লাভ করতে পারবে না। অতএব মাভৈ।

সারা পূর্ব-পাকিস্তানে বিভিন্ন জেলায় আমার দলের সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়ে যায়। পশ্চিম পাকিস্তানেও কাজ শুরু হয়।

জুলাই মাসে ন্যাশনাল প্রোগ্রেসিভ লীগের একটি সম্মেলন আহ্বান করা হয়। আমরা ছয় সাত শ' কাউন্সিলার ও ডেলিগেটকে আমন্ত্রণ জানায়ে তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মীদের উৎসাহ উত্তেজনা এত বেশী যে, সব মিলে প্রায় আঠার শ' কাউন্সিলার ও ডেলিগেট উপস্থিত হয়। কোন কোন জেলা ও মহকুমায় দু'টি করে কমিটিও গঠিত হয়েছিল।

খুব উত্তেজনা ও আগ্রহের সাথে সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলনে দলীয় শাসনতন্ত্র গৃহীত হয়, ম্যানিফেষ্টোও আলোচিত

হওয়ার পর ওয়াকিং কমিটিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিবার অধিকার অর্পণ করা হয়।

কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করার ভার আমার উপর অর্পণ করা হয়েছিল। বিভিন্ন জেলা ও মহকুমাব কর্মী ও নেতারাও কমিটি নির্বাচনে আপত্তি জানায়। তারাও বলে নির্বাচন করতে গেলে গোড়াতেই তিক্ততা আরম্ভ হবে।

এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করতে আমি অস্বীকার করি কিন্তু চাপে পড়ে স্বীকাব করি। তবুও সিদ্ধান্ত নিবার আগে জেলা মহকুমার কনভেনবদের সাথে মোটামুটি পরামর্শ করে তাদের মতামত গ্রহণ করে, পাকিস্তান ও পূব-পাকিস্তান অর্থাৎ বাংলার জন্য তুইটি কমিটির তালিকা প্রস্তুত করি।

দলেব নাম পরিবর্তন করে পাকিস্তান ন্যাশনাল বা জাতীয় লীগ বাখা হয়।

কমিটির নাম পাঠ করার পর গৃহীত হয় এব' অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। ঠিক পরক্ষণেই একটি জেলাব কয়েকজন উঠে দাড়ায়ে আপত্তি জানায়। তারপর বচসা শুরু হয়। আমি ও অন্যান্যরা সভা ত্যাগ কবে চলে আসি কিন্তু আপত্তিকারীরা গভীর রাত্রি পর্যন্ত দববার করে এবং দল ভেঙ্গে অন্য নামে অর্থাৎ আগের নামেই একটি দল গঠন করার প্রস্তাব করে। তাবা প্রকাশ করে যে, সম্পূর্ণ কমিটি গঠন করার ভার আমাকে দেওয়া হয় নাই, আমি অন্যায়ভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছি।

আমি শুনে তাজ্জব বনে গেলাম। যারা বিশিষ্ট কর্মকর্তা তারা আমাকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করে কমিটি গঠন করার প্রস্তাবে রাজী করায়। বলেছিল, আপনার টিম আপনিই গঠন করবেন। তা সত্ত্বেও আমি একা সমস্ত ভার গ্রহণ না করে জেলা ও

মহকুমার মতামতও নিয়েছিলাম। বলেছিলাম, সকলের মনঃপুত নাও হতে পারে। সবগুলি মনোনয়নই যে সবাই খুশী মনে মেনে নিবে তা সম্ভব নয়।

যা হোক, দল-ভাঙ্গা বন্ধ করার জন্য আপত্তিকারীদের কতকগুলি প্রস্তাব আমি মেনে নিতে বাধ্য হলাম। অন্যরা তাতে আপত্তি করতে লাগল। তারা বলল, সম্মেলনে যা গৃহীত হয়েছে তাই বহাল রাখতে হবে। হয়ত তা-ই উচিত ছিল। কিন্তু একটি দল আঁতুড় ঘরেই ভেঙ্গে যাবে এটা বন্ধ করতে গিয়ে আমি আপত্তিকারীদের প্রস্তাবে রাজী হই।

এরপর আরও অসুবিধার সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত সবাইকে আশ্বাস দিলাম, নির্বাচন নিয়ে তখন সবাই ব্যস্ত হবে। নির্বাচন শেষে সবাই বসে একটা সমঝোতা করে উভয় দলকে সন্তুষ্ট করা হবে।

নির্বাচনের ব্যাপারে আমাদের দলে মত-বিরোধ ছিল। এল-এফ-ওর অগণতান্ত্রিক বিধান অনুযায়ী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে অনেকেই রাজী হন নাই। ওয়ার্কিং কমিটির এই ব্যাপারে দীর্ঘ সময় আলোচনা অন্তে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। আমরা ধারণা করেছিলাম যে পূর্ব-পাকিস্তান এই নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবেই। পশ্চিম পাকিস্তানীরা যদি সম্মতি না-ও দেয়, তবুও পূর্ব-পাকিস্তানের নির্বাচিত সদস্যরা গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনের দিনেই এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করবে যে, এই গণপরিষদ স্বাধীন ও সার্বভৌম। তা হলে অবশ্য ইয়াহিয়া খাঁর অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করতে হবেনা। অবশ্য এই ভয়ও ছিল যে ইয়াহিয়া খাঁ এ ব্যাপারে নতি স্বীকার করবেনা এবং গণপরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে মার্শাল ল' চালু রাখতেও পারে।

এর মধ্যে দেশে বন্যার প্লাবন এসে গেল। এই অবস্থায় অক্টোবর মাসে নির্বাচন হওয়া অসম্ভব। এমনিই ত বাংলাদেশে অক্টোবর মাসে সারা দেশের মাঠে ময়দানে পানি থাকে। তার পর বন্যায় যখন সব ডুবায়ে দিল তখন ত নির্বাচন অনুষ্ঠান করা কিছুতেই সম্ভব হবেনা।

ইয়াহিয়া খাঁ ঢাকা এলেন। এক নৈশ-ভোজে মিলিত হলাম। সব দলের নেতারাই উপাস্থিত ছিলেন। খেতে খেতে প্রস্তাব করলাম তারিখ পরিবর্তনের। শেখ মজিব আমতা আমতা করে আপত্তি করলেন।

ইয়াহিয়া খাঁকে আবার গণপরিষদের সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন জিজ্ঞাস করলাম। একটু নরম সুরে বললেন, আসুন না আপনারা পাশ করে। সকল সদস্য যদি চায় তা হলে আমি একগুঁয়েমী করে আমার মতবাদ কেন বদলাব না। দেখি, আপনারা কি করেন।

পাক-সোভিয়েত মৈত্রী সংসদের নিমন্ত্রণে ভাইসপ্রেসিডেন্ট হিসাবে আমার ও সেক্রেটারী আলী আকসাদের মস্কো ও সোভিয়েতের অন্যান্য শহর ভ্রমণে যাবার কথা। কিন্তু অক্টোবরের নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন না করলে আমি যেতে পারিনা। আগষ্টের মাঝামাঝি যাওয়ার সময় ধার্য করা হয়েছিল।

একদিন প্রায় সব দলের নেতৃবৃন্দ ইয়াহিয়া খাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে অক্টোবরের তারিখ পরিবর্তনের অনুরোধ জানায়। ইত্যবসরে সরকারী কর্মচারীগণ যাঁরা নির্বাচন কার্য পরিচালনা করবেন, তাঁরা সবাই বন্যা-প্রপীড়িত এলাকাসমূহে রিলিফের কাজে নিযুক্ত হয়ে যাওয়ায় ইয়াহিয়া খাঁ বাধ্য হয়ে অক্টোবরের তারিখ পরিবর্তন করার কথা গভীরভাবে চিন্তা করছেন বলে আশ্বাস দিলেন।

তারপর আমরা রওনা হয়ে গেলাম মস্কো। সেখানে খবরের কাগজে জানতে পারলাম, নির্বাচন ডিসেম্বর মাসের ৭ তারিখে হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

ন্যাশনাল প্রোগ্রেসিভ লীগ গঠন করার পরপরই সত্তর সালের প্রথম ভাগে করাচী যাই, ওখানে দলের শাখা গঠন করার জন্য। মোটামুটি একটা কাঠামো দাঁড় করান হয়।

ঐ উপলক্ষে একটা প্রেস-কনফারেন্স আহ্বান করি। আমার দলের নীতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। বলেছিলাম, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র মোটামুটিভাবে আমার দলের মূলনীতি। কয়েকজন সাংবাদিক প্রশ্ন করে, পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে—পাকিস্তান আদর্শ-ভিত্তিক রাষ্ট্র। বলেছিলাম, এটা নতুন মতবাদ। পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল মুসলিম হোমল্যাণ্ড হিসাবে—সম্পূর্ণ ভিন্ন আদর্শের ভিত্তিতে।

করাচীর 'ডন' পত্রিকা সম্পাদকীয় লিখে ফেলল এর উপর। লিখল, পাকিস্তান যে ইসলামী আদর্শে গঠিত এ কথা স্কুলের ছাত্ররা পর্যন্ত জানে। উত্তরে বলেছিলাম, কিন্তু আমরা যারা পাকিস্তান সংগ্রামে সামান্য অংশগ্রহণ করেছি—আমরা জানিনা এবং এতকাল শুনিও নাই। স্কুলের ছাত্রদের জানার প্রশ্নই উঠেনা। তবে এখন তাদের নতুন করে সবক দেওয়া হচ্ছে, তারা তোতা পাখীর মত তাই শিখ্ছে, অর্থ বুঝুক আর নাই বুঝুক।

ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থাৎ সেকিউলারিজম সম্বন্ধে উর্দু কাগজে লিখল, আমি নাকি লা-দীনি হুকুমত অর্থাৎ ধর্মহীন রাষ্ট্র গঠন করার প্রস্তাব করেছি, এটা পাকিস্তানের মূল আদর্শের সম্পূর্ণ খেলাফ। উর্দু ভাষায় ধর্মনিরপেক্ষতার কোন প্রতিশব্দ নাই বলে সেকিউলারিজমের তরজমা করেছে লা-দীনি। আর তাতে মারাত্মক বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে।

পরের বার যখন করাচী যাই তখনও প্রেস কনফারেন্স আহ্বান করি। তারা প্রশ্ন জিজ্ঞাস করার আগেই, আমি তাদের জিজ্ঞাস করি তারা কেমন করে লিখল, আমি 'লা-দীনি' হুকুমত চাই। সাংবাদিক বলল, তা হলে সেকিউলারিজমের মানে কি? বললাম, অভিধান খুলে অর্থ খুঁজে বার কর। উর্দু ভাষায় আমার জ্ঞান সীমাবদ্ধ, তবুও মনে হয় এর অর্থ হচ্ছে, দুনিয়াবী, ঐহিক ও লৌকিক। যাই হোক না কেন, 'লা-দীনি' ত হতেই পারে না—এটা অত্যন্ত কদর্থ। অজ্ঞানতাবশতঃ না ইচ্ছাকৃত তা বলা মুসকিল। মোটামুটি মর্ম হচ্ছে, ধর্ম রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকবে এবং রাষ্ট্রও ধর্মীয় ব্যাপারে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করবে। ধর্মহীনতা কেমন করে হতে পারে।

তারপর প্রশ্ন করে সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে। সমাজতন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যা দেওয়ার পর বললাম, পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক আল্লামা ইকবাল উনিশ শ' তিরিশ সালে স্যার ফ্র্যান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ডের কাছে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, বলশেভিজমের সাথে আল্লার নাম থাকলেই তা ইসলাম থেকে অভিন্ন। এটা নিশ্চয়ই তোমরা পড়েছ।

এর কিছুদিন পর পিণ্ডিতে ইয়াহিয়া খাঁর সাথে এক মোলাকাতের সময় তিনিও আমার এই মতবাদের কথা শুনে আঁতকে উঠেছিলেন। বললেন, আপনি এসব কি বলছেন? সেকিউলারিজম, সোশালিজম। এ সব ত ইসলামী আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। পাকিস্তানের ভিত্তিই হচ্ছে ইসলামিয়াত, আর সালমিয়াত—অখণ্ডতা বা জাতীয় সংহতি। মনে হয় তার সিগারেট কেসের উপর এই দুইটি শব্দ মীনা করা।

বললাম, আপনি খামাখা ঘাবড়ায়ে যাচ্ছেন। ইসলাম ধর্মটাই ত হচ্ছে সেকিউলার। এবারে চক্ষু ছানাবড়া। কেমন করে বলছেন

এই কথা! বললাম, এই জন্য যে ইসলাম ইজ এ সেকিউলার রিলিজন। সাধারণ অর্থে রিলিজন বা ধর্ম বলতে যা বোঝায়, বা অন্য ধর্মাবলম্বীরা যা বোঝে, ইসলাম সে অর্থে রিলিজন নয় ইসলাম হচ্ছে কমপ্লিট কোড অফ লাইফ—সম্পূর্ণ জীবন পদ্ধতি। অর্থাৎ দীন ও দুনিয়ার সমস্ত ব্যাপারেই, ইসলাম আমার ও আপনার জীবনের পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করে। এটাকে অস্বীকার করলে ইসলামকে অস্বীকার করা হয়। দুনিয়ার ব্যাপারে ইসলাম আপনার জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করে, তাকে সেকিউলারিজম ছাড়া আর কোন নামে অভিহিত করবেন? তাই বলছিলাম, ইসলাম ইজ সেকিউলার রিলিজন।

বললেন, এটা কেউ কোনদিন বলে না—আমিও কোনদিন শুনি নাই।

বললাম, হয়ত কেউ বলে থাকবেন কি বা বলেন নাই, কিন্তু না শোনার জন্য আপনিই দায়ী। অবশ্য আপনার হাতে দেখছি প্রচুর সময় নাই, থাকলে দীর্ঘ আলোচনা করে এই মতবাদের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার করতে পারতাম।

নির্বাচনের তোড়জোড় খুব চলছে। দেশে দল বা উপদলের অন্ত নাই। প্রত্যেক দলেরই বিভিন্ন কর্মসূচী আছে: নির্বাচনে জয়লাভ করলে দেশে দুধ মধুর স্রোত বয়ে যাবে এই সব ওয়াদা অনেক দলই করতে লাগল।

আমার দল ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলে আমাদের বিরুদ্ধে খুব বেশী আক্রমণ চলল। আওয়ামী লীগ সর্ববৃহৎ ও শক্তিশালী পার্টি—ধনে জনে সবাপেক্ষা শক্তিমান। বক্তৃতার জোরও সব চাইতে বেশী। পাকিস্তানী নেতারা পচিশ বছরে তিনহাজার কোটি টাকার সম্পদ লুট করে পূর্ব-পাকিস্তানকে

শ্মশানে পরিণত করেছে। 'পূর্ব-বাংলা শ্মশান কেন' বলে লম্বা প্ল্যাকার্ডও তারা সারাদেশে প্রচার করল। সর্বোপরি ঘোষণা করা হল, নির্বাচন হবে ছয় দফার ভিত্তিতে।

এই সাধারণ নির্বাচন যে একদম সাধারণ নয়, এ কথাটা কিন্তু অনেক নেতাই মনে করেন নাই। সাধারণ নির্বাচনে জয়-পরাজয়ের উপর নির্ভর করে সরকার রদ-বদল। এবারের নির্বাচন তার ব্যতিক্রম। নির্বাচনের ফলে একটি গণপরিষদ প্রতিষ্ঠিত হবে। সে গণপরিষদ নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে রচনা করবেন একটি শাসনতন্ত্র। শুধু রচনা করলেই চলবে না। সকলের মনঃপুত হওয়া চাই। সর্বোপরি ইয়াহিয়া খাঁর মনোমত হতে হবে। তা না হলে তিনি গ্রহণ করবেন না, অর্থাৎ অনুমোদন করবেন না। না করলে, গণপরিষদ বাতিল। সব আশা ভরসার অবলুপ্তি।

আর যদি দৈবক্রমে শাসনতন্ত্র গৃহীত হয়ে গেল, তা হলে সংখ্যা-গরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করতে পারবে এবং দেশের কল্যাণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারবে। সেটা অনেক পরের কথা। ন' মন তেল খরচ করার পর রাধার নাচার কথা উঠবে।

ওদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ নানাধরণের প্রচারণা চালাতে লাগলেন। তাদের মধ্যে ইসলামী শাসনতন্ত্র ওয়ালার জোরই বেশী। ভুট্টোর পিপলস পার্টিও বলে ইসলামী সমাজতন্ত্র। পূর্ব-পাকিস্তানের সংখ্যা-গরিষ্ঠতায় ওরা রীতিমত ভয় পায়। ইয়াহিয়া খাঁ যে প্যারিটি ভাঙ্গিয়া দিয়া 'ওয়ান ম্যান ওয়ান ভোট' নীতি অবলম্বন করেছে, এটা পশ্চিম পাকিস্তানের দুই একজন নেতা অভিনন্দন করলেও সাধারণতঃ সবাই এজন্য ইয়াহিয়ার উপর রুষ্ট। কারণ এটা পানির মত স্পষ্ট যে পূর্ব-পাকিস্তান এবার পরিষদে অনেক বেশী আসন গ্রহণ করবে এবং পাকিস্তানের ভবিষ্যত এখন থেকে তাদের হাতেই ন্যাস্ত। বল এবার পশ্চিম

কোর্ট থেকে পূর্ব কোর্টে চলে গেল। তারাই ইচ্ছামত সে বল খেলবে। এতদিনের জারিজুরি, বঞ্চনা-অবিচার, অপমান-নির্যাতন সব এবার প্রকাশ হয়ে পড়বে, এবং বাতাস ঘুরে গেলে এ সব তাদের কপালে ফিরে গিয়ে লাগবে।

তবে তাদের একটা ভরসা—খুব ক্ষীণ ভরসা যে, কোন দিনও পার্টি পূর্ব-পাকিস্তানে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করতে পারবে না। বিভিন্ন পার্টিও কিছু কিছু আসন লাভ করবে। তাদের মধ্য থেকে বিশেষ করে ইসলাম-পছন্দ দল থেকে সর্দস্যরা পশ্চিম পাকিস্তানী ইসলাম-পছন্দ দলের সাথে মিলে পাকিস্তানের সালমিয়াত রক্ষা করতে পারবে। আওয়ামী লীগ অন্ততঃপক্ষে দেশের কর্তৃত্ব লাভ করে যদৃচ্ছা দেশ পরিচালনার সুযোগ লাভ করতে পারবে না।

এই আনন্দেই তাদের দিন কাটতে লাগল। এ দিকে রাজনীতির ঘুরপাকে সব দলগুলি ঘুরতে লাগল।

এমন সময়, বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূলে সমুদ্র ও তুফানের এক প্রচণ্ড তাণ্ডব হয়ে গেল, নভেম্বর মাসের বারই রাত্রে। সাগরের পানি বিশ তিরিশ ফুট উঁচা হয়ে তীর বেগে ছুটে এসে সমগ্র উপকূল গ্রাস করে ফেলল। দশ পনর লাখ মানুষ মরে গেল, সাগরের দিকে ভেসে গেল। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাসমুরগী কত মারা গেল তার হিসাব কেউ রাখতে পারে নাই। এমন প্লাবন দুনিয়াতে আর কোনকালে কোথাও হয় নাই, নুহ আলায়হে চ্ছালামের সময়ের প্লাবনের পরে। সে কালে লোকসংখ্যা দুনিয়াতে ত অনেক কম ছিল। সুতরাং এত লোক তখনও মরে নাই। এমন সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড় কোন দেশে হয় নাই।

এই খবর সামান্য পরিমাণে ঢাকা আসে তের ও চৌদ্দ তারিখে। কোন কোন সংবাদপত্রে মৃতের সংখ্যা দু' পাঁচশ, আবার দু' একটি কাগজে লিখল, হাজার হাজার।

বিদেশী রেডিও এবং বার্তাবাহক সংবাদপত্রগুলি প্রথম থেকেই মোটামুটি সঠিক খবর দিতে লাগল।

পনর তারিখে সন্ধ্যায় এক জনসভা থেকে ফিরে এসে এই খবর শুনলাম গভর্ণমেণ্ট হাউস থেকে। প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খাঁ চীন সফর করে ফিরে এসে এই সংবাদ পেয়ে সবাইকে নিয়ে সম্মেলনে মিলিত হয়েছেন। এর আগে গভর্ণর আহসানকে আমি বলেছিলাম, ইয়াহিয়া খাঁ চীন থেকে ফিরে এলে তার সাথে আমার দেখা করাব ব্যবস্থা করে দিতে। সেই খবর নিতে গিয়েই এই টাইডাল বোরের দুঃসংবাদ জানতে পারলাম।

ঐ রাতেই পাঁচটায় আমিনা বেগম, ফেরদৌস কোরেশী ও আমার এক পুত্রসহ নোয়াখালীর দিকে রওনা হয়ে পরদিন বেলা ১ টায় অকুস্থলে পৌছলাম। যা দেখলাম, তা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। মানুষ গরু মহিষ ছাগল ভেড়া মরে পড়ে আছে হাজার হাজার।

যারা বেঁচে আছে দৈবক্রমে, তারা বলল, কোন রকমেব সঙ্কেত তারা পায় নাই। রেডিও থেকে মহাবিপদসঙ্কেতের দশ নম্বর সংকেত উঠায়েছে কিন্তু গ্রামবাসীরা তার অর্থ বুঝতে পারে নাই।

অথচ পরে জানা গেল, বিদেশীরা, বিশেষ করে মার্কিণ পত্র-পত্রিকা ও রেডিও পাঁচ সাতদিন আগে থেকেই সতর্ক বাণী দিয়েছে। দক্ষিণপূর্ব দিকে প্রায় দু' তিন হাজার মাইল দূর থেকে এই উত্তাল তরঙ্গাবর্তের গতি তারা নির্দ্ধারণ করতে পেরেছে, আকাশে ঘুর্ণায়মান সেটিলাইট থেকে। দু'দিন আগেও তারা বলেছে, গঙ্গার মোহানা থেকে এই জোয়ারের বাণ সাত আট শ' মাইল দূরে আছে এবং প্রচণ্ড বেগে উত্তর দিকে আসছে। এই খবর আমাদের সরকারী অফিসে ঠিক ঠিক সময়ে এসে পৌচেছে। কিন্তু সরকার কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করে নাই—অর্থাৎ এ সব উপেক্ষা করেই চলেছে।

মার্কিণ দেশের নিউজ উইক ও টাইম ম্যাগাজিন কয় দিনের মধ্যেই এ সবের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করেছিল।

সতের তারিখে ফিরে এসে ইয়াহিয়া খাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে খবর নিয়ে জানতে পারলাম, তিনি ঐ দিন ভোরেই পিণ্ডি চলে গেছেন।

আশ্চর্য কথা। এতবড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল, আর তিনি চলে গেলেন পিণ্ডি। জানতে পারলাম ষোল তারিখে তিনি বিমানে করে দক্ষিণ অঞ্চল সফরে গিয়ে আকাশ থেকেই সব দেখে দু'এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এসেছিলেন। কোথাও নামেন নাই।

ইয়াহিয়া খাঁ ও তার সরকার তারপর চুপচাপ। সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে সাহায্যসামগ্রী আসতে লাগল বেশুমার। কিন্তু পিণ্ডি সরকার নীরব। এই সব সাহায্য সামগ্রীর বিলি ব্যবস্থাও করতে তারা যেন নারাজ। গভর্ণর আহ্‌সান দু'একদিনের জন্য দেখতে গেলেন তারপর ফিরে এলেন। ইয়াহিয়া খাঁ একটি কথাও বলেন না। বিভিন্ন দেশে শোকসভা করেছে—অগত্যা আমাদের সরকার নির্দেশ দিলেন কুড়ি তারিখে শোকদিবস পালনের জন্য।

পশ্চিম পাকিস্তানের কোন নেতা বা রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তা এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে একটি কথাও বলেন নাই। মামুলি শোকবার্তাও পাঠান নাই।

কয়দিন আগে আগষ্ট সেপ্টেম্বরে যে বন্যা হয়েছিল, তখন ইয়াহিয়া খাঁ প্রায় দিন দশেক ঢাকা অবস্থান করে বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করলেন। এবার এত বড় অভূতপূর্ব দুর্ঘটনা ঘটে গেল, দশ পনর লাখ লোক মারা গেল, আরও দশ বিশ লাখ মরার পথে, কিন্তু এ দিকে তিনি সম্পূর্ণরূপে উদাসীন হয়ে রইলেন।

এই অপরাধজনক উদাসীনতা ও নিষ্ক্রিয়তার কারণে মানুষের ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, শোষকশ্রেণী পূর্ব-পাকিস্তানকে

পাকিস্তানের অংশ হিসাবে মনে করেনা বরং কলোনী হিসাবে ব্যবহার করতে চায়। এই অঞ্চলের মানুষকে তারা ভালবাসতে পারেনা—এদের সুখদুঃখের অংশীদার তারা হতে চায়না।

এই দুর্ঘটনার পর স্পষ্ট বোঝা গেল যে, পাকিস্তানের দুই অংশ কোন অবস্থায়ই এক থাকতে পারে না। ৪ঠা ডিসেম্বর পল্টনে জনসভা হয়, তাতে এই কথা পরিষ্কার করে বলেছিলাম যে, এই ব্যবহারের পর ওদের সাথে আমাদের থাকা আর সম্ভব নয়।

সব দলের নেতারা (শেখ মুজিব বাদে) ইয়াহিয়া খাঁকে টেলিগ্রাম করে ঢাকা আসতে অনুরোধ করলেন। এবং বর্তমান অবস্থায় নির্বাচনের তারিখ পিছায়ে দেবার জন্যও অনুরোধ করলেন।

ইয়াহিয়া খাঁ এলেন পচিশ তারিখে। তার সাথে দেখা করার জন্য নেতৃবৃন্দ দরখাস্ত করলেন। তার কর্মচারীরা আশ্বাস দিলেন যে, তিনি দুর্গত এলাকা সফরে গিয়েছেন, ফিরে এসে সাক্ষাৎদান করবেন। কিন্তু ফিরে এসে তিনি ২৮ তারিখে সন্ধ্যায় এক রেডিও মারফত বক্তৃতা প্রচার করলেন। তিনি অবশ্য তার আগেই ঢাকা ছেড়ে চলে গেছেন।

ইতিমধ্যে শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন যে, দশ লাখ লোক মারা গেছে, যদি নির্বাচন বন্ধ করা হয় তাহলে আরও দশলাখ মারা যাবে অর্থাৎ তিনি বিপ্লব করবেন, যার ফলে দশ লাখ লোক মারা যাবে।

ইয়াহিয়া খাঁ গেলেন ঘাবড়ে। তার ঘোষণায় বললেন, নির্বাচন হবে ঠিক সময়েই, তবে দুর্গত এলাকার ১৮টি আসনের নির্বাচন জানুয়ারী মাসের সতের তারিখ পর্যন্ত স্থগিত রাখলেন।

ইয়াহিয়া খাঁর আটাশ তারিখে বেতার বক্তৃতার একটি অংশ অত্যন্ত নিরুৎসাহ ব্যঞ্জক। এল-এফ-ওতে তিনি শাসনতন্ত্রের পাঁচটি মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন মাত্র। আর কিছু

বলেন নাই। আমরা ভেবেছিলাম, তার এল-এফ-ও ত্রুটিপূর্ণ হলেও একবার নির্বাচন হয়ে গেলে সে সব ত্রুটি সংশোধন করে নেওয়া সম্ভব হবে। এবারের বেতারে তিনি কঠোর ভাষায় আবার পাঁচটি নীতির কথা উল্লেখ করে বললেন যে, যারা নির্বাচিত হয়ে এই নীতি গ্রহণ করতে অস্বীকার করবেন, তাদের স্পষ্ট ঘোষণা করছি যে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন নাই বলেই গণ্য করা হবে। অর্থাৎ ভোটে নির্বাচিত হয়ে গেলে তারা পরিষদ গৃহে প্রবেশের অনুমতি পাবেন না। পরিষদের দুয়ার তাদের জন্য রুদ্ধ। এক কথায় তাদের মেম্বারশিপ বাতিল।

এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখীন হলাম আমরা। একদিকে দশপনর লক্ষ লোকের লাশ চারদিকে ছড়ায়ে রয়েছে—তার মধ্যে অধিকাংশ লাশকে এখনও মাটির নীচে ঢুকান হয় নাই। তারপর লক্ষ লক্ষ লোক মরণোন্মুখ অবস্থায় কোন প্রকারে বেঁচে আছে। অন্যদিকে এল-এফ-ওর এই অপমানজনক ব্যথা আমাদের গভীরভাবে নিরুৎসাহ করে ফেলল। এতগুলি মৃতদেহের উপর নির্বাচনে অংশগ্রহণ কবা নৈতিক অধঃপতন বলে আমরা মনে করি। তার উপব এল-এফ-ওর এই অদ্ভুত ব্যাখ্যা গ্রহণ করে নির্বাচণে অংশগ্রহণ কবা সম্মানজনক বলে বিবেচনা করি নাই।

অন্যান্য দলেব অনেকেই নির্বাচনে অংশগ্রহণে বিরত থাকার ইচ্ছা জ্ঞাপন করে। মৌলানা ভাষানীর দল নির্বাচন করবে না স্থির করে।

আমার দলের কার্যকরী সংসদের সভা আহ্বান করা সম্ভবপর হয় নাই। সুতরাং দলের বিশিষ্ট সদস্য যাদের তাড়াতাড়ি পাওয়া গেল এবং টেলিফোন বা টেলিগ্রাম মারফত যোগাযোগ করা হল, তাদের মতামত গ্রহণ করে আমরা নির্বাচন থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। নুরুল আমিন ও কাউন্সিল মুসলিম লীগ

প্রথমে রাজী হয়, পরে মত পরিবর্তন করে। পাকিস্তানের প্রাক্তন এয়ার মার্শাল নুর খাঁও ঢাকা এসে আমার সাথে দেখা করেন। তিনিই শেষ পর্যন্ত কাউন্সিল লীগকে নিরস্ত করেন। নিজামে ইসলামের দুদু মিঞা আমাদের সাথে একমত। নুরুল আমিন শেষ পর্যন্ত নির্বাচন করবেন স্থির করলেন, কিন্তু তাঁর দলের মোহন মিয়া, নান্না মিয়া ও আরও অনেকে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন।

মুজাফফর আহমদও নিমরাজী হয়েছিল এবং আমি যখন বিবৃতি লিখছি, তখন এসে আলাপ-আলোচনা করে জানাবে বলে চলে যায়।

আমি আমার দলের পক্ষ থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করাব সিদ্ধান্তও সংবাদপত্রের বিবৃতি মারফত ঘোষণা করি।

তার পরদিন, মোহনমিয়া ও দুদু মিয়াকে সঙ্গে করে দক্ষিণ অঞ্চলে দুর্গতদের যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাই।

এর পরও দু'একবার নোয়াখালী চর এলাকায় ঐ উদ্দেশ্যে সদলবলে গিয়েছি।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জন্য মাঠ এক রকম খালিই রইল। জামাতে ইসলাম, মুসলীম লীগ ও পি, ডি, পির কয়েকজন ছাড়া আর কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নাই।

দুই কিস্তিতে নির্বাচন পর্ব শেষ হল।

সামরিক কর্তারা শেখ মুজিবকে পাশ্চত্য-ঘেষা মধ্যপন্থী বিবেচনা করে পূর্ণ সমর্থন দিলেন। নির্বাচন পর্বের শেষে এক পর্যায়ে তিনি শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী বলে বেসরকারী ভাবে ঘোষণা করে ফেললেন।

শিল্পপতিরাও তাকে সমর্থন দিল। তাদের ধারণা, শেখ মুজিব মুখে মুখে সমাজতন্ত্রের কথা বললেও ওটা বাতকে বাত। অন্তর

দিয়া তিনি ওটা চাননা। সুতরাং তারা নিরাপদে ব্যবসাবাণিজ্য চালায়ে যেতে পারবেন।

আওয়ামী লীগ এক শ' উনসত্তর আসনের মধ্যে এক শ' সাতষট্টি আসন লাভ করে। এটা যেমন অভূতপূর্ব, তেমনি বিস্ময়কর। ভুট্টোর পিপলস পার্টি এক শ' চুয়াল্লিশের মধ্যে আটাশি আসন দখল করল। কোন দলই অন্য অংশ থেকে একটি আসনও দখল করতে পারে নাই। দু'টি দলই আঞ্চলিক প্রাধান্য ও আধিপত্য লাভ করল।

কিন্তু আওয়ামী লীগ সারা পাকিস্তানে সর্বসমেত সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল। এবং এতকাল পরে পাকিস্তানের সবক্ষমতা পূর্ব-পাকিস্তানের হাতে এসে পড়বে, এ আশা ও উৎসাহ মানুষের মনে অভূতপূর্ব উত্তেজনার সৃষ্টি করল। এতকালের লাঞ্ছনা গঞ্জনার অবসান ঘটবে এই আশায় বুক বেঁধে মানুষ সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করতে লাগল। স্বৈরাচারের অবসান ঘটবে। মানুষ গণতান্ত্রিক জীবনের স্বাদ ভোগ করবার সুযোগ লাভ করবে। কিন্তু—?

তামাম শুদ